প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠউপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠউপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠউপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয় পাঠউপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তাঁর নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠউপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ ঃ অক্টোবর, 2013

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ইতিহাস **স্নাতকোত্তর স্তর**

পঞ্চম পত্র

পর্যায়—1

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1–4 :	ড. সুমন্ত্র দত্ত	ড. চন্দন বসু

পর্যায়—2

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1–2 :	সুকন্যা সরকার	ড. চন্দন বসু
একক 3–4 :	অধ্যাপক শান্তনু ব্যানার্জী	ঐ

পর্যায়—3

মূল রচনা	অনুবাদ	সম্পাদনা
অধ্যাপিকা অপরাজিতা ধর	অধ্যাপক সুরজিৎ গুপ্ত	ড. চন্দন বসু

পর্যায়—4

মূল রচনা	অনুবাদ	সম্পাদনা
অধ্যাপিকা অপরাজিতা ধর	অধ্যাপিকা নীলাঞ্জনা মুখার্জী	ড. চন্দন বসু

পর্যায়—5

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1–5 :	ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায়	ড. চন্দন বসু

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায়—1

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1–4 :	ড. চিত্তব্রত পালিত	অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার

পর্যায়—2

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1–3 :	ড. সুমন্ত্র দত্ত	ড. চন্দন বসু

পর্যায়—3

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1–4 :	মৌমিতা মজুমদার	অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত

পর্যায়—4

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1–4 :	ড. রূপকুমার বর্মণ	অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG History 5 & 6

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পঞ্চম পত্র

পর্যায়—1

একক	1	❑ ১৭৮৯ খৃঃ পূর্বে ফ্রান্সের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ফরাসী পটভূমিকা	9–25
একক	2	❑ ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগতি	26–51
একক	3	❑ ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল ও প্রভাব	52–62
একক	4	❑ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট	63–96

পর্যায়—2

একক	1	❑ ইউরোপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রসার	97–113
একক	2	❑ ইউরোপীয় রাজনীতির উপর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব	114–122
একক	3	❑ বিসমার্কের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি	123–135
একক	4	❑ জার্মানিতে শিল্প বিপ্লব, বিসমার্কের যুগের অবসান ও কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের নেতৃত্বে জার্মানির পররাষ্ট্র নীতি	136–148

পর্যায়—3

একক	1	❑ ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ঃ সংজ্ঞা ও ধারাবাহিকতা	150–155
একক	2	❑ শিল্প বিপ্লবের কারণসমূহ ঃ এটি কেন ইংল্যান্ডে প্রথম ঘটেছিল?	156–159
একক	3	❑ কৃষি, পরিবহন, জনসমাজগত বিপ্লব	160–167
একক	4	❑ শিল্প বিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবসমূহ	168–172

পর্যায়—4

একক	1	❑ ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উত্থান	174–177
একক	2	❑ ইতালির ঐক্য	178–181
একক	3	❑ জার্মানির ঐক্য	182–187
একক	4	❑ জাতীয়তাবাদের উত্থানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের অবক্ষয়	188–194

পর্যায়—5

একক	1	❑ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট	196–209
একক	2	❑ শান্তি সংস্থাপন প্রক্রিয়া	210–219
একক	3	❑ ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন	220–235
একক	4	❑ ইউরোপে উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান	236–249
একক	5	❑ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ প্রেক্ষাপট ও পরিণতি—ঠাণ্ডা যুদ্ধের আগমন	250–262

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায়—1

একক	1	❑ ঠাণ্ডা লড়াই-এর পটভূমি বা সূচনা	263–268
একক	2	❑ ইউরোপে পট পরিবর্তন	269–285
একক	3	❑ তৃতীয় বিশ্বে ঠাণ্ডা লড়াই	286–292
একক	4	❑ নির্জোট আন্দোলন ও বিশ্ব রাজনীতিতে তার প্রভাব	293–298

পর্যায়—2

একক	1	❑ গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উত্থান এবং চীন-সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্ক	300–330
একক	2	❑ আমেরিকা ভূখণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা ঃ কিউবা বা চিলি	331–356
একক	3	❑ আফ্রিকায় উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন ঃ আলজেরিয়া ও কঙ্গো	357–378

পর্যায়—3

একক 1 ❑ ঔপনিবেশিকতাবাদ ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে বিতর্ক 380–384

একক 2 ❑ নিরস্ত্রীকরণের বিভিন্ন পর্যায় 385–390

একক 3 ❑ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 391–395

একক 4 ❑ বর্ণবৈষম্যবাদ 396–400

পর্যায়—4

একক 1 ❑ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঃ গরবাচভের সময়কাল—ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান—একমেরু বিশ্বের দিকে যাত্রা 401–409

একক 2 ❑ বিশ্বায়ন ও তার প্রভাব 410–420

একক 3 ❑ ভারত ও দক্ষিণ এশিয়া 421–433

একক 4 ❑ ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর ভারতের বৈদেশিক নীতি 434–444

একক ১ ❐ ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ফ্রান্সের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ফরাসী পটভূমিকা

গঠন

১.০ উদ্দেশ্যসমূহ
১.১ সূচনা
১.২ ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক কারণ বা বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের সামাজিক পরিস্থিতি
১.৩ ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণ বা বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি
১.৪ ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণ বা বিপ্লবের জন্য বুরবোঁ রাজতন্ত্রের দায়িত্ব
১.৫ ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা
১.৬ উপসংহার
১.৭ অনুশীলনী
১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ ❐ উদ্দেশ্যসমূহ

এই এককের উদ্দেশ্য হ'ল ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে যে সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল তা বিশ্লেষণ করা। সেই সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রে দার্শনিকদের ভূমিকা কতখানি ছিল তা এবং বিপ্লবের অন্যান্য কারণগুলিও আলোচিত হবে। এর মাধ্যমে একথা হৃদয়ঙ্গম করা যাবে যে কোন্ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ফরাসী বিপ্লবের মত আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল।

১.১ ❐ সূচনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে)। এই বিপ্লব ফ্রান্সে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, সামাজিক অসাম্য এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এক নবযুগের সূত্রপাত করেছিল এবং দেশকালের সীমানা অতিক্রম করে ইউরোপ তথা বিশ্বে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফরাসী বিপ্লব কোনো একক ঘটনার ফলশ্রুতি ছিল না। নানাবিধ বিষয়ের ঘাত-সংঘাত এই মহান বিপ্লবকে সম্ভব করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে তাই আজও ঐতিহাসিক বিতর্কের অবসান ঘটেনি। বর্তমান এককে সেই কারণগুলির যথাসম্ভব নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করা হবে।

১.২ ❒ ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক কারণ বা বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের সামাজিক পরিস্থিতি

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক কারণকে বহু ঐতিহাসিক বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। একথা বলা যায় যে, বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের (যা পুরাতনতন্ত্র বা Ancien Regime নামে পরিচিত) সামাজিক পরিস্থিতি সংখ্যাগরিষ্ঠ ফরাসী জনগণের অসন্তোষকে তীব্র করে তুলেছিল। ফরাসী সমাজের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো, সামাজিক অসাম্য, বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণির প্রাধান্য, সমাজ সংস্কারে রাজার উদ্যোগহীনতা ইত্যাদি তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল, তাই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অপেক্ষা অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই বিপ্লবের পশ্চাতে অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

বিপ্লবপূর্ব ফরাসী সমাজ ছিল প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। যথা—সুবিধাভোগী (Privileged বা Haves) এবং সুবিধাহীন (unprivileged বা Have nots)। আর্থ-সামাজিক অধিকার এবং মর্যাদার বিচারে এই শ্রেণিবিভাগ গড়ে উঠেছিল। এই সামাজিক অসাম্যের প্রতিষ্ঠানগত রূপ ছিল বিভিন্ন 'এস্টেট' (Estate)। ফ্রান্সের যাজক সম্প্রদায় (Clergy) ছিলেন প্রথম শ্রেণি (First Estate), অভিজাতবর্গ (Nobility) দ্বিতীয় শ্রেণি (Second Estate) এবং অবশিষ্ট জনগণ (Commoners) তৃতীয় শ্রেণি (Third Estate)। তবে এই Estate তিনটিকে সামাজিক শ্রেণি বলা ঠিক নয়। প্রতিটি সম্প্রদায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন এবং এঁদের মধ্যে পারস্পরিক বিরুদ্ধতাও ছিল।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের সমগ্র জনসংখ্যার এক শতাংশেরও কম ছিলেন প্রথম শ্রেণিভুক্ত যাজক সম্প্রদায়। এঁরা ছিলেন চার্চ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত এবং কতকগুলি বিশেষ রাজনৈতিক, বিচার এবং রাজস্ব সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরেও এঁদের বাধাহীন প্রভাব ছিল। ফরাসী আইন অনুযায়ী একমাত্র স্বীকৃত ধর্মীয় সংস্থা ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চ। সমগ্র ফ্রান্সের প্রায় এক-দশমাংশ জমি বা ভূসম্পত্তি ছিল চার্চের দখলে। যাজক সম্প্রদায় প্রশাসনকে কোন প্রত্যক্ষ কর দিতেন না। ভূসম্পত্তি থেকে প্রভূত আয়ের (ফরাসী মন্ত্রী নেকারের মতে চার্চের বাৎসরিক আয় ছিল আনুমানিক ১৩ কোটি লিভ্‌র) পাশাপাশি এঁরা প্রজাদের কাছ থেকে 'ধর্মকর' (Tithe) ও অন্যান্য নানাবিধ কর (মৃত্যু-কর, নামকরণ-কর, বিবাদ-কর ইত্যাদি) আদায় করতেন, বহু উচ্চ যাজক গ্রামে সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতেন। পরিবর্তে তাঁরা রাষ্ট্রকে দিতেন একপ্রকার স্বেচ্ছাকর, যার পরিমাণ তাঁরাই স্থির করতেন এবং 'দেসিম' বা ফ্রাঁর এক-দশমাংশ, যার মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ৬৫ লক্ষ লিভ্‌র। অপরিসীম ঐশ্বর্য ও ভোগবাদী জীবন যাজকদের মধ্যে নৈতিক অবনতি সুস্পষ্ট করে তুলেছিল। অবিচার, ব্যভিচার ও দুর্নীতি রোমান ক্যাথলিক চার্চকে জনমানসে হেয় করে তুলেছিল।

বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সে যাজক সম্প্রদায় যে একটিই সুনির্দিষ্ট শ্রেণি ছিল বা তাঁদের সকলেই সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিলেন তা নয়। উচ্চ যাজকরা অভিজাত সম্প্রদায়ের ভূস্বামীদের মতই সব সুবিধা ও অধিকার ভোগ করতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আর্চ-বিশপ, বিশপ, ক্যানন, মঠাধ্যক্ষ প্রভৃতি। এঁরা অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে পোপ কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। অপরদিকে উচ্চপদস্থ যাজকদের সুপারিশ অনুযায়ী

তৃতীয় শ্রেণি থেকে নিযুক্ত হতেন নিম্নপদস্থ যাজকেরা (ক্যুরে, ভিকার, গ্রামীণ পাদ্রী ও অন্যান্যরা)। এঁদের সামাজিক মর্যাদা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। দারিদ্র ছিল এঁদের নিত্যসঙ্গী। এঁদের প্রতি উচ্চপদস্থ যাজকদের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত হীন, চার্চের ভূসম্পত্তি ভোগদখলের অধিকার নিম্নপদস্থ যাজকদের ছিল না। শহরাঞ্চলে এঁদের অনেকেই সমকালীন প্রগতিশীল সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিলনে। ছিলেন শিক্ষিত। স্বাভাবিক কারণেই উচ্চপদস্থ যাজকদের প্রতি এঁদের ঘৃণা ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, নৈতিক সঙ্কট এবং নিম্নস্তরের যাজকদের অসন্তোষ যাজক সম্প্রদায়ের সংহতি নষ্ট করেছিল, ফলে বিপ্লবের সময় নিম্নস্তরের যাজকেরা তৃতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন।

ফরাসী সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায় (Nobility)। এঁরা ফ্রান্সের সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র দেড় শতাংশ ছিলেন। তা সত্ত্বেও রাজ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছিলেন এঁরা। ফরাসী সমাজ ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে এঁরা পরিচিত ছিলেন। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অধিকারকে ভিত্তি করে ফ্রান্সে এঁদের উত্থান ঘটেছিল।

সম্প্রদায় হিসেবে অভিজাতদের অনেকেই বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ পদগুলি তাঁদের জন্যই সংরক্ষিত থাকত। দক্ষতা বা যোগ্যতা সত্ত্বেও সাধারণ জনগণ এইসব পদের অধিকারী হতে পারতেন না। স্বীয় জমিদারীতে বিচারের অধিকার, গ্রামাঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণ, শিকার ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে তাঁদের ছিল একক কর্তৃত্ব। অপরদিকে কৃষকসম্প্রদায়ের সেবা (service) এবং করের মাধ্যমে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন এঁরা। এছাড়া বিভিন্ন বাধ্যতামূলক কর যেমন ''তেই'', ''ভ্যাঁতিয়েম'', ''ক্যাপিটেশন'' প্রভৃতি থেকে তাঁদের অব্যাহতি ছিল, এই অভিজাত শ্রেণির একটি বিশেষত্ব ছিল বংশকৌলিন্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে যাজক সম্প্রদায়ের মত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও সংহতির পরিবর্তে পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীর আবির্ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অভিজাতদের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রধান ছিল দরবারী অভিজাত (Court Nobility) বা প্রাচীন বনেদী ঘরের অভিজাত। রাজার অনুগ্রহভাজন এবং ধনী, বিলাসী এই অভিজাতদের অভিজাত্য ছিল জন্মগত। রাজার সভাসদ, সেনাপতি, বিচারবিভাগীয় উচ্চপদ, প্রাদেশিক শাসনকর্তা, রাজদূত এবং 'ইনটেনডেন্টের' কাজ এঁদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। একথা সত্য যে আয় ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের অভাব এঁদের ঋণগ্রস্ত করে তুলেছিল ফলে পুরাতনতন্ত্রের বিশেষ সুবিধাগুলিকে স্থায়ী করতে এঁরা ছিলেন অত্যধিক আগ্রহী।

বংশকৌলীন্য ব্যতীত কর্মসূত্রেও আভিজাত্য অর্জনের প্রথা ফ্রান্সে প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুরবোঁ রাজারা অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্তের কাছে বিভিন্ন প্রশাসনিক উচ্চপদ বিক্রয় করে তাঁদের দ্বারা এক নতুন অভিজাত শ্রেণি সৃষ্টি করতে থাকেন। এঁরা 'পোশাকী অভিজাত' (Nobility of the Robe) নামে পরিচিত। কিছু ক্ষেত্রে এই আভিজাত্য বংশানুক্রমিকভাবেই দেওয়া হত এবং প্রধানত বিত্তবান বুর্জোয়া সম্প্রদায় থেকে আবির্ভূত এই অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বংশকৌলিন্যে প্রাপ্ত আভিজাত্যের পার্থক্য বিপ্লবের প্রাক্কালে প্রায় মুছে গিয়েছিল। পার্লামেন্টগুলির সদস্যপদ দখল এঁদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এনে দিয়েছিল।

অভিজাতদের অপর একটি গোষ্ঠী 'প্রাদেশিক অভিজাত' বা 'গ্রামীণ অভিজাত' হিসেবে পরিচিত

ছিলেন। উপরিউক্ত দুধরনের অভিজাতদের তুলনায় এঁরা ছিলেন অনেকটাই দরিদ্র। এঁদের আয়ের একমাত্র উৎস ছিল কৃষকদের উপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকার। অষ্টাদশ শতকের দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের ফলে এঁদের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটছিল, ফলে প্রাপ্য কর আদায়ের জন্য কৃষকের উপর তাদের নিপীড়ন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সে অভিজাত সম্প্রদায় সকলেই সচ্ছল ছিলেন না, ফরাসী রাজতন্ত্রের সঙ্গে অভিজাতদের সুসম্পর্ক ছিল একথাও সঠিক নয়। অভিজাত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ক্ষোভ ছিল। ব্যক্তিগত স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সম্রাট চতুর্দশ লুই অভিজাত প্রতিষ্ঠানগুলিকে দমন করেছিলেন যদিও তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়নি। এইসকল অভিজাত প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম ছিল পার্লামেন্ট বা পার্লামঁ। ১৭৮৯ খ্রিঃ ফ্রান্সের তেরোটি পার্লামেন্টের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ছিল প্যারিসের পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টের প্রধান কাজ ছিল রাজার কোন নির্দেশনামা পার্লামেন্টের অধিবেশনে নথিভুক্ত করা। তবে নথিভুক্ত করার আগে এবিষয়ে সদস্যরা অভিযোগ জানাতে পারতেন। অপরপক্ষে রাজাও রাজকীয় অধিবেশন আহ্বান করে তাঁর নির্দেশ নথিভুক্ত করাতে পারতেন। অভিজাত সম্প্রদায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে রাজার বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন। বিশেষত আর্থিক বিষয়ে রাজকীয় নির্দেশনামার বিরুদ্ধে তাঁদের আপত্তি ছিল। প্রাদেশিক সভাগুলিকেও (Estate) অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সম্প্রদায়গতভাবে নিজেদের সুযোগসুবিধা ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা এবং সেইসঙ্গে রাজকীয় ক্ষমতা ভোগ করা। বুরবোঁ রাজতন্ত্র ক্রমশ অভিজাতদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছিলেন এবং অভিজাতরাও সমস্তরকম রাজকীয় সংস্কারের বিরোধী হয়ে উঠছিলেন, যার ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নি তাঁরাই প্রথম প্রজ্বলিত করেছিলেন।

ফ্রান্সের অবশিষ্ট জনগণ ছিলেন তৃতীয় শ্রেণির (Third Estate) অন্তর্গত। ঐতিহাসিক লেফেভরের মতে ফ্রান্সের প্রায় ছিয়ানব্বই শতাংশ মানুষ এই শ্রেণিভুক্ত। তবে এই সম্প্রদায়ও একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণির ছিল না। এঁদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য এবং সামাজিক প্রভেদও ছিল সুস্পষ্ট। বিত্তশালী বুর্জোয়া থেকে দরিদ্রতম ভিক্ষুক পর্যন্ত সকলেই ছিলেন এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। স্বাভাবিক কারণেই এঁদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ছিল।

তৃতীয় শ্রেণির নেতৃত্বে ছিলেন সংখ্যালঘু বুর্জোয়া সম্প্রদায়। এঁদের মধ্যেও স্তরভেদ ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল। ঐতিহাসিক লেফেভরের মতে, অর্থের কারবারী এবং অর্থনীতির নিয়ামক উচ্চ বুর্জোয়াদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন প্রশাসনিক আমলা, ব্যাঙ্ক মালিক, বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি প্রমুখ। এঁদের প্রতিপত্তি ছিল কর্মার্জিত বিত্তের ওপর নির্ভরশীল এবং এঁরা কোনভাবেই রাজশক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না, তবে বংশকৌলীন্যের অভাবে ফরাসী সমাজে অভিজাতদের সমান মর্যাদা এঁদের ছিল না। ফলে, অভিজাত পরিবারের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে এঁরা আগ্রহী ছিলেন। ফরাসী সরকার প্রায়শই এঁদের কাছ থেকে আর্থিক ঋণ গ্রহণ করতেন। অষ্টাদশ শতকে এঁরা প্রায় অভিজাতদের মতই বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল 'পোশাকী অভিজাত' বা কর্মসূত্রে অভিজাত গোষ্ঠী। এঁদের ওপর ছিল পরোক্ষ কর সংগ্রহের দায়িত্ব, অনেক সময়ই

যা বলপূর্বক আদায় করা হ'ত। ফলে, জনগণের কাছে এঁরা বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন না। অপরদিকে বুরবোঁ রাজতন্ত্র ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যের ওপর নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করায় ও পণ্যশুল্ক চাপানোয় এঁরা সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

বুর্জোয়াদের দ্বিতীয় স্তরে ছিলেন বিভিন্ন বিত্তজীবি মানুষ। যাঁদের 'পাতি বুর্জোয়া' (Bourgeois de petit) নামেও অভিহিত করা হ'ত। এঁদের মধ্যে চাকুরীজীবী, আইনজীবী, অধ্যাপক, মাঝারি রাজকর্মচারী, শিক্ষক, লেখক, প্রকাশক প্রমুখ ছিলেন। বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁরাই ছিলেন বুদ্ধিমান, সমাজসচেতন ও নব্য দর্শনের ধারক ও বাহক। এঁরাই অভিজাতদের বংশকৌলীন্য ও বিশেষ অধিকারকে আক্রমণ করেন এবং বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন।

বুর্জোয়াদের সর্বনিম্ন স্তরে ছিলেন প্রধানত শ্রমজীবী অথচ দরিদ্র ও অশিক্ষিত শ্রেণির মানুষেরা। উচ্চ বুর্জোয়াদের কাছে এঁরা ছিলেন তাচ্ছিল্যের পাত্র। ফলে, উচ্চ বুর্জোয়াদের প্রতি তাঁদের অসন্তোষ চাপা ছিল না।

ফরাসী সমাজের সর্বাপেক্ষা অসন্তুষ্ট শ্রেণি ছিল বুর্জোয়া সম্প্রদায়। তাঁদের মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বও ছিল বেশ তীব্র। কর্মার্জিত বিত্ত এবং শিক্ষা এঁদের উচ্চাশা বৃদ্ধি করেছিল এবং জন্ম দিয়েছিল আত্মবিশ্বাসের। উচ্চ বুর্জোয়ারা নিজেদের অভিজাতদের সমগোত্রীয় মনে করতেন কিন্তু খুব অল্প বুর্জোয়াই আভিজাত্যে উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। পুরোনো জন্মভিত্তিক আভিজাত্যের বদলে নতুন বিত্ত ও কর্মভিত্তিক আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। আবার মধ্যবর্তী বুর্জোয়ারা উচ্চ ও নিম্ন বুর্জোয়াদের সম্পর্কে হীনমন্যতা ও উন্নাসিকতায় আক্রান্ত ছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন এমন একটি সমাজব্যবস্থা যেখানে জন্মকৌলীন্যের পরিবর্তে অর্থ ও বিদ্যা প্রাধান্য পাবে। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য পুরাতনতন্ত্রের বিনাশ অনিবার্য ছিল বলে এরা উপলব্ধি করেছিলেন। ঐতিহাসিক লেফেভর দেখিয়েছেন নতুন দর্শনের প্রভাবে এঁরা নিজেদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল নাগরিক সাম্য, ধর্ম-সহিষ্ণুতা এবং নানাবিধ বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি।

ফ্রান্সে তৃতীয় শ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল কৃষক সম্প্রদায়। এঁরা ছিলেন ফ্রান্সের জনসংখ্যার শতকরা আশিভাগ। একথা ঠিক পূর্ব ইউরোপের তুলনায় ফরাসী কৃষকরা ছিলেন স্বাধীন এবং সচ্ছল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ভূমিদাস প্রথা প্রায় লুপ্ত হয়েছিল। জমির স্বত্বও তাঁরা ভোগ করতে পারতেন। তবে কৃষকসমাজও অখণ্ড ছিল না, এঁদের মধ্যেও ছিল নানা স্তর। স্বাধীন কৃষক (Tenancier) নিজের জমি নিজেই চাষ করতেন। এঁরা সমগ্র ফ্রান্সের এক-তৃতীয়াংশ জমির মালিক ছিলেন। এঁদের পরবর্তী স্তরে ছিলেন ভাগচাষী বা বর্গাচাষী (Matayer)। এঁরা জমিদারদের জমি ভাগে চাষ করতেন এবং সকলপ্রকার কর প্রদানের পর উৎপন্ন ফসলের মাত্র কুড়ি শতাংশ এঁদের হাতে থাকত। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ভূমিহীন কৃষকরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। কৃষিকাজের প্রাচীন পদ্ধতি, বৎসরে আংশিকভাবে চাষ, দুই বা তিন বৎসর অন্তর অনাবাদী জমিতে ফসল বোনা ইত্যাদি কৃষকের অনাহার ও অবনতির একটা বড় কারণ ছিল। রাজকীয়, সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মীয় করের ভারে তাঁরা ন্যুব্জ ছিলেন। কৃষকদের সঙ্কটের আরো একটি কারণ ছিল ঐতিহাসিক কোবানের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা জমির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করছিল। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে জমি বিভক্ত হয়ে কৃষিজমিগুলি ক্ষুদ্র থেকে

ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়ছিল যা নিশ্চিতভাবে কৃষি সঙ্কটের সৃষ্টি করছিল। করভারে জর্জরিত কৃষকের আয়ের আশি শতাংশই ব্যয় হত করদানের জন্য। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সমানুপাতিক হারে কৃষকদের আয়বৃদ্ধি না হওয়ায় অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র হয়েছিল।

তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে আর একধরনের মানুষ ছিলেন যাঁদের বলা হত সাঁ কুলোৎ বা শহরের জনতা। প্রধানত দৈহিক শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদনে নিযুক্ত মানুষরাই এই শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে কারিগর ও শ্রমিক ছাড়াও ছিলেন দিনমজুর, পত্রবাহক, ক্ষুদ্রব্যবসায়ী, ভারবাহী মজুর, মালী, কাঠুরিয়া, গৃহভৃত্য, রাজমিস্ত্রী, ছোট দোকানদার প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন দরিদ্র ও ভবঘুরে মানুষ। এই শ্রেণির মানুষেরা ছিলেন অভিজাত ও বুর্জোয়াদের অবজ্ঞার পাত্র। অর্থনৈতিক সঙ্কট এদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ঐতিহাসিক লাব্রুশের মতে, প্রাক্-বিপ্লব যুগে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল ষাট থেকে পঁয়ষট্টি শতাংশ কিন্তু সেই তুলনায় মজুরি বৃদ্ধি হয়েছিল বাইশ শতাংশ। ফলে এঁদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। এঁদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল অভিজাত ব্যবসায়ীরা, তাঁরা মনে করতেন যে ব্যবসায়ীরা শস্য মজুত করে কৃত্রিম দুঃর্ভিক্ষ সৃষ্টি করছেন। সাঁ-কুলোৎদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা ও শ্রেণিচেতনা হয়ত ছিল না কিন্তু দারিদ্র্য ও ক্ষুধা তাঁদের মধ্যে তীক্ষ্ণ বিপ্লবী চেতনার জন্ম দিয়েছিল বলেই মনে করেছেন ঐতিহাসিক মিশেল।

প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সের সামাজিক পরিস্থিতির উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, সামাজিক অসাম্য ছিল এ যুগের ফ্রান্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রথম দুই শ্রেণি ভোগ করতেন দায়িত্বহীন অধিকার। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃতীয় শ্রেণির বিশেষ অধিকার না থাকলেও এঁরা ছিলেন করভারে জর্জরিত। যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধা ও অধিকার এবং অহমিকা শ্রেণিবৈষম্যের শিকার তৃতীয় শ্রেণিকে, বিশেষত শিক্ষিত বুর্জোয়া ও সম্পদশালী বণিক গোষ্ঠীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এঁদের আহত মর্যাদাবোধ বিপ্লবের অন্যতম কারণ বলে অনেক ঐতিহাসিকের বিশ্বাস। নেপোলিয়ন বোনাপার্টও স্বীকার করেছিলেন স্বাধীনতার দাবি ছিল অজুহাত মাত্র, বিপ্লবের প্রধান কারণ ছিল অহমিকা, একথা মেনে নিয়েছেন ঐতিহাসিক ওলার (Aulard)। অবশ্য অ্যালবার্ট সবুল ওলারের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছেন যে ওলারের বক্তব্যকে মেনে নিলে একথা স্বীকার করতে হয় যে, বুর্জোয়া সম্প্রদায়ই ছিল তৃতীয় শ্রেণির একমাত্র চালিকাশক্তি, এই শ্রেণির অন্যান্য জনগোষ্ঠীর যেন কোন চাহিদাই ছিল না। তবে সামাজিক বৈষম্য যে বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ একথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি ঐতিহাসিক জুরেস, মাতিয়ে লেফেভ্‌র প্রমুখ ঐতিহাসিকবৃন্দ।

১.৩ ❒ ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণ বা বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বা ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণ নির্ণয় ঐতিহাসিকদের কাছে একটি আকর্ষণীয় বিষয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিকেরা এটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের আর্থিক পরিস্থিতি যে দুর্বল ছিল একথা সত্য নয়। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর সময় ফ্রান্স যে অনাবশ্যক যুদ্ধে বিপুল অর্থব্যয় করেছিল তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দের

পর ফ্রান্সের সামুদ্রিক বা ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। এক স্থায়ী মুদ্রা ব্যবস্থা বাণিজ্যের অগ্রগতিকে সহায়তা করেছিল। ঐতিহাসিক কোবান দেখিয়েছেন যে, ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফ্রান্সের বিখ্যাত বন্দরগুলির (মার্সাই, বর্দু, নান্তে, লা রচেল প্রভৃতি) ব্যস্ততা এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির প্রমাণ। বলা যায়, ইংলন্ডের ঠিক পরেই ছিল ফরাসী বাণিজ্যের স্থান, বন্দর-নগরী ব্যতীত অন্যান্য ফরাসী শহরগুলির (প্যারী, রেলি প্রভৃতি) আয়তন ও জাঁকজমকের বৃদ্ধি আর্থিক সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দেয়। ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্বাণিজ্যের অবস্থা বহির্বাণিজ্যের মত না হলেও সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যের পরিমাণ এবং অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। আন্তর্বাণিজ্যের স্বাভাবিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ছিল ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ শুল্কব্যবস্থা। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে নানাপ্রকার শুল্কের প্রচলন ছিল। সমগ্র দেশে একটি সার্বিক শুল্কনীতির অভাব ফ্রান্সের অভ্যন্তরে অবাধ বাণিজ্যের সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করেছিল। এজন্য অবশ্য দায়ী ছিলেন 'ফার্মার জেনারেল' নামক কর আদায়কারী ব্যক্তিগণ বা অন্যান্য গোষ্ঠী যাঁরা অভ্যন্তরীণ শুল্কনীতি বজায় থাকায় লাভবান হচ্ছিলেন, ফলে, বুরবোঁ রাজা ও মন্ত্রীদের কারও কারও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এঁদের বিরোধিতার ফলে তা প্রচলন করা সম্ভব হয়নি। গ্রামাঞ্চলের অযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা গ্রামীণ উৎপাদকদের উৎপাদন বৃদ্ধির আগ্রহ নষ্ট করে দিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে প্রাক্-বিপ্লব যুগে ফ্রান্স দরিদ্র দেশ না হলেও কিছু ভুল নীতি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একথা ঠিক যে ১৭৩০-এর দশক থেকে ১৭৭০ পর্যন্ত ফরাসী অর্থনীতির বিশেষ উন্নতি হয়েছিল এবং বাণিজ্যের বিশেষত বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছিল কিন্তু এর সঙ্গে যদি শিল্পক্ষেত্রে এক পরিকল্পিত নীতি ও উদ্যোগ নেওয়া যেত তাহলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সঙ্কট সম্ভবত ঘনীভূত হত না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাট বা সত্তরের দশকে ফ্রান্সে শিল্পায়নের গতি রুদ্ধ ছিল তা নয় কিন্তু ফরাসী প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা যেমন কোন সুষ্ঠু শিল্পনীতির কথা ভাবেননি তেমনি বণিকগোষ্ঠীও শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করার কথা চিন্তা করেননি। যেটুকু পুঁজি শিল্পে নিয়োজিত হত তার ক্ষেত্র ছিল কুটিরশিল্প, ব্যক্তিগত উদ্যোগে ফ্রান্সে বেশ কিছু ছোট শিল্প গড়ে উঠেছিল। কিন্তু মধ্যযুগীয় উৎপাদন পদ্ধতি এবং সরকারের কার্যকরী উদ্যোগের অভাব, অভ্যন্তরীণ শুল্কনীতি শিল্পোন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়া ফ্রান্সে শিল্পের বিকাশে আরেকটি প্রতিবন্ধকতা ছিল গিল্ডগুলির অস্তিত্ব। শিল্পমালিকেরা গিল্ডের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ফরাসী মন্ত্রী তুর্গোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গিল্ডগুলির সম্পূর্ণ অবসান সম্ভব হয়নি, যা শিল্পমালিকদের ক্ষুব্ধ করেছিল।

শিল্পের পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়নি, কৃষির উন্নতির পিছনে উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয় করা হয়নি। একথা বলা হয় যে ফ্রান্সে কৃষিব্যবস্থা খুবই পশ্চাৎপদ ছিল আর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফ্রান্সের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ পড়েছিল কৃষিব্যবস্থার উপর এবং কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে। সেইসঙ্গে ১৭৮৮ খ্রিঃ ব্যাপক শস্যহানি ও খাদ্যসঙ্কট কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে বিপ্লবের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। ধনী ব্যবসায়ী বা প্রশাসনিক আমলাগণ তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারলেও গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের দারিদ্র ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, এই অবস্থায় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধিও সম্ভব ছিল না, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এই শ্রেণির মানুষের দুরবস্থাকে আরো বৃদ্ধি করেছিল।

এই অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যাভাব, বেকারী দূরীকরণ বা প্রশাসনিক ব্যয়সঙ্কোচের বিশেষ উদ্যোগ রাজকীয় সরকারের তরফে নেওয়া হয়নি। ঐতিহাসিক গুডউইন দেখিয়েছেন ১৭৮৯ খ্রিঃ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬৩ কোটি লিভ্র এবং ঋণের সুদ হিসেবে ব্যয় হয়েছিল ৩১ কোটি ৮০ লক্ষ লিভ্র। ১৭৩৩-১৭৮৩ খ্রিঃ মধ্যে যুদ্ধবাবদ ফ্রান্সের ব্যয় হয়েছিল ৪০০ কোটি লিভ্র। আর ঐতিহাসিক কোবান বলেছেন যে এই আর্থিক অনটন মেটানোর জন্য প্রয়োজন ছিল কর ব্যবস্থার পরিবর্তন। কিন্তু ফ্রান্সের মধ্যযুগীয় কর ব্যবস্থা এই সঙ্কটকে আরো তীব্র করে তুলেছিল।

ত্রুটিপূর্ণ ও অযৌক্তিক করনীতির ফলে ফ্রান্সের যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় অধিকাংশ জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও করপ্রদান থেকে একপ্রকার মুক্ত ছিল। রাষ্ট্রের আদায়ীকৃত করের ৯৫ শতাংশ বহন করতে হত তৃতীয় শ্রেণিকে। প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সে তিনটি প্রত্যক্ষ কর প্রচলিত ছিল। সেগুলি হল 'তেই' (Taille) অর্থাৎ মোট আয়ের উপর কর বা ভূমিকর, 'ক্যাপিতসিঁয়' (Capitation) অর্থাৎ এক ধরনের উৎপাদন ভিত্তিক আয়কর এবং 'ভ্যাঁতিয়েম' (Vingtieme) অর্থাৎ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উপর আয়কর। পূর্বেই বলা হয়েছে, যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় এই করগুলি এড়িয়ে যেত এবং কর প্রদানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়ত তৃতীয় শ্রেণির উপর। প্রত্যক্ষ করগুলি ছাড়াও তৃতীয় শ্রেণিকে কিছু পরোক্ষ কর দিতে হত যেমন 'গ্যাবেল' বা 'লবণশুল্ক', বাণিজ্যশুল্ক ইত্যাদি। এছাড়া চার্চকে দিতে হত ফসলের $\frac{(}{((}$ ভাগ বা Tithe। এছাড়া ছিল সামন্ত প্রভুকে দেয় 'কর্ভি' বা শ্রমকর, 'সঁস' বা নগদ আবাসন কর, শাঁপার' বা পণ্যের আবাসন কর, 'উৎ' বা জমি হস্তান্তর কর, 'বানালিতে' অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে সামন্তপ্রভুর কলে গম, যব বা মদ্য প্রস্তুতের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। এছাড়া রাজার নদীঘাট, পশুচারণ ক্ষেত্র ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য সামন্তপ্রভুরা কর আদায় করত, সরকার গির্জা বা সামন্তপ্রভুকে বিভিন্ন কর দেওয়ার পর তৃতীয় শ্রেণির, বিশেষত কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠত, ফলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল।

প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলা প্রয়োজন যে একদিকে আর্থিক সচ্ছলতা এবং অপরদিকে প্রাচুর্যের পাশে দারিদ্র এই দুটির মধ্যে কোনটি ফরাসী বিপ্লবের জন্য অধিক দায়ী ছিল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ আর্নেস্ট লাব্রুসের তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে লেফেভ্র, মিশেল প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তৃতীয় শ্রেণির আর্থিক দুর্দশাকেই ফরাসী বিপ্লবের প্রধান কারণ বলে মনে করেন, লেফেভ্র দেখিয়েছেন যে প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে অর্থনৈতিক হতাশা বিশেষত কৃষক ও সাঁকুলেতদের মধ্যে কিভাবে দারিদ্র ও দুর্দশা নেমে এসেছিল। একথা ঠিক যে উচ্চ বুর্জোয়াদের মধ্যে একটা আর্থিক সচ্ছলতা ছিল। অভিজাতদের বিরুদ্ধে তাদের সামাজিক অসন্তোষ যদি তাদের বিদ্রোহের পথে ঠেলে দিয়ে থাকে তবে কৃষক ও সাঁকুলেত শ্রেণির দারিদ্র ও ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুর্দশা তাদের বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ঐতিহাসিক তোক্‌বিল, মাতিয়ে, জোরেম প্রমুখ অবশ্য বিশ্বাস করেন যে আর্থিক সাচ্ছল্যই ছিল বিপ্লবের প্রধান কারণ। তোক্‌ভিলের মতে শহুরে বুর্জোয়াগণের আর্থিক সচ্ছলতাই তাদের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার ও বংশকৌলীন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলেছিল আর কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন তাদের সামন্ত প্রভুদের দ্বারা আদায়ীকৃত বিভিন কর ও বেগার প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলে। আলবেয়ার মাতিয়ে তাই বলেছেন যে আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা

ফ্রান্সের তৃতীয় শ্রেণিকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে দেয়। তবে সাম্প্রতিককালে এই দুই মতবাদকে ঐক্যবদ্ধ করে ঐতিহাসিক জর্জ রুডে একথা বলেছেন যে একদিকে ঐশ্বর্যবান বুর্জোয়াশ্রেণি ও অপরদিকে দারিদ্র্যপীড়িত কৃষক ও সাঁকুলেতশ্রেণি উভয়ের মধ্যেই তীব্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষ ছিল যা তাদের পুরাতনতন্ত্রের অবসান ঘটাতে উৎসাহ জুগিয়েছিল। এককথায় অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ও দুর্দশা উভয় কারণই বিপ্লবের জন্য দায়ী ছিল।

১.৪ ❐ ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণ বা বিপ্লবের জন্য বুরবোঁ রাজতন্ত্রের দায়িত্ব

প্রাক্-বিপ্লব যুগে ফ্রান্সে রাজত্ব করতেন বুরবোঁ রাজবংশ। ইউরোপের অধিকাংশ দেশের মত এই রাজতন্ত্রও ছিল স্বৈরাচারী এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা বা দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী। রাজ্য ও রাষ্ট্রের সত্তাকে অভিন্ন প্রমাণ করার জন্য সম্রাট চতুর্দশ লুই ঘোষণা করেছিলেন 'আমিই রাষ্ট্র' (I am the state)। সপ্তদশ শতকে তাঁর আমলে (১৬৪৩-১৭১৫ খ্রিস্টাব্দ) ফ্রান্স এক সমৃদ্ধিশালী স্বৈরাচারী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নিরঙ্কুশ রাজক্ষমতা। প্যারিসের পরিবর্তে ভার্সাই নগরীতে তিনি স্থাপন করেন তাঁর বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদ। তাঁর আমলে অভিজাত সম্প্রদায় এবং চার্চের প্রাধান্য বহুলাংশে খর্ব করা হয়েছিল। তিনি গঠন করেছিলেন এক সুদক্ষ আমলাতন্ত্র। 'ইনটেনডেন্ট' নামক এক বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ আমলাগোষ্ঠীর সাহায্যে তিনি প্রদেশগুলির উপর তীক্ষ্ণ নজরদারী ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সমস্ত প্রাদেশিক শাসকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি অভিজাতদের মানসিকতায় ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল যার ফলে তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ষোড়শ লুই-এর আমলে বিপ্লবে প্রথম অগ্নিসংযোগ করেছিলেন। তবে অভিজাতদের বিশেষ অধিকারে চতুর্দশ লুই হস্তক্ষেপ করেননি বরং বেশ কিছু প্রশাসনিক উচ্চপদ বণ্টন করে এক পোশাকী অভিজাতশ্রেণি সৃষ্টি করেছিলেন। তবে তাঁর এই নীতি ফরাসী রাজকোষের উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করেছিল। সেইসঙ্গে বৈদেশিক ক্ষেত্রে একাধিক যুদ্ধে জড়িত হয়ে যে বিপুল অর্থব্যয় তিনি করেছিলেন তা পূরণ করা ও অর্থনীতির সংস্কারসাধন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

চতুর্দশ লুই-এর মৃত্যুর পর অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স ছিল রাজপ্রতিনিধি ডিউক অফ অর্লিয়েন্স, অকর্মণ্য রাজা পঞ্চদশ লুই এবং মাদাম দ্যা পম্পাদুর প্রভাবিত এক পতনোন্মুখ রাষ্ট্র। রাজপ্রতিনিধি ডিউক অফ অর্লিয়েন্স ফরাসী অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করেন। এ ব্যাপারে তিনি জনৈক স্কচ নাগরিক জন ল্যর সাহায্য লভ করেছিলেন। ব্যাঙ্ক ও বৃহৎ বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলি তাঁর আমলে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষকে কর ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসার ব্যর্থ চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু পঞ্চদশ লুই-এর আমলে (১৭২৩-১৭৭৪) রাজার ব্যক্তিগত ভোগবিলাস রাজকীয় স্বার্থের উপরে স্থান গ্রহণ করে। অভিজাতদের দুর্নীতি এবং চক্রান্ত রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রকে পঙ্গু করে তুলেছিল। সেইসঙ্গে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৬৩ খ্রিঃ) ফ্রান্সের পরাজয় রাজতন্ত্রের সামরিক দুর্বলতাকে প্রকট করে তুলেছিল।

ফ্রান্সের এই সঙ্কটজনক অধ্যায়ে প্রয়োজন ছিল এক শক্তিশালী দক্ষ ও নেতৃত্বদানে সক্ষম সম্রাটের। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পঞ্চদশ লুই-এর উত্তরাধিকারী তাঁর পৌত্র ষোড়শ লুই-এর চরিত্রে এই গুণগুলির কোনটিই ছিল না। রাজার দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী ষোড়শ লুই 'আমি যা ইচ্ছা করি, তাই-ই আইন' (What I

desire is decree) —এ ধরনের গর্বিত ঘোষণা করলেও প্রশাসনের দুর্নীতি দূর করার কোন প্রচেষ্টাই করেননি রানী মারী আঁতোয়ানেতের বশীভূত এই ব্যক্তিত্বহীন সম্রাট। ফলে, ফরাসী জনগণের শ্রদ্ধা অর্জনে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও শাসনতান্ত্রিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বুরবোঁ রাজাদের ব্যক্তিগত অযোগ্যতার সঙ্গে রাজতন্ত্রের প্রশাসনিক সঙ্কটের বিষয়টিও পৃথকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। একথা বলা যায় যে, বুরবোঁ রাজতন্ত্র আইনত সর্বশক্তিমান হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে রাজক্ষমতা নিরঙ্কুশ ছিল না। শাসনব্যবস্থায় অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাব এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। কিছু মধ্যযুগীয় সংস্থা রাজক্ষমতাকে সীমিত করে রেখেছিল, এগুলি হ'ল চার্চ, পার্লামেন্ট এবং প্রাদেশিক প্রতিনিধিসভাগুলি।

প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী স্বয়ংশাসিত সংগঠন ছিল চার্চ। অর্থসম্পদে চার্চ ছিল বলীয়ান, চার্চের প্রধান দায়িত্ব ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত কিছু কাজ, দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্যদান, স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজ ও জন্ম-মৃত্যুর হিসাব সংরক্ষণ। ধনী ব্যক্তিদের আর্থিক দানে চার্চ পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। চার্চের অভ্যন্তরীণ শাসনে রাজার কোন হস্তক্ষেপ চলত না। গ্রামীণ বিশপরা নানা প্রশাসনিক অধিকার ভোগ করতেন। চার্চের ভূসম্পত্তির ওপর কর ধার্য করার ক্ষমতা রাজার ছিল না। ১৫৬১ খ্রিঃ পোয়াসির চুক্তির (Contract of Poissy) অনুযায়ী তৎকালীন রাজা নবম চার্লস চার্চকে রাজকীয় কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দান করেন। বলা হয়েছিল যাজকদের সম্প্রতি ব্যতীত তাঁদের ওপর কোন প্রকার প্রশাসনিক কর ধার্য করা চলবে না, এর ফলে চার্চ স্বেচ্ছায় রাজকোষে কিছু অর্থদানে স্বীকৃত হয়েছিল, যার পরিমাণ ছিল অতি নগণ্য। ফরাসী রাজতন্ত্র কোনভাবেই সম্পদশালী চার্চের ওপর কোন প্রত্যক্ষ কর স্থাপন করতে বা রাষ্ট্রীয় আইন চার্চের ওপর বলবৎ করতে পারেনি।

চার্চ ব্যতীত বুরবোঁ রাজতন্ত্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে তোলার পিছনে ফরাসী পার্লামেন্ট বা পার্লামঁগুলির প্রভাব কম ছিল না। প্রাচীন এই সংস্থাগুলি ছিল ফ্রান্সের সর্বোচ্চ রাজকীয় আপীল আদালত। নিম্ন আদালতগুলির রায়ের পুনর্বিবেচনার অধিকার ছিল এই সংস্থার। পার্লামেন্টের সদস্যগণ রাজা কর্তৃক মনোনীত হতেন এবং তাঁরা কর্মসূত্রে অভিজাতদের সমমর্যাদা ভোগ করতেন। ধনী বুর্জোয়াগণ অনেকেই সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর আমল থেকে সরকারকে অর্থ দানের মাধ্যমে পার্লামেন্টের সদস্য মনোনীত হতেন। ঐতিহাসিক গুডউইনের মতে প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সে এ ধরনের পার্লামেন্টের সংখ্যা ছিল তেরটি। এগুলির মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল প্যারিসের পার্লামেন্ট। কারণ, পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে তারা রাজকীয় আইনসমূহ নথিভুক্ত করার অধিকার অর্জন করে। এখানে নথিভুক্ত হবার পরেই রাজকীয় আইন বৈধতা প্রাপ্ত হ'ত। প্রয়োজনে আইন পরিবর্তন বা সংশোধনের পরামর্শ দেওয়ার অধিকারও ছিল পার্লামেন্টের। ফ্রান্সের মত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের আমলে পার্লামেন্টের এই অধিকার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পার্লামেন্টের এই অধিকার অবশ্যই নিরঙ্কুশ ছিল না। কারণ, রাজাও তাঁর বিশেষ অধিকার (Lit de justice) প্রয়োগ করে পার্লামেন্টের আপত্তি অগ্রাহ্য করতে পারতেন। সম্রাট পঞ্চদশ লুই-এর আমলে এমন ঘটতে দেখা গেছে। কিন্তু বাস্তবে রাজা পার্লামেন্টের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করার সাহস বিশেষ দেখাতেন না, কারণ সেক্ষেত্রে পার্লামেন্টের পক্ষে রাজাকে জনস্বার্থবিরোধী হিসেবে প্রচার করা সহজ হ'ত। আর সেই সুযোগে প্যারিসের পার্লামেন্ট অষ্টাদশ শতাব্দীতে বারংবার রাজা বা তাঁর সংস্কারপন্থী মন্ত্রীদের (যেমন,

তুর্গো) সংস্কারের বিরোধিতা করে গেছে, কারণ সেগুলি ছিল অভিজাতদের স্বার্থবিরোধী। ষোড়শ লুই-এর আমলে পার্লামেন্ট রাজশক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং রাজক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে তুলেছিল।

পার্লামেন্টের মতই রাজক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করার ক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রাদেশিক প্রতিনিধিসভাগুলিও বিশেষ ভূমিকা পালন করত। এগুলিতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ মিলিত হয়ে নিজ নিজ অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বহন করতেন। এগুলি 'পেই-দেতা' (Pays d'etat) নামক সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে মিলিত হ'ত। এগুলি ফ্রান্সের এক-তৃতীয়াংশ অধিকার করে থাকত। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বুরবোঁ রাজাগণ এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিকে শর্তসাপেক্ষে কোন চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। এগুলিতে প্রাদেশিক এস্টেট বা তার মনোনীত কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী ছিল। তারা শাসনতান্ত্রিক ও আর্থিক স্বাধীনতা ভোগ করত। কেন্দ্রীয় শাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলিতে (যাদের বলা হত পেই দেলেকসিঁয় বা) যেমন রাজপ্রতিনিধি 'ইন্টেনডেন্ট'দের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল, 'পেই দেতা'গুলিতে তা ছিল না। এই বিশেষ সুবিধার ফলে তারা রাজকীয় কর সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রদান বা প্রয়োজনে নতুন কর এড়িয়ে যেতে পারত। এই প্রাদেশিক সভাগুলিতে মূলত রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত ও যাজকগণ সদস্য হিসেবে থাকতেন যাঁরা নিজস্ব অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অধিকার বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সংঘাতে যেতেও দ্বিধা করতেন না।

অপরদিকে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন প্রদেশগুলিতে 'ইন্টেনডেন্টরা' ছিলেন সর্বেসর্বা, বিচার, সাধারণ প্রশাসন, বাণিজ্য, শিল্প, পৌরসভা, রাজস্ব বা কৃষিব্যবস্থার ওপর তাঁদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। এদের ক্ষমতার অপব্যবহার বা দুর্নীতি জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ফ্রান্সের সর্বত্র একই আইন, মাপ ও ওজন চালু না থাকায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য ছিল না, রাজা কোনরকমে 'ইন্টেনডেন্ট'দের সাহায্যে প্রশাসন সক্রিয় রাখতেন।

ফ্রান্সের ত্রুটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থাও রাজতন্ত্রের মহিমা নষ্ট করেছিল। বিচারব্যবস্থার শীর্ষে অবশ্যই ছিল রাজার অবস্থান। 'লত্রে দ্য গ্রাস' (Lettre de grace) -এর মাধ্যমে রাজা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি মকুব করতে পারতেন এবং 'লত্রে দ্য কেসে'-র (lettre de cachet) মাধ্যমে যে কোন নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কারাগারে বিনা বিচারে আটক রাখতে পারতেন। ব্যয়বহুল, বিলম্বিত বিচারব্যবস্থা, পক্ষপাতদুষ্ট জটিল বিচার প্রণালী, ম্যাজিস্ট্রেট পদের ক্রয়বিক্রয় ফরাসী বিচারব্যবস্থাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছিল এবং তৃতীয় শ্রেণির দুর্গতি বৃদ্ধি করেছিল।

এগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিশৃঙ্খল ও অযৌক্তিক রাজস্বনীতি, বুরবোঁ রাজদরবারের বিলাস-বৈভব, পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইয়ের বৈদেশিক যুদ্ধে যোগদান (যেমন, ১৭৪০-৪৮ খ্রিঃ অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ, ১৭৫৬-৬৩ খ্রিঃ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ) ও পরাজয় রাজকোষের ওপর প্রভূত চাপ সৃষ্টি করে। আবার রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে রাজস্ব বৃদ্ধির কোন উপায় না থাকায় ঋণ ব্যতীত অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের আর কোন উপায় ছিল না। আবার রাজস্বনীতির পরিবর্তন করে সুবিধাভোগী শ্রেণির ওপর কর ধার্য করার উপায়ও কোনো মন্ত্রীর ছিল না। এছাড়া ফরাসী প্রতিনিধি সভা 'স্টেটস্ জেনারেল'-এর অধিবেশন ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে আর আহ্বান করা হয়নি। সাধারণত কর ধার্য করার জন্যই স্টেটস

জেনারেল আহ্বান করা হ'ত। তবে স্টেটস্ জেনারেলের অনুমোদন ছাড়াও কর ধার্য করার অধিকার রাজার ছিল। কিন্তু প্রশাসন ক্রমে ক্রমে রাজার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। ষোড়শ লুই অর্থ সঙ্কটে পড়ে স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হন আর এই ঘটনাই ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত করে। অনেক ঐতিহাসিক একথা বলে থাকেন যে, বুর্জোয়াদের দাবী অনুযায়ী স্টেটস্ জেনারেলে মাথা পিছু ভোটাধিকার ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধা লোপ করে ষোড়শ লুই বিপ্লব এড়াতে পারতেন। কারণ, বুর্জোয়াদের প্রাথমিক আক্রমণের লক্ষ্য রাজতন্ত্র ছিল না। কিন্তু, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও অভিজাত শ্রেণির বিশেষ অধিকার একে অপরের পরিপূরক ছিল। ফলে, অভিজাতদের বিশেষ অধিকার লোপ করে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর ছিল না। জীর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু পুরাতনতন্ত্রকে সংস্কারের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে তোলার ক্ষমতা ষোড়শ লুই-এর মত দুর্বল সম্রাটের ছিল না। ফলে বিপ্লবের মাধ্যমে পুরাতনতন্ত্রের পতন ছিল অনিবার্য।

১.৫ ❐ ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা

ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রে দার্শনিকদের ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতবাদ বর্তমান। সমকালীন দার্শনিকদের মতবাদ ও ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বক্তব্য আলোচনার মাধ্যমে এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যেতে পারে।

ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীকে আলোকিত দর্শনের যুগ বা জ্ঞানদীপ্তির যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই শতকের জ্ঞানদীপ্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল ফ্রান্স। প্যারিস ছিল যুক্তিবাদী ও উপযোগবাদী দর্শনের প্রধান কেন্দ্র। জ্ঞানদীপ্তির ধারকদের বলা হত 'ফিলজফ'। শুধু দর্শনের মধ্যেই এঁরা সীমাবব্ধ ছিলেন না, এঁদের জ্ঞানের ও মনের পরিধি ছিল আরো ব্যাপক। তবে এঁরা যে সকলেই সবসময় একই মত প্রকাশ করেছিলেন তা নয়। এঁদের প্রত্যেকের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তবে এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী এবং সংস্কারের সমর্থক। তবে একথা মনে করা ভুল যে সমকালীন ইউরোপে শুধুমাত্র ফ্রান্সে এই আলোকিত দর্শন তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংল্যান্ড, ইতালী, জার্মানি, হ্যাপস্বার্গ বংশশাসিত অঞ্চলগুলি এবং কিছু পরিমাণে স্পেন এই নব্যদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি বর্তমান ছিল সে সম্পর্কে ফরাসী দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্‌দের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প সকল ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পেতে থাকে যুক্তিবাদের প্রভাব এবং রাজা ও বিশেষ সুবিধাভোগী সমাজের প্রথম দুই শ্রেণির অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছিত অধিকারের সমালোচনা চলতে থাকে।

প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা দার্শনিক ছিলেন মঁতেসকিয়ো (Montesquieu)। তিনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সমসাময়িক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আস্থাহীন। পশ্চিমী সমাজ ও সভ্যতার অসঙ্গতি ফুটে উঠেছে তার ১৭২১ খ্রিঃ প্রকাশিত 'The Persian Letters' (Letters Persanes) গ্রন্থে। ১৭৪৮-এ প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Spirit of Laws' (L'esprit des Lois)। এই গ্রন্থে তিনি পুরাতনতন্ত্রের অনেক বিতর্কিত বিষয়কে সমর্থন করেছিলেন। সামাজিক দিক থেকেও তাঁর চিন্তাধারা খুব একটা

বৈপ্লবিক ছিল না বরং অভিজাতদের বিশেষ সুযোগসুবিধা ও সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থেই রাজতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ করার কথা বলেছিলেন। তিনি প্রশাসনের ক্ষমতা বিভাজন নীতিকে সমর্থন করেন কারণ তা ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তবে ঐতিহাসিক কোবানের মতে তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমতার পৃথকীকরণের কথা বলেন নি, তিনি ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন।

অন্ধ কুসংস্কার, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, অযৌক্তিক আধ্যাত্মিকতা, এমনকি চার্চের অনাচারের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও তীব্র বিদ্রূপ দেখা গিয়েছিল ভলতেয়ারের (১৬৯৪-১৭৭৮) রচনার মধ্যে। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গরচনায় পারদর্শী। ইংল্যান্ডের মুক্ত রাজনীতি ও সামাজিক সহিষ্ণুতার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৭৩৪ খ্রিঃ প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'লেতর ফিলজফিক' (Letters Philosophiques)। এতে তিনি সকলের উর্ধ্বে ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন তবে তিনি গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না, তিনি বিশ্বাস করতেন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক। তিনি কোন নতুন আদর্শের কথা বলেননি তবে সেযুগের সামাজিক অসাম্য, অর্থনৈতিক অসঙ্গতিকে তিনি তীব্র আক্রমণ করেছেন, সংস্কারের দাবি করেছেন আইন ও বিচারব্যবস্থার। তাঁর সমালোচনামূলক রচনা পুরাতনতন্ত্রকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন জ্যাঁ-জ্যাক রুশো (১৭১২-৭২)। রুশোর রচনায় যুক্তি বা বুদ্ধির তুলনায় আবেগ ও অনুভূতির গুরুত্ব ছিল বেশি। মঁতেসকিয়ো বা ভলতেয়ারের মত ইংল্যান্ডের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তিনি কখনই আদর্শ বলে মনে করেননি, পশ্চিম ইউরোপে সভ্যতা বলতে যা বোঝাতো তাকে তিনি উচ্চ সম্প্রদায়ের কিছু সীমিত মানুষের স্বার্থরক্ষার যন্ত্র বলে মনে করতেন। 'Confession' গ্রন্থে তিনি স্বীকার করেন যে মানুষ স্বভাবতই সৎ কিন্তু সভ্যতা তাকে অসৎ করে তোলে। ১৭৬২ খ্রিঃ প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সোশ্যাল কনট্র্যাক্ট' (La Contract Social)-এ তিনি মনুষ্যজাতির আদি জীবন এবং ক্রমরূপান্তরের মধ্য দিয়ে সংঘবদ্ধতার দিকে অগ্রসরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেছেন যে মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন কিন্তু সমাজ তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল সাধারণের ইচ্ছার (General will) প্রতিফলন। সামাজিক চুক্তি অনুসারে সরকার সাধারণের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে বাধ্য। জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে না পারলে সরকার বা রাজাকে পদচ্যুত করার অধিকার জনগণের রয়েছে। সামাজিক সাম্য ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকেই আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে মনে করে এসেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বকোষ রচয়িতাগণ (Encyclopaedist) যুক্তিবাদী মানসিকতা গঠনে সাহায্য করেন। ডেনিস দিদেরো, দ্যা এলেমবেয়ার প্রমুখ ছিলেন এই গ্রন্থমালার প্রধান উদ্যোক্তা। দিদেরোর সম্পাদনায় ১৭৫১-৫২ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় বিশ্বকোষ। শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে এই গ্রন্থে যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধর্ম ও রাজতন্ত্র সম্পর্কে বিশ্বকোষের বিশ্লেষণ মানুষকে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তে যুক্তিনির্ভর ধারণা গ্রহণে সাহায্য করেছিল। এঁরা ছাড়াও লা মেত্রি, কাঁদিলাক, হেলভিমিউস, দ্য' হলবাক প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনার মাধ্যমে মানবতাবাদ ও বস্তুবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটে। ফরাসী সমাজ ও অর্থনীতির তীব্র সমালোচনা করেন মাবলী (১৭০৯-৮৫) এবং সমর্থন করেন প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের। ফরাসী চার্চ, অভিজাত সম্প্রদায় ও রাজতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করে সমাজতন্ত্র

প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন জাঁ মেসলিয়ে (১৬৬৪-১৭৩৩ খ্রিঃ)। দার্শনিক মরেলি, ল্যাঁগুয়ে প্রমুখ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বংশগত অধিকারের বিলোপের কথা বলেন, রাজা পঞ্চদশ লুই-এর সময় থেকেই ফ্রান্সের বাইরে প্রোটেস্ট্যান্ট দেশগুলি থেকে বহু পুস্তিকা গোপনে ফ্রান্সে প্রবেশ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যেগুলি ছিল প্রধানত চার্চবিরোধী রচনা। ফরাসী 'স্যালোঁ'গুলিকে কেন্দ্র করে জ্ঞানের স্রোত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে প্রচলিত সমাজ ও রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ এক জনগোষ্ঠী তৈরি করছিল।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের চেতনা সঞ্চার করেছিলেন 'ফিজিওক্র্যাট' নামক অর্থনীতিবিদগণ, এই মতবাদের প্রধান প্রচারক ছিলেন অ্যাডাম স্মিথ। তিনি তাঁর 'ওয়েলথ অব নেশনস' গ্রন্থে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণমুক্ত, রাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের গুরুত্ব দিয়ে ছিলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ ফরাসী অর্থনীতি চালিত হচ্ছিল 'মার্কেন্টাইলবাদ' ধারণার দ্বারা। এই মতবাদে অর্থব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অর্থনীতি রূপায়ণের ওপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হ'ত। কুয়েসনে ও ফিজিওক্র্যাট গোষ্ঠী এই মার্কেন্টাইল মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁরা ফ্রান্সের সরকারী আর্থিক নীতি, ব্যবসাবাণিজ্যের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, অভ্যন্তরীণ শুল্কবেড়া ইত্যাদির তীব্র সমালোচনা করে অবাধ বাণিজ্যনীতি ও খাদ্যশস্যের খোলা বাজার দাবী করেন। তাঁদের মতে ভূসম্পত্তি সম্পদের প্রধান উৎস। সেজন্য ভূমিকর থেকে কারও অব্যাহতি পাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। বিপ্লবের যুগে এঁদের রচনার প্রভাবে বিপ্লবীগণ অভ্যন্তরীণ শুল্কবেড়া লুপ্ত করে অর্থনৈতিক ঐক্য আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সে দার্শনিকদের রচনা বিপ্লব সৃষ্টিতে আদৌ কোনো ভূমিকা গ্রহণ করছিল কিনা এ নিয়ে তীব্র বিতর্ক বর্তমান। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দার্শনিকগণই অসন্তোষের বারুদে চিন্তার স্ফুলিঙ্গ যোগ করে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আবার অন্য কারো মতে বিপ্লবের পশ্চাতে চিন্তা ও আদর্শের প্রভাব একান্তই নগণ্য বরং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণই তাঁদের মতে ফরাসী বিপ্লবকে সম্ভব করেছিল। অপর একশ্রেণির ঐতিহাসিক গোষ্ঠী উভয় মতের সমন্বয় সাধন করে ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতে আর্থ-সামাজিক ও দার্শনিক উভয় কারণকেই সক্রিয় বলে মনে করেন।

বিপ্লবের যুগের প্রখ্যাত আইরিশ রাষ্ট্রবিদ্ এডমন্ড বার্ক ফরাসী বিপ্লবের পেছনে দার্শনিকদের 'চক্রান্তের' কথা প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে, ফ্রান্সের প্রচলিত আর্থ-সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য ফরাসী জনগণ ব্যাকুল ছিল না। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রচার করে দার্শনিকগণ সাধারণ মানুষকে প্ররোচিত করেছিলেন। 'লা এনসিয়েন রেজিম' গ্রন্থে ঐতিহাসিক অলেক্সি তোক্‌ভিল বার্কের 'চক্রান্ততত্ত্ব' না মানলেও একথা স্বীকার করেছেন যে দার্শনিকরা তাঁদের রচনার মাধ্যমে পুরাতনতন্ত্রের নীতিগত ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন। বুরবোঁ রাজতন্ত্রের ব্যর্থতা এবং সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ফ্রান্সে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল দার্শনিকরা তাকেই রূপদান করেছিলেন। ঐতিহ্যের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাই ছিল পুরাতনতন্ত্রের ভিত্তি। দার্শনিকগণ নিরন্তর সমালোচনার মাধ্যমে সেই ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়েছিলেন। এঁরা ছাড়া অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ যেমন তেইন, বুস্তান, হল্যাণ্ডরোজ, জর্জ রুদে প্রমুখ ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন, বোদ্ধের মতে এই দার্শনিকেরা মানুষের মনে একধরনের আশাবাদ সৃষ্টি করেছিলেন যা ফ্রান্সে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছিল। 'গস্‌পেল' থেকে 'সোশ্যাল

কনট্রাক্ট' পর্যন্ত পুস্তকই বিপ্লব সৃষ্টি করেছে এ মন্তব্য বোনাল্ডের। ঐতিহাসিক রাইকার দার্শনিকদের ভাবাবেগের প্রক্রিয়াকে বিপ্লবের কারণ বলে অভিহিত করেছেন। জর্জ রুডে দেখিয়েছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণির স্তরে স্তরে প্রবেশ করেছিল দার্শনিকদের বহু রচনা। অধিকতর সংখ্যায় উৎসুক মানুষ এঁদের লেখা পড়ছিলেন এবং তাঁদের বক্তব্য শুনছিলেন। একথা ঠিক যে দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় এক ছিল না। কেউ নাস্তিক, কেউ ঈশ্বর বিশ্বাসী বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র অথবা গণতন্ত্রের সমর্থক। কিন্তু সকলেই ধর্মের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, স্বৈরতন্ত্র ও সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন।

অপরদিকে অর্থনৈতিক মতবাদের সমর্থক ঐতিহাসিকগণ দার্শনিকদের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান না। তাঁদের মতে বিপ্লবের সঙ্গে দার্শনিকদের রচনার কোন সম্পর্ক নেই। ঐতিহাসিক মর্স-স্টিফেনস সরাসরি বলেছেন বিপ্লবের কারণ ছিল মূলত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক, দার্শনিক বা সামাজিক নয়। পরবর্তীকালে জর্জ রুডে, লেফেভ্‌র প্রমুখ অনেকেই বিপ্লবের প্রধান কারণ হিসেবে তৃতীয় শ্রেণির আর্থ-সামাজিক ক্ষোভ এবং ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটকেই দায়ী করেছেন। লেফেভ্‌র বলেছেন পুরাতনতন্ত্রের ভিত্তি নিজে থেকেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতির ফলে মধ্যযুগের কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজও তার যৌক্তিকতা হারাচ্ছিল। এই সুযোগে বুর্জোয়া শ্রেণি সমাজের উচ্চস্তরে উন্নীত হবার জন্য পুরাতনতন্ত্রকে ভেঙে ফেলতে উৎসাহী হয়েছিল। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন দার্শনিকদের রচনার মূল পাঠক ছিলেন এই বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। জর্জ রুডের মতে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধকতার ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াশ্রেণির সরকারী উচ্চপদ লাভের সম্ভাবনা প্রাক্-বিপ্লব যুগে ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত করেছিল সরকারী শুল্কনীতি। আর্থিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সত্ত্বেও পুরাতনতন্ত্রে মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াশ্রেণির সামাজিক মর্যাদা বা রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যে ক্ষীণ একথা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারছিলেন। দার্শনিকদের রচনা তাঁদের এই উপলব্ধিকে বিপ্লব-মনস্কতায় রূপান্তরিত করেছিল। তবে এই প্রসঙ্গে এ প্রশ্নও তোলা যায় যে দার্শনিকদের মতের সঙ্গে গ্রামীণ কৃষক, শ্রমিক, শহুরে শ্রমজীবি, সাঁকুলেৎ ও সাধারণ মধ্যবিত্তরা আদৌ কতটা পরিচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে দার্শনিকদের রচনা খুব কমসংখ্যক লোকই পড়ার সুয়োগ পায়। শিক্ষিত বুর্জোয়াদের উপর দার্শনিকদের রচনার প্রভাব পড়েছিল। পারিসের সালোঁগুলিতে দার্শনিকদের মতামত নিয়ে তর্কবিতর্ক চলত। বুর্জোয়াদের মাধ্যমে দার্শনিকতত্ত্ব কিছু মানুষের কাছে পৌঁছেছিল তাই দার্শনিকতত্ত্বকে বিপ্লবের অন্যতম কারণ বলা অযৌক্তিক।

দার্শনিকদের প্রভাব সম্পর্কে এই বিতর্কের কিছুটা সমাধানের চেষ্টা করেছেন আধুনিক ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন এবং জর্জ রুডে। ডেভিড টমসনের মতে, ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে দার্শনিকদের সম্পর্ক ছিল দূরবর্তী ও পরোক্ষ। কারণ দার্শনিকরা কেউই বিপ্লবের কথা বলেননি, শুধুমাত্র প্রচলিত ব্যবস্থার ভুলত্রুটি দেখিয়ে সমালোচনা করেছেন। দার্শনিকদের যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের ক্ষোভ ও অসন্তোষকে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি দিয়েছিল। আর জর্জ রুডে বলেছেন যে দার্শনিকদের রচনার মাধ্যমে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের অসাম্য ও অন্যায়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে। তৃতীয় শ্রেণির বিভিন্ন স্তরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষের পার্থক্য ছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও তারা সকলে ১৭৮৯ খ্রিঃ বিপ্লবে

যোগ দিয়েছিল তার কারণ এদের সকলের মধ্যে একধরনের বিপ্লবমনস্কতার জাগরণ হয়েছিল যার সৃষ্টিতে দার্শনিকদের অবদান ছিল। সুতরাং একথা বলা যায় যে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতে এক বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল দার্শনিকদের রচনা।

১.৬ ❒ উপসংহার

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সামাজিক বৈষম্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, কৃষক ও শহরের দরিদ্র মানুষের অসন্তোষ, ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সঙ্কট, ষোড়শ লুই-এর স্বল্পকালীন রাজত্বে রাজা ও রাজকীয় প্রশাসনের সংস্কার প্রবর্তনে সামগ্রিক ব্যর্থতা, বিত্তশালী ও ক্রমবর্ধমান বুর্জোয়া শ্রেণির ক্ষোভ এবং বিপ্লবী মানসিকতা সৃষ্টিতে দার্শনিকদের অবদান ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ঘাত সংঘাত যেমন ফরাসী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল, তেমনি দুটি বৈদেশিক ঘটনার প্রভাবও এই বিপ্লবের পশ্চাতে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সেগুলি হ'ল ইংলন্ডের গৌরবময় বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব।

একথা বলা যায় যে, ফরাসী দার্শনিকগণ ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের ইংলন্ডের গৌরবময় বিপ্লবের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, ইংরাজ দার্শনিক জন লকের 'জনগণের সার্বভৌমত্বে'র তত্ত্ব ফরাসী দার্শনিকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। ইংলন্ডের নিয়মতান্ত্রিক সরকারের আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন ভলতেয়ার। লাফায়েৎ প্রমুখ ফরাসী অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্তগণ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং গণতন্ত্রের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালান। বুর্জোয়াগণ নিজেদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হয়ে ওঠেন। আর এই পরিস্থিতিতে অভিজাত সম্প্রদায় তাঁদের বিশেষ অধিকার হারাবার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, বলেছেন ঐতিহাসিক জর্জ রুডে। যার ফলে তাঁরা নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। অপরপক্ষে অর্থবান হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক অধিকার ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের ছিল সামাজিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হওয়াজনিত দুশ্চিন্তা। সেইসঙ্গে অগণিত দরিদ্র মানুষ দারিদ্র্য ও মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে বুরবোঁ রাজতন্ত্র আইন ও সংস্কারের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণির অসন্তোষ এবং কৃষক, শ্রমিক বা দরিদ্র জনসাধারণের অভাব অভিযোগ দূর করে বিপ্লব এড়াতে পারতেন বলে মনে করা হয়। কিন্তু একথাও সত্য যে, এজন্য রাজতন্ত্র, অভিজাত ও বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাজা তাঁর দৈবসত্তার বিভাজনে এবং অভিজাতগণ তাঁদের বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করতে রাজী ছিলেন না। ফলে, রাজতন্ত্রের সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত হেনেছিলেন অভিজাত সম্প্রদায় পুরাতনতন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে। তাই প্রথম দিকে তাঁরা বুর্জোয়াদের সমর্থন পেলেও অভিজাতদের নিজস্ব শ্রেণিস্বার্থ চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা উভয় সম্প্রদায়ের পথ ভিন্ন করে দেয়। ফ্রান্স আরও বড় বিপ্লবের পথে এগিয়ে যায়। ফরাসী বিপ্লব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

১.৭ ❒ অনুশীলনী

- **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

১। প্রাক্-বিপ্লব (১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে) ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট কিভাবে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল?

২। ''ফরাসী বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদান ছিল 'পরোক্ষ' ও 'সুদূর''' — আলোচনা করুন।

- **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

১। ফরাসী বিপ্লবের জন্য বুরবোঁ রাজতন্ত্র কতখানি দায়ী ছিল?

২। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের তৃতীয় শ্রেণির সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল?

- **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

১। প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সের অভিজাত শ্রেণির মধ্যে কি কি স্তর ছিল?

২। প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সে প্রত্যক্ষ করগুলি কি কি ছিল?

৩। 'সাঁকুলেৎ' কারা?

১.৮ ❒ গ্রন্থপঞ্জী

১। কোবান আলফ্রেট, এ হিস্ট্রি অফ মডার্ন ফ্রান্স (খণ্ড ১-২)

২। লেফেভ্‌র জর্জ, দি ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন (২ খণ্ড)

৩। রুডে জর্জ, রেভোলিউশনারি ইউরোপ, ১৭৮৩-১৮১৫

৪। সবুল অ্যালবার্ট, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দি ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন

৫। চক্রবর্তী প্রফুল্ল কুমার, ফরাসী বিপ্লব

একক ২ ❒ ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগতি

গঠন

২.০ উদ্দেশ্যসমূহ
২.১ সূচনা
২.২ আর্থিক সঙ্কট মোচনে বুরবোঁ রাজতন্ত্রের প্রয়াস ও অভিজাত বিদ্রোহ
২.৩ বুর্জোয়া বিপ্লব
২.৪ পৌর বিপ্লব
২.৫ কৃষক বিপ্লব
২.৬ সংবিধান সভা (১৭৮৯-১৭৯১)
২.৭ বিপ্লবের অগ্রগতি (১৭৯১-১৭৯৩) : নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পতন
২.৮ আইনসভা
২.৯ জাতীয় মহাসভা (১৭৯২-১৭৯৫)
২.১০ সন্ত্রাসের শাসন
২.১১ থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়া
২.১২ ডাইরেক্টরীর শাসন
২.১৩ অনুশীলনী
২.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ ❒ উদ্দেশ্যসমূহ

এই এককের উদ্দেশ্য হ'ল ১৭৮৯ খ্রিঃ সংঘটিত ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়গুলি বিশ্লেষণ করা। অভিজাত বিদ্রোহ, বুর্জোয়া বিপ্লব, পৌর বিপ্লব ও কৃষক বিপ্লবের পর্যায় অতিক্রম করে 'সংবিধান সভা' কর্তৃক রচিত ফ্রান্সের জন্য নতুন সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন করা হবে। এছাড়া ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিপ্লবের অগ্রগতি, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পতন, জাতীয় মহাসভা ও সন্ত্রাসের রাজত্ব এবং ডাইরেক্টরীর অযোগ্য শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ক্ষমতালাভের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোচনা করা হবে।

২.১ ❒ সূচনা

ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ) কোন একটিমাত্র বিপ্লব ছিল না। এই বিপ্লবে ফ্রান্সের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ কোন না কোন সময় সংযুক্ত হয়েছিলেন। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের মাধ্যমে এর সূত্রপাত। পরে এতে যোগ দেন বুর্জোয়া শ্রেণি এবং কৃষক ও সাঁকুলেৎ শ্রেণি। এরই ফলে

ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজতন্ত্রের পতন, অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার ও সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটে। ফ্রান্সের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ফ্রান্স তথা ইউরোপের ইতিহাসকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

২.২ ❐ আর্থিক সঙ্কট মোচনে বুরবোঁ রাজতন্ত্রের প্রয়াস ও অভিজাত বিদ্রোহ

ফরাসী বিপ্লবের শুরুতে অভিজাত সম্প্রদায়ই বিপ্লবের সূচনা করেন, কারণ ১৭৮৭-'৮৮ খ্রিস্টাব্দে বুরবোঁ রাজতন্ত্রের সংস্কারের নীতি অভিজাত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশেষ সুবিধাগুলিকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিল।

বুরবোঁ সম্রাট পঞ্চদশ লুই-এর সময় থেকেই রাজকীয় সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অভিজাত বিচারসভা বা পার্লামেন্টের প্রতিবাদী ভূমিকা দেখা যায়। ১৭৬৫ খ্রিঃ সিংহাসনে বসেন অনভিজ্ঞ ও দুর্বলচিত্ত ষোড়শ লুই। এই সময় অভ্যন্তরীণ নানা স্ববিরোধ ফ্রান্সে পুরাতনতন্ত্রকে (Ancien Regime) জীর্ণ করে তুলেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার এবং রাজপ্রাসাদের ক্রমবর্ধমান ব্যয় ফ্রান্সকে গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে এনে ফেলেছিল। এরপর আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করে ষোড়শ লুই বিশাল ঋণের বোঝা সৃষ্টি করেছিলেন। এ থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রয়োজন ছিল আর্থিক সংস্কার ও করভারের সুষম বণ্টন। কিন্তু যেহেতু ফ্রান্সের প্রথম দুই শ্রেণি (যাজক ও অভিজাত) করভার থেকে মুক্ত ছিল, সেজন্য রাজনৈতিক কাঠামোর সংস্কার ব্যতীত এঁদের ওপর করভার চাপানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু তা না করে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়।

অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে রাজকীয় অর্থসঙ্কট দূর করার উদ্দেশ্যে ষোড়শ লুই তুর্গো নামক জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। তুর্গো ছিলেন ফিজিওক্র্যাট মতবাদে অনুরাগী। মাত্র কুড়ি মাস অর্থদপ্তরের প্রধান থাকলেও, এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রভূত আর্থিক সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তুর্গো দেশের অভ্যন্তরে অবাধ খাদ্যশস্যের বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে। কিন্তু ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের অজন্মার ফলে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয় এবং খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। ফলে, প্যারিস ও তার আশেপাশে ব্যাপক দাঙ্গা হয় যা 'রুটির দাঙ্গা' (Bread Riot) নামে পরিচিত। তুর্গো সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই দাঙ্গা দমন করেন। তুর্গোর অন্যান্য সংস্কারের মধ্যে ছিল চার্চ-এর ক্ষমতা হ্রাস করার চেষ্টা। তাঁর ধর্মসহিষ্ণুতা নীতি যাজকদের ক্ষুব্ধ করে। রাজস্ববাবদ আয় ও সরকারী ব্যয়ের মধ্যে বিশাল ফারাকের ফলে তুর্গো অনুভব করেন যে প্রশাসনের কাঠামোগত মৌলিক সংস্কারই একমাত্র অর্থসঙ্কট দূর করতে পারে। এজন্য ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ষোড়শ লুইকে ৬-টি প্রস্তাব (Six Edicts) দেন। এগুলি হল, (১) খাদ্যশস্যের অবাধ বাণিজ্য নীতির আওতায় প্যারিসকে নিয়ে আসা, (২) সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ। এজন্য অপ্রয়োজনীয় সরকারী পদগুলি লুপ্ত করা এবং রাজপরিবারের ব্যয় সঙ্কোচ ঘটানো, (৩) সরকারী অর্থের অপচয় রোধ করার জন্য সরকারী কর্মচারীদের জীবনযাত্রার ব্যয় সঙ্কোচ করা, (৪) কর ধার্য করার ব্যাপারে ফ্রান্সের প্রাদেশিক সভাগুলির অনুমোদন নেওয়া বন্ধ করা, (৫) গিল্ড বা বণিক সংঘগুলির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের অবসান

এবং নতুন বণিকদের বাণিজ্যের সুয়োগ দান, (৬) 'কর্ভি' প্রথা লোপ করে কৃষক, জমিদার সকলকেই একটি সাধারণ করের আওতায় নিয়ে আসা। তুর্গোর এই সংস্কার প্রচেষ্টা অভিজাত ও রানীসহ রাজপরিবারের সদস্যদের স্বার্থে আঘাত করে। অভিজাত সম্প্রদায় এগুলিকে তাঁদের বিশেষ অধিকারের ওপর আঘাত বলে মনে করেন। দুর্বলচিত্ত ষোড়শ লুই ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে তুর্গোকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর সমস্ত সংস্কারকে নির্মূল করা হয়।

পরবর্তী অর্থমন্ত্রী কুইঁনি-র অকালমৃত্যুর ফলে জ্যাক নেকার অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন (১৭৭৬-৮১ খ্রিঃ)। এ সময় ফ্রান্স আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেয়। যুদ্ধের বিপুল ব্যয় মেটানোর জন্য অতিরিক্ত কর স্থাপনের পরিবর্তে নেকার আকর্ষণীয় সুদের (১-১০%) বিনিময়ে ৫৩০ কোটি লিভ্‌র ঋণ করেন। ফলে সরকারের ঘাটতি বাজেট আরও বৃদ্ধি পায়। নেকারের আমলেই সুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০ কোটি লিভ্‌র। ১৭৮১ খ্রিঃ সরকারী আয়-ব্যয়ের ভুল তথ্য সম্বলিত হিসাব নেকার সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত নৌবিভাগ ও সামরিক দপ্তরের ব্যয়ের ওপর অর্থবিভাগের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং শাসন সংস্কার প্রয়াসের জন্য নেকার পদচ্যুত হন। বুরবোঁ রাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সঙ্কট আরো ঘনীভূত হয়।

নেকারের পর ফ্লিউরি ও দরমেঁস-র স্বল্পকালীন মন্ত্রীত্বের পর ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন ক্যালোন। ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্য তিনি ব্যয় সঙ্কোচ এবং করব্যবস্থার সার্বিক সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেন। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যালোন তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন। উল্লেখযোগ্য যে ক্যালোন করসাম্যের প্রস্তাব করেননি। তাঁর প্রস্তাব ছিল লবণ ও তামাকের উপর সারাদেশে একচেটিয়াভাবে কর স্থাপন করা। জমির মালিকগণ যে মাথাপিছু কর বা ক্যাপিতেসিঁয় দিত তা লুপ্ত করে অভিজাত যাজক ও সাধারণ জমিমালিকদের উপর একপ্রকার কর ধার্য করে এবং সমস্ত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক শুল্ক রদ করে তিনি জাতীয় সীমান্তে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক বসানোর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর ফলে দেশীয় শিল্পের উন্নতি করা। তিনি প্রাদেশিক সভার উপর করভার বণ্টনের দায়িত্ব অর্পণের পরামর্শ দেন। এছাড়া অন্যান্য নিপীড়নমূলক করের ক্ষেত্রে আমূল কোন পরিবর্তনের প্রস্তাব না দিলেও তিনি সামান্য কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন। যেমন 'তেই' থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ এক-দশমাংশ কমানোর এবং 'করভি'-র পরিবর্তে অর্থগ্রহণের প্রস্তাব করেন। একথা বলা যায় যে এই প্রস্তাবগুলি কার্যকরী হলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক কাঠামোতে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে পারত। তবে ক্যালোন অনুভব করেন যে পার্লামেন্ট বা অভিজাত সম্প্রদায় তাঁর এই পরিকল্পনা মেনে নেবে না। তাই রাজার অনুমতি নিয়ে তিনি নিজ মনোনীত অভিজাতদের সভা (Assembly of Notables) আহ্বান করে তাঁর প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করেন (Feb. 1787)। কিন্তু রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্ত করার পরিবর্তে এই সভা শ্রেণিস্বার্থকেই বড় করে দেখে। অভিজাত এবং যাজকরা তাদের বিশেষ সুবিধা রক্ষায় বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেন। অভিজাতদের সভা দাবী করেন যে ক্যালোন প্রস্তাবিত ভূমিকর অসাংবিধানিক এবং ক্যালোনকে তাঁর যাবতীয় আর্থিক হিসেবনিকাশ অভিজাতদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৭ খ্রিঃ ৮ই এপ্রিল ষোড়শ লুই ক্যালোনকে পদচ্যুত করেন। এই ঘটনা অভিজাতদের কাছে রাজার দুর্বলতাকে প্রকট করে তোলে। অভিজাতদের যাবতীয় দাবী রাজা মেনে নেন এবং এই ঘটনা অভিজাতদেরও মনোবল বৃদ্ধি করে।

ক্যালোনের স্থলাভিষিক্ত হন লমেনি দ্য ব্রিয়াঁ। তিনিও অনুভব করেন ক্যালোনের সংস্কার পরিকল্পনা ব্যতীত রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষার সম্ভাবনা কম। ফলে তিনি ক্যালোনের পরিকল্পনা কিছুটা রূপান্তরিত করে (যেমন ভূমিকরের বাৎসরিক পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি, স্ট্যাম্পকর কিছুটা বৃদ্ধি, বাড়ি ভাড়ার উপর কর স্থাপন ইত্যাদি) অভিজাত সভার সামনে পেশ করেন। সেইসঙ্গে তিনি এও প্রস্তাব দেন যে সরকারী ক্ষুদ্র ঋণগুলি শোধ করার জন্য সরকারের তরফ থেকে পুনরায় পঞ্চাশ কোটি লিভ্‌র ঋণ নেওয়া হোক। অভিজাত সভা এগুলিতে আপত্তি জানালে ২৫শে মে ষোড়শ লুই ওই সভা ভেঙে দেন এবং ব্রিয়াঁর প্রস্তাবগুলি প্যারিসের পার্লামেন্টের কাছে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু পার্লামেন্ট স্ট্যাম্প করের প্রস্তাব এবং ভূমিকরের পরিকল্পনা নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করে। যেহেতু পার্লামেন্ট ছিল মূলত অভিজাতদের সভা সেই কারণে তারা বোঝে যে, এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে তাদের বিশেষ অধিকারে আঘাত পড়বে। ব্রিয়াঁ রাজার বিশেষ অধিকার বা Lit de Justic প্রয়োগের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করতে উদ্যোগী হলে পার্লামেন্ট এটিকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলে দাবী করে। এই পরিস্থিতিতে পার্লামেন্ট নিজেকে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে প্রচার করতে শুরু করে এবং রাজার ক্ষমতা খর্ব করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। পার্লামেন্ট অর্থ সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্য স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন আহ্বানের জন্য রাজার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, জনসমর্থন আদায়ের জন্য প্যারিস পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক পার্লামেন্টগুলি জাতির জন্য মৌলিক অধিকার দাবী করে এবং এর দ্বারা তৃতীয় সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মে পার্লামেন্ট ঘোষিত মৌলিক আইন বিধিতে ঘোষণা করা হয় যে, রাজতন্ত্র বংশানুক্রমিক, একমাত্র স্টেটস জেনারেল নতুন কর প্রস্তাব অনুমোদন করার অধিকারী, বিশেষ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বা বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করার প্রথা (Letters de Cachet) বেআইনী। প্রাদেশিক সভাগুলির অধিকার ভঙ্গ করা অবৈধ এবং বিচারকদের পদচ্যুত বা নির্বাসিত করাও অবৈধ। এই ঘোষণার মাধ্যমে অভিজাতদের বিশেষ অধিকার রক্ষা এবং রাজার ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করা হয়। এটি ছিল রাজশক্তির বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের আইনী বিদ্রোহ।

পার্লামেন্টের বিদ্রোহ দমনের জন্য ষোড়শ লুই পার্লামেন্টের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেন ও ৮ই মে বিশেষ ক্ষমতা জারি করে পার্লামেন্টের বিচার করার অধিকার কেড়ে নেন। রাজকীয় আইন নথিভুক্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নবসৃষ্ট এক প্লেনারী কোর্ট-এর ওপর। এছাড়া পার্লামেন্টগুলির দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা কয়েকটি নতুন বিচারালয়ের হাতে দেওয়া হয়। তৃতীয় সম্প্রদায়কে সামন্তপ্রভুদের ম্যানর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রাজকীয় আদালতে আবেদন করার অধিকার দেওয়া হয়।

উপরিউক্ত রাজকীয় ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে পার্লামেন্ট সরাসরি রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ, জন্মসূত্রে অভিজাতগণ এবং প্রাদেশিক অভিজাতরা পার্লামেন্টকে সমর্থন করেন। এছাড়া এক শ্রেণির মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া যাঁরা কর্মসূত্রে বা অন্য কোনোভাবে অভিজাতদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, তাঁদেরও সমর্থন লাভ করে পার্লামেন্ট। বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা শুরু হয়। দ্যাফিনের দাঙ্গা য় অভিজাতদের সপক্ষে নেতৃত্ব দেন বুর্জোয়ারা। অপরদিকে ব্রিটানীতে শ্রমিকশ্রেণি সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষ শুরু করে। ১৭৮৮ খ্রিঃ ২১শে জুলাই অভিজাত উচ্চ যাজক এবং বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা ভিজেই নামক স্থানে মিলিত হয়ে স্টেটস জেনারেলের আহ্বানের দাবী জানায়। ৫ই জুলাই ব্রিয়াঁ প্রতিশ্রুতি দেন যে ১৭৮৯-

এর ১লা মে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন বসবে। ১৭৮৮ খ্রিঃ ২৪শে অগাস্ট ব্রিয়াঁ পদত্যাগ করেন এবং অর্থমন্ত্রী হিসেবে নেকারকে পুনর্নিয়োগ করা হয়। যোড়শ লুই সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিস পার্লামেন্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রাদেশিক সভা ও পার্লামেন্টগুলির অধিকার ফিরিয়ে দেন। এইভাবে রাজকীয় সংস্কারের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে অভিজাতগণ জয়লাভ করে।

অভিজাতশ্রেণির এই অভ্যুত্থানের প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ বর্তমান। ঐতিহাসিক লেফেভ্‌র এই অভ্যুত্থানকে 'অভিজাত বিপ্লব' হিসেবে অভিহিত করেছেন। যদিও মাতিয়ে একে 'অভিজাত বিদ্রোহ' বলতেই বেশি আগ্রহী। যাই হোক অভিজাতদের এই আন্দোলন একটি প্রতিক্রিয়াশীল অভ্যুত্থান হিসেবে শুরু হয়েছিল। একে সঠিক অর্থে বিপ্লব বলা যায় না কারণ পুরাতনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন বা করভারের সুষম বণ্টনের পরিবর্তে অভিজাতসম্প্রদায় রাজক্ষমতার হ্রাস এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নিজেদের বিশেষ অধিকার বজায় রাখার দাবীতে আন্দোলন শুরু করেছিল। অভিজাতদের এই দাবী ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। তবে লেফেভ্‌র এই অভ্যুত্থানকে অভিজাত বিপ্লব বলেন কারণ এই অভ্যুত্থানে সুবিধাভোগী সমস্ত গোষ্ঠী রাজার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ক্রমশ বুর্জোয়াদের সমর্থনে এই আন্দোলন রাজতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধ একে সফল প্রতিবাদ বলা যেতে পারে। তবে রাজার দৈব ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করা ছাড়া এই অভ্যুত্থান বিশেষ কিছু করতে পারেনি। অভিজাতদের প্রত্যাশা ছিল স্টেটস জেনারেলের মাধ্যমে রাজশক্তির ক্ষমতা খর্ব করার সম্ভব হলেও অভিজাতদের স্বার্থরক্ষা হবে। কিন্তু তাঁরা বোঝেননি যে পুরাতন ব্যবস্থায় রাজশক্তি এবং বিশেষ সুবিধাভোগীর স্বার্থ একে অপরের পরিপূরক। ফলে স্টেটস জেনারেল আহ্বানের মাধ্যমে রাজতন্ত্র বিরোধীতা শেষ পর্যন্ত অভিজাতদেরই প্রত্যাঘাত করেছিল। তৃতীয় শ্রেণির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জনের পথ অভিজাতরাই অবচেতনে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। অভিজাতরা যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন সেই বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন তৃতীয় সম্প্রদায়।

২.৩ ❒ বুর্জোয়া বিপ্লব

অভিজাত সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান রাজা যোড়শ লুইকে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহ্বানের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করেছিল। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দের পর স্টেটস জেনারেলের কোনো অধিবেশন হয়নি। অর্থাৎ বিগত ১৭৫ বৎসর যাবৎ জাতির প্রতিনিধিসভার পরামর্শকে অগ্রাহ্য করে গেছেন ফ্রান্সের রাজারা। ফলে, স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহ্বানের অঙ্গীকার ফ্রান্সের সকল সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করে তুলেছিল। অভিজাত সম্প্রাদয়ের ধারণা ছিল এই সংগঠনের মাধ্যমে তাঁদের বিশেষ সুযোগসুবিধা ও অধিকার সুরক্ষিত করা যাবে। অপরদিকে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের আশা ছিল এর দ্বারা দেশে শান্তি ও প্রগতির বাতাবরণ সৃষ্টি হবে।

প্রথমে স্টেটস জেনারেলের প্রাচীন প্রথা ও কার্যপদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৬১৪ খ্রিঃ বা তার পূর্বে স্টেটস জেনারেল তিনটি কক্ষ নিয়ে গঠিত ছিল। এই তিনটি কক্ষ ফ্রান্সের তিনটি সামন্ত শ্রেণির (Estate) জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যৌথ অধিবেশনের পরিবর্তে প্রতিটি কক্ষের পৃথক পৃথক অধিবেশন হ'ত।

উল্লেখযোগ্য যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে তৃতীয় শ্রেণির অনেক বেশি প্রতিনিধি প্রাপ্য থাকলেও তিন শ্রেণির নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল সমান। যে কোনো প্রস্তাব প্রতিটি কক্ষে পৃথকভাবে আলোচনা করে ভোটাধিক্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত সেই সিদ্ধান্ত কক্ষের সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হ'ত। তিনটি কক্ষের একটি ক'রে মোট তিনটি ভোটের মধ্যে প্রস্তাবের পক্ষে দুটি ভোট হলে প্রস্তাবটি গৃহীত হ'ত। এই ভোট মাথাপিছু ছিল না, ছিল শ্রেণিভিত্তিক। এর ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তৃতীয় শ্রেণির যে কোনো সিদ্ধান্তকে নাকচ করতে পারত।

অভিজাত সম্প্রদায় দাবী করেন যে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে নবনির্বাচিত স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন পূর্বের রীতিপদ্ধতি অনুসারেই পরিচালিত হবে। এর দ্বারা তাঁরা তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ অধিকার বজায় রাখতে উদ্যোগী হন। যাজকগোষ্ঠীও তা সমর্থন করেন। তৃতীয় শ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষিত বুর্জোয়া গোষ্ঠী অনুভব করেন যে অভিজাত বিদ্রোহের সময় জাতির রক্ষক হিসেবে যে দাবী অভিজাত গোষ্ঠী তুলেছিলেন তা অন্তঃসারশূন্য। ফলে পূর্ববর্তী অভিজাত ও বুর্জোয়া ঐক্য নষ্ট কহতে শুরু করল। বুর্জোয়া গোষ্ঠী পরিবর্তিত আকারে স্টেটস্ জেনারেলের নির্বাচন ও পরিচালনা প্রক্রিয়ার দাবী তোলেন। উল্লেখযোগ্য যে, এক্ষেত্রে যাজক ও অভিজাতদের অনেকেই তৃতীয় শ্রেণির সমর্থনে এগিয়ে আসেন। ফলে, অভিজাতদের নিজেদের ঐক্যও নষ্ট হ'তে শুরু করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইতিমধ্যে অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের কিছু উদারপন্থী ব্যক্তি লাফায়েৎ, ট্যালিরাঁ, মিরাবো প্রমুখ গঠন করেন 'জাতীয় দল' বা Patriotic Party, তৃতীয় শ্রেণির মুখপাত্র হিসেবে এঁরা প্রচার চালাতে শুরু করেন। এছাড়া বহু পত্রপত্রিকা, প্রচারপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে অভিজাতদের প্রতিক্রিয়াশীল দাবীর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা শুরু হয়, ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয় উদারনৈতিক চিন্তাধারা ও দার্শনিকদের বক্তব্যগুলি। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং বৃত্তিজীবী বুর্জোয়া গোষ্ঠী অভিজাতদের সমমর্যাদা লাভের জন্য সংগ্রাম শুরু করেন।

বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের দাবি ছিল, তৃতীয় শ্রেণির প্রতিনিধিদের সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হবে। শ্রেণিভিত্তিক ভোটের পরিবর্তে মাথাপিছু ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর সরকার তৃতীয় শ্রেণির প্রতিনিধিদের সংখ্যা দ্বিগুণ করার প্রস্তাব মেনে নেন। তবে মাথাপিছু ভোটদানের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। স্টেটস্ জেনারেলের নির্বাচন সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ জারি হয় ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। নির্বাচন পদ্ধতি ছিল জটিল। তৃতীয় শ্রেণির অধিকাংশ সদস্যই নির্বাচিত হয়েছিলেন শিক্ষিত বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্য থেকে। এঁরা ছিলেন সংস্কারকর্মী, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, সৎ। অ্যাবে সিয়েসের মত যাজক বা মিরাবোর মত অভিজাত নির্বাচিত হন তৃতীয় শ্রেণি থেকে। লাফায়েৎ, বেইলি, বারণাভ, বুজ, রোবসপিয়ের প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা ছিলেন তৃতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি। স্টেটস্ জেনারেলের মোট ১২১৪ জন সদস্যের মধ্যে ৫৯৩ জন ছিলেন যাজক ও অভিজাত শ্রেণিভুক্ত এবং তৃতীয় শ্রেণির সদস্যসংখ্যা ছিল ৬২১ জন।

ষোড়শ লুই-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনটি শ্রেণি জাতীয় সভা বা স্টেটস্ জেনারেল সম্পর্কে তাঁদের প্রস্তাব বা অভিযোগ সমূহ (Cahiers) পাঠান, এই অভিযোগপত্রগুলির বক্তব্যসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অভিজাত এবং যাজকগণ তাঁদের বিশেষ অধিকারগুলি সংরক্ষিত রাখতে উৎসাহী ছিলেন। শহুরে বুর্জোয়াদের

দাবী ছিল অভিজাতদের সঙ্গে সামাজিক সাম্য আর গ্রামীণ কৃষকরা সামন্ততান্ত্রিক ভার ও অতিরিক্ত রাজকীয় কর থেকে মুক্তির দাবী তুলেছিল। গ্রাম বা শহরাঞ্চলের সাধারণ মানুষ খাদ্যশস্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ, ধনতান্ত্রিক সম্প্রসারণেরও নিয়ন্ত্রণ দাবী করেছিল। তবে কয়েকটি বিষয়ে তিনটি শ্রেণির দাবী একবিন্দুতে মিলে গিয়েছিল যেমন আইনের শাসনের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের স্বৈরক্ষমতাকে সংস্কারসাধন করা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, পত্রপত্রিকার স্বাধীনতা, শুল্কব্যবস্থার বৈষম্য হ্রাস ইত্যাদি। তবে সর্বনিম্ন স্তরের দরিদ্র ও গ্রাম্য জনতার অভিযোগও উপস্থাপিত করার সুযোগ তাঁরা পাননি যেহেতু প্রাথমিক নির্বাচনেই তারা পিছিয়ে পড়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে বুর্জোয়া বা অভিজাত সম্প্রদায়ের দাবীপত্রে রাজতন্ত্রের প্রতি আস্থার অভাব ছিল না। বুর্জোয়াগণ সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের বিপক্ষে ছিলেন না। তবে তাঁরা অভিজাতদের বিশেষ অধিকারের পরিবর্তে সমমর্যাদা দাবী করেছিলেন। সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতার কোন অর্থ ছিল না তৃতীয় শ্রেণির কাছে। ষোড়শ লুই এই দলগুলির দাবীরপ্রতিকার করতে পারলে সম্ভবত বিপ্লবের গতি অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু সেই ব্যক্তিত্ব বা যোগ্যতা অথবা কোন সুযোগ্য মন্ত্রীর পরামর্শ ষোড়শ লুই-এর ছিল না।

১৭৮৯-এর ৫ই মে স্টেটস্ জেনারেলের ঐতিহাসিক অধিবেশন শুরু হয়। রাজা এবং প্রশাসন তিনশ্রেণির প্রতিনিধিদের একত্রে বসার অধিকার দিলেন না, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণির দাবী ছিল সকল শ্রেণির যৌথ অধিবেশন এবং শ্রেণিগত ভোটের পরিবর্তে মাথাপিছু ভোটের অধিকার। ১০ই জুন যাজক এবং অভিজাত প্রতিনিধিদের শেষবারের মত তৃতীয় শ্রেণির সঙ্গে সংযুক্ত হবার অনুরোধ জানানো হয়। এতেও ব্যর্থ হয়ে ১৭ই জুন অ্যাবে সিয়েস-এর প্রস্তাব অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণির সদস্যরা নিজেদের ফ্রান্সের 'জাতীয় সভা' (National Assembly) বলে ঘোষণা করেন। রাজা একটি রাজকীয় অধিবেশনের মাধ্যমে বিক্ষুব্ধ সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হবার সিদ্ধান্ত নেন। ২০শে জুন তৃতীয় শ্রেণির প্রতিনিধিরা সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে দ্বার বন্ধ দেখে ঐতিহাসিক 'টেনিসকোর্ট' শপথ গ্রহণ করেন। বেইলীর নেতৃত্বে তাঁরা ঘোষণা করেন যে ফ্রান্সের নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ঐক্যবন্ধ থাকবেন এবং প্রয়োজনে সর্বদা মিলিত হবেন। বেশকিছু নিম্নস্তরের যাজকও তৃতীয় শ্রেণির সঙ্গে যোগ দেন।

২৩শে জুন রাজকীয় অধিবেশন শুরু হলে রাজা প্রধানত সুবিধাভোগী শ্রেণির পক্ষ নিলেন। তিনি অবশ্য ফ্রান্সের জন্য একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা, নাগরিক স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য ইত্যাদি সহ ঘোষণা করেন স্টেটস জেনারেলের কর স্থাপন, ঋণ সংগ্রহ এবং বাজেট অনুমোদনের ক্ষমতা থাকবে। স্বীকৃত হবে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণির মাথাপিছু ভোটের সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিলেন না। ফলে তৃতীয় শ্রেণির প্রতিনিধিগণ পৃথক অধিবেশনের আদেশ অমান্য করে সভাকক্ষ ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। ইতিমদ্যে যাজক ও অভিজাতদের একটি অংশ তৃতীয় শ্রেণির সঙ্গে যোগ দেন। শেষপর্যন্ত রাজা তৃতীয় শ্রেণির কাছে নতিস্বীকার করেন এবং ২৭শে জুন তিন সম্প্রদায়ের অধিবেশনের দাবী মেনে নেওয়া হয়। এই নির্দেশের মাধ্যমে বাস্তবে রাজার বিশেষ ক্ষমতা ফ্রান্সের সর্বশ্রেণির প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এক জাতীয় সভার হাতে চলে গেল। বুর্জোয়া বিপ্লবের রক্তপাতহীন প্রাথমিক পর্ব সফল হল। তৃতীয় শ্রেণির রাজনৈতিক গুরুত্ব স্বীকৃত হল। জাতীয় সভাকে সংবিধান সভার মর্যাদা দান করা হল। স্থির হল জাতীয় সভা দেশের জন্য একটি নতুন সংবিধান রচনা করবে। বুর্জোয়া শ্রেণির এই জয়কে অনেকে 'বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক লেফেভ্‌র ফরাসী বিপ্লবে বুর্জোয়াদের ভূমিকার সপক্ষে মত

ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, বুর্জোয়ারা চেয়েছিলেন সামাজিক ও আর্থিক সম্পর্কের পুর্নবিন্যাস। কারণ, বুর্জোয়াদের একাংশ এ যুগে প্রভূত অর্থের অধিকারী হলেও বংশকৌলীন্যের অভাবে যোগ্যতা সত্ত্বেও সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। যে অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত ছিলেন, তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজতন্ত্র ও অভিজাত সম্প্রদায়। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে আঘাত হানাই ছিল বুর্জোয়াদের লক্ষ্য। এই লক্ষে তাঁরা বিপ্লবে যোগ দেন। তবে, লেফেভ্র ফরাসী বিপ্লবের এক বিশেষ পর্যায়কে 'বুর্জোয়া বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে অভিজাতশ্রেণি ও শেষ পর্যায়ে সাঁকুলেৎ জনতার হাতে বিপ্লবের নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক সোবুল লেফেভ্রকে সমর্থন করলেও ব্রিটিশ ঐতিহাসিক কোবান দেখিয়েছেন যে বিপ্লব সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করে বুর্জোয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল একথা ঠিক নয়। কারণ ১৭৮৯-এর স্টেটস্ জেনারেল নির্বাচিত বুর্জোয়া সদস্যদের মাত্র ১৩ শতাংশ ছিলেন ধনী বুর্জোয়া আর বিপ্লবে যাঁরা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন সেই আইনজীবী, শিক্ষক, লেখক প্রমুখকে তিনি বলেছেন 'ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া'। তাঁর মতে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি প্রভৃতি সম্পদশালী বুর্জোয়ারা বিপ্লবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেননি। তবে লেফেভ্র অবশ্য বলেছেন এই ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াদের লক্ষ্য এবং কর্মসূচী ছিল সামন্ততন্ত্র বিরোধিতা যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের সহায়ক হয়েছিল।

সম্প্রতি জর্জ টেলর বলেছেন যে মূলধনী বুর্জোয়ারা রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। ফ্রান্সের উচ্চ ও নিম্ন বুর্জোয়াদের মধ্যে আর্থিক অবস্থা ও মর্যাদাগত বিভেদ এতটাই তীব্র ছিল যে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এদের ঐক্যবন্ধ করা সম্ভব ছিল না। জন ম্যাকম্যানার্স-এর মতে, অর্থ ও সম্পদের প্রাচুর্য অভিজাত এবং উচ্চ বুর্জোয়াদের একসূত্রে বেঁধেছিল। বহু ক্ষেত্রেই উভয়ের স্বার্থ ছিল অভিন্ন। অধুনা বেটী বেহেরেনস্ নামক গবেষক বলেছেন যে ফ্রান্সে অভিজাত ও বুর্জোয়াদের বিরোধী সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা রয়েছে। কারণ পুরাতনতন্ত্রে অভিজাতরা যেমন অনেকটাই কর দিতেন তেমনি বুর্জোয়ারাও বেশকিছু সামাজিক অধিকার ভোগ করতেন। আবার বহু অভিজাত পুঁজির অধিকারী ছিলেন এবং বুর্জোয়ারাও অনেকে জমির মালিক ছিলেন। এককথায় বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সে বুর্জোয়া ও অভিজাতদের অভ্যন্তরীণ সংঘাত খুব শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু এ সত্ত্বেও বিপ্লবের প্রাথমিক পর্বে এদের সংঘাতের কারণ অর্থনৈতিক ছিল না। ঐতিহাসিক জর্জ টেলরের মতে, এদের সংঘাতের মূলে ছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সঙ্কট, স্টেটস্ জেনারেলে অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক পুরাতন ভোটদান পদ্ধতি বজায় রাখার দাবী জোরালো হয়ে উঠলেই এদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। অভিজাতদের এই প্রয়াস বুর্জোয়াদের সকল অংশকেই শঙ্কিত করেছিল। ফলে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে এই দুই গোষ্ঠীর বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সুতরাং ফরাসী বিপ্লব যে একটি পর্যায়ে বুর্জোয়াদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখেই অগ্রসর হয়েছিল একথা বলা যায়।

২.৪ ❒ পৌর বিপ্লব

রাজা যোড়শ লুই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তৃতীয় শ্রেণির দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। একই সঙ্গে জাতীয় সভার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিচলিত যোড়শ লুই প্যারিস ও ভার্সাই নগরে সৈন্য মোতায়েন করতে শুরু

করেন। জাতীয় সভা রাজাকে সৈন্যবাহিনীর প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানালেও ষোড়শ লুই তা প্রত্যাখ্যান করেন। রাজার আশা ছিল সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় পুরাতনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা যাবে। ১১ই জুলাই অর্থমন্ত্রী নেকার ও তাঁর সমর্থকদের পদচ্যুত করা হয় এবং নেকারকে দেশ থেকে বহিষ্কারও করা হয়। এই সময় প্যারিসের জনতার মধ্যে এক বিপ্লবী চেতনা দেখা দেয়। তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকগণ একটি নাগরিক রক্ষীবাহিনী গঠন করেন। বহু সরকারী সৈন্য এই বাহিনীতে যোগ দেয়। ইতিমধ্যে খাদ্যাভাব, মূল্যবৃদ্ধি, ফসলহানি ইত্যাদির ফলে বহু দরিদ্র মানুষ গ্রামত্যাগ করে প্যারিসে চলে আসে। রাজার প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থায় ক্রুদ্ধ জনতা দাঙ্গা হাঙ্গামা লুঠতরাজ শুরু করে। রাজকর্মচারীদের বিতাড়িত করা হয়। শুল্ক চৌকিগুলি ভেঙে ফেলা হয়। অস্ত্রশস্ত্রের দোকান লুঠ করে জনতা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে। প্যারিসের শ্রমিক কৃষক জনতার বিরুদ্ধে রাজা অশ্বারোহী সৈন্য পাঠালে ক্ষিপ্ত ও সশস্ত্র জনতা ১৪ই জুলাই ফ্রান্সের স্বৈরাচারের মূর্ত প্রতীক বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করে। বাস্তিলের পতন ফরাসী বিপ্লবের প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ঘটনা। আতঙ্কিত ষোড়শ লুই প্যারিস থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করেন এবং নেকারকে পুনরায় মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হয়। প্যারিসের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় বিপ্লবী জনতার হাতে। ঐতিহাসিক জে. এম. রব বাস্তিলের পতন সম্পর্কে বলেছেন যে এই ঘটনা প্রমাণ করে যে বহির্শক্তির সাহায্য ব্যতীত রাজতন্ত্রের পক্ষে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না এবং রাজা জাতীয় সভার সঙ্গে ক্ষমতা বিভাজন করতে বাধ্য। ১৭ই জুলাই ষোড়শ লুই প্যারিসে আসে এবং বিপ্লবের তিনরঙা পতাকাকে (লাল, নীল, সাদা) জাতীয় প্রতীক হিসেবে মেনে নেন। উল্লেখযোগ্য যে জনতা তখনও রাজবিরোধী ছিল না, তাদের ধারনা ছিল যে রাজা এখন অভিজাতদের কবলমুক্ত। প্যারিসের বুর্জোয়াশ্রেণি নগরের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসন পরিচালনার জন্য প্যারিসের পৌর প্রশাসনকে নতুন করে সংগঠিত করতে এক কমিটি গঠন করল যা 'প্যারী কমিউন' নামে পরিচিত। এই কমিউনের মেয়র নিযুক্ত হলেন বেইলী। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জাতীয়রক্ষীবাহিনী গঠন করা হল যার সর্বাধিনায়ক হলেন লাফায়েৎ। প্যারী কমিউন গঠনকে নগর শাসনব্যবস্থায় একটি বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন ঐতিহাসিক হেজ। এর ফলে প্রশাসনিক ক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাতে এল। প্যারী কমিউনের স্বায়ত্তশাসন রাজা মেনে নিলেন এবং ভার্সাই-এর পরিবর্তে প্যারিস ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে পরিণত হল। ফ্রান্সের অন্যান্য শহরগুলিতেও প্যারী কমিউনের অনুকরণে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌরপসভা এলাকার উপর ইনটেনডেন্টের ক্ষমতা অগ্রাহ্য করা হয়। শহরাঞ্চলে রাজার কর্তৃত্ব কমে আসে এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়।

২.৫ ❒ কৃষক বিপ্লব

ফ্রান্সে পৌর বিপ্লব বা প্যারিসের বিপ্লবের ফলে বিপ্লব সুদূর গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক জর্জ রুডে বলেছেন এর অনেক আগে থেকেই গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছিল। ১৭৮৮ খ্রিঃ ফসলহানি, খাদ্যাভাব, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষকদের অবস্থা দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এই পরিস্থিতিতে প্যারিসের বিপ্লব এবং বাস্তিলের পতন কৃষকদের মধ্যে অভিজাত ও যাজকশ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মানসিকতা এনে দেয়। সামন্ততান্ত্রিক দায়দায়িত্ব বাতিল করার ইচ্ছাও তাদের মধ্যে ছিল। সেইসঙ্গে শুরু

হয় লেফেভ্‌রের ভাষায় ‘মহা আতঙ্ক’ (Great Fear)। গুজব রটে যে অভিজাতরা ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে গ্রামের শস্যক্ষেতগুলি নষ্ট করতে চায়। ফলে গ্রামাঞ্চলে কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে। তারা শস্যভাণ্ডার আক্রমণ করে। রাজা, চার্চ বা সামন্তপ্রভুকে করদান থেকে বিরত থাকে। নরম্যান্ডি অঞ্চলে জমিদারদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয়, দলিল দস্তাবেজ পুড়িয়ে ফেলা হয়। এককথায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর এক বড় আঘাত হানে এই কৃষক বিপ্লব। উল্লেখযোগ্য যে শহুরে ব্যবসায়ী ও বুর্জোয়াশ্রেণি যারা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে দরিদ্র মানুষদের জীবন অসহনীয় করে তুলেছিল তারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অভিজাত ও ধনী বুর্জোয়া ভয়কেই কৃষকরা শোষক হিসাবে গণ্য করে। এই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ তথা জাতীয় সভার নেতারা কৃষকদের দমন করে তাদের তৃতীয় শ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে আইন প্রণয়ন করে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিলেন।

১৭৮৯ খ্রিঃ ৪ঠা অগাস্ট জাতীয় সভায় সর্বসম্মতভাবে কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব ঘোষিত হয়। এগুলি হল ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে সামন্তপ্রভুর অধিকার, ভূমিদাস প্রথা, কর্ভি, টাই প্রভৃতি করের বিলুপ্তি। আইন ও বিচারের সাম্য স্বীকৃত হয়, সরকারী পদ বিক্রয় প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। রাজার খাস জমি ও চার্চের জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এইভাবে ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব লুপ্ত করার চেষ্টা করা হয়। তবে একথাও ঠিক যে সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ ধ্বংস এই প্রস্তাবে করা হয়নি কারণ অভিজাতদের বহু করের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ শর্ত ছিল অর্থাৎ কৃষকদের অর্থ দিয়ে ঐ সমস্ত করদান থেকে মুক্ত হতে হবে। যাইহোক ১১ই আগস্ট জাতীয় সভা এক ডিক্রি জারি করে ফ্রান্সে সামন্তপ্রথার অবলুপ্তির কথা ঘোষণা করে। ফলে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে ফ্রান্স এক ধাপ এগিয়ে যায়। ২৭শে অগাস্ট ব্যক্তিগত ও মানবিক অধিকারের ঘোষণা করা হয় যাতে স্বাধীনতা, সাম্য ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়। রাজা আরও প্রস্তাব বা মানবিক অধিকারের ঘোষণা মেনে নিতে রাজি হলেন। সেইসঙ্গে ভবিষ্যত সংবিধানের রূপ নিয়ে সংবিধানসভায় মতবিরোধ চলতে থাকে। ইতিমধ্যে খাদ্যসঙ্কট, রুটির মূল্যবৃদ্ধি প্যারিস, ভার্সাই ও সেন্ট ডেনিসে দাঙ্গার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ৫ই অক্টোবর দরিদ্র মহিলাদের একটি মিছিল ভার্সাই-এর দিকে যাত্রা করে। আত্মরক্ষার জন্য ষোড়শ লুই ভার্সাই-এ সেনা সমাবেশ করান। অপরদিকে রাজাকে প্যারিসে নিয়ে আসার দাবি তুমুল হয়ে ওঠে। এই বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে ষোড়শ লুই জাতীয় সভার আইনগুলিতে সম্মতি দেন। রাজা ও তাঁর পরিবারকে একটি সাধারণ গাড়িতে চাপিয়ে প্যারিসে নিয়ে আসা হয়। দশদিন পর জাতীয় সভা রাজার সঙ্গে মিলিত হয়। রাজা বিপ্লবী নেতাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য হন। বুর্জোয়া প্রতিনিধিগণ রাজা এবং অভিজাত উভয়ের উপরেই অধিপত্য স্থাপন করে। এই ঘটনা বুর্জোয়া শ্রেণিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে বলা যেতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে রাজার চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকলে তিনি সম্ভবত অভিজাত শ্রেণির পতনের সুযোগ নিতে পারতেন। কিন্তু তা হয়নি। জাতীয় সভা ক্রমশ রাজা ও তার মন্ত্রীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। ১৭৯০-এর ২০শে জুন ষোড়শ লুই গোপনে দেশত্যাগ করতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং তারপর থেকে প্যারিসের তুইলেরি প্রাসাদে রাজপরিবারকে প্রায় বন্দী জীবনযাপন করতে হয়। ২৫শে জুন জাতীয় সভা ষোড়শ লুইকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে।

২.৬ ❒ সংবিধান সভা (১৭৮৯-৯১)

৯ই জুলাই, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাতীয় সভা সংবিধান সভায় রূপান্তরিত হয়। সংবিধান সভা ফ্রান্সের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্বের কথা ঘোষণা করে। সভার সদস্যদের থেকেই কয়েকটি কমিটি গঠন করে সংবিধান সভা তার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি, কৃষক বা সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের প্রতিনিধিত্ব প্রায় ছিল না। ফলে, সংবিধান সভা প্রধানত মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া সাম্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই সংবিধান রচনা করে। তবে এর মধ্যেও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। যেমন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রী, বামপন্থী প্রমুখ। উচ্চশিক্ষিত লাফায়েৎ মিরাবো, ট্যালিরাঁ, রোবসপিয়ের, বারনেভ, দ্যুপো প্রমুখ ছিলেন বিশেষ সক্রিয় সদস্য, বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ থাকায় তাঁদের মধ্যে মতবিরোধও ছিল।

বাস্তিলের পতন, পৌর বিপ্লব, কৃষক অভ্যুত্থান প্রসূত বৈপ্লবিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় জাতীয়। সভা ৪ঠা আগস্ট ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রের বিলোপের কথা ঘোষণা করেছিল। সংবিধান সামন্ততন্ত্রের অবসানকে আইনসঙ্গা ত স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন করতে অগ্রসর হয়। মূল সংবিধান প্রণয়নের পূর্বে দীর্ঘ আলোচনার পর সংবিধান সভা ২৬শে আগস্ট, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের মূল লক্ষ্য ও আদর্শের নীতি সম্বলিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যা 'ব্যক্তি ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা' নামে পরিচিত। এই ঘোষণাপত্রকে বিপ্লবী সংবিধানের প্রস্তাবনা রূপে অভিহিত করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, এই ঘোষণায় আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের আদর্শ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী চিন্তাধারা প্রতিফলিত। ইংলন্ডের বিখ্যাত 'ম্যাগনা কার্টার' প্রভাবও এতে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে ঘোষণাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। এটি ফরাসী বিপ্লবের এক কিংবদন্তী চরিত্র দান করেছিল, বলেছেন লেফেভর। কোবানের মতে এই ঘোষণায় 'স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্ব' বা Natural Law -কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জর্জ টেলরের মতে, পুরাতনতন্ত্রের স্বৈরাচারী শাসন এবং অভিজাতদের বংশকৌলীন্যের শোকগাথা ছিল এই ঘোষণা। 'বিশেষ অধিকার' ও অসাম্যের বিরুদ্ধে সাম্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এর দ্বারা।

এই ঘোষণাপত্রে সকল মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বলা হয়, প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং কয়েকটি প্রকৃতিগত অধিকার লাভ করে থাকে। এগুলি হ'ল, স্বাধীনভাবে বাঁচা, সম্পত্তি ভোগ ও অর্জন, নিরাপত্তা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অধিকার, এছাড়া মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারী পদে নিযুক্তি, বিনাবিচারে বন্দী হওয়া থেকে মুক্তি, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, করের সমবণ্টন ইত্যাদিও ঘোষিত হয়। সর্বোপরি, ঘোষণা করা হয় যে, ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তে সমগ্র জাতিই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। অথর্খাৎ রাজা নন, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণ।

'ব্যক্তি ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণা' ফরাসী জনগণের কাছে এক অভূতপূর্ব প্রত্যাশার বাণী নিয়ে এলেও এই ঘোষণার কতকগুলি সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। এই ঘোষণায় সর্বসাধারণের স্বার্থের পাশাপাশি বুর্জোয়াশ্রেণির স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে

বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য এই ঘোষণার কিছু কিছু নীতি লঙঘন করা হয়েছিল। নাগরিক অধিকারগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক অধিকারের কথা বলা হয়নি। ফরাসী উপনিবেশগুলিতে ক্রীতদাসপ্রথার অস্তিত্ব, দাস ব্যবসা ইত্যাদি বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়নি। রাজনৈতিক সাম্যের কথা বলা হলেও সামাজিক বা অর্থনৈতিক সাম্যের কথা ছিল অনুচ্চারিত, শিক্ষার অধিকার, নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদিও উহ্য রয়ে গিয়েছিল। নাগরিকদের সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করে সর্বসাধারণের ভোটাধিকারকেও লঙঘন করা হয়েছিল। তবে এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বুর্জোয়া স্বার্থের পরিপোষক এই ঘোষণা ফরাসী জনগণের সামনে এক অসীম সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন এবং লেফেভ্‌র উভয়ই একথা স্বীকার করেছেন।

১৭৮৯-এর অক্টোবর থেকে ১৭৯১-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার পর সংবিধানসভা ফ্রান্সের জন্য যে সংবিধান প্রণয়ন করে তা '১৭৯১ খ্রিঃ সংবিধান' নামে পরিচিত। নতুন সংবিধানে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করা না হলেও এটিকে করা হল সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। বুরবোঁ রাজতন্ত্রের দৈবস্বত্বকে অস্বীকার করে রাজাকে সংবিধানের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হল। বলা হল যে ফ্রান্স নয় রাজা হবেন ফরাসী জাতির রাজা। তিনি প্রশাসন পরিচালনার জন্য মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন কিন্তু মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য হবেন না। মন্ত্রীরা তাঁদের কাজের জন্য রাজার কাছে দায়ী থাকবেন। সামরিক বাহিনীর প্রধান হলেও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করার অধিকার রাজার থাকবে না। আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকারও থাকবে না। তিনি সাময়িক নিষেধাজ্ঞা (suspensive veto) দ্বারা আপাতত কোন আইন রদ করতে পারবেন কিন্তু ঐ আইন পরপর তিনবার আইনসভা পাশ করলে তা স্বতঃসিদ্ধভাবে আইনে পরিণত হবে। রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে বার্ষিক ২৫ মিলিয়ন লিভ্‌র ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য মঞ্জুর করা হয়।

সংবিধান অনুযায়ী প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হবে একটি এককক্ষযুক্ত আইনসভা যার সদস্য সংখ্যা হবে ৭৪৫। এঁরা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। এজন্য সম্পত্তির ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলীকে 'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রিয়' এই দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। নির্দিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী সক্রিয় নাগরিকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। নিষ্ক্রিয় নাগরিকদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এর ফলে এই নির্বাচন ব্যবস্থায় অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী নাগরিকদের অধিকারই প্রতিষ্ঠিত হল।

আইনসভাকে আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। এছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তিস্থাপন, করব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, সংবিধান সংশোধন, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত আইন রচনা, সরকারী কাজকর্ম পর্যালোচনা ইত্যাদি দায়িত্ব আইনসভার হাতে অর্পণ করা হয়। এইভাবে ক্ষমতা বিভাজন তত্ত্ব অনুযায়ী শাসন ও আইন বিভাগকে পৃথক করা হয়।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সমগ্র ফ্রান্সকে ৮৩টি প্রদেশ বা ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টকে কয়েকটি ক্যান্টন বা জেলায় এবং কয়েকটি কমিউন বা শহরাঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। ডিপার্টমেন্টগুলি শাসনের জন্য প্রাচীন ইনটেনডেন্ট প্রথা লুপ্ত করে প্রদেশ, জেলা, গ্রাম প্রতিটি স্তরে নির্বাচিত শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি প্রদেশ ও জেলায় একটি নির্বাচিত সাধারণ পরিষদের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। সক্রিয় নাগরিকদের ভোটে দু'বছরের জন্য প্রতিটি কমিউনে একটি পৌরপরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিচারব্যবস্থারও গণতন্ত্রীকরণ করা হয়। বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথক করে স্বাধীনতা দান করা হয়। বিচারকদের সক্রিয় নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব বা 'লত্র দ্য ক্যাশে' আইনের অবসান ঘটে। নতুন নীতি অনুযায়ী ফৌজদারী আইনবিধি গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন বিচারালয়। সর্বোচ্চ স্তরে দুটি জাতীয় আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। যথা, আপীল আদালত এবং উচ্চ আদালত। ক্যান্টনগুলিতে দেওয়ানী বিচারের জন্য একজন 'জাস্টিস্ অফ দ্য পীস' নিযুক্ত হন। প্রত্যেক জেলায় বিচারালয় স্থাপিত হয়। ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচারের ক্ষমতা পৌরসভার ওপর অর্পিত হয়। আর গুরুতর মামলার বিচার করতেন 'জাস্টিস অফ দ্য পীস'। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং বিচারব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়।

ফ্রান্সের মধ্যযুগীয় অর্থব্যবস্থার সংস্কার সাধন ছিল সংবিধান সভার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পুরাতন অর্থব্যবস্থার ভিত্তি এবং করপ্রথা বিপ্লবের ফলে ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু আয়ের নতুন পথ উদ্ভাবিত না হওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল অর্থনৈতিক সঙ্কট। এই সঙ্কট মোকাবিলার জন্য সকলপ্রকার পরোক্ষ কর রদ করে আয়, জমি ও স্থাবর সম্পত্তির ওপর নতুনভাবে কর ধার্য করা হয়। বাণিজ্যিক ও শিল্পজাত অর্থের ওপর কর আরোপ করা হয়। এগুলির মাধ্যমে বার্ষিক প্রায় ২৪০ মিলিয়ন লিভ্‌র আয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আর অন্যান্য ক্ষেত্র থেকেও আদায় হয় প্রায় ১০০ মিলিয়ন। উল্লেখযোগ্য যে স্থাবর সম্পত্তির উপর কর কৃষকের উপরই বেশি করে চেপে বসেছিল। পূর্বের বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে আয় অনুযায়ী সকল শ্রেণির উপর কর ধার্য করা হয়। কিন্তু এর ফলেও আর্থিক সঙ্কটের সমাধান না হওয়ায় চার্চের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তা বিক্রয় করে অর্থসঙ্কট দূর করার চেষ্টা করা হয়। এছাড়া এই সম্পত্তির মূল্যের ভিত্তিতে 'এ্যাসাইন্যাট' (Assignat) নামে এক প্রকার কাগজীমুদ্রার চালু করা হয়। তবে এর দ্বারাও সঙ্কটের বিশেষ সমাধান হয়নি কারণ এই মুদ্রার অনিয়ন্ত্রিত প্রচলন ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে। 'এ্যাসাইন্যাটের মূল্য দ্রুত কমে যায়। ফলে সাধারণ মানুষের আর্থিক দুরবস্থা বৃদ্ধি পায়। সোরা, গন্ধক ও মুদ্রা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের থেকে সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ লুপ্ত করা হয়। বুর্জোয়াশ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য অবাধ বাণিজ্য এবং স্বাধীন উদ্যোগে শিল্প ও বাণিজ্য গঠনের অধিকার স্বীকার করা হয়। অভ্যন্তরীণ শুল্ক ব্যবস্থার কঠোরতা হ্রাস করা হয়। গিল্ড ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হয়।

ধর্মের ক্ষেত্রেও সংবিধান সভা তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার করে চার্চের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে চার্চকে নতুন করে সংগঠিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফরাসী রাষ্ট্র ধর্মমতসহিষ্ণু এই ঘোষণার সঙ্গে ক্যাথলিক ধর্ম আর রাষ্ট্রীয় ধর্ম নয় এক ঘোষণা করা হয় 'টাইদ' বা ধর্মকর বিলুপ্ত করা হয়। ১৭৯০-এর ফেব্রুয়ারিতে মঠবাসী যাজক সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ও মঠগুলির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে চার্চের সংগঠনকে যুক্ত করার জন্য প্রতি ডিপার্টমেন্টে একজন বিশপ এবং প্রতি কমিউনে এক বা একাধিক স্থানীয় যাজক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। চার্চের সমস্ত পদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ কার হবে। ফ্রান্সের উপর পোপের অধিকার থাকল না। বিশপ যাজকরা রাষ্ট্রের অধীনে বেতনভোগী কর্মীতে পরিণত হন এবং তাঁদের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। চার্চের উপরে জাতীয় সার্বভৌম কর্তৃত্ব

প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফ্রান্সের চার্চ জাতীয় চার্চে পরিণত হয়। উল্লেখযোগ্য যে পোপ এই বৈপ্লবিক ব্যবস্থার সমালোচনা করেন এবং খুব কম যাজকই আনুগত্যের শপথ নেন। ফলে ক্যাথলিকদের সাথে ফরাসী বিপ্লবের সংঘাত তীব্র হয় এবং প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে সংবিধান সভার কার্যাবলী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সংবিধান ফ্রান্সে মধ্যযুগীয় বিশেষ অধিকার তথা রাজতন্ত্রের স্বৈরক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে এক সামাজিক বিপ্লব নিয়ে আসে। এবং সীমাবদ্ধ জাতীয় রাজতন্ত্র স্থাপনে সাফল্যলাভ করেছিল সংবিধান সভা। সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ব্যক্তি ও নাগরিকদের অধিকার ঘোষণায় যে সাম্যের নীতির কথা বলা হয়েছিল তা ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপকে বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছিল। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, শাসনব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থার পুনর্গঠন, ভূমিদাসপ্রথার অবসান, চার্চের আধিপত্য হ্রাস ইত্যাদির মাধ্যমে সংবিধান সভা ফ্রান্সের জনগণের মনে নতুন আশাবাদের জন্ম দিয়েছিল।

কিন্তু সংবিধান সভার কাজে বেশকিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। সংবিধান সভা ফ্রান্সের জাতীয় জীবনের প্রায় সমস্ত দিককে ছুঁয়ে গেলেও এর কাজকর্মের মধ্যে বুর্জোয়া স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা অনেকটাই স্পষ্ট। সংবিধান সভায় স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা উচ্চারিত হলেও সকল নাগরিকের জন্যই মুক্তি এসেছিল একথা বলা যায় না। আইনসভার নির্বাচন পদ্ধতি এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে শুধুমাত্র সম্পদশালী বুর্জোয়ারাই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সুযোগ পান। আর্থিক ক্ষমতার ভিত্তিতে নাগরিকদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দু'ভাগে বিভক্ত করার ফলে সংবিধান সভা তার ঘোষিত সাম্যের নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছিল একথা বলা যায়। সামন্তপ্রথা উচ্ছেদ করার কথা ঘোষিত হলেও কৃষকদের অর্থের বিনিময়ে মুক্তিক্রয়ের প্রয়াস কৃষক অসন্তোষকে বৃদ্ধি করেছিল। সংবিধান সভার বাণিজ্য এবং শিল্পনীতি বুর্জোয়াশ্রেণির স্বার্থরক্ষার্থেই সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রমিকদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে বুর্জোয়া মালিকদের হাত শক্ত করেছিল সংবিধান সভা।

ফ্রান্সের মত একটি কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার আকস্মিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনে জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। দেখা দিয়েছিল শাসন এবং আইন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগের অভাব। প্রাদেশিক নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীদের পরাজয় অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনকে দুর্বল করে দিয়েছিল। উপরন্তু কেন্দ্র ও প্রদেশের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে নির্ণীত না হওয়ায় ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়েছিল। রাজার ক্ষমতাহীন দায়িত্ব এবং আইনসভার দায়িত্বহীন ক্ষমতা ছিল প্রশাসনের অন্তরায়। সেইসঙ্গে আইনসভার সদস্যদের পুনঃ নির্বাচিত হওয়ার অধিকার না থাকায় অভিজ্ঞ সদস্যদের পরিবর্তে নবাগত সদস্যদের নিয়ে কাজ চালানোয় সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। রাজার 'বিশেষাধিকার' (Suspensive Veto) প্রয়োগের ক্ষমতা রাজা ও আইনসভার বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

সংবিধান সভার চার্চ বা ধর্ম সংক্রান্ত নীতি এবং নির্বাচন মাধ্যমে যাজক নিয়োগ বহু মানুষকে অসন্তুষ্ট করে। বিপ্লবের সময় নিম্ন যাজকগণ বিপ্লববিরোধী হয়ে ওঠেন। এছাড়া কাগজী মুদ্রা 'এ্যাসাইনেটে'র প্রচলন ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতি ডেকে আনে। আর ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্ব প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সের কৃষিসঙ্কটের অবসান করে ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। ত্রুটি বিচ্যুতি বা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা অবশ্যই বলা যায় যে, সংবিধান সভার কাজকর্ম ফ্রান্সে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতিফলন এসব কার্যাবলীর মধ্যে থাকলেও সেগুলি ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্রের ভিত্তি শিথিল করার ক্ষেত্রে সফল হয়েছিল।

তবে, সংবিধান সভার সব নীতিই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরবর্তী নেতৃত্ব এই সাংবিধানিক সংস্কারের অনেক কিছু অস্বীকার করেছিলেন।

২.৭ ❒ বিপ্লবের অগ্রগতি (১৭৯১-৯৩ খ্রিঃ) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পতন

১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানে রাজক্ষমতা খর্ব করা হলেও নিরুপায় ষোড়শ লুই ঐ সংবিধানে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সংবিধানে বুর্জোয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কিছুদিনের মধ্যে কয়েকটি ঘটনা বুর্জোয়া আধিপত্যে সঙ্কট ডেকে আনে। যেমন ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ক্রমশই বিপ্লবের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে প্যারিসের চরমপন্থী জনতা। অপরদিকে নিজেদের দেশেও বিপ্লব প্রসারিত হওয়ার আশঙ্কায় ইউরোপের শক্তিবর্গ ফ্রান্সে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে। ফরাসী দেশত্যাগী অভিজাতরাও বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিদেশী হস্তক্ষেপের জন্য সচেষ্ট ছিল। এই অবস্থায় ষোড়শ লুই বিদেশী সাহায্যে পুনরায় ফ্রান্সে স্বৈর রাজতন্ত্র স্থাপনে সচেষ্ট হন। ১৭৯১-এর ২০শে জুন তিনি সপরিবারে অস্ট্রিয়ায় পলায়নের চেষ্টা করলে ২১শে জুন ভেয়ারনে নামক স্থানে বিপ্লবীদের হাতে ধরা পড়েন। ২৫শে জুন রাজাকে প্যারিসে ফিরিয়ে এনে প্রায় বন্দী অবস্থায় রাখা হয় এবং শেষ পর্যন্ত রাজা বাধ্য হয়ে নতুন সংবিধান গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন।

২.৮ ❒ আইনসভা (Legislative Assembly)

নতুন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত ৭৪৫ জন সদস্যের ফরাসী আইনসভায় চারটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ছিল। প্রথম দলটিকে বলা হয় 'ফিউল্যান্ট' বা সংবিধানপন্থী দল যাঁরা ১৭৯১ খ্রিঃ সংবিধানকে কার্যকরী করতে চেয়েছিলেন। ঐতিহাসিক এ্যালবার্ট সোবুল এঁদের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী বলে অভিহিত করেছেন, রাজতন্ত্র যাজক এবং অভিজাতদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে এদের প্রতিবিপ্লবী বলেও চিহ্নিত করা হয়েছিল। এঁরা আইনসভায় সভাপতির দক্ষিণ দিকে আসন গ্রহণ করতেন বলে এঁদের দক্ষিণপন্থীও বলা হয়। দ্বিতীয় দলটি ছিল 'জিরন্ডিস্ট'। এঁরা বামপন্থী মনোভাবাপন্ন হলেও নরম মনোভাব ছিলেন। ব্রিসো, দ্যুমরিয়ে, রোঁলা প্রমুখ মধ্য ও উচ্চ বুর্জোয়াদের এই দলে বিশেষ প্রাধান্য ছিল। তৃতীয় দলটি ছিল উগ্র বামপন্থী যাঁরা 'জ্যাকোবিন' নামে পরিচিত ছিলেন। নিম্নবিত্ত বুর্জোয়া, কারিগর, দোকানদার ইত্যাদি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এই দলের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। এ বিপ্লবের সঙ্কটজনক সময়ে জ্যাকোবিন দলের প্রধান নেতা হিসেবে রোবসপিয়েরের উত্থান ঘটে। আর সর্বশেষ ছিল একটি মধ্যপন্থী যাঁরা কোন বিশেষ মতের সমর্থক ছিলেন না। এঁদের কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী বা নেতৃত্বও ছিল না তবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এঁদের ভোট ছিল মূল্যবান।

আইনসভার অধিবেশন শুরু হয়েছিল ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর। প্রথম থেকে আইনসভা দুটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথমত সংবিধান সভার চার্চ নীতি গোঁড়া ক্যাথলিকদের ক্ষুব্ধ করেছিল। এছাড়া গ্রামীণ রক্ষণশীল কৃষকগোষ্ঠী এই সংবিধানকে তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। দ্বিতীয়ত ফরাসী অভিজাতরা বিদেশে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করাও ছিল আইনসভার বড় সমস্যা।

প্রথম সমস্যাটি সম্পর্কে আইনসভা প্রস্তাব গ্রহণ করে যে যেসব সিভিল কনস্টিটিউশন মেনে চলতে অস্বীকার করবে তাদের বেতন, পেনশন ইত্যাদি বাতিল করে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হবে। আরো জটিল কারণ এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের ফলে আতঙ্কিত ইউরোপের স্বৈরাচারী শাসকবর্গ। ষোড়শ লুই-এর পত্নী মেরি আঁতোয়ানেৎ ছিলেন অস্ট্রিয়ার রাজকুমারী। স্পেন, সিসিলি, ও নেপল্‌স-এর রাজারা ছিলেন বুরবোঁ বংশীয়। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জুলাই অস্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ড পাদুয়া থেকে একটি ঘোষণায় (Manifesto of Padua) ইউরোপের রাজন্যবর্গকে ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই-এর সমর্থনে হস্তক্ষেপে আহ্বান জানান। অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়া পিলনিজ থেকে এক যৌথ ঘোষণায় (Declaration of Pillnitz) ফ্রান্সে হস্তক্ষেপের হুমকি দেন। এই পরিস্থিতিতে আইনসভা দেশত্যাগী ফরাসী অভিজাতদের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাবে জানায় যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁরা দেশে ফিরে না এলে তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তাঁদের দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করা হবে। ধরা পড়লে তাঁরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

রাজতন্ত্রের সমর্থক যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী উপরিউক্ত দুটি ব্যবস্থায় ষোড়শ লুই ভেটো প্রয়োগ করে এ বিষয়ে আইন প্রচলন স্থগিত রাখেন। এর ফলে প্যারিসের ক্ষিপ্ত জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে রাজাকে ভেটো প্রত্যাহারে বাধ্য করে। প্যারিসের বিপ্লবী জনতা এ সময়ে প্যারী কমিউন উচ্ছেদ করে বিপ্লবী কমিউন গঠন করে।

১৭৯২-এর ২০শে এপ্রিল আইনসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ষোড়শ লুই অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। উল্লেখযোগ্য যে বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিদেশী চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য ফ্রান্সের মধ্যে এক যুদ্ধবাদী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। তবে রোবসপিয়ের সহ সংখ্যালঘু জ্যাকোবিন দল যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন। যাইহোক যুদ্ধের প্রথম দিকে ফ্রান্স বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, প্যারিস ও দক্ষিণ ফ্রান্সের নানা স্থানে ক্ষুধার্ত জনতার হিংসাত্মক আচরণ, লুণ্ঠন, রাজতন্ত্রীদের হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি ফ্রান্সে এক অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ১৭৯২-এর ২৫শে জুলাই অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক ব্রান্সউইকের ডিউক ঘোষণা করেন যে রাজা ষোড়শ লুইকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। রাজপরিবারের কোন ক্ষতি হলে কঠোর শাস্তি বা প্যারিস নগরীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হবে। প্রাশিয়া বা অস্ট্রিয়ার নৃপতিদের আদেশ মান্য করতে হবে। এটি ‘ব্রান্সউইক ম্যানিফেস্টো’ নামে পরিচিত।

ব্রান্সউইক ঘোষণায় অপমানিত, বিক্ষুব্ধ জনতা জ্যাকোবিন দলের নেতৃত্বে ১০ই অগাস্ট প্যারিসের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। শঙ্কিত রাজারানী আইনসভা কক্ষে আশ্রয় নেন। রাজার দেহরক্ষীর সঙ্গে জনতার রক্তাক্ত সংঘর্ষ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী জনতার চাপে রাজতন্ত্রকে সাময়িকভাবে উচ্ছেদ করা হয় এবং ছয় সদস্য বিশিষ্ট এক অস্থায়ী মন্ত্রীপরিষদের হাতে প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন জ্যাকোবিন নেতা দাঁতো। রাজতন্ত্রের সাময়িক অবসানের ফলে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং স্থির হয় প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত একটি ‘জাতীয় মহাসভা’ (National Convention) নতুন সংবিধান প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা করবে। ঐতিহাসিক লেফেভ্‌র ১০ই অগাস্টের এই গণ অভ্যুত্থানকে দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন। এর ফলে ফ্রান্স নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র থেকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যদিও রাজতন্ত্রকে তখনও উচ্ছেদ করা হয়নি। বিপ্লবী জনতা

২রা থেকে ৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিপ্লব বিরোধী সন্দেহে প্রায় দেড় হাজার ব্যক্তিকে (যাঁদের মধ্যে যার রাজতন্ত্র, অভিজাত সহ সাধারণ অপরাধী, ভবঘুরে ইত্যাদি ছিলেন) বিনা বিচারে হত্যা করে। এই ঘটনা 'সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড' (The September Massacre) নামে পরিচিত। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে বিপ্লবের রাশ উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণির হাত থেকে অসংগঠিত জনতার হাতে চলে গেছে।

২.৯ ❒ জাতীয় মহাসভা, ১৭৯২-৯৫

১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর এক অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সংঘর্ষের মধ্যে 'জাতীয় মহাসভা'র নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন শুরু হয়। ঐ দিনই ভালমি-র যুদ্ধে অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়া বাহিনী ফ্রান্সের কাছে পরাজিত হওয়ায় যুদ্ধে গতি ফ্রান্সের অনুকূলে চলে আসে। ফলে, 'জাতীয় মহাসভা' নব উদ্যমে কাজ শুরু করার সুযোগ পায়। উল্লেখযোগ্য যে, 'জাতীয় মহাসভা'ও সঠিক অর্থে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা ছিল না। কারণ সকল স্তরের মানুষ এখানেও ভোটাধিকার পাননি। এছাড়া রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে অনেকেই ভোটদান থেকে বিরত ছিলেন। সমগ্র ভোটদাতাদের মাত্র ৭.৫% (কোবানের মতে ১০%) নির্বাচনে অংশ নেয়।

'জাতীয় মহাসভা' ছিল ৭৫০ জন সদস্যবিশিষ্ট। এখানে তিনটি রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য ছিল। যতা—জিরন্ডিস্ট, জ্যাকোবিন এবং মার্স বা প্লেইন। এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল জিরন্ডিস্ট যাঁরা প্রথম দিকে তাঁদের নেতা ব্রিসোর নাম অনুসারে ব্রিসোতিন নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা ছিলেন প্রধানত উচ্চ বুর্জোয়া শ্রেণির সমর্থনপুষ্ট। তাঁরা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। জ্যাকোবিন গোষ্ঠী ছিলেন চরমপন্থী বৈপ্লবিক আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁদের ক্ষমতার ভিত্তি ছিল প্যারী কমিউন। এঁরাও প্রজাতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন তবে জিরন্ডিস্টরা যেখানে বিকেন্দ্রীভূত প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন করতেন সেক্ষেত্রে জ্যাকোবিনরা ছিলেন কেন্দ্রীভূত প্রজাতন্ত্রের সমর্থক। তাঁরা মনে করতেন বিপ্লব সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়নি। তাই যুদ্ধের পক্ষে তাঁদের সমর্থন ছিল না, এঁরা প্রধানত মধ্যবুর্জোয়া শ্রেণির সমর্থন পেতেন। এই দুটি দল ছাড়া 'মার্স' বা 'প্লেইন' গোষ্ঠী ছিলেন নির্দল বা স্বাধীন মতাবলম্বী। জাতীয় মহাসভার প্রথম পর্ব জিরন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দলের মতাদর্শগত সংঘাতের পর্ব হিসেবে চিহ্নিত।

জাতীয় মহাসভা ২১শে সেপ্টেম্বর সর্বসম্মতভাবে ফ্রান্স থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘোষণা করে এবং ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্ররূপে অভিহিত করে। এরপর থেকে জিরন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা দখলের সংঘাত শুরু হয়। রাজা ষোড়শ লুই-এর বিচারকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। জিরন্ডিস্টগণ রাজার বিচার বা মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী ছিল। কিন্তু রোবসপিয়ের সহ জ্যাকোবিন নেতাদের কাছে বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য দেশদ্রোহী রাজার প্রাণদণ্ড ছিল আবশ্যিক। শেষ পর্যন্ত জাতীয় মহাসভায় একটি মাত্র ভোটের ব্যবধানে রাজার প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি ষোড়শ লুইকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়।

রাজার প্রাণদণ্ড ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ও বাইরে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত করে। ইউরোপের দেশগুলি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্মিলিত যুদ্ধ ঘোষণা করে। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ তো শুরু হয়েছিল

এরপর ইংল্যান্ড, রাশিয়া, স্পেন, হল্যান্ড এবং জার্মানি ও ইটালীর রাজ্যগুলি সেই যুদ্ধে জড়িত হয়। একথা সত্য যে শুধুমাত্র রাজার প্রাণদণ্ডই যে এই যুদ্ধের কারণ ছিল তা নয় বিভিন্ন রাষ্ট্র এই অজুহাতে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে বা বিপ্লবের আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেতে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। যুদ্ধের পরিস্থিতিও ক্রমশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছিল। ১৭৯৩-এর মার্চে নীরউইনডেনের যুদ্ধ এবং লুভেনের যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হয়। ফরাসী সেনাপতি দুমুরিয়ে একটি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ফ্রান্স ত্যাগ করে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দেন। এরফলে জাতীয় মহাসভা পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য নতুন সৈন্যবাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেয়। এমতাবস্থায় ফ্রান্সের লা-ভেণ্ডীতে কৃষক অভ্যুত্থান শুরু হয় যাতে যাজক ও ভূস্বামী শ্রেণি ইন্ধন জোগাতে থাকেন। অপরদিকে লিয়ঁ এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের কোন কোন স্থানে বিদ্রোহ প্রসারিত হয়। এর পাশাপাশি ফ্রান্সে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, এ্যাসাইনেটের মূল্যহ্রাস ইত্যাদি সাধারণ জনতার বিক্ষোভে ইন্ধন যোগায়। জিরন্ডিস্টদের প্রতি জনতার ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নতুন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রেও জিরন্ডিস্টদের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি জ্যাকোবিন ও তাদের প্রধান শক্তি প্যারী কমিউনকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে। রোবসপিয়ের, মারা (Marat) প্রমুখ জিরন্ডিস্টদের হাত থেকে জাতীয় মহাসভাকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করেন। ১৭৯৩-এর ২রা জুনের মধ্যে জ্যাকোবিন দল কর্তৃক জিরন্ডিস্টদের পতনের পথ পরিষ্কৃত হয়। জাতীয়রক্ষী বাহিনী এবং সাঁকুলোৎদের এক যৌথবাহিনী জাতীয় সভায় উপস্থিত হয়ে ২৯ জন জিরন্ডিস্ট সদস্য এবং দুজন মন্ত্রীকে সভা থেকে বহিষ্কৃত করে। ফলে জ্যাকোবিন দল জাতীয় মহাসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এরপর ১৭৯৩-এর জুন থেকে ফ্রান্সে এক অভূতপূর্ব কঠোর এবং কেন্দ্রীভূত শাসন পরিচালিত হয় জ্যাকোবিন দলের নেতৃত্বে যা 'সন্ত্রাসের শাসন' (Reign of Terror) নামে পরিচিত।

২.১০ ❒ সন্ত্রাসের শাসন

ফ্রান্সের ইতিহাসে 'সন্ত্রাসের শাসন' কোনো পূর্ব-পরিকল্পনার ফলশ্রুতি নয়। এই শাসন গড়ে উঠেছিল প্রয়োজনের তাগিদে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয়ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত সঙ্কটাপন্ন ফ্রান্সের প্রয়োজন ছিল ঐক্য। প্যারিসের সাঁকুলোৎ সমর্থিত জ্যাকোবিন গোষ্ঠী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা জরুরী পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্য এক কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ঐতিহাসিক ওলারের মতে, দেশরক্ষার জন্য অপরিহার্য হ'ল স্বৈরাচারী শাসন। তবে ঐতিহাসিক সীডেনহাম আরও ব্যাপক অর্থে সন্ত্রাসের শাসনকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, শুধু দেশরক্ষার প্রয়োজন নয়, বাস্তিল দুর্গের পতনের পর থেকে ফ্রান্সে গড়ে ওঠা হিংসাত্মক পরিস্থিতির ফলশ্রুতি সন্ত্রাসের শাসন।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ২রা জুনের অভ্যুত্থান এবং জাতীয় মহাসভা থেকে জিরন্ডিস্টদের বহিষ্কারের পর জ্যাকোবিনদের হাতে ফ্রান্সের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে জ্যাকোবিনদের প্রধান কর্তব্য ছিল বৈদেশিক যুদ্ধে জয়লাভ এবং ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানগুলির দমন করা। এছাড়া জিরন্ডিস্টদের প্ররোচনায় গড়ে ওঠা ডিপার্টমেন্টগুলির বিদ্রোহের অবসান ঘটানোর প্রয়োজন ছিল। জ্যাকোবিন গোষ্ঠী প্রদেশগুলির বিদ্রোহ প্রতিরোধের জন্য এবং কৃষকদের সন্তুষ্ট করার জন্য একটি আইনের মাধ্যমে

দেশত্যাগী অভিজাতদের জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করে দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে। স্থির হয় দশ বছরের মধ্যে এই জমির মূল্য শোধ করা যাবে। এছাড়া বিনা ক্ষতিপূরণে সামন্ততান্ত্রিক অধিকারগুলিকে লুপ্ত করা হয়।

১৭৯৩-এর মে থেকে জুন মাসের মধ্যে রুশোর গণসার্বভৌমত্বের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে একটি সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করা হয়। এই সংবিধান সম্পর্কে জাতীয় মহাসভার অনুমোদনও নেওয়া হয়। এই সংবিধানের মাধ্যমে ফ্রান্সকে একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। জনকল্যাণ, জনগণের নিরাপত্তা বিধান, শিক্ষার প্রসার, অসহায় মানুষের ভরণপোষণ ইত্যাদিকে রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এছাড়া বলা হয় যে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ফ্রান্সের এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হবে। আইনসভার কার্যনির্বাহক পরিষদে ২৪ জন সদস্য থাকবে। আইনসভা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে এই ২৪ জনকে নির্বাচিত করবে। আইনসভাই হবে জাতীয় সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক এবং মন্ত্রীসভা তার কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়বন্ধ থাকবে। নির্দেশ (Decree) এবং আইন (Law) এই দু'ধরনের বিধি রচনা করার অধিকার থাকবে আইনসভার। আইনগুলিকে কার্যকর করার জন্য গণভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামত যাচাই করতে হবে। ১০ই আগস্ট গণভোটের মাধ্যমে '১৭৯৩-এর সংবিধান' গৃহীত হয়। কিন্তু প্রদেশগুলিতে জিরন্ডিস্ট প্রভাবিত যুক্তরাষ্ট্রপন্থীদের বিদ্রোহ প্রসূত গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় এই সংবিধান কার্যকর করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। জ্যাকোবিনদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিদ্রোহের মোকাবিলা এবং তারা দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিদ্রোহীদের দমন করে। উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ ফ্রান্সে জাতীয় মহাসভার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। পশ্চিম ফ্রান্সে ক্যাথলিক প্রভাবিত অঞ্চলে সংবিধান বিরোধী যাজক ও রাজতন্ত্রীদের অধিপত্য ছিল। প্রতিবিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্র ছিল ব্রিটানী। এছাড়া লিঁয়, নান্তে প্রভৃতি শহরে বিদ্রোহ বিস্তারলাভ করছিল। বহু জ্যাকোবিনকে হত্যাও করা হচ্ছিল। দেশে এ শ্রেণির মানুষ কর প্রদান বন্ধ করে এবং সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। এই অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগে ফ্রান্সের উত্তরপূর্ব সীমান্তে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা প্রবেশ করে। তুলোঁ বন্দরকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উগ্র জ্যাকোবিন নেতা জাঁ পল মারাকে হত্যা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে জ্যাকোবিন দল ১৭৯৩-এর সংবিধানকে বাস্তব রূপ দেবার পরিবর্তে এক জরুরী শাসন চালু করে। এই শাসনই 'সন্ত্রাসের শাসন' নামে পরিচিত।

জাতীয় মহাসভা আইনসভার সদস্যদের দ্বারা কয়েকটি কমিটি গঠন করে তাদের ওপর শাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেয়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দুটি কমিটি যথা 'গণ নিরাপত্তা কমিটি' (Committee of Public Safety) এবং 'সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি' (Committee of General Security)। ১৭৯৩-এর এপ্রিলে ন'জন সদস্য সম্বলিত গণ নিরাপত্তা কমিটি প্রথম গঠিত হয়েছিল, পরে জ্যাকোবিনদের ক্ষমতা দখলের পর ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক গোলযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই কমিটিকে পুনর্গঠিত করে ১২জন সদস্যবিশিষ্ট করা হয়। এই কমিটি দেশরক্ষার জন্য ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসন বলবৎ করে। প্রথমদিকে এই কমিটিতে দাঁতোর প্রাধান্য থাকলেও পরে রোবসপিয়ের এই সংস্থার একনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর দুই সহযোগী ছিলেন সাঁ কুস্ত এবং জর্জ কুথো। সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির উপরে পুলিশি ব্যবস্থা বা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল। ১৭৯৩-এর সেপ্টেম্বর থেকে এই কমিটিও ১২জন সদস্য বিশিষ্ট হয়। ধীরে ধীরে

এই কমিটিকে গণ নিরাপত্তা কমিটির অধীনে নিয়ে আসা হয়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন জাতীয় মহাসভার অধীনে বিভিন্ন কমিটিগুলিকে রোবসপিয়েরের একনায়কতন্ত্রের সাংবিধানিক ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

জ্যাকোবিন দলের অপর একটি প্রতিষ্ঠান ছিল 'বিপ্লবী বিচারালয়' বা Revolutionary Tribunal। এই বিচারালয়ের উদ্দেশ্য ছিল অতি দ্রুত রাজনৈতিক বিরোধীদের বিচার করা। এটি অবশ্য দাঁতোর প্রস্তাব অনুসারে ১৭৯২-এর অগাস্ট মাসে সাধারণ আদালত হিসেবে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সন্ত্রাসের শাসনের যুগে এটিকে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে পরিণত করা হয়। একটি অদ্ভুত আইনের মাধ্যমে দেশের দোষী ব্যক্তিদের বিচার করা হত যে বিচার মূলত ছিল প্রহসন। কারণ এই বিশেষ আইনটিকে বলা হত 'সন্দেহের আইন' বা Law of Suspect. এই আইনের দ্বারা যে কোন নাগরিককে কোন কারণ না দেখিয়েই নিছক সন্দেহের বশে বিচার করে প্রাণদণ্ড দিয়ে গিলোটিনে হত্যা করা হত। এছাড়া ছিল Square of the Revolution বা বিপ্লবের বধ্যভূমি যেখানে দোষীদের হত্যা করা হত। আর ছিল একটি তদারকি প্রতিনিধি দল বা Representative of Mission.

ডেভিড টমসনের মতে উপরিউক্ত সংস্থাগুলি ছাড়া প্যারী কমিউন এবং জ্যাকোবিন ক্লাব রোবসপিয়েরের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিল। আর জাতীয় কনভেন্সন্ দাঁতোর বিদায়ের পর থেকেই রোবসপিয়ের কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল।

জ্যাকোবিনরা নিজেদের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় এবং বিপ্লবকে স্থায়ী করার জন্য ফ্রান্সকে এক কঠোর কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনতে চেয়েছিল। যেহেতু জিরন্ডিস্টদের পতনের পরেও ফ্রান্সে যুক্তরাষ্ট্রীয় আন্দোলনের অবসান ঘটেনি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়েছিল সেই কারণে এগুলির মোকাবিলা করাও ছিল জ্যাকোবিনদের অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া বৈদেশিক আক্রমণও ফ্রান্সকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। সেনাপতি দুমুরিয়ের বিশ্বাসঘাতকতা, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর কাছে ফ্রান্সের বিপর্যয়, জাতীয় মহাসভার মধ্যে দাঁতোর বিরোধিতা ইত্যাদি জ্যাকোবিনদের কঠোর ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী করে তুলেছিল। ১৭৯৩ সালের অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাস থেকে সন্ত্রাস চরম রূপ ধারণ করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয় সামরিক ক্ষেত্রেও সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়।

প্রতিবিপ্লবী এবং জিরন্ডিস্টপন্থী যুক্তরাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রধানত রাজনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। এজন্য প্রধানত প্রতিবিপ্লবী সন্দেহে বহু মানুষকে কারারুদ্ধ এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডগুলি প্রধানত করা হয়েছিল বিপ্লবের প্রতি সাঁকুলোৎদের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য। ১৭৯৩-এর ১৬ই অক্টোবর রানী মারী আঁতোয়ানেৎ-কে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। এছাড়া জিরন্ডিস্ট নেতৃবৃন্দ যথা, মাদাম রোলাঁ, ব্রিসো, বার্নাভ, জাতীয়সভার ২৯জন জিরন্ডিস্ট সদস্য, ষোড়শ লুই-এর বহু সেনানায়ককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। জাতীয় সম্মেলনের প্রথম প্রেসিডেন্ট বেইলী, বিখ্যাত বিজ্ঞানী ল্যাভয়েশিয়ার প্রমুখ ব্যক্তিকে পুরাতনতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে হত্যা করা হয়। প্যারিসের বাইরে অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও সন্ত্রাস চলতে থাকে। তবে শুধুমাত্র যে উচ্চ পর্যায়ের মানুষই সন্ত্রাসের বলি হয়েছিলেন তা নয়। ডেভিড টমসনের মতে সন্ত্রাসের শিকারদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই ছিলেন কৃষক এবং সাধারণ দরিদ্র মানুষ যাঁরা বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সন্ত্রাসের মোটপর্বে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিলেন।

শুধুমাত্র হত্যাকাণ্ডই নয় ফ্রান্সে একটি কঠোর কেন্দ্রীভূত শাসন প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক সন্ত্রাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মন্ত্রীসভা, সামরিক বাহিনী, বিচারক ও অন্যান্য প্রশাসকদের উপর গণ নিরাপত্তা কমিটির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় মহাসভার সর্বাপেক্ষা সক্রিয় সদস্যদের তদারকি প্রতিনিধি বা Representative of Mission হিসেবে বিভিন্ন প্রদেশে ও সেনাবাহিনীতে কমিটির সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকরী করানোর জন্য পাঠানো হয়। প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট ও তাদের অধীনস্থ জেলাগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশনামা যথাযথভাবে কার্যকরী করার আদেশ দেওয়া হয়। খর্ব করা হয় প্যারী কমিউনের অবাধ ক্ষমতা, ফ্রান্সের তৎকালীন চরম প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ সম্ভবত প্রয়োজন ছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও একধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয় সামরিক বাহিনীতে সরবরাহ বজায় রাখার জন্য এবং সাধারণ মানুষের দুর্গতির অবসানের জন্য এর প্রয়োজন ছিল। সাঁকুলোৎদের দাবী অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করার জন্য মজুতদার ও ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি ও পণ্যদ্রব্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিশন গঠন করা হয়। ১৭৯৩-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর 'ল অফ ম্যাক্সিমাম জেনারেল' আইনের মাধ্যমে রুটি এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দিষ্ট করা হয়। এর ফলে কারিগর, ছোট দোকানদার প্রমুখ আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

সামরিক ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় করার ব্যবস্থা শুরু হয়। লা ভেন্ডী, বর্দু, নান্তে, লিয়ঁ, মার্সাই প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রদেশগুলিকে দমন করে তাদের বিপ্লবী সরকারের অধীনস্থ করা হয়। তুলোঁ বন্দর থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করে মুক্ত করা হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট মাসে সকল প্রাপ্তবয়স্ক যুবকদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। নারী-কিশোরদের ওপর সামরিক সরঞ্জাম তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়। সামরিক বিভাগকে পুনর্গঠিত করা হয়। সরকারী কারখানায় অস্ত্রোৎপাদন, সৈন্যবাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণ দান, প্রশাসনিক প্রতিনিধি কর্তৃক সীমান্ত পরিদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে স্বল্পকালের মধ্যে এক দক্ষ সামরিক বাহিনী গঠন করা হয়, যার মাধ্যমে ১৭৯৪-এর জুন মাস নাগাদ বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

ধর্মীয় সন্ত্রাসের প্রধান সংগঠক ছিলেন হিবার্ট এবং তাঁর সহযোগী শামেৎ, ফুশে প্রমুখ। এঁরা বিভিন্ন প্রদেশে খ্রিস্টধর্ম-বিরোধী প্রচার, বলপূর্বক চার্চগুলিকে বন্ধ করা ও বিশপ এবং যাজকদের পদত্যাগে বাধ্য করছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল 'বুদ্ধির উপাসনা'র (worship of reason) প্রচলন ঘটানো। ১০ই অক্টোবর, ১৭৯৩ প্যারিসে চার্চের বাইরে সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়। খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার বাতিল করা এবং নতুন প্রজাতান্ত্রিক ক্যালেন্ডার চালু করা হয়। তবে, রোবসপীয়ের এর বেশি ধর্মীয় সন্ত্রাসের বিরোধী ছিলেন। তিনি অনুভব করেন যে, হিবার্টপন্থীদের উদ্দেশ্য তাঁর ক্ষমতায় ভাগ বসানো। এছাড়া ধর্মীয় সন্ত্রাস সামাজিক অস্থিরতা ও সরকার বিরোধী পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষত দরিদ্র কৃষক সমাজের ওপর ধর্মের প্রবাব ছিল অসীম। ফলে তিনি হিবার্টপন্থীদের প্রতিরোধে উদ্যত হন এবং দাঁতো-র সমর্থন লাভ করেন। ১৭৯৪ খ্রিঃ মার্চ মাসে হিবার্ট ও তাঁর সহযোগীদের গিলোটিনে হত্যা করা হয়।

দাঁতোর মৃত্যুর পর রোবসপীয়েরের নেতৃত্বে চরম সন্ত্রাস শুরু হয়, যাকে সাধারণভাবে 'লাল সন্ত্রাস' (Red Terrorism) নামে অভিহিত করা হয়। একথা বলা হয় যে, রোবসপীয়ের এক আদর্শ প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। এক দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজব্যবস্থাকে ভিত্তি করে যে পুরাতনতন্ত্র গড়ে উঠেছিল তার পরিবর্তে সততার ভিত্তিতে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কারণ, বিপ্লবের যুগেও দুর্নীতি, বৈপ্লবিক আদর্শের বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র, গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা, জাতীয় মহাসভায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব (জ্যাকোবিনদের মধ্যেও এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল, যেমন হিবার্টপন্থী, দাঁতোপন্থী প্রমুখ) ইত্যাদি ছিল। ফলে, রোবসপীয়ের চেয়েছিলেন সন্ত্রাসের মাধ্যমে অসৎ ব্যক্তি তথা প্রতিবাদী গোষ্ঠীকে দমন করতে। পরিস্থিতিই তাঁকে বাধ্য করেছিল এ ধরনের এক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে। ইতিমধ্যে গণনিরাপত্তা কমিটির সদস্যদের মধ্যে এবং গণনিরাপত্তা কমিটি ও সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ ও সংঘাত শুরু হয়। রোবসপীয়ের চেয়েছিলেন সন্দেহভাজন ব্যক্তির ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দরিদ্র ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করতে। কিন্তু এক্ষেত্রে সাঁ কুস্ত, জর্জ ক্যুথো প্রমুখ তাঁর সমর্থন করতে মত দিলেন না। উপরন্তু ১৭৯৪ খ্রিঃ ১০ই জুন বিপ্লবী বিচারালয়গুলির ক্ষমতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে গণনিরাপত্তা কমিটির বহু সদস্য প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির স্বাধীনতা খর্ব করার ফলে এঁরাও রোবসপীয়ের বিরোধী হয়ে ওঠেন। ১৭৯৩-এর মার্চ থেকে ১৭৯৪-এর জুলাই পর্যন্ত বহু মানুষের (যাঁদের মধ্যে অভিজাত, যাজক, বুর্জোয়া, কৃষক সকলেই ছিলেন) প্রাণদণ্ড হয়। কমিউনগুলির হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মরক্ষার সামান্যতম সুযোগও দেওয়া হল না। ধীরে ধীরে রোবসপিয়েরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দানা বাঁধতে শুরু করে। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে জুন ফ্লোরাসের যুদ্ধে ফ্রান্সের জয়লাভের পর থেকেই জাতীয় মহাসভা সন্ত্রাসকে নিষ্প্রয়োজন মনে করতে থাকে। সাঁকুলোৎ গোষ্ঠী ও বুর্জোয়া জ্যাকোবিনদের মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরে। ল অফ ম্যাক্সিমাম দৃঢ়ভাবে চালু করায় মজুরীর হার আরো কমে যায়। শেষ পর্যন্ত ডিরন্ডিস্ট, জ্যাকোবিন এবং প্লেইন দলের সদস্যরা একত্রে রোবসপিয়েরকে গ্রেপ্তার করেন (২৭শে জুলাই) এবং পরের দিন অর্থাৎ ২৮শে জুলাই রোবসপিয়েরকে গিলোটিনে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। রোবসপিয়েরের মৃত্যুর সঙ্গেই ফ্রান্সের ইতিহাসের এক মর্মান্তিক পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

সন্ত্রাসের শাসনের প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ বর্তমান। সন্ত্রাসের সপক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন। পরিস্থিতির চাপে উদ্ভূত এক স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা ছিল সন্ত্রাসের শাসন, একথা বলেছেন ঐতিহাসিক ওলার (Aulard)। অষ্টাদশ শতাব্দীর নয়ের দশকের শেষে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ এবং বৈদেশিক আক্রমণ ফ্রান্সে এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে নাগরিকদের অনীহা, করদানে অসম্মতি, সরকারী আইন অগ্রাহ্য করা ইত্যাদি যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি ক'রে বিপ্লবকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল, তা থেকে ফ্রান্সকে উদ্ধার করার জন্য প্রয়োজন ছিল এক দৃঢ় ও শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা। নয়ত পুরাতনতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব সম্ভবত অসম্ভব ছিল না। তাই ঐতিহাসিক রাইকার বলেছেন সন্ত্রাস বিপ্লবকে রক্ষা করেছিল। বাস্তব পরিস্থিতির এক অনিবার্য পরিণতি ছিল সন্ত্রাস। বিপ্লবকে ফ্রান্সে এবং ফ্রান্সকে ইউরোপে অস্তিত্ব রক্ষার সহায়ক হয়েছিল সন্ত্রাসের শাসন ঐতিহাসিক হেজ-এর এই উক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়। ঐতিহাসিক

মাতিয়ের মতে, সমাজে বৈপ্লবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য সন্ত্রাসের প্রয়োজন ছিল। লেফেভ্‌র-ও সন্ত্রাসের অর্থনৈতিক দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বিপ্লবের চরিত্রকে পরিবর্তিত করে তার সামাজিক ভিত্তিকে আরও বিস্তৃত করতে চেয়েছিল। একথা বলা যায় যে, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বুর্জোয়া স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। কিন্তু সাধারণ জনতা, সাঁকুলোৎ প্রমুখের কাছে এই নিয়ন্ত্রণ ছিল আশীর্বাদের মত। জ্যাকোবিনরা নিজেদের বুর্জোয়া স্বার্থ পরিত্যাগ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে বিপ্লবের সুফল পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, নিম্নতম মজুরী আইন মুদ্রাস্ফীতি দমন, সামন্তপ্রভুদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বাতিল করে কৃষককে অব্যাহতি দান, ক্ষুদ্র কৃষকের কাছে ভূমিদান, ভূমিহীনদের মধ্যে স্বল্প হলেও প্রতিবিপ্লবীদের বাজেয়াপ্ত জমি বণ্টন ইত্যাদি বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। ঐতিহাসিক সবুল অবশ্য বলেছেন যে, ১৭৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দের হিংসাত্মক ঘটনা বিপ্লবের ওপর চাপানো হয়েছিল। সন্ত্রাস বিপ্লবের অঙ্গ ছিল না।

কোন কোন ঐতিহাসিক অবশ্য বলেছেন যে আপদকালীন অবস্থার সঙ্গে সন্ত্রাসের তীব্রতার বিশেষ যোগ ছিল না কারণ, ১৭৯৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে ১৭৯৪-এর জুলাই পর্যন্ত যে সময়কে মহাসন্ত্রাসের কাল বলে অভিহিত করা যায় সে সময় ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট এবং বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনাও কমে গিয়েছিল। রোবসপিয়ের তাঁর অবাস্তব আদর্শবাদকে (যেমন পুণ্যের শাসন প্রতিষ্ঠা) রূপায়িত করার জন্যে অকারণে বহু মানুষের প্রাণদণ্ড দেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামমাত্র বা বিনা বিচারে বহু মানুষকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। সন্ত্রাসের সুযোগে একশ্রেণির উশৃঙ্খল জনতা যে নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছিল একথা স্বীকার করেছেন লেফেভ্‌র। ডেভিড টমসনের মতে, ফরাসী বিপ্লবে যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছিল রোবসপিয়েরের একনায়কতন্ত্র তার সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল না। তখন ব্যক্তিগত এবং দলগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ করার জন্যই সন্ত্রাস চালু রাখা হয়। আরো উল্লেখযোগ্য যে যে সমস্ত মানুষকে গিলোটিনে পাঠানো হয়েছিল তাদের বেশিরভাগের বিরুদ্ধেই ছিল বিপ্লব বিরোধিতা বা দেশদ্রোহিতার অভিযোগ। কিন্তু ফাটকাবাজী বা মজুতদারীর জন্য প্রাণদণ্ডের উদাহরণ প্রায় নেই, সুতরাং একথা বলা যায় যে যতদিন পর্যন্ত ফ্রান্সে জাতীয় সঙ্কটের সম্ভাবনা ছিল ততদিন এধরনের শাসনের পিছনে হয়ত কিছু যুক্তি থাকতে পারে। কিন্তু জাতীয় সঙ্কট বা বিদ্রোহের সম্ভাবনা অবসানের পর সন্ত্রাসের আদৌ কোন যৌক্তিকতা ছিল না।

২.১১ ❒ থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়া

রোবস্‌পীয়েরের মৃত্যু ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। তিনি ২৭শে জুলাই, ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত হন। বিপ্লবী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ঐ দিনটি ছিল ৯ই থার্মিডোর। এর পরেও ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত জাতীয় মহাসভার শাসন চলেছিল। এই পর্বের শাসন ইতিহাসে 'থামিডোরীয় প্রতিক্রিয়া' (Thermidorian Reaction) নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক কোবান এই ঘটনাকে 'প্রতিবিপ্লব' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়ার সময়কালে সন্ত্রাসের যুগের সকল নেতা, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত

করা হয়েছিল। উগ্র জ্যাকোবিনদের পরিবর্তে দক্ষিণপন্থী 'জিরন্ডিস্ট' ও মধ্যপন্থী 'প্লেইন'-রা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। জাতীয় মহাসভায় মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্যারী কমিউন ও সাঁকুলেৎ শ্রেণির অবৈধ প্রতিপত্তির অবসান ঘটে। জ্যাকোবিন ও অন্যান্য বিপ্লবী ক্লাবগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই পর্যায়ের শাসন ইতিহাসে 'শ্বেত সন্ত্রাস' (White Terror) নামে পরিচিত।

এ সময় গণনিরাপত্তা ও সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির ক্ষমতা খর্ব করে ১২টি কার্যনির্বাহী কমিশনের ওপর মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বিপ্লবী বিচারালয় লুপ্ত করা হয়। সন্দেহের আইনে আটক ব্যক্তিদের মুক্তিদান করা হয়। এছাড়া ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ও দেশত্যাগীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান করা হয়। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করে খাদ্যশস্যের অবাধ বাণিজ্য চালু করা হয় এবং সর্বোচ্চ মূল্যের আইন তুলে দেওয়া হয়। এক কথায় বিপ্লবী সরকারের সমস্ত নীতি ক্রমশ পরিবর্তিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার ফলে ফ্রান্সে পুনরায় আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়। 'এ্যাসাইনেটে'র মূল্য হ্রাসের সময় দ্রুত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু সে তুলনায় শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি না হওয়ায় ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল ও মে মাসে (বিপ্লবী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী 'জার্মিনাল' ও 'প্রেইরীয়াল' মাস) প্যারিসের জনতা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সেনাপতি পিশেগ্রু ও মুরাট তা দমন করেন। এরপর কিছুকাল মৃত্যুদণ্ড ও গ্রেপ্তারের মাধ্যমে জ্যাকোবিন ও বিপ্লব নিশ্চিহ্ন করা শুরু হয়। কিন্তু দেশত্যাগী অভিজাতদের প্রত্যাবর্তন ফ্রান্সে পুনরায় রাজতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের পরিবেশ সৃষ্টি করে। বুরবোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুই পুরাতনতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী হন।

এই পরিস্থিতিতে জাতীয় মহাসভা 'তৃতীয় বর্ষের সংবিধান নামে নতুন একটি সংবিধান প্রচলন করে। এই সংবিধানে বুর্জোয়া আধিপত্যের সবরকম ব্যবস্থা রাখা হয়। এতে পাঁচজন ডাইরেক্টরের ওপর শাসনক্ষমতা অর্পণ করা হয়। তাঁরা নির্বাচিত হবেন আইনসভা কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য। আইনসভায় দুটি কক্ষ থাকবে ২৫০ জন সদস্যবিশিষ্ট উচ্চকক্ষ (Council of Aucients) এবং ৫০০ জন সদস্যবিশিষ্ট নিম্নকক্ষ (Council of Five Hundred)। একটি মন্ত্রিসভা ডাইরেক্টদের কাছে দায়িত্ববন্ধ থাকবে, আইনসভার কাছে নয়। আইনসভার সদস্যগণ সম্পত্তির ভিত্তিতে এক সীমাবন্ধ নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হবেন। আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য জাতীয় মহাসভার সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, পুলিশ, বৈদেশিক নীতি ও স্থানীয় শাসনের ওপর ডাইরেক্টরীর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে। অর্থদপ্তরের দায়িত্ব ৬ জন নির্বাচিত কমিশনারের হাতে দেওয়া হয়। বিচারকগণও নির্বাচনের ভিত্তিতে নিযুক্ত হবেন। ১৫ই অগাস্ট, ১৭৯৫ গণভোটের মাধ্যমে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধানে বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রচেষ্টার ফলে প্যারিসের কয়েকটি সেকশনে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এতে রাজতন্ত্রী, অভিজাত ও জাতীয় রক্ষী বাহিনীর কিছু সদস্যও যোগ দেন। এই অভ্যুত্থান দমন করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন সামরিক বাহিনীর এক নবীন সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর জাতীয় মহাসভার স্থলে ডাইরেক্টরী ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহণ করে।

২.১২ ডাইরেক্টরীর শাসন

ফ্রান্সের প্রথম পাঁচজন ডাইরেক্টর হিসেবে নির্বাচিত হন বারাস, লা র‍্যভেলিয়ের, ল্যতুর্নিয়ে, র‍্যউবেল এবং কার্নো। শুরু থেকেই এঁদের সামনে নানাবিধ সমস্যা ছিল। দক্ষিণপন্থী অভিজাত এবং বামপন্থী প্রজাতন্ত্রীগণ প্রথম থেকেই এই শাসনের বিরোধী ছিলেন। শুধুমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণির একাংশের সমর্থন ছিল এঁদের প্রতি। তাই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ডাইরেক্টরীতে দুই বিরোধীপক্ষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার নীতি অনুসরণ করতে হয়, যা 'বাসকুল' নীতি নামে পরিচিত।

প্রাথমিক পর্যায়ে ডাইরেক্টরী অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপ নেয়। ডাইরেক্টরীর বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রীদের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ফলে 'বাসকুল' নীতি অনুযায়ী তাঁরা জ্যাকোবিনদের কিছু সুযোগ-সুবিধা দান করেন। কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কট ডাইরেক্টরীর সামনে এক নতুন বিপদ নিয়ে আসে।

ডাইরেক্টরী অবাধ বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করায় মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটে। অ্যাসাইনেটের মূল্য হ্রাস পায়। পরিবর্তে ডাইরেক্টরী নতুন কাগজী মুদ্রা 'Mandats Territoriaux' চালু করলেও তা ব্যর্থ হয়। ফলে ধাতব মুদ্রার প্রচলন করা হয়। কিন্তু ফ্রান্সে রুপোর অভাব এক্ষেত্রেও মুদ্রাসঙ্কট সৃষ্টি করে। ফলে বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক, ছোট দোকানদার প্রমুখ আর্থিক দুর্দশার সম্মুখীন হয়। অপরদিকে বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণির বুর্জোয়াদের হাতে প্রভুত অর্থ সঞ্চিত হয়।

এই পরিস্থিতিতে 'সোসাইটি অফ দ্য প্যানথিয়ন' নামক বিপ্লবী সংস্থার সদস্য ও 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক ফ্রাঁসোয়া ব্যেয়ুফ ডাইরেক্টরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ এবং সম্পত্তির যৌথ মালিকানা ও উৎপাদন দাবী করেন। তবে ব্যবেয়ুফের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে সেনাবাহিনীর সাহায্যে ব্যবেয়ুফ ও তাঁর অনুগামীদের কারারুদ্ধ করা হয় এবং ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়।

পঞ্চমবর্ষের নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীদের জয়লাভ ডাইরেক্টরীর সদস্যদের মধ্যে ভাঙন নিয়ে আসে। র‍্যউবেলো র‍্যভেলিয়র ও বারাস কঠোরভাবে রাজতন্ত্রীদের মোকাবিলার পক্ষে ছিলেন। অপরদিকে ছিলেন কার্নো, পার্তেলিমি এবং নিম্নকক্ষ বা কাউন্সিল অফ ফাইভ হানড্রেডের সফাপতি পিশেগ্রু। এই পরিস্থিতিতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৮ ফ্রুক্তিদর) ১৭৯৭ ডাইরেক্টর প্যারিসের ভার সেনাবাহিনীর উপর ছেড়ে দেয়। পিশেগ্রু, বার্তে ও আরো কিছু পরিষদ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। কার্নো পলায়ন করেন। ১৯৮ জন নবনির্বাচিত সদস্যের নির্বাচন বাতিল করা হয় এবং কার্নো ও বার্তেলিমির জায়গায় দু'জন নতুন ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হয়।

এরপর ডাইরেক্টরী ফ্রান্সে এক জরুরী শাসন প্রবর্তন করে। ষষ্ঠ বর্ষের নির্বাচনে বহু জ্যাকোবিন সদস্য নির্বাচিত হন। এঁদের বাদ দেওয়ার জন্য পাঁচজন সদস্যের এক কমিশন গঠন করা হয়। ১০৬ জন নতুন সদস্যের নির্বাচনকে কমিশন বাতিল করে এবং দুই পরিষদে পছন্দসই সদস্যদের রাখা হয়। এই পরিস্থিতিতে ডাইরেক্টরী ফ্রান্সে কিছুটা সংস্কারের চেষ্টা করে যেমন মুদ্রা বিনিময়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ, বিদেশি পণ্য বিশেষত ব্রিটিশ পণ্যের উপর উচ্চ শুল্ক চাপিয়ে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের চেষ্টা, শিল্পের অগ্রগতির প্রচেষ্টা,

অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ব্যয় সঙ্কোচ, প্রত্যক্ষ কর হ্রাস, ইত্যাদি। সমগ্র দেশে কেন্দ্রীয় আমলা নিয়োগের মাধ্যমে প্রশানিক ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অর্থসঙ্কট এবং মুদ্রাস্ফীতি ডাইরেক্টরীর বহু পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়। এছাড়া ডাইরেক্টরগণ দুর্নীতিপূর্ণ ও বুর্জোয়া শ্রেণির লোক হওয়ায় এই সরকারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয়। আর বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক শক্তির উপর অত্যধিক নির্ভরতার ফলে ডাইরেক্টরীর অস্তিত্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক নেতাদের হাতে চলে যায়। ডাইরেক্টরীর শাসনের শেষদিকে অসন্তোষ ও অরাজকতার সুযোগে ১৭৯৯-এর ১০ই নভেম্বর (১৮ ব্রুমেয়র) সমরনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ডাইরেক্টরীকে উচ্ছেদ করে ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করেন।

২.১৩ ❒ অনুশীলনী

- **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

১। প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে অভিজাত শ্রেণির প্রতিক্রিয়া ও তার পরিণতি ব্যাখ্যা করুন।

২। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান সভা প্রণীত নতুন ফরাসী সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলির সমালোচনামূলক আলোচনা করুন।

- **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

১। ফরাসী বিপ্লবকে 'বুর্জোয়া বিপ্লব' আখ্যাদান কতদূর যুক্তিসঙ্গত?

২। ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বের যৌক্তিকতা বিচার করো।

- **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

১। 'টেনিস কোর্টের শপথ' কি ?

২। জাতীয় মহাসভায় প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল কি ছিল?

৩। 'থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়া' বলতে কি বোঝায়?

২.১৪ ❒ গ্রন্থপঞ্জী

১। কোবান আলফ্রেট, এ হিস্ট্রি অফ মডার্ন ফ্রান্স (খণ্ড ১-২)

২। লেফেভ্‌র জর্জ , দি ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন (২ খণ্ড)

৩। রুডে জর্জ, রেভোলিউশনারি ইউরোপ, ১৭৮৩-১৮১৫

৪। সবুল অ্যালবার্ট, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দি ফ্রেঞ্চ রেবোলিউশন

৫। চক্রবর্তী প্রফুল্ল কুমার, ফরাসী বিপ্লব

একক ৩ ❒ ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল ও প্রভাব

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ সূচনা
৩.২ ফ্রান্সে বিপ্লবের ফলাফল
৩.৩ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব
৩.৪ উপসংহার
৩.৫ অনুশীলনী
৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ ❒ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী দুটি এককে ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে) কারণ এবং বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান এককে ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল এবং প্রভাব আলোচিত হবে। এই বিষয়টি প্রধানত দুটি দিক থেকে আলোচনা করা হবে। প্রথমে ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল কি হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করার পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই বিপ্লব কতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বিশ্লেষিত হবে।

৩.১ ❒ সূচনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপ তথা বিশ্বের একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ছিল ফরাসী বিপ্লব। এই বিপ্লব শুধুমাত্র ফ্রান্স নয়, সমগ্র ইউরোপকে এক রূপান্তরের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে যে বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটেছিল তার আদর্শ ফ্রান্সের সীমিত বেষ্টনী অতিক্রম করে ইউরোপে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। একথা সত্য যে, ফ্রান্সে এই বিপ্লব একটি নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে চলেনি। শ্রেণিগত স্বার্থও বিপ্লবের পিছনে একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবুও এই বিপ্লব যে ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্রকে আঘাত করে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল একথা অনস্বীকার্য। ইউরোপের বিভিন্ন দেশও এই বিপ্লবের আদর্শকে উপেক্ষা করতে পারেনি।

৩.২ ❒ ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্স এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছিল। প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্স ছিল স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা, স্তরভিত্তিক সমাজ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রধান

ক্ষেত্র। এর পাশাপাশি দুর্নীতিগ্রস্ত চার্চ ফ্রান্সে এক অশুভ শক্তি হিসেবে প্রতিভাত হত। সমাজ দাঁড়িয়ে ছিল বিশেষ সুবিধা ও জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকারের ওপর। ঐশ্বরিক অধিকারের আবরণে রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচার রাষ্ট্রজীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ফরাসী বিপ্লব এই ঘুণধরা পুরাতনতন্ত্রকে আঘাতের মাধ্যমে কতটা পরিবর্তিত করেছিল বর্তমান আলোচনায় তা বিশ্লেষিত হবে।

ঐতিহাসিক লেফেভ্র বলেছেন, ফরাসী বিপ্লব ছিল এমন এক গৃহযুদ্ধ যেখানে পুরাতনতন্ত্রের ভাঙন যতখানি স্পষ্ট এবং প্রকট, নতুন ব্যবস্থার উদ্ভবের দিকটি ততটা নয়। এর মূল কারণ হিসেবে তিনি তৃতীয় সম্প্রদায়ের অনৈক্যের কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বিপ্লবের অন্তিমলগ্নে বিপ্লবীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এক ধরনের লক্ষ্য ও গতিহীনতা গ্রাস করেছিল বিপ্লবকে। রোবস্‌পীয়েরের মৃত্যুর পর এক প্রকার অসম্পূর্ণ অবস্থায় থেকে গিয়েছিল বিপ্লব। তবে অসম্পূর্ণ হলেও বিপ্লব ব্যর্থ ছিল না। পুরাতনতন্ত্র ভাঙার কাজে তা বহুলাংশে সফল হয়েছিল।

ফরাসী বিপ্লবের সূচনা থেকেই ফ্রান্সের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল ত্রি-স্তর বিশিষ্ট ফরাসী সমাজের সংখ্যালঘু অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের ‘বিশেষ অধিকার’ লোপ করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে ‘ব্যক্তি ও মানবাধিকার ঘোষণা’র মাধ্যমে বুর্জোয়া সম্প্রদায় ঘোষণা করেছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আইনের সমতার নীতি। এর দ্বারা ত্রি-স্তর ভিত্তিক ফরাসী সামাজিক সংগঠনকে অস্বীকার করা হয়। এছাড়া সকল প্রকার সামন্তকর, সামন্ত স্বত্ব বিলোপ করে সামন্তশ্রেণির বিশেষ অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা লোপ করা হয়। অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধার বিলুপ্তি ঘটে। যোগ্যতাকে রাজপদ লাভের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে বিপ্লব অভিজাততন্ত্রের মূলে আঘাত করেছিল। রাজপদ ক্রয়ের প্রথার অবসান ‘পোশাকী অভিজাত’ সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা এনে দেয়। বিপ্লবের সময় ফরাসী আইনসভা (১৭৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দ) পতিত জমির ওপর সর্বসাধারণের অধিকার ঘোষণা করেছিল এবং দেশত্যাগী অভিজাত বা ‘এমিগ্রি’দের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। ‘জাতীয় মহাসভা’ (National Convention) পরবর্তীকালে ঐ বাজেয়াপ্ত জমি যথাযথভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। এর ফলে বহু সমৃদ্ধিশালী পরিবার সম্পত্তিচ্যুত হয়। বৃহৎজমিদারী ভূখণ্ড বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে বিক্রীত হয়ে যায়। সন্ত্রাসের শাসনকালে ঘোষণা করা হয়েছিল মৃত ব্যক্তির কোন ইচ্ছাপত্র (will) না থাকলে তার সম্পত্তি পুরুষ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হবে। এমনকি অবৈধ সন্তানেরও সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। ‘সংবিধান সভা’র আমলে গ্রামীণ অভিজাতদের বিচার করার বিশেষ অধিকার বাতিল হয়। ভূমিদাস প্রথাও অবলুপ্ত হয়। সামন্তপ্রথার অবলুপ্তির পর নানাপ্রকার বিশেষ সম্পত্তিসংক্রান্ত অধিকারও ক্রমশ লুপ্ত হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুলাই জমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকার ক্ষতিপূরণ ব্যতীতই লোপ করা হয়। সাধারণ জমি ব্যবহারের বিশেষ সুযোগ হারায় অভিজাত সম্প্রদায়।

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে চার্চ ও যাজক সম্প্রদায়ের যে প্রতিপত্তি ছিল তা বিনষ্ট হয়। বিপুল সম্পত্তির মালিকানা, কর আদায়ের ক্ষমতা, শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালক, বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকারী এবং স্বাধীন আর্থিক প্রশাসন ফ্রান্সের চার্চ এবং যাজক বিশেষত উচ্চ যাজক সম্প্রদায়কে এক শোষক শ্রেণিতে পরিণত করেছিল। বিপ্লবের ফলে চার্চের রাষ্ট্রবহির্ভূত ক্ষমতা নষ্ট হয়। সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের বিলুপ্তির ফলে

বিপুল সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে চার্চ শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। চার্চের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। যাজক সম্প্রদায় বেতনভোগী সরকারি কর্মচারীতে পরিণত হন। যাজকদের লৌকিক সংবিধান প্রবর্তনের পরে যাজক সম্প্রদায়ও বিভক্ত হয়ে যায়। ফ্রান্সে ক্যাথলিক ধর্মবিরোধী মনোভাব এবং ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে নব্য ধারণা চার্চের ধর্মীয় প্রভাবকেও হ্রাস করে। ফ্রান্সে ক্রমশ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ পরিব্যাপ্ত হয়। চার্চ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পরিবর্তে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থায় জাতির সর্বস্তরে শিক্ষা বিতরণের নীতি গৃহীত হয়।

বিপ্লবের পুরোধা বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের ওপর ফরাসী বিপ্লবের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সাধারণভাবে বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণি উপকৃত হয়েছিল। বিপ্লব এই শ্রেণির ক্ষমতালাভের হাতিয়ারে পরিণত হয়। তবে বুর্জোয়াদের মধ্যে শ্রেণিগত পার্থক্য ছিল। বিপ্লবের ফলে এঁদের সকলেই যে উপকৃত হয়েছিলেন তা নয়। পুরাতনতন্ত্রের যুগের এক শ্রেণির বুর্জোয়া ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক, যাঁরা প্রজাতন্ত্র ও পরবর্তীকালে বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। উচ্চ বুর্জোয়াদের পক্ষে অর্থের বিনিময়ে অভিজাত পদ ক্রয় করা আর সম্ভব ছিল না। চাকরীজীবী বুর্জোয়া বা পাতি বুর্জোয়াদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। শুধুমাত্র বংশকৌলীনের দ্বারা অর্জিত অধিকার ও ত্রি-স্তর ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা লুপ্ত হলে এই শ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের সরকারি চাকরিলাভের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। সামাজিক অসাম্য থেকে তাঁরা মুক্ত হন। তবে চার্চ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ভেঙে দেওয়ায় বহু শিক্ষক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক প্রমুখ জীবিকা ও পদমর্যাদা হারান। পরোক্ষ করব্যবস্থা লোক কর আদায়কারী নিম্ন বুর্জোয়াদের বেকারত্বের দিকে ঠেলে দেয়। পুরাতনতন্ত্রের যুগে যে সমস্ত ধনী বুর্জোয়া বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, তাঁরাও তাঁদের জমি হারান বিপ্লবের সময় ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে। এছাড়া উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তনের ফলে শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রের পিতৃসম্পত্তি ভোগ করার অধিকার লোপ পায় এবং পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ হওয়ায় বুর্জোয়া ধনী পরিবারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সন্ত্রাসের শাসনের সময় জয়েন্ট স্টক কোম্পানিগুলির অবলুপ্তি, ডিসকাউন্ট ব্যাঙ্কের পতন ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি ব্যবসায়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। জ্যাকোবিন শাসনে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প এবং বাণিজ্যনীতির প্রচলন ফ্রান্সে পুঁজিবাদের অগ্রগতি ব্যাহত করে এবং শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনাকে পিছিয়ে দেয়।

উল্লেখযোগ্য যে, বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণির গঠনেও এক পরিবর্তন এনেছিল। বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণির অনেকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তেমনি অন্য শ্রেণির অনেকে প্রভাবশালী বুর্জোয়া শ্রেণিতে পরিণত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণির অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেছেন ঐতিহাসিক লেফেভ্‌র। থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়ার ফলে ফ্রান্সের নেতৃত্বে আসেন এক ধরনের সম্পদশালী বুর্জোয়া গোষ্ঠী। এঁদের সঙ্গে ফ্রান্সের দরিদ্র জনতার কোনো যোগাযোগ ছিল না। এই 'নব্য ধনী' সম্প্রদায়ই বিপ্লবের ফলে লাভবান হয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক সুফলকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা নিজেদের আর্থিক ভিত্তি দৃঢ় করেছিলেন। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, এই 'নব্য ধনী' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন প্রধানত ব্যবসায়ী, মহাজন, সৈন্যবাহিনীর রসদ সরবরাহকারী, সরকারি ঠিকাদার, স্পেকুলেটর, ভূমিস্বত্বাধিকারী ধনী কৃষক প্রমুখ। নীতিবোধহীন, স্থূল রুচিসম্পন্ন এই বুর্জোয়া গোষ্ঠী তাঁদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে বিপ্লবের ফলে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি বজায় রাখতে তৎপর ছিলেন। অভিজাততন্ত্র ও সাধারণ জনতা উভয়েই এঁদের অপছন্দের

পাত্র ছিল। দরিদ্র সাধরণ জনতার পরিবর্তে বিপ্লবের ফলে স্থায়ীভাবে লাভবান হয়েছিলেন এই 'নব্য ধনী' বুর্জোয়া গোষ্ঠী।

পুরাতনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র পতনের ফলে কৃষক সম্প্রদায়ও কিছুটা উপকৃত হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক করভার এবং চার্চকে দেয় 'টাইদ' বা ধর্মকর প্রভৃতি থেকে তারা মুক্ত হয়। ভূমিদাস প্রথার অবলুপ্তি ভূমিদাসদের মুক্তি নিয়ে আসে। এরা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়। তবে বিপ্লবের ফলে সকল শ্রেণির কৃষক যে সমভাবে উপকৃত হয়েছিল তা নয়। সম্পন্ন কৃষকগণ সরকারের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত জমি ক্রয় করে, গ্রামাঞ্চলে এক ধরনের বুর্জোয়া জমি মালিকে পরিণত হয়। ভাগচাষী বা ভূমিহীন ক্ষেতমজুরগণ পূর্বের মতই ভূমিস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। নতুন জমি মালিক শ্রেণি এই সম্পন্ন কৃষকরা তাদের জমির স্বত্ব বজায় রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং বিপ্লববিরোধী হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক লেফেভ্‌র এই শ্রেণিকে 'কৃষক বুর্জোয়া' বলে অভিহিত করেছেন। ফ্রান্সে জমি ভূস্বামীদের কবলমুক্ত হলেও ইংলন্ডের মত 'কৃষি বিপ্লব' আনতে পারেনি। কারণ সম্পন্ন মানুষদেরই হস্তগত হয়েছিল বিক্রীত জমি। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক টম কেম্প ('Economic Forces in French History') দেখিয়েছেন যে বিপ্লবের যুগের অর্থনীতি কৃষক সমাজের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক বৈষম্যকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। বিপ্লবের যুগে ভূমিব্যবস্থায় চার্চ এবং এমিগ্রি বা দেশত্যাগীদের জমি প্রধানত ধনী বুর্জোয়ারাই কিনেছিল এবং তারা এক রক্ষণশীল শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল। কৃষি ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত করার সঙ্গতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র কৃষকের ছিল না। অতি ক্ষুদ্র জমির অংশে এঁদের জীবিকানির্বাহ কষ্টকর ছিল।

প্রকৃতপক্ষে অগণিত দরিদ্র জনতার আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি বিপ্লব পরবর্তী যুগে, 'ল অফ ম্যাক্সিমাম' বা 'ল অফ মিনিমাম'-এর মাধ্যমে কিছুদিনের জন্য সাঁকুলেৎ শ্রেণির উন্নতির চেষ্টা করা হলেও থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়ার যুগে এগুলি রদ করা হয়। এই শ্রেণির জীবিকা ও কর্মের অধিকারের দাবি এ সময়ের বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ পূরণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না বলে মন্তব্য করেছেন লেফেভ্‌র। শহরে দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে ছিলেন ক্ষুদ্র কারিগর, ব্যবসায়ী বা পণ্যসরবরাহকারীগণ। বিপ্লব এঁদের জীবনযাত্রায় বিশেষ পরিবর্তন আনেনি। শ্রমিকদের অবস্থারও বিশেষ উন্নতি হয়নি। মজুরির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ, ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ, বেকার সমস্যা ইত্যাদি তাদের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। নারী সম্প্রদায় বিপ্লবের যুগে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও নারীমুক্তির কথা বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ চিন্তা করেননি। শিল্প বিস্তার বা নতুন প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রয়োগের তেমন প্রচেষ্টাও দেখা যায়নি। পুরাতনতন্ত্রে শিল্পের পরিবর্তে বাণিজ্য গুরুত্ব পেত। আর বিপ্লবের ফলে বাণিজ্যের পরিবর্তে শিল্পোদ্যোগের দিকে ফ্রান্স অগ্রসর হতে পেরেছিল মাত্র। আসলে ফরাসী বিপ্লব অষ্টাদশ শতাব্দীর নিম্নমানের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা বা বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সৃষ্টি করতে পারেনি। বিপ্লব সমাজের উচ্চস্তরকেই কেবল স্পর্শ করেছিল এবং সেই স্তরে শ্রেণিবিন্যাসের এক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তাই এই বিপ্লবকে সীমিত অর্থে 'সামাজিক বিপ্লব' বললে অত্যুক্তি হয় না। বিশেষ অধিকার ও শ্রেণিগত বিভেদের অবসান ঘটিয়ে সাম্যের বাণী তুলে ধরা হলেও বুর্জোয়ারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাম্য চায়নি। তারা ব্যস্ত ছিল নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ নিয়ে। ফলে, ঐ স্বার্থ বহুলাংশে সিদ্ধ হবার পর তারা বিপ্লব সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, সাঁকুলেৎদের প্রয়োজন তাদের কাছে শেষ হয়ে যায় এবং উপেক্ষিত সাঁকুলেৎদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েই যায়।

ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সে রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন এনেছিল। ফ্রান্সের স্বৈরাচারী, দৈবানুগৃহীত ও কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে জাতির স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাত করেছিল ফরাসী বিপ্লব। সন্ত্রাসের শাসনকালে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনা হলেও থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়ার যুগে আবার শাসনতান্ত্রিক উদারতার নীতি গ্রহণ করা হয়। বিপ্লব ফ্রান্সের ইতিহাসে প্রথম প্রজাতন্ত্রের সূত্রপাত করেছিল। যদিও এই প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি ছিল দুর্বল। ফলে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নেপোলিয়নের একনায়কতন্ত্র।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার হয়। তা হল, রাজা বা কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়, জনগণই হল সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নির্বাচিত আইনসভার সার্বভৌমিকতা। ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থায় জনগণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। তবে এ প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হলেও সে ‘জনগণ’ ছিল মূলত সম্পত্তিভোগী বুর্জোয়া শ্রেণি। কারণ সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক অবস্থার মাপকাঠিতে ‘সক্রিয়’ ও ‘নিষ্ক্রিয়’ নাগরিকে ফ্রান্সের জনগোষ্ঠীর বিভাজন এবং ‘সক্রিয়’ নাগরিকের ভোটাধিকার প্রাপ্তি রাষ্ট্র ও প্রশাসনে বুর্জোয়াদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তারা রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। ফলে, সংঘাত ও বিরোধের বীজ থেকেই গিয়েছিল।

দেশে জাতীয় ঐক্যের বিকাশসাধন ফরাসী বিপ্লবের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে দেশ ও জাতির প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ বিপ্লবের ফলেই সম্ভব হয়। সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বিভেদ, অভ্যন্তরীণ শুল্কবেড়া ইত্যাদির অবসান দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা দূর করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং দেশের সর্বত্র একই শাসনব্যবস্থা, জাতীয় বাজার, সমগ্র দেশে দশমিক পদ্ধতির প্রচলন জাতীয় ঐক্যের বিকাশে সহায়ক হয়। বিপ্লবের যুগে জাতীয় সামরিক বাহিনী গঠন ও তাদের সাফল্য, শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম দেশাত্মবোধের আদর্শকে পরিব্যাপ্ত করেছিল। এ সত্ত্বেও অবশ্য একথা বলা যায় যে, ফ্রান্সের সার্বিক ঐক্যের পথে তখনও কিছু বাধা ছিল। যেমন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, আইনবিধি তৈরি করার অসমাপ্ত কাজ, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যথোচিত পরিকল্পনা গৃহীত না হওয়া ইত্যাদি সার্বিক ঐক্যের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ ছিল।

ফ্রান্সের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং চিন্তার জগতে ফরাসী বিপ্লব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ফরাসী বিপ্লবের পিছনে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অপর দিকে বিপ্লববিরোধীগণ যাবতীয় সংঘাতের জন্য দায়ী করে যুক্তিবাদকে। পুরাতন ঐতিহ্য ও প্রচলিত ধর্মব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন ছিল তাদের কাম্য। লা হার্প, কনটানে, বোনাল্ড প্রমুখ এই ধরনের বুদ্ধিজীবীগণ বিপ্লবের সমালোচক বার্কের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন। তবে বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে যুক্তিবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিপ্লব এক নতুন ধারার সূত্রপাত করে। পুরাতন ঐতিহ্যের অনুসরণ নবযুগের বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন মানুষদের অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। দুর্কে দুমিনিল, বার্নারডিন প্রমুখের রচনা তাদের অনুপ্রাণিত করে। শিল্পের জগতে প্রাচীন ধারার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি না ঘটলেও শিল্পী ডেভিডের নেতৃত্বে এক নতুন ধারার সূত্রপাত হয়। তাঁরা সমসাময়িক ঘটনাকে শিল্পে স্থান দিতে উৎসাহী ছিলেন।

ডেভিডের আঁকা 'টেনিস কোর্ট শপথ' বা 'মারা-র হত্যা' অনবদ্য শিল্পদৃষ্টি। সঙ্গীতের জগতে গোসেক, মেহুল প্রমুখ শিল্পীরা নতুন ধারার সূত্রপাত করেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যুক্তিবাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। রসায়নবিদ ল্যাভয়সিয়ে, ব্যরতোলে, অঙ্কে লাগ্রঁজ, ল্যজঁদর, লা প্লাস, প্রকৃতিবিজ্ঞানী কুভিয়ে, স্যাঁতিলেয়র, লামার্ক প্রমুখের অবদান স্মরণীয়।

সামাজিক আচরণ বা পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও বিপ্লবের প্রভাব লক্ষণীয়। পূর্ববর্তী যুগের সম্বোধন 'মঁসিয়' বা 'মাদাম'-এর পরিবর্তে 'সিতয়াঁ' এবং সিতায়াঁতেন' শব্দ দুটির ব্যবহার শুরু হয়। ঐতিহাসিক কোবানের মতে, সন্ত্রাসের শাসনের পর ফ্রান্সে পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিপ্লবের প্রতীক হিসেবে তিন রঙা পোশাক, লাল টুপি ইত্যাদি জনপ্রিয় হয়। মহিলাদের লকেটে গিলোটিনের মডেল ব্যবহার শুরু হয়। এগুলির প্রমাণ করে যে, বিপ্লব ফরাসী জনগণের মানসিকতাতেও পরিবর্তন এনেছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফ্রান্সে বিপ্লবী ঐতিহ্যের বিরুধে প্রতিবিপ্লবী চিন্তারও অভ্যুদয় ঘটেছিল। যাঁরা বিপ্লবের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন বা দেশত্যাগী অভিজাতদের মধ্যে প্রতিবিপ্লবী মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়। তবে এসব সত্ত্বেও, সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর যে আদর্শ ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল তা শুধুমাত্র ফ্রান্স নয়, সমগ্র ইউরোপকেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

৩.৩ ❒ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব

ফ্রান্সের সীমাবন্ধ বেষ্টনীর মধ্যে আবন্ধ না থেকে ফরাসী বিপ্লব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে, প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। ফরাসী বিপ্লব ও বিপ্লবের আদর্শ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পরিবর্তনের স্রোত তিনি এসেছিল।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ফরাসী বিপ্লবকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র সুনজরে দেখেনি। কারণ তাঁদের কাছে বিপ্লবী আদর্শ ও চিন্তাধারা পুরাতনতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক বোধ হয়েছিল। রুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন, স্পেনীয় রাজা চতুর্থ চার্লস বা সুইডেনের তৃতীয় গুস্তাভাস ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। অস্ট্রিয়ান সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ উদারপন্থী হলেও ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পতন তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, ইউরোপের স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গের নিকট সবচেয়ে আশঙ্কার কারণ ছিল নিজ নিজ দেশের প্রজাবর্গের মানসিকতায় বিপ্লবী আদর্শের প্রসারের সম্ভাবনা। তাঁরা যোড়শ লুই-এর পলায়নের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, বিপ্লবের যুগে ফ্রান্সে ভূমি-সংস্কার, চার্চ ও দেশত্যাগী অভিজাতদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ প্রভৃতি বৈপ্লবিক কার্যকলাপ তাঁদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। পাদুয়া ও পিলনিজের ঘোষণায় ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের উদ্বেগই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউরোপের দেশগুলিতে বৈপ্লবিক আদর্শের প্রসার রোধ করার মত ক্ষমতা এই সকল স্বৈরাচারী রাজন্যদের ছিল না। ফলে, নানা ঘটনা পরম্পরায় বিভিন্ন দেশ ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুন্ধ হয়ে ওঠে। বিপ্লব ইউরোপের মানুষকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে।

ইউরোপের যে সকল দেশে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব পড়েছিল সেখানেই পুরাতনতন্ত্রের রূপান্তর অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবী যুদ্ধ এবং বিপ্লবের অব্যবহিত পরে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ইউরোপ বিজয় বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবে ইউরোপের সকল দেশেই যে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সমভাবে পড়েছিল, তা নয়। একই দেশে বিপ্লবের সমর্থক এবং বিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী গোষ্ঠীর অবস্থান ছিল। ইউরোপের উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় স্বাগত জানিয়েছিলেন ফরাসী বিপ্লবকে। আবার ইংল্যান্ডের এডমন্ড বার্কের মত ব্যতিক্রমী ব্যক্তিও ছিলেন, যারা ফরাসী বিপ্লবকে সমর্থন করতে পারেন নি। অপরদিকে টম পেইনের মত ইংরেজ বুদ্ধিজীবী ও মানবতাবাদী তাঁর, ১৭৯১ ও ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দু খণ্ডের 'Rights of Man' গ্রন্থে বার্কের বক্তব্য খণ্ডন করেছিলেন এবং স্বৈরতন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর রচনা ক্ষুব্ধ করেছিল ইংল্যান্ডের ধনী অভিজাত সম্প্রদায়কে এবং উৎসাহিত করেছিল প্রগতিশীল সংস্কারকামী মানুষদের। ব্রিটিশ রাজতন্ত্র ও চার্চকে সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন টম পেইন, ইংল্যান্ডের বুদ্ধিজীবী, বণিক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছিল তাঁর রচনা। এছাড়াও ইংল্যান্ডের ব্লেক, বার্নস, কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, জার্মানির কান্ট, হেগেল, ফিকটে, হার্ডার, বিটোভেন এবং রাশিয়া সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের বুদ্ধিজীবিগণ ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে সন্ত্রাসের শাসনের জন্য অনেক বুদ্ধিজীবীই বিপ্লবের প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করেছিলেন।

ইংল্যান্ডে ফরাসী বিপ্লব এক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সূচনা করেছিল। যেহেতু বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ফ্রান্স ছিল ইংল্যান্ডের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ইংল্যান্ডে স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল হবে এমন ধারণা ইংরেজ সরকারের ছিল বিপ্লবের প্রথমদিকে। তবে স্যানহোপ, শেরিডান, ফক্স, ইরস্কিন প্রমুখ ইংল্যান্ডের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ অনেকেই ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সাফল্য ইংল্যান্ডে বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠায় বহু মানুষকে ইৎসাহিত করেছিল। লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত 'রেভলিউশন সোসাইটি' গড়ে উঠেছিল ইংল্যন্ডের 'গৌরবময় বিপ্লবে'র স্মরণে। ড. রিচার্ড প্রাইস ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে হিসেবে এই সংস্থাটিকে ব্যবহার করেন। টমাস হার্ডির নেতৃত্বে ১৭৯২ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত 'লন্ডন করেসপন্ডিং সোসাইটি' ছিল ইংল্যন্ডের র‍্যাডিকাল আন্দোলনের কেন্দ্র। বিপ্লবী ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রগতিশীল সংস্থার সঙ্গে এটির যোগাযোগ ছিল। এই সংস্থাটি ছিল প্রধানত ইংল্যান্ডের কারিকর, ছোট ব্যবসায়ী বা শ্রমজীবী মানুষের সংগঠন। এটি ছাড়াও ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে যেমন ম্যাঞ্চেস্টার, লীডস, নটিংহ্যাম, শেফিল্ড প্রভৃতিতে অনুরূপ সংস্থার উদ্ভব ঘটেছিল, যারা বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত। এককথায় ব্রিটিশ শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে ফরাসী বিপ্লব বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের পর ইংল্যান্ডের পিট সরকার দমননীতির মাধ্যমে এইসব বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। স্কটল্যান্ডেও ফ্রান্সের সমর্থনে আন্দোলনকে দমননীতির মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়।

ইংল্যান্ড অপেক্ষা ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব আরও বেশি করে পড়েছিল আয়ারল্যান্ডে। আয়ারল্যান্ডের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ফরাসী দার্শনিকদের চিন্তাধারা বিশেষত রুশোর মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপীয় যুদ্ধের কালে এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড ও উলফ টোনের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রাম। এঁরা ফ্রান্সের জাতীয় মহাসভা বা ন্যাশনাল কনভেনশনের

সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। অপর একটি আন্দোলন ছিল আইরিশ কৃষকদের বিদ্রোহ। এঁরাও ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ফরাসী সৈনিকদের আয়ারল্যাণ্ডে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিলেন এই বিদ্রোহী কৃষকগণ। অবশ্য আয়ারল্যাণ্ডের এই সমস্ত আন্দোলন ব্রিটিশ সরকার কঠোরভাবে দমন করেন।

ফরাসী বিপ্লবের যুগে জার্মানি ছিল বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া এবং স্যাক্সনি ব্যতীত সমগ্র জার্মীন রাজ্য বহু ক্ষুদ্র অঞ্চল ও কিছু স্বাধীন নগরের সমষ্টি ছিল। এই সকল অঞ্চল সামন্তপ্রভু কর্তৃক শাসিত হত। রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব থাকলেও রুশো, মন্টেস্কুর চিন্তাধারা ও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ জার্মান কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। ফরাসী বিপ্লবকে এক অসাধারণ ঘটনা হিসেবে অভিহিত করেছিলেন জার্মান ঐতিহাসিক ভন ম্যুলার এবং হার্ডার। কান্ট, হেগেল, ফিক্‌টে প্রমুখ দার্শনিক ফ্রান্সে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ফরাসী জনগণের সংগ্রামকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বহু জার্মান কবি উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন বিপ্লবের দ্বারা। তবে, ফ্রান্সে রাজার মৃত্যুদণ্ড, চার্চের জমি বাজেয়াপ্তকরণ, সন্ত্রাসের শাসনের ভয়াবহতা এঁদের অনেককেই পরবর্তীকালে বিপ্লব সম্পর্কে হতাশ করেছিল। গ্যেটে বা শিলারের মত বিখ্যাত কবি ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে নিস্পৃহতা দেখান। রাজার মৃত্যুদণ্ড বা সন্ত্রাসের শাসন হেগেলকেও বিরূপ করে তুলেছিল। তাঁরা বিপ্লব সম্পর্কে তাঁদের পুরনো উৎসাহ হারিয়েছিলেন। আবার অনেক বুদ্ধিজীবী ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রকে স্বাগতও জানিয়েছিলেন। এককথায় ফরাসী বিপ্লব জার্মান বুদ্ধিজীবী মহলকে আলোড়িত করেছিল।

জার্মানির বিভিন্ন রাজ্য, নগর ইত্যাদি অঞ্চলে রাজনীতিবিদ, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, কৃষক প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লব দ্বারা অনুপ্রাণিত হন, জার্মানির কোলোন, মেইনজ, ব্যাডেন, প্যালাটিনেট ইত্যাদি স্থানে যে সকল কৃষক বিদ্রোহ ঘটে তার পিছনে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। জার্মানির বেশ কয়েকটি নগরে বৈপ্লবিক সংঘ স্থাপিত হয়। কোন কোন অঞ্চলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান দাবি করা হয়। মেইনজ শহরের দরিদ্র জনগণ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং কৃষকগোষ্ঠী জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। তবে জার্মান রাজ্য স্যাক্স ও ব্যাভেরিয়াতে ফরাসী বিপ্লবের বিশেষ প্রভাব পড়েনি। প্রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের রাজসভার অনেক রাজপুরুষ, আমলা প্রমুখ এবং বুর্জোয়া সমাজকে বিপ্লব প্রভাবিত করেছিল। বেশ কিছু গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়েছিল সাইলেশিয়ায় এবং সেখানে বিদ্রোহী কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় ফ্রান্সের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিল। তবে সমগ্র জার্মানিতে আরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল পরবর্তীকালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বিজয়ের পর।

ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে ইটালির মত রাজনৈতিকভাবে শতধাবিভক্ত রাজ্য বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ইটালীয়দের মধ্যে প্রথম জাতীয় ঐক্যের সূত্রপাত করলেও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ তার ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল। ইটালিতে প্রধান আধিপত্য ছিল অস্ট্রিয়ার। অস্ট্রিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের ক্ষোভ ছিল। ইটালির শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। অসন্তোষ ছিল কৃষক স,মাজের মধ্যেও। তবে বিপ্লবের জন্য যে ঐক্যের প্রয়োজন, সেই ঐক্য তখনও ইটালীয়দের মধ্যে ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পিডমন্ট ও স্যাভয়ে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দেই স্যাভয়ের বিদ্রোহীরা সামন্তকর প্রদানে অস্বীকার করে। পিডমন্টের বিদ্রোহী কৃষক সম্প্রদায়ের ভূমি সংস্কারের দাবি এবং নিজেদের 'ফরাসী নাগরিক' রূপে ঘোষণা ছিল উল্লেখযোগ্য। বোলোন্যা এবং

উত্তর ইটালির অন্যান্য অঞ্চলের জনগণ বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও দক্ষিণ ইটালিতে শিক্ষিত উদারনৈতিক গোষ্ঠী থাকলেও তারা জনগণের বিশ্বাসভাজন ছিল না। এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাই ইটালির ঐক্যের পথে বাধাস্বরূপ ছিল, যা দূর হয় আরও অনেক পরে।

ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী রাজ্য বেলজিয়ামে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দেই অস্ট্রীয় সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত হলে এখানে আন্দোলন আরও তীব্র হয়। ফ্রান্সের সঙ্গে বিদ্রোহীদের যোগাযোগ হয়। তবে বিদ্রোহীদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। ছিল নেতৃত্বের সংঘাত। ফলে, অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করে 'বেলজিয়াম যুক্তরাষ্ট্র' গঠনে সক্ষম হলেও বেলজিয়ামে এক গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সেই সুযোগে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া পুনরায় বেলজিয়ামের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

বিপ্লবী তরঙ্গ আঘাত করেছিল সুইজারল্যান্ডকেও। এখানকার ক্যান্টনগুলিতে বৈপ্লবিক তৎপরতা শুরু হয়েছিল। কয়েকটি অঞ্চল ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক পৃথক ফরাসী 'ডিপার্টমেন্ট' গঠন করে। জেনেভার গণতান্ত্রিক দলসমূহ সকল অধিবাসীকে ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে নাগরিকত্ব দান করে এবং 'বিপ্লবী কমিটি' ও 'বিপ্লবী বিচারালয়' প্রতিষ্ঠা করে। জার্মান অধ্যুষিত জুরিখ ক্যান্টনে অনেক বেশি বৈপ্লবিক তৎপরতা দেখা যায়। সেখানকার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এর সামিল হন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে 'জ্যাকোবিন ক্লাব' স্থাপিত হয়। সেন্ট গল-এ কৃষক সম্প্রদায় এককালীন অর্থের বিনিময়ে সামন্ততান্ত্রিক দায়ভার থেকে মুক্ত হন। এখানকার আন্দোলন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতেও বিস্তার লাভ করে।

হাঙ্গেরীতে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিনিধিমূলক সভার স্বীকৃতি এবং ম্যাগিয়ার ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দানের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এতে নেতৃত্ব দেন অভিজাত সম্প্রদায় যাঁরা অনেকেই ফরাসী দার্শনিকদের, বিশেষত, রুশো ও ভলতেয়ারের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে এঁরাই হ্যাপস্‌বার্গ সম্রাট লিওপোল্ডের আমলে তাঁদের আনুগত্যের বিনিময়ে ভূমিদাস প্রথার পুনঃপ্রবর্তন দাবি করেন। আবার ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের অনুকরণে 'মানবাধিকার' নামে এক ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করেন যা সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস কর্তৃক প্রত্যাহৃত হয়। হাঙ্গেরীতে অবশ্য তখনও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শক্তি ও সাধারণ জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ উল্লেখযোগ্য না হওয়ায় অভিজাততন্ত্রের বিরোধিতা করলেও তাঁরা সফল হননি। এঁদের ওপর অস্ট্রীয় প্রশাসনের নির্যাতনও নেমে এসেছিল। হাঙ্গেরীয় গণ আন্দোলনে তীব্রতা না থাকলেও এঁদের আদর্শের অপমৃত্যু ঘটেনি এবং এর ফলেই সেখানে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছিল।

পৃথক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি এবং ভৌগোলিক ব্যবধান সত্ত্বেও পোল্যান্ডে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল। পোল্যান্ডের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং অভিজাতদের ফরাসী বিপ্লব অনুপ্রাণিত করেছিল। পোল সম্রাট স্টানিসলাস পনিয়াটোস্কি ফরাসী বিপ্লবের অনুকরণে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে একটি সংবিধান গ্রহণ করেন। তবে পোল্যান্ড অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে ত্রিধাবিভক্ত হওয়ায় এইসব সংস্কার কার্য সফল হয়নি। রুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিনের চাপে পনিয়াটোস্কি সংবিধান

বাতিল করতে বাধ্য হন। বিপ্লবীগণ ফরাসী সাহায্যের প্রত্যাশা করলেও সে সাহায্য পাওয়া যায়নি।

যে সকল দেশে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব প্রায় নেতিবাচক ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্পেন। স্পেনীয় সমাজব্যবস্থা এবং রাজনীতির সঙ্গে ফ্রান্সের যথেষ্ট মিল থাকলেও ফ্রান্সের বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মত বিপ্লবী চেতনা স্পেনের দুর্বল মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছিল না। স্পেনের কৃষক সম্প্রদায় ছিল দরিদ্র। জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব এদেশে বিশেষ পড়েনি। এছাড়া স্পেনের সরকারও বিপ্লবের প্রভাব যাতে স্পেনে না পড়ে সে বিষয়ে তৎপর ছিলেন।

রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের বল্কান রাজ্যসমূহে এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব বিশেষ অনুভূত হয়নি। ফ্রান্সের সঙ্গে এইসব দেশের ভৌগোলিক দূরত্ব এর অন্যতম কারণ ছিল। এছাড়া এইসমস্ত দেশে ঐতিহ্য এবং সামাজিক সংগঠনের দিক থেকেও ফ্রান্সের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ছিল। রাশিয়ার কিছু সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী (কবি রাদিশচেভ, প্রিন্স গ্যালিটজিন) ফরাসী বিপ্লব নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলেও এধরনের মানুষের সংখ্যা ছিল অল্প।

৩.৪ ❐ উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে ফ্রান্সে বিপ্লব অনেক নতুনত্বের সূচনা করেছিল। তবে এই বিপ্লবকে কখনই একটি সম্পূর্ণ বিপ্লব বলা সঙ্গত নয়। বিপ্লব ফরাসী সমাজের উচ্চস্তরকেই স্পর্শ করেছিল এবং সেখানে শ্রেণিবিন্যাসের একটি পরিবর্তন এনেছিল। সেই নতুন সমাজে ছিল 'নব্য ধনী' বুর্জোয়া গোষ্ঠীর প্রাধান্য এবং এদের নীচে থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগণের সামগ্রিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারেনি। ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পতনের পর প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও এই প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি ছিল দুর্বল। তাই শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ন বোনাপার্টের একনায়কতন্ত্রকেই স্বাগত জানাতে হয়েছিল।

অপরদিকে ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের আদর্শ পৌঁছে দিলেও নেপোলিয়নের ইউরোপ বিজয় এবং জুলাই (১৮৩০ খ্রি.) এবং ফেব্রুয়ারি (১৮৪৮ খ্রি.) বিপ্লবের তরঙ্গ নানা দেশে আরো শক্তিশালী বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। এর প্রধান কারণ ছিল ফ্রান্সের মত প্রভাবশালী ও শক্তিশালী বুর্জোয়া সম্প্রদায় ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছিল না। বিপ্লবের কোন নেতাই ইউরোপে বিপ্লবের বিস্তারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে বিপ্লবের আদর্শ ছড়িয়ে দেবার পরিবর্তে ফ্রান্সে বিপ্লবকে রক্ষা করাই ছিল ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্য। ফলে ইউরোপে আরো দৃঢ়ভাবে বিপ্লবের আদর্শ সম্প্রসারণের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুত্থান পর্যন্ত।

৩.৫ ❐ অনুশীলনী

- **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

১। ফ্রান্সের সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব কি ছিল?

২। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল আলোচনা করুন।

- **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

১। সমসাময়িক অভিজাত এবং বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের ওপর ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রি.) প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

২। জার্মানি ও ইটালিতে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব কি কোন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল?

- **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

১। 'নব্য ধনী' বুর্জোয়া গোষ্ঠী কাদের বলা হয়েছে?

২। শিল্পী ডেভিডের আঁকা ফরাসী বিপ্লব সংক্রান্ত দুটি চিত্রের নাম করুন।

৩। আয়ারল্যান্ডে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে কাদের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়?

৩.৬ ❐ গ্রন্থপঞ্জী

১। সবুল অ্যালবার্ট, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দি ফ্রেঞ্চ রেবোলিউশন (২ খণ্ড)

২। টমসন ডেভিড, ইউরোপ সিন্স নেপোলিয়ন

৩। চক্রবর্তী প্রফুল্ল কুমার, ফরাসী বিপ্লব

৪। কোবান আলফ্রেড, এ হিস্ট্রি অফ মডার্ন ফ্রান্স (২ খণ্ড)

একক ৪ ❒ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ সূচনা

৪.৩ ডাইরেক্টরীর বৈদেশিক নীতি ও নেপোলিয়নের ক্ষমতায় উত্তরণ

৪.৪ কনস্যুলেটের শাসনব্যবস্থা

৪.৫ নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ সংস্কার

৪.৬ নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি

ক. প্রথম কনসাল রূপে নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি (১৭৯৯-১৮০৩ খ্রি.)

খ. ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাটপদ গ্রহণের পর নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি

গ. নেপোলিয়ন কর্তৃক ইউরোপের পুনর্গঠন

ঘ. মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা

ঙ. উপদ্বীপের যুদ্ধ

চ. মস্কো অভিযান

৪.৭ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ ও নেপোলিয়নের নির্বাসন

৪.৮ একশত দিবসের রাজত্ব

৪.৯ নেপোলিয়নের পতনের কারণ

৪.১০ নেপোলিয়ন কি বিপ্লবের সন্তান?

৪.১১ অনুশীলনী

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ ❒ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককের উদ্দেশ্য হল ফরাসী বিপ্লব পরবর্তীকালে অযোগ্য ডাইরেক্টরীর শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদ করে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কিভাবে ফ্রান্সে পুনরায় একনায়কতন্ত্র স্থাপন করলেন তা ব্যাখ্যা করা। সেই সঙ্গে ফ্রান্সে তাঁর অভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্য কতটা বিপ্লবের আদর্শের রূপায়ণ ঘটাতে পেরেছিল এবং তাঁর বৈদেশিক নীতি ইউরোপের দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ প্রসারে কতটা সহায়তা করেছিল তা আলোচিত হবে। বিশ্লেষিত হবে নেপোলিয়নের পতনের বিভিন্ন কারণ এবং তিনি প্রকৃত অর্থে 'বিপ্লবের সন্তান' ছিলেন কি না সেই বিষয়টিও।

৪.২ ❒ সূচনা

পূর্ববর্তী একক ২ : ১২-তে ফ্রান্সে ডাইরেক্টরী শাসনব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ নীতি আলোচনা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, ফ্রান্সে ঐ শাসনব্যবস্থার কিছু কৃতিত্ব থাকলেও অন্তর্নিহিত সঙ্কট, মুদ্রাস্ফীতি, ডাইরেক্টরগণের অসততা, এবং তাঁদের প্রতি জনসমর্থন হ্রাস ডাইরেক্টরী শাসনের পতনের সূত্রপাত করেছিল। এই অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের পাশাপাশি এ যুগে ফ্রান্স পুনরায় ইউরোপীয় যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের সূত্র ধরেই কর্সিকা-জাত সৈনিক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ক্ষমতায় উত্তরণের সূত্রপাত। তাই ডাইরেক্টরীর বৈদেশিক নীতি ও নেপোলিয়নের ক্ষমতায় উত্তরণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

৪.৩ ❒ ডাইরেক্টরীর বৈদেশিক নীতি ও নেপোলিয়নের ক্ষমতায় উত্তরণ

ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, সামন্ততন্ত্রের পতন, অভিজাতদের বিশেষ অধিকারের বিলুপ্তি, সাম্যের আদর্শ, জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা ও মানবাধিকারের ঘোষণা ইত্যাদি তথা বিপ্লবের প্রভাব থেকে পুরাতনতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ইউরোপের বহু রাষ্ট্রই বিপ্লব বিরোধী হয়ে উঠেছিল। তবে প্রথমদিকে এই সকল রাষ্ট্র নিজস্ব আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে বিব্রত থাকায় তারা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ করতে পারেননি। তা সত্ত্বেও ১৭৯১ সাল থেকেই যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ১৭৯২ সালে ২০শে এপ্রিল ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বিপ্লব এবং যুদ্ধ একই সঙ্গে চলতে থাকে। ঐতিহাসিক ফিলিপ গডেলা বলেছেন যে এই যুদ্ধ ছিল বিপ্লবী ফ্রান্সের আদর্শবাদের সঙ্গে রাজতান্ত্রিক ইউরোপের সংঘাত। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ড হলে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, ইংল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, সার্ডিনিয়া প্রভৃতি দেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম রাষ্ট্রজোট গঠন করে। কিন্তু এই রাষ্ট্রজোট স্থায়িত্ব লাভ করেনি। ফরাসী বাহিনী সর্বত্র জয়লাভ করতে থাকলে প্রাশিয়া, হল্যান্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশ জোট ত্যাগ করে। কিন্তু বেলজিয়ামে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি অস্ট্রিয়া ও ইংল্যান্ডকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বাধ্য করে। সুতরাং ডাইরেক্টরীর ক্ষমতালাভের প্রাক্কালে ফ্রান্স প্রথম রাষ্ট্রজোটেকর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর ডাইরেক্টরী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে কিন্তু ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করলে ফ্রান্স প্রাশিয়া এবং স্পেনের সাহায্য লাভের চেষ্টা করে। কিন্তু প্রাশিয়ারাজ দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন না। তবে ইউরোপের ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলি ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সাফল্যকে অভিনন্দিত করেছিল। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে টাস্কানির ডিউক ফ্রান্সের সঙ্গে এক সন্ধিতে আবদ্ধ হন। এছাড়া ডাইরেক্টরী উত্তর ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ অর্থাৎ ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে।

১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্রান্স দ্বিমুখী অভিযান শুরু করে। একদিকে মোরিউ, যুরোদাঁর নেতৃত্বে ফরাসী বাহিনী দানিয়ুব নদীর অববাহিকা ধরে অগ্রসর হয়, অপরদিকে তরুণ সেনানায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট উত্তর ইটালির পথ ধরে অস্ট্রিয়ার দিকে অগ্রসর হন। অস্ট্রীয়বাহিনীর কাছে যুরোদাঁ পরাস্ত হয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করতে বাধ্য হন। অপরদিকে নেপোলিয়ন উত্তর ইটালিতে প্রবেশ করে সেখানকার রাজ্যগুলি একের পর এক দখল করতে শুরু করেন। নেপোলিয়নের ইটালি অভিযানের সাফল্যই তাঁকে

গৌরবান্বিত করে তোলে। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে মন্তভির যুদ্ধে সার্ডিনিয়াকে পরাজিত করে তিনি লাভ করেন স্যাভয় ও নিস। তারপর লম্বার্ডি, মিলান, নেপল্‌স, পার্মা, মডেনা প্রভৃতি নেবোলিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই রাজ্যগুলি নিয়ে নেপোলিয়ন গঠন করেন লাইগুরিয়ান প্রজাতন্ত্র।

১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়বাহিনীকে পরাজিত করে অস্ট্রিয়-লম্বার্ডি অধিকার করেন। আক্রমণ করেন পোপের রাজ্য। পোপ ষষ্ঠপায়াস টলেনটিনোর সন্ধির (১৮৯৭) মাধ্যমে নেপোলিয়নকে প্রভূত ক্ষতিপূরণ এবং কিছু রাজ্যাংশ দান করেন। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত রাজ্যগুলি অর্থাৎ পূর্বতন অস্ট্রিয়ান নেদারল্যান্ডস,, রাইন নদীর বাম তীরবর্তী অঞ্চল এবং উত্তর ইটালির বিজিত অংশগুলি নিয়ে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের অধনে সিজালপাইন প্রজাতন্ত্র গঠন করেন যার ওপর ফরাসী আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয় অস্ট্রিয়া। এরপর নেপোলিয়ন নব উদ্যমে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং রিভোলির যুদ্ধে (১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে) অস্ট্রিয়া পরাজিত হয় এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস নেপোলিয়নের সঙ্গে ‘ক্যাম্পোফোর্মিও সন্ধি’ (১৭৯৭) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই সন্ধির শর্তানুসারে অস্ট্রিয়া রাইন নদীকে ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্ত হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। ফ্রান্স অস্ট্রিয় নেদারল্যান্ড, আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং বেলজিয়াম লাভ করে। ইটালিতে ফ্রান্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লাইগুরিয়ান এবং সিজালপাইন প্রজাতন্ত্রকে অস্ট্রিয়া স্বীকৃতি দান করে। পরিবর্তে ফ্রান্স অস্ট্রিয়াকে ভেনিস ও ডালমেশিয়া প্রত্যার্পণ করে। উল্লেখযোগ্য যে নেপোলিয়ন কর্তৃক অস্ট্রিয়াকে ভেনিস প্রদান ডাইরেক্টরীর ইচ্ছা বিরুদ্ধ ছিল। তবে ইটালি এবং অস্ট্রিয়াতে নেপোলিয়নের সাফল্য নেপোলিয়নের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। ডাইরেক্টরীতে নেপোলিয়নের প্রতিপত্তিও অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সার্ডিনিয়া ও অস্ট্রিয়ার পরাজয় এই দুটি দেশকে প্রথম রাষ্ট্রজোট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় ফলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একমাত্র দাঁড়িয়ে থাকে ইংল্যান্ড। নেপোলিয়ন প্রথমদিকে ইংল্যান্ড আক্রমণের বিরোধী হলেও পরে মিশরের মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডের পূর্বদিকের সাম্রাজ্য আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন। নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল মিশরকে ফরাসী উপনিবেশে রূপান্তরিত করে সেখান থেকে ইংল্যান্ডের ব্যবসাবাণিজ্য ধ্বংস করা এবং প্রাচ্যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে বিপন্ন করা। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন তুলোঁ বন্দর থেকে মিশর অভিমুখে যাত্রা করেন। মাল্টা ও আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করে তিনি পিরামিডের যুদ্ধে মিশরকে পরাজিত করে কায়রো নগরে প্রবেশ করেন। কিন্তু নীলনদের যুদ্ধে (১৭৯৮) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নৌশক্তি ইংল্যান্ডের কাছে ফরাসীবাহিনী বিধ্বস্ত হয়। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌসেনাধ্যক্ষ ছিলেন নেলসন। নীলনদের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সের সঙ্গে নেপোলিয়নের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

নেপোলিয়নের মিশর অভিযান রাশিয়া ও তুরস্ককে ক্ষুব্ধ করে কারণ এর ফলে নিকট প্রাচ্যে এই দুই রাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। ফলে তারা নিজেদের মধ্যে বিরোধ সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হয়। যার ফলশ্রুতি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোট গঠন। এই জোটে প্রথমে ইংল্যান্ড, রাশিয়া ও তুরস্ক এবং পরে অস্ট্রিয়া যোগ দেয়। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে আসেন। নীলনদের যুদ্ধে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি ফ্রান্সে বীরোচিত সম্বর্ধনা লাভ করেন।

ডাইরেক্টরীর বৈদেশিক নীতি এবং নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের ব্যর্থতা এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোট গঠন ডাইরেক্টরীর পতনের পথ প্রস্তুত করেছিল। সেইসঙ্গে ইটালিতে নেপোলিয়নের সাফল্য

ও সামরিক প্রতিভার বিকাশ নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তাকে বৃদ্ধি করেছিল। তবে ইউরোপের যে সমস্ত স্থানে ডাইরেক্টরীর আমলে ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানেই চেষ্টা করা হয়েছিল বৈপ্লবিক আদর্শের ভিত্তিতে রচিত ফরাসী আইন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ডাইরেক্টরীর জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ডাইরেক্টরী শাসনের বিরুদ্ধে একাধিক অন্তর্বিপ্লব দেখা যাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে নেপোলিয়ন স্বদেশে ফিরে আসেন এবং পুরাতন বিপ্লবী এ্যাবেসিয়েসের সঙ্গে ডাইরেক্টরী উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ই নভেম্বর (১৮ই ব্রুমেয়ার) এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ডাইরেক্টরী উচ্ছেদ করে নেপোলিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন কনস্যুলেটের শাসন যেখানে তিনজন কনসালের উপর শাসনভার অর্পণ করা হয় এবং প্রথম কনসাল হিসেবে নেপোলিয়ন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হন।

৪.৪ কনস্যুলেটের শাসনব্যবস্থা

১৮ই ব্রুমেয়ারের অভ্যুত্থান ফ্রান্সে ডাইরেক্টরী শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল এবং ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা দখল করে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন তা কনস্যুলেটের শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিত। ডাইরেক্টরী ধ্বংস করার পর নেপোলিয়ন একটি নতুন সংবিধানের সাহায্যে ফ্রান্স শাসনের পরিকল্পনা করেন। এই সংবিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন অ্যাবেসিয়েস।

অ্যাবেসিয়েস যে সংবিধান রচনা করেন তার প্রধান ভিত্তি ছিল যে জনগণের আস্থার উপর নির্ভর করে সরকার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে। ফরাসী বিপ্লবের আমলে অ্যাবেসিয়েসের মত মানুষ যিনি আইনসভার সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনিই আইনসভার ক্ষমতাকে খর্ব করে শাসন বিভাগকে শক্তিশালী করার নীতি গ্রহণ করেন যা ধীরে ধীরে নেপোলিয়নের একনায়কতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করে।

ফ্রান্সের এই নতুন সংবিধান 'অষ্টমবর্ষের সংবিধান' নামে পরিচিত। এই সংবিধান অনুযায়ী স্থির হয় যে ফ্রান্সের শাসনভার তিনজন কনসালের ওপর ন্যস্ত থাকবে যাঁরা দশ বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন। প্রথম কনসালের হাতে থাকবে সর্বাধিক ক্ষমতা। তিনি মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ, সৈন্যবাহিনী ও বৈদেশিক নীতির নিয়ন্ত্রণ, কাউন্সিল অফ স্টেট বা আইনের প্রস্তাবক সভার সদস্যদের নিয়োগ করবেনা এমনকি কাউন্সিল অফ স্টেটের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কনসাল প্রায় অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী হবেন। বাকী দু'জন কনসাল প্রথম কনসালের সহযোগী হিসেবে থাকবেন। সংবিধানে প্রথম কনসাল হিসেবে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নাম উল্লেখ করা হয় এবং অপর দু'জন কনসাল ছিলেন ক্যামবাসেরেস এবং লা ব্রুন।

নতুন সংবিধানে আইনসভাকে চারটি কক্ষে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল কাউন্সিল অফ স্টেট, ট্রিবিউনেট, লেজিসলেটিভ বডি এবং সিনেট। কাউন্সিল অফ স্টেটের দায়িত্ব ছিল আইনের প্রস্তাব রচনা। ট্রিবিউনেট সেইসব প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার অধিকারী হলেও প্রস্তাবের উপর ভোটদানের অধিকারী ছিল না। লেজিসলেটিভ বডি আইনের প্রস্তাবগুলির বিভিন্ন দিক আলোচনার অধিকারী ছিল না কিন্তু সেই

প্রস্তাব ভোট মারফত গ্রহণ করতে পারত। আর আইন পাশ হওয়ার পর সিনেট সেই আইনকে চূড়ান্ত অনুমোদন বা বর্জন করতে পারত। এইভাবে ক্ষমতা বিভক্ত হওয়ায় কার্যত আইনসভা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছিল।

আইনসভার সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচন ও মনোনয়ন দুটি পদ্ধতিই গৃহীত হয়। প্রথম কনসাল সিনেট এবং কাউন্সিল অফ স্টেটের সদস্যদের মনোনয়ন করার অধিকারী ছিলেন। আর ট্রিবিউনেট এবং লেজিসলেটিভ বডির সদস্যরা নির্বাচিত হওয়ার পর সিনেট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করে নেওয়া হলেও ভোট দানের পদ্ধতি এতই জটিল ছিল যে আইনসভার প্রতিনিধিদের নির্বাচনে জনগণের প্রকৃতই কোন প্রভাব থাকত না।

এই 'অষ্টম বর্ষের সংবিধান' দৃশ্যত প্রজাতান্ত্রিক হলেও এটি ছিল নেপোলিয়নের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন তাই কনস্যুলেটকে প্রজাতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের প্রধান পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতকপক্ষে এই সংবিধানে প্রথম কনসাল বা নেপোলিয়নই ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। আইনসভার ওপর নেপোলিয়নের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল। আইনসভার আইন রচনা করার সার্বভৌম অধিকার ছিল না। সিনেট এবং কাউন্সিল অফ স্টেটের মনোনীত সদস্যবৃন্দের মাধ্যমে প্রথম কনসাল বা নেপোলিয়ন আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। উল্লেখযোগ্য যে সংবিধান সম্পর্কে জনগণের মতামত জানার জন্য গণভোট অনুষ্ঠিত হলে এই সংবিধান বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। ১৮০২ সালে জনগণের বিপুল সমর্থনে নেপোলিয়ন যাবজ্জীবনের জন্য কনসালের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এবং ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে সিনেটের ঘোষণার মাধ্যমে নেপোলিয়ন বংশানুক্রমিক সম্রাটে পরিণত হন। প্রজাতন্ত্রের সাময়িক আবরণ পরিত্যক্ত হয়ে ফ্রান্সে নেপোলিয়নের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪.৫ ❐ নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ সংস্কার

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রথম কনসাল হিসেবে ফ্রান্সে যে অভ্যন্তরীণ সংস্কার করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে ফ্রান্সের যে রূপান্তর ঘটান তার মধ্যে তাঁর দুটি পরস্পর বিরোধী মন্তব্যের—'আমিই বিপ্লব' (I am the Revolution) এবং 'আমিই বিপ্লব ধ্বংস করেছি' (I destroyed the Revolution)— বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। একথা বলা হয়েছে যে নেপোলিয়নের সামরিক কীর্তি চিরস্থায়ী না হলেও তাঁর অভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্য ছিল দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৯৯ থেকে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি ফ্রান্সের আর্থিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয় এবং বিচার বিভাগীয় পুনর্গঠনের কাজে দৃষ্টি দেন। এই পর্বেই শাসক হিসেবে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। উল্লেখযোগ্য যে প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের মতাদর্শ নির্বিশেষে অনেক দক্ষ এবং প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের তিনি নিয়োগ করেছিলেন যাঁরা অভ্যন্তরীণ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন।

নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সমূহের মধ্যে প্রথমে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কথা উল্লেখ করা যায়। একথা বলা যায় যে ফরাসী বিপ্লবের যুগে ফ্রান্সে বহু সংস্কারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ১৭৯১

খ্রিস্টাব্দের সংবিধান, সন্ত্রাসের শাসন বা ডাইরেক্টরীর আমলে অনেক উল্লেখযোগ্য সংস্কারের প্রচেষ্টা হলেও তা ছিল বিক্ষিপ্ত এবং কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বহির্ভূত। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, ফরাসী বিপ্লব পুরাতনতন্ত্রের উচ্ছেদে যতটা উদ্যোগী ছিল, নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ততটা ছিল না। নেপোলিয়নের উদ্যোগেই ফ্রান্সে অভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যে গতি সঞ্চারিত হয়।

নেপোলিয়নের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ। নেপোলিয়নের প্রশাসনিক ব্যবস্থার শীর্ষে ছিল কাউন্সিল অফ স্টেট। এই পরিষদের সদস্যদের মনোনয়নের অধিকার ছিল প্রথম কনসাল অর্থাৎ নেপোলিয়নের। তিনি প্রশাসনিক কাজে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মনোনীত করে এই পরিষদ গঠন করেন। এক্ষেত্রে তিনি মতাদর্শকে কোন প্রাধান্য দেননি। দক্ষতা বা যোগ্যতাই ছিল এই পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত হবার প্রধান বিষয়।

নেপোলিয়ন সমগ্র ফ্রান্সে পূর্বের ন্যায় তিরাশিটি ডিপার্টমেন্ট এবং পাঁচশ সাতচল্লিশটি জেলাকে বজায় রাখলেও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লোপ করে প্রদেশ, জেলা বা কমিউনগুলিতে নিজের একক কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। এই সকল ডিপার্টমেন্ট, জেলা বা কমিউনগুলির শাসনকর্তারা অর্থাৎ প্রিফেক্ট, সাবপ্রিফেক্ট ও মেয়ররা পূর্বে স্থানীয় ভোটে নির্বাচিত হলেও নেপোলিয়ন সেই প্রথা বাতিল করে এঁদের মনোনয়নের অধিকার নিজের হাতে নেন। তবে প্রদেশ ও জেলার কাউন্সিলগুলিতে নির্বাচনপ্রথা বহাল থাকলেও এগুলি শুধুমাত্র আইনবিষয়ক ক্ষমতার অধিকারী হয়।

নেপোলিয়নের শাসনব্যবস্থায় প্রিফেক্টদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নেপোলিয়ন কর্তৃক মনোনীত এই প্রিফেক্টগণ তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত ছিল। ডিপার্টমেন্টগুলির যাবতীয় ক্ষমতা প্রিফেক্টদের হাতে ছিল তবে এদের বুরবোঁ যুগের ইনটেনডেন্টদের মতো কেন্দ্রীয় আইনের নিজস্ব ব্যাখ্যার মাধ্যমে আইনের প্রয়োগ করার অধিকার ছিল না। প্রিফেক্টদের অধীনে থাকত কিছু সাবপ্রিফেক্ট যাঁদের বিশেষ স্বাধীনতা ছিল না। এঁরাও প্রথম কনসাল কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। এছাড়াও সকল শ্রেণির কর্মচারী, বিচারক প্রমুখ নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগের পরিবর্তে প্রথম কনসাল কর্তৃক নিযুক্ত করার ব্যবস্থা ছিল। প্রিফেক্ট প্রথার মাধ্যমে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে প্রদেশগুলির উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডাইরেক্টরীর যুগের প্রশাসনিক কাজকর্ম ছাড়াও প্রিফেক্টগণের দায়িত্ব সামরিক ব্যবস্থার সঙ্গেও যুক্ত হয় যেমন যুদ্ধের জন্য সেনাদল বা অশ্ব সংগ্রহ, যুদ্ধবন্দীদের দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ, যুদ্ধের জন্য অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে নিয়মিত কর আদায় ইত্যাদি। তবে নেপোলিয়নের দুর্দিনে এঁরা অনেকেই তাঁর প্রতি আনুগত্যহীনতা প্রকাশ করতে থাকেন। যেহেতু এঁদের কোন স্থানীয় ভিত্তি ছিল না, সেই কারণেই তাঁরা নেপোলিয়নের পতনের যুগে স্থানীয় শাসনকে রক্ষা করার পরিবর্তে বিপক্ষে চলে যেতে দ্বিধা করেননি।

নেপোলিয়ন কর্তৃক ফ্রান্সের আইন সংস্কার ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ফলাফল হয়েছিল স্থায়ী তিনি শাসনক্ষমতা গ্রহণের পর লক্ষ্য করেন যে বিপ্লব পরবর্তী এবং প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সে অনেক নূতন ও পুরাতন আইন বহাল ছিল। এছাড়া প্রদেশগুলির স্থানীয় আইন, চার্চের আইন, সামন্ততান্ত্রিক বিধিবিধান, রাজকীয় অনুশাসন ইত্যাদি সমন্বিত আইনব্যবস্থা বিশেষ জটিল আকার ধারণ করেছিল। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানসভার যুগে সমগ্র দেশের জন্য একই প্রকার আইন প্রচলনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। জাতীয় মহাসভা এই আইন রচনার কাজে হাত দিলেও তা অসমাপ্ত থেকে যায়। নেপোলিয়ন অনুভব করেন যে

একটি সুদৃঢ় প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন এক সুবিন্যস্ত আইনবিধি। এছাড়া ফরাসী বিপ্লবের মূল আদর্শ অর্থাৎ সামাজিক সাম্যকে স্বীকার করে ফ্রান্সে নতুন সমাজ গঠনের জন্যও ফরাসী আইনগুলির সুষ্ঠু সংকলন ও পরিমার্জন করা প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে নেপোলিয়ান আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে একটি বিশেষ কমিটি গছন করেন এবং এঁদের ওপর আইনবিধির মূল সূত্রগুলিকে স্থির করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে এঁদের প্রচেষ্টায় রচিত হল 'সিভিল কোড'। তারপর ফৌজদারী ও বাণিজ্যিক আইনবিধি এবং দণ্ডবিধি বা পেনাল কোড রচিত হয়। এই সমগ্র আইনবিধি ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়ে 'কোড নেপোলিয়ন' নামে পরিচিত হয়।

'কোড নেপোলিয়নের' ২২৮১টি ধারা ছিল (অনেকের মতে ২২৮৭টি ধারা)। এর প্রধান তিনটি অংশ ছিল দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং বাণিজ্যিক আইনবিধি। এই আইনবিধিতে প্রাচীন রোমান আইন এবং প্রচলিত ও বিপ্লবী যুগের উদারনৈতিক আইনবিধির সমন্বয় সাধন করা হয়। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, সম্পত্তির অধিকার, সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও সুযোগ লাভের অধিকার, সামন্ততান্ত্রিক বিশে, অধিকারের বিলুপ্তি, যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার, পরিবারে স্ত্রী ও সন্তানের উপর স্বামী বা পিতার কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা, রেজিস্ট্রী বিবাহ ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট হয়। যুক্তিবাদ ও প্রাকৃতিক আইনের সমন্বয়ে রচিত হয় ফৌজদারী আইনবিধি। অপরাধীর প্রতি নির্মম শাস্তিপ্রথা লোপ করা হয়। তবে নেপোলিয়নের এই আইনবিধিতে নারী স্বাধীনতা, শ্রমিকদের কাজের অধিকার, ন্যূনতম কাজের অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার ইত্যাদি স্বীকৃত হয়নি। তা সত্ত্বেও এই আইনবিধি ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের অর্থনৈতিক এবং রাজস্ব ব্যবস্থায় গভীর সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। সন্ত্রাসের শাসনের আমলে সাময়িকভাবে কিছুটা আর্থিক স্থায়িত্ব এলেও ডাইরেক্টরীর আমলে পুনরায় মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছিল। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের আর্থিক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সরকারি ব্যয় সংকোচ এবং নিজ সরকারি বাজেট পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ স্থির করে দেন নেপোলিয়ন। অর্থদপ্তরকে রাজস্ব এবং হিসাবরক্ষা (Audit) দপ্তর এই দু'ভাগে বিভক্ত করেন। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রেখে নতুন রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সরকারি উদ্যোগে সরাসরি কর আদায়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিপ্লবের যুগে অ্যাসাইনেট নামক কাগজী মুদ্রার প্রচলন আর্থিক সমস্যাকে জটিল করে তুলেছিল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স প্রতিষ্ঠা করে তার উপর মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বণিক ও শিল্পপতিদের ঋণদানের দায়িত্ব এই ব্যাঙ্কের হাতে থাকে। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যাঙ্কনোট প্রবর্তনের একচেটিয়া অধিকার এই ব্যাঙ্ক লাভ করলেও ব্যাঙ্কনোটের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়। পুনরায় সোনা ও রুপোর ধাতুমুদ্রাও প্রচলিত হয়।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সে অবাধ বাণিজ্যনীতির পরিবর্তে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যনীতির সমর্থক ছিলেন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষির অগ্রগতি, ফ্রান্সের পক্ষে সুবিধাজনক বাণিজ্য, যথেষ্ট পরিমাণ ধাতুর আমদানি ইত্যাদি নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য চেম্বার অফ কমার্স বা বণিক সংঘকে পুনর্গঠিত করেন। বাণিজ্যের উন্নতির জন্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নতুন নদীবন্দর ও স্থলপথ নির্মাণ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য

বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

নেপোলিয়নের ধর্মবিষয়ক সংস্কার বা Concordat ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য যে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের সংবিধানসভা 'সিভিল কনস্টিটিউশন অফ ক্লার্জির' মাধ্যমে চার্চকে জাতীয়করণ করে পোপের ক্ষমতা লোপ করা হয়েছিল যা ফ্রান্সের সঙ্গে পোপতন্ত্রের বিরোধ ও গৃহবিবাদকে অনিবার্য করে তোলে। ফরাসী ক্যাথলিকগণ এই আইন মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। এককথায় ধর্মীয় সমস্যার কোন সুনির্দিষ্ট সমাধান ফরাসী বিপ্লবের ফলে হয়নি। নেপোলিয়ন একথা অনুধাবন করেছিলেন যে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটা সুষ্ঠু ধর্মীয় ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এজন্য বিপ্লবী আমলের ধর্মীয় বিচ্ছেদের পরিবর্তে একটি বাস্তব সমাধান দরকার। তাঁর লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সে একটি স্বীকৃত ধর্ম হিসেবে যাই থাকুক না কেন তার লাগাম রাষ্ট্রের হাতে থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পোপ সপ্তম পায়াসের সঙ্গে একটি ধর্মমীমাংসা চুক্তি বা Concordat স্বাক্ষর করেন প্রধানত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে ফ্রান্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তির ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত হবে ক্যাথলিক ধর্ম। তবে তা থাকবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। অন্যান্য সকল ধর্মের প্রতি গৃহীত হবে সহিষ্ণুতার নীতি। পুরাতন বিশপদের পদত্যাগের পর সরকার কর্তৃক নতুন বিশপরা নিয়োজিত হবেন যাঁদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবেন পোপ। এই বিশপদের আধিপত্য থাকবে যাজকদের ওপর এবং যাজকরা সরকারের কাছে আনুগত্যের শপথ নেবেন। অপরদিকে পোপ চার্চের জমির রাষ্ট্রীয়করণ স্বীকার করে নেবেন। আরো বলা হয় যে পোপের কোন নির্দেশ ফ্রান্সে প্রচার করার জন্য সরকারি অনুমোদন প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার ওপরেও চার্চের নিয়ন্ত্রণ ফিরে আসে। তবে নেপোলিয়নের এই ধর্মমীমাংসা ফ্রান্সের ধর্মীয় বিরোধের সমাধান করতে পারে নি। একথা ঠিক যে এর মাধ্যমে নেপোলিয়ন নিজের ইচ্ছেমত যাজকদের ব্যবহার করতে পেরেছিলেন কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষ পর্যায়ে সম্রাটের প্রতি যাজকদের আনুগত্যের অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পোপতন্ত্র বা চার্চের সঙ্গে যে সুসম্পর্ক নেপোলিয়ন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাও ছিল ক্ষণস্থায়ী। ঐতিহাসিক ডেভিড টমশন তাই এই চুক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন যে এটি প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি আপস এবং অন্যান্য আপস রফার মতই এটি দুই পক্ষের উগ্রপন্থীদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ববিষ্যতের ফ্রান্সে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের জন্য নেপোলিয়নের ধর্মমীমাংসাকে অনেক ঐতিহাসিক দায়ী করে থাকেন।

নেপোলিয়নের শিক্ষাসংস্কার প্রসঙ্গে বলা যায় যে শিক্ষার ওপর চার্চের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের তিনি বিরোধী ছিলেন। বিপ্লবের কালে পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থা ফ্রান্সে ভেঙে পড়লেও কোন বিকল্প ব্যবস্থা তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। নেপোলিয়নের শিক্ষাসংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের প্রয়োজনে দক্ষ প্রশাসক এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী তৈরি করা। ফ্রান্সে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। নেপোলিয়নের আমলে প্রত্যেক কমিউনে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় এবং সেগুলিকে প্রিফেক্ট বা সাবপ্রিফেক্টের অধীনস্থ করা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এইসব বিদ্যালয়ে ভাষা, বিজ্ঞান ইত্যাদির বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়। এছাড়া ডাইরেক্টরীর যুগে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলির পরিবর্তে 'লাইসী' (Lycee) নামক কিছু বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় যেগুলি ছিল মূলত আধা-সামরিক বিদ্যালয়। নেপোলিয়ন সামরিক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিউনের ওপর দায়িত্ব থাকলেও চার্চ নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ও

ছিল। এই সকল বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দান করা হত ফলে এই শিক্ষাব্যবস্থা এবং সাধারণ বিদ্যালয়ের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল প্যারিস ইমপিরিয়াল ইউনিভার্সিটি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। এছাড়া কারিগরী শিক্ষা, সামরিক বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা বা শিক্ষকশিক্ষণের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। তবে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেননি নেপোলিয়ন। তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীন চিন্তার কোন স্থান ছিল না। সংবাদপত্র ও গ্রন্থ প্রকাশের স্বাধীনতা রদ হয়। সংবাদপত্রগুলি হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের প্রচারমাধ্যম। নাটক এবং নাট্যশালাগুলির ওপর পুলিশি নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। উচ্চশিক্ষাকে মূলত সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের জন্যই সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়।

নেপোলিয়ন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের সেবা এবং অন্যান্য যোগ্যতার জন্য 'লিজিয়ন অফ অনার' নামক বিশেষ সম্মান দানের ব্যবস্থা করেন। তবে এই ধরনের উপাধি দানের মাধ্যমে নেপোলিয়ন চেয়েছিলেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্য থেকে তাঁর প্রতি অনুগত এক নতুন অভিজাতশ্রেণি তৈরি করা। সামরিক এবং বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই তিনি এই ধরনের সম্মান দানের ব্যবস্থা করেন। এটি কার্যত বিপ্লবের সাম্যনীতির বিরোধী ছিল।

বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে নেপোলিয়ন বিচারকদের সরকার কর্তৃক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা প্রশাসনের হাতে না থাকায় বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা রক্ষিত হয়।

নেপোলিয়ন পুলিশ সংগঠনকে পূর্বের চেয়ে শক্তিশালী করলেও বিপ্লবের যুগের সামরিক সংগঠনকে তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। এছাড়া তাঁর আমলে বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করা হয়। ২২৯টি সামরিক রাস্তা, ইটালির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আল্পসের গিরিপথ ভেদ করে দু'টি রাস্তা, বহু প্রাসাদ, উদ্যান ইতাদি তাঁর আমলে নির্মিত হয়। লুভর জাদুঘরকে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাদুঘরে পরিণত করেন। নেপোলিয়ন দেশত্যাগীদের ('এমিগ্রী') প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করেছিলেন কারণ এঁরা বিদেশি সরকারগুলির সঙ্গে ফ্রান্স বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থেকে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছিল। তাই নেপোলিয়ন ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের একটি প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে এঁদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন বাতিল করেন, তাঁদের স্বদেশে ফিরে আসার আমন্ত্রণ এবং ধনসম্পত্তি ইতিমধ্যে বিক্রীত না হয়ে গেলে তা প্রত্যর্পণের আদেশ দেন।

নেপোলিয়নের সংস্কার কার্যে ফরাসী বিপ্লবের কিছু আদর্শ স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা এবং সাম্যের অধিকারের বিনিময়ে হরণ করা হয়েছিল রাজনৈতিক অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ফ্রান্সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে সুশাসন স্থাপনে নেপোলিয়নের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও সংস্কার কার্যগুলি ছিল স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৪.৬ ❐ নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি

(ক) প্রথম কনসাল রূপে নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি (১৭৯৯-১৮০৩ খ্রি.)

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন প্রথম কনসাল হিসেবে ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহণ

করেন তখন বৈদেশিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের সঙ্গে 'দ্বিতীয় শক্তিজোট' (Second Coalition)-এর যুদ্ধ চলছিল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এই জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল রাশিয়া, তুরস্ক, অস্ট্রিয়া এবং ইংল্যান্ড। নেপোলিয়নের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'দ্বিতীয় শক্তিজোট'-এর ধ্বংস সাধন। উল্লেখযোগ্য যে, এ সময় শক্তিজোটের মধ্যে ঐক্যের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। নেপোলিয়ন চেয়েছিলেন সামরিক শক্তির সাহায্যে দ্বিতীয় শক্তিজোটকে পরাজিত করে অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সুদক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ফ্রান্সে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে। বলা বাহুল্য, তাঁর এই দু'টি উদ্দেশ্যই সাফল্য লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোটের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন নেপোলিয়ন প্রথম কনসালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে এসময় তাঁর প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা। নেপোলিয়ন রুশ জার পলকে মাল্টা প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি দিলে জার প্রাশিয়া, সুইডেন এবং ডেনমার্ক সহ একধরনের 'সশস্ত্র নিরপেক্ষতা' অনুসরণ করতে রাজি হন। ফলে দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোটে মূল শক্তি হিসেবে থাকে অস্ট্রিয়া এবং ইংল্যান্ড। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিমুখী আক্রমণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। একটি সরাসরি দানিয়ুব উপত্যকার মধ্য দিয়ে সেনাপতি মরিউ-র নেতৃত্বে এবং দ্বিতীয়টি ইটালির মধ্য দিয়ে নেপোলিয়নের নেতৃত্বে। ১৮০০ খ্রি. নেপোলিয়ন তাঁর দ্বিতীয় ইটালি অভিযানে সামিল হন। ম্যারেঙ্গোর যুদ্ধে নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করেন। অপরদিকে মরিউ-র কাছে অস্ট্রিয়া হোহেনলিন্ডেন-এর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নেপোলিয়নের সঙ্গে লুনেভিলের সন্ধি (ফেব্রুয়ারি ১৮০১) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধির মাধ্যমে অস্ট্রিয়া পূর্বের ক্যাম্পোফোর্মিওর সন্ধির শর্তগুলি পুনরায় স্বীকার করে নেয়। এছাড়া উত্তর ইটালির লাইগুরিয়ান এবং সিজালপাইন প্রজাতন্ত্র, সুইজারল্যান্ডের হেলভেশীয় প্রজাতন্ত্র এবং হল্যান্ডে বাটাভিয়ান প্রজাতন্ত্রের ওপর ফরাসী প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। রাইন নদীর বাম তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ এবং বেলজিয়ামের ওপর ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই সময়ই উত্তর ইটালিতে ফরাসী সাফল্য পোপ সপ্তম পায়াসকে নেপোলিয়নের সঙ্গে আপসরফার পথে নিয়ে আসে। নেপোলিয়নও পোপের সঙ্গে একটি মীমাংসায় আসতে আগ্রহী ছিলেন। যার ফলশ্রুতি ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের ধর্মমীমাংসা বা Concordat।

অস্ট্রিয়ার পরাজয় সত্ত্বেও ইংল্যান্ড ফ্রান্সের শত্রুতায় রত থাকে। নেপোলিয়ন চেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের সঙ্গে একটি সমঝোতা করতে কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিট রাজী না থাকায় সে সমঝোতা হয়নি। অপরদিকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্যে উৎসাহিত নেপোলিয়ন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যত্র অভিযান প্রেরণ করে উপনিবেশ বিস্তারে উদ্যোগী হন। ফলে ইংল্যান্ডের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের সমঝোতার ক্ষেত্রে আর একটি বাধা ছিল মিশরের সমস্যা। ১৮০১ সালে ইংল্যান্ড কায়রো দখল করে নেয় যা নেপোলিয়নকে হতাশ করে। এই পরিস্থিতিতে একদিকে উদ্বিগ্ন ইংল্যান্ড ফ্রান্সের বাণিজ্য ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয় অপরদিকে নেপোলিয়ন ইউরোপের ভূখণ্ডে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক আধিপত্য নষ্ট করার জন্য স্পেন ও পর্তুগালের বন্দরগুলির সঙ্গে ইংল্যান্ডের বাণিজ্য বন্ধ করে দেন যা ছিল তাঁর বিখ্যাত মহাদেশীয় অবরোধপ্রথার পটভূমি। এছাড়া ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক শক্তি খর্ব করার জন্য নেপোলিয়নের উদ্যোগে ডেনমার্ক, রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং সুইডেনকে নিয়ে একটি সশস্ত্র নিরপেক্ষ জোট গঠিত হয়। ইংরেজ নৌসেনাপতি নেলসন কর্তৃক ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন বিধ্বস্ত হওয়ায় এবং রুশ জার পল নিজ দেশে নিহত হওয়ার এই জোটে ভাঙন ধরে। এই পরিস্থিতিতে রণক্লান্ত ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ১৮০২

খ্রিস্টাব্দে ২৫শে মার্চ 'এমিয়েন্সের চুক্তি' স্বাক্ষর করে যা ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে দীর্ঘযুদ্ধের অবসান ঘটায়। এই চুক্তিতে স্পেন ও হল্যান্ডও স্বাক্ষর করে। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে নেপোলিয়ন নেপল্স, মিশর ও পর্তুগাল থেকে এবং ইংল্যান্ড মিশর ও মাল্টা থেকে সৈন্য অপসারণে স্বীকৃত হয়। ইংল্যান্ড সিংহল ও ত্রিনিদাদ ব্যতীত সমস্ত বিজিত ঔপনিবেশিক অঞ্চল ফ্রান্স ও তার মিত্রপক্ষকে প্রত্যর্পণ করে। উল্লেখযোগ্য যে এমিয়েন্সের সন্ধি নেপোলিয়নের পক্ষে সম্মানজনক হলেও ইংল্যান্ডের জনগণ এই সন্ধিকে সমর্থন করেনি। এই সন্ধির ফলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংগঠিত দ্বিতীয় শক্তিজোটের অবসান ঘটলেও এই সন্ধি ছিল সাময়িক যুদ্ধবিরতি মাত্র। ফ্রান্সের পক্ষে ইংল্যান্ডের নৌশক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। অপরদিকে ইংল্যান্ডের পক্ষেও ইউরোপে ফরাসী প্রাধান্য মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের একত্র অবস্থান সম্ভব ছিল না। ইংল্যান্ড মাল্টা থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে অস্বীকৃত হলে ফ্রান্সও হল্যান্ড এবং পিডমন্ট থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে অস্বীকার করে। ফলে, ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দেই পুনরায় ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের যুদ্ধ শুরু হয়। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙক্ষা পরিস্ফুট হয় এবং বোঝা যায় যে শুধুমাত্র ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য নয়, আরো বড় স্বপ্ন নেপোলিয়ন দেখছেন তা হল ইউরোপ বিজয়ের স্বপ্ন।

(খ) ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট পদ গ্রহণের পর নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি

নেপোলিয়ন প্রথম কনসাল পদে নিজের ক্ষমতাকে দৃঢ় করার জন্য প্রথমে এক গণভোটের মাধ্যমে কনসালের কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করে দশ বছর করেছিলেন। তারপর ১৮০২ সালের মে মাসে সিনেট কর্তৃক সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তিনি যাবজ্জীবন কনসাল পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং সেইসঙ্গে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনয়নেরও অধিকার লাভ করেন। তবে নেপোলিয়নের প্রধান লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের সম্রাট পদ অর্জনের। ইতিমধ্যে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে রাজতন্ত্রপন্থীদের মাধ্যমে তাঁকে হত্যার প্রচেষ্টা করা হয়। নেপোলিয়ন কঠোরভাবে সেই ষড়যন্ত্র দমনের পর নিজের ক্ষমতার পূর্ণ কেন্দ্রীকরণ ঘটান। শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুগত সিনেট জাতীয় স্বার্থের অছিলায় নেপোলিয়নকে ফ্রান্সে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর পোপ ষষ্ঠ পায়াস কর্তৃক নোতরদাম গির্জায় নেপোলিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রান্সের সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন। ফ্রান্সে বিপ্লব পরবর্তীকালে পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

ফ্রান্সের সম্রাট পদ অর্জনই নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙক্ষার সমাপ্তিরেখা ছিল না। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল সমগ্র ইউরোপে একাধিপত্য স্থাপন। ১৮০৪ থেকে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস নেপোলিয়নের ক্ষমতার শীর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার ইতিহাস। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের পরে অবিরত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকলেও তখন থেকেই সূত্রপাত হয়েছিল নেপোলিয়নের পতনের।

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দেই নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ১৮০৪ খ্রি. স্পেন ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দিলেও নৌযুদ্ধগুলিতে ফ্রান্স ইংল্যান্ডের কাছে পরাজিত হতে থাকে। স্থলযুদ্ধে নেপোলিয়নের বাহিনী অপরাজেয় হলেও নৌশক্তিতে ব্রিটিশ বাহিনীর সমকক্ষ ছিল না। নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল স্পেনীয় নৌবহরের সাহায্যে ইংল্যান্ডকে নৌযুদ্ধে বিপর্যস্ত করা। কারণ নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙক্ষা চরিতার্থ

করার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল ইংল্যান্ড। ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের অনৈক্য তাঁকে আরও বেশি উচ্চাকাঙক্ষী করে তুলেছিল। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ছিল ঐক্যের অভাব। এমতাবস্থায় ইংল্যান্ডের পক্ষে ফ্রান্সবিরোধী রাষ্ট্রজোট গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। রুশ জার আলেকজান্ডার ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পিটের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। যার ফলশ্রুতি ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন। কয়েক মাস বাদে অস্ট্রিয়া এই কনভেনশনে যোগদান করে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে তৃতীয় রাষ্ট্রজোট যাতে সামিল হল ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া সুইডেন ও নেপলস। প্রাশিয়া সাময়িকভাবে নিরপেক্ষ থাকে। হ্যানোভার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়মকে রাষ্ট্রজোট থেকে দূরে রাখেন।

১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তৃতীয় রাষ্ট্রজোটের যুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি নেলসন ট্রাফালগারের যুদ্ধে ফ্রান্স ও স্পেনের যুগ্ম নৌবাহিনীকে পরাস্ত করেন। এই পরাজয় নেপোলিয়নের সরাসরি ইংল্যান্ড আক্রমণের পরিকল্পনা বিনষ্ট করে। কিন্তু স্থলযুদ্ধে নেপোলিয়ন ছিলেন অপরাজেয়। উল্লেখযোগ্য যে ট্রাফালগারের যুদ্ধের পরেই নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা' গ্রহণ করেন।

তৃতীয় রাষ্ট্রজোট ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়া আক্রমণ করেন। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে উল্ম এবং অস্টারলিজের যুদ্ধে পরাজিত অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে প্রেসবার্গের সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য হল (১৮০৫ খ্রি.)। এই সন্ধির মাধ্যমে অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস ইতালীর ভেনিসিয়া ফ্রান্সকে এবং টাইরল ব্যাভেরিয়াকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন এবং উর্টেমবার্গকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিশাল ক্ষতিপূরণ লাভ করে ফ্রান্স এবং জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য সঙ্কুচিত হয়। অস্ট্রিয়ার পরাজয় প্রাশিয়াকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তৃতীয় রাষ্ট্রজোটের বাইরে নিরপেক্ষ থাকার জন্য প্রাশিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়নের চুক্তি দীর্ঘস্থায়ী হল না। নেপোলিয়নের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং প্রাশিয়াকে তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত করার প্রচেষ্টা দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করে। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন প্রাশিয়াকে ক্লীভস্ প্রত্যর্পণে বাধ্য করেন এবং প্রাশিয়ার বন্দরগুলি যাতে ইংল্যন্ড ব্যবহার করতে না পারে এজন্য চাপ সৃষ্টি করেন। উপরন্তু জার্মানিতে 'কনফেডারেশন অফ রাইনে'র প্রতিষ্ঠার ফলে প্রাশিয়া জার্মানিতে স্বীয় প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় আশঙ্কিত হয়ে ওঠে। সর্বোপরি, নেপোলিয়ন ইংল্যন্ডকে হ্যানোভার অর্পণ করতে চাইলে প্রাশিয়ার সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়মের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। প্রাশিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে জেনা এবং অস্টাউট-এর যুদ্ধে প্রাশিয়া পরাজিত হয় এবং নেপোলিয়ন বার্লিন অধিকার করেন। প্রাশিয়া নেপোলিয়নের সঙ্গে স্কনব্রনের (Schonbron) সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। এই সন্ধি ইউরোপে প্রাশিয়ার মর্যাদাহানি করে।

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার পরাজয়ের পর নেপোলিয়ন তৃতীয় রাষ্ট্রজোটের অপর সদস্য রাশিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। অস্টারলিজের যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মিলিতভাবে রাশিয়া নেপোলিয়নের কাছে পরাজিত হলেও রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য এ সময় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ্য হলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে সমঝোতার অভাব, অস্টারলিজের যুদ্ধে পরাজয়ের পর অস্ট্রিয়ার দুর্বলতা, ইংল্যান্ডের স্বার্থপর মনোবৃত্তি তাদের ঐক্যবদ্ধ হবার

পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল, যাই হোক, প্রথমে আইলাউ (Eylau)-এ খণ্ডযুদ্ধে কোন জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হবার পর রাশিয়া শেষ পর্যন্ত ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রীডল্যান্ডের যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডার নেপোলিয়নের সঙ্গে টিলসিটের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির ফলে রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। নেপোলিয়ন ইউরোপে যে সকল রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন করেছিলেন তা রুশ জার মেনে নেন। রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধের অবসানের জন্য ফ্রান্সের মধ্যস্থতা গ্রহণে রাশিয়া স্বীকৃত হয়। সবচেয়ে ক্ষতি হল রাশিয়ার। তার কাছ থেকে যে রাজ্যাংশ অধিকৃত হল তার মধ্যে থেকে পশ্চিমপ্রান্তে সৃষ্টি করা হল ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্য এবং সেখানকার শাসক হিসেবে বসানো হল নেপোলিয়নের ভাই জেরম বোনাপার্টকে। আর জার্মানির পূর্ব প্রান্তে গঠিত হল গ্র্যান্ড ডাচি অফ ওয়ারশ। এটি স্যাক্সনিকে দেওয়া হল। নেপোলিয়ন এবং রুশ জারের গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্থির হল যে পশ্চিম ইউরোপে নেপোলিয়নের এবং পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধে রাশিয়া ফ্রান্সকে সমর্থন করবে। টিলসিটের সন্ধির মাধ্যমে রাশিয়াকে যেমন কোন ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি তেমনি এই সন্ধি ছিল নেপোলিয়নের ক্ষমতার সর্বোচ্চ বিন্দু। ১৮০৭ সালেই নেপোলিয়নের ক্ষমতার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে বেলজিয়াম, স্যাভয়, নিস, জেনোয়া, ডালমেশিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া যুক্ত হয়েছিলব। এছাড়া তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসেবে ছিল হল্যান্ড, ওয়েস্টফেলিয়া, কনফেডারেশন অফ রাইন, ইটালি, গ্র্যান্ড ডাচি অফ ওয়ারশ এবং সুইজারল্যান্ড আর মিত্ররাষ্ট্ররূপে ব্যাভেরিয়া, উরটেনবার্গ, ডেনমার্ক, সুইডেন, স্পেন, রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার অস্তিত্ব নেপোলিয়নকে প্রায় সমগ্র ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছিল।

(গ) নেপোলিয়ন কর্তৃক ইউরোপের পুনর্গঠন

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সামরিক সাফল্য এক নতুন ইউরোপের জন্ম দিয়েছিল, যে ইউরোপ গড়ে উঠেছিল নেপোলিয়নের প্রতি আনুগত্যের ওপর ভিত্তি করে। ইউরোপের যে দু'টি অঞ্চলে নেপোলিয়নের সামরিক বিজয়ের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়েছিল সেগুলি হল ইটালি এবং জার্মানি। এই দু'টি অঞ্চলই বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং দু'টি দেশের ওপরেই অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্বার্গ বংশের প্রভাব ছিল।

ইটালির লোম্বার্ডিকে ভিত্তি করে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল 'সিজালপাইন প্রজাতন্ত্র'। তবে এই প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ভেনিসকে যুক্ত না করে অস্ট্রিয়ার হাতে অর্পণ করা হয় এবং পিডমন্ট ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ঐ প্রজাতন্ত্রকে 'ইটালীয় প্রজাতন্ত্র' এবং ১৮০৫ খ্রি তাকে ইটালীয় রাজ্যে (Kingdom of Italy) রূপান্তরিত করা হয়। নেপোলিয়ন 'ইটালির রাজা' উপাধি ধারণ করেন এবং তাঁর সৎপুত্র (স্ত্রী জোসেফিনের প্রথম পক্ষের সন্তান) ইউজিনের ওপর উত্তর ইটালির শাসনভার অর্পিত হয়। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই রাজ্যের সীমা আরও বর্ধিত হয়ে অ্যাড্রিয়াটিক উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ভেনিস, আনকোনা ও ট্রেনটিনোকে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে। ১৮০৫ থেকে ১৮০৯-এর মধ্যে জেনোয়া, পার্মা, পিয়াসেনজা, টাস্কানি এবং পোপের রাজ্য নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। নেপলসে তাঁর ভ্রাতা জোসেফকে

শাসনভার অর্পণ করা হয়। পরবর্তীকালে জোসেফ স্পেনের শাসক নিযুক্ত হলে নেপলসের রাজা হন নেপোলিয়নের ভগ্নিপতি ও বিশ্বস্ত সেনানায়ক মুরাত। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী মারী লুইসের শিশুপুত্রকে 'রোমের রাজা' (King of Rome) উপাধিতে ভূষিত করেন।

ডাইরেক্টরীর আমল থেকে নেপোলিয়ন তাঁর জয় করা ইটালির অংশবিশেষে নব্য শাসন ও সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। পরবর্তীকালে 'ইটালি রাজ্য' গঠনের পর সেখানে চালু করা হয় 'কোড নেপোলিয়ন'। নেপোলিয়নের সংস্কার এখানকার জনগণকে এক উন্নত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করেছিল। ইটালিতে সামন্ততন্ত্রের অবসান, ভূমিদাসপ্রথার বিলোপ, করভারের সুষম বণ্টন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, একই শুল্ক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন, বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবসান এবং চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মাধ্যমে পুরাতনতন্ত্রকে উচ্ছেদের পথ পবিষ্কার করা হয়েছিল। তবে ইটালিতে চার্চের যে জমি বিক্রয় করা হয়েছিল তা শুধুমাত্র ধনী ব্যক্তিরাই কিনতে পেরেছিলেন। দরিদ্র কৃষকরা এর ফলে আদৌ লাভবান হয়নি। ঐতিহাসিক জর্জ রুডে দেখিয়েছেন যে এর ফলে ধনী কৃষক বা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দরিদ্র কৃষকদের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে নেপোলিয়ন প্রধানত সামরিক শক্তির সাহায্যেই ইটালিতে আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।

জার্মানিতে নেপোলিয়নের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ার প্রভাব ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ। এসময় জার্মানি প্রায় তিনশটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং জার্মানির ওপর অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার প্রভাব ছিল। নেপোলিয়ন জার্মানিকে পুনর্গঠন করার সময় এই দুই শক্তির প্রাধান্যনাশের ব্যবস্থা করেন। তিনশটি রাজ্যে বিভক্ত জার্মানিকে ঊনচল্লিশটি রাজ্যে বিভক্ত করে নেপোলিয়ন জার্মান মানচিত্রের সরলীকরণ করেন। তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য ছিল জার্মানিকে ফ্রান্সের একটি তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত করা। জার্মান রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন দান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ক্যাম্পোফোর্মিও ও লুনভিলের সন্ধি অনুযায়ী নেপোলিয়ন রাইন নদীর পশ্চিমতীর পর্যন্ত জার্মান ভূখণ্ড ফ্রান্সের অধীন করেছিলেন। এই সমস্ত অঞ্চলে যে সকল বিশপ অধীনস্থ রাজ্য ছিল তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। একমাত্র বংশানুক্রমিক রাজাদেরই ক্ষতিপূরণ দানের কথা ঘোষণা করা হয়। আর রাইন নদীর পূর্ব তীরস্থ বিশপশাসিত রাজ্য বা স্বায়ত্তশাসিত শহরগুলিকে লোপ করে সেই সকল ভূখণ্ডের মাধ্যমে রাইন নদীর পশ্চিম তীর থেকে উৎখাতপ্রাপ্ত বংশানুক্রমিক রাজাদের পুনর্বাসিত করা হয়। এইভাবে তিনশটি রাজ্যে বিভক্ত জার্মানি ঊনচল্লিশটি 'কনফেডারেশন অফ রাইন'-এ পরিণত হয়। প্রথমে ষোলটি ও পরে আঠারোটি জার্মান রাজ্যের শাসকবৃন্দ এই কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ফরাসী রক্ষণাধীনে চলে আসে। প্রথম দিকে জার্মানির ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন এবং উর্টেমবার্গের শাসকরা এবং পরে স্যাক্সনি এতে যোগ দেয়। এই সংগঠনের ফলে জার্মানী থেকে অস্ট্রিয়ার প্রভাব লোপ পায়। উত্তরে ম্যাকলেনবার্গ থেকে দক্ষিণে টাইরল পর্যন্ত এই কনফেডারেশন বিস্তৃত ছিল। এরা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিন্ন করে নেপোলিয়নকে কনফেডারেশনের 'প্রোটেক্টর' হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ৬ই আগস্ট অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ সম্রাট ফ্রান্সিস তাঁর পবিত্র রোমান সম্রাট উপাধি ত্যাগ করেন।

জার্মানি থেকে প্রাশিয়ার প্রভাব দূর করার জন্য নেপোলিয়ন ১৮০৭ থেকে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এলব্ নদীর পশ্চিম তীরবর্তী হ্যানোভার, বানস্‌উইক, হেসক্যাসেল ও রাইনের প্রদেশ নিয়ে ওয়েস্টফেলিয়া

রাজ্য গঠন করে নিজ ভ্রাতা জেরোমকে সেখানকার শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাল্টিক সাগর পর্যন্ত জার্মান প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইটালির মতো জার্মানীতেও নেপোলিয়ন তাঁর সংস্কার প্রবর্তন করেন। সামন্তপ্রথা ও ভূমিদাস প্রথার অবসান, কোড নেপোলিয়ন প্রচলন, ধর্মসহিষ্ণুতা, ইহুদিদের নাগরিক অধিকার দান, সামাজিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা, বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জার্মানির একাংশে রাজনৈতিক এবং কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হওয়ার প্রভাব পরবর্তীকালের জার্মান ঐক্য আন্দোলনের ওপর পড়েছিল।

প্রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত পোল্যান্ডকে নিয়ে নেপোলিয়ন 'গ্র্যান্ড ডাচি অফ ওয়ারশ' গঠন করে স্যাক্সনির শাসকের ওপর তার দায়িত্ব দেন। ফলে, রাশিয়া এবং নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের মধ্যে এক অন্তর্বর্তী রাষ্ট্র গঠন সম্পন্ন হয়। এখানেও আধুনিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সামন্ততন্ত্রের অবসান ও সামন্ত কর লোপ করা হয়।

সুইজারল্যান্ডে হেলভেশীয় প্রজাতন্ত্রের স্থানে সুইস কনফেডারেশন স্থাপন করা হয়। বেলজিয়ামকে ফরাসী সীমানাভুক্ত করা হয়। ১৮০৪ খ্রি, হল্যান্ডে বাটাভিয়া প্রজাতন্ত্রকে হল্যান্ডের রাজ্য রূপে প্রতিষ্ঠা করে নেপোলিয়নের ভ্রাতা লুইকে সেখানকার শাসনাধিকার দান করা হয়। প্রাশিয়ার ভগ্নাংশ নিয়ে সৃষ্টি করা হয় গ্র্যান্ড ডাচি অফ বার্গ। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের বিস্তার দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল। ১৩০টি ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন এলাকার বাইরে বিভিন্ন সহযোগী রাজ্য ও করদ রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। এইসব রাজ্যে নেপোলিয়নের আত্মীয়স্বজন, বিশ্বাসভাজন ও অনুগত ব্যক্তিরা শাসনের দায়িত্বে ছিলেন। খণ্ড খণ্ড রাজ্য সমন্বিত তাঁর 'Grand Empire' কে নেপোলিয়ন একই ধরনের প্রশাসনিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মাধ্যমে একসূত্রে গ্রথিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। দ্রুত সংস্কারের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন মধ্যবিত্ত ও কৃষক সমাজকে। কারণ এঁরাই ছিলেন তাঁর সাম্রাজ্যের প্রধান শক্তি। পুরাতনতন্ত্রের পরিবর্তে ইউরোপে আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল নেপোলিয়নের সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে। সুগম হয়েছিল জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পথ।

(ঘ) মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে টিলসিটের সন্ধির পর নেপোলিয়নের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে থেকে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ট্রাফালগারের যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় তাঁর মনে এই বিশ্বাসকে স্থিত করেছিল যে, নৌশক্তিতে বলীয়ান ইংল্যান্ডকে দমন করার জন্য বিকল্প পন্থা অনুসরণ করা প্রয়োজন। ইংল্যান্ডের শক্তির প্রধান উৎস ছিল তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং বাণিজ্যসম্পদ। ইউরোপের দেশগুলি ছিল ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্যের প্রধান ক্রেতা। ইউরোপের বন্দরসমূহে ব্রিটিশ পণ্যের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ করে দিলে ভেঙে পড়বে ইংরেজ অর্থনীতি। চাহিদার অভাবে কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেলে এবং শিল্প শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়লে ইংলন্ডের অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে যাবে। অপরদিকে খাদ্যসামগ্রীর জন্য ইউরোপের ওপর নির্ভরশীল ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হলে সে দেশে খাদ্যাভাব ও অসন্তোষ রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করবে। অপরদিকে ইংল্যান্ডকে তার বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত করলে ইউরোপের বিশাল বাজার

ফ্রান্সের করায়ত্ত হবে। ফলে বিপুল চাহিদা মেটানোর জন্য ফ্রান্সে শিল্পোদ্যোগের প্লাবন আসবে। ব্রিটিশ বাণিজ্যের শূন্যস্থান ফ্রান্স তার রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে পূর্ণ করবে। ফলে ফরাসী অর্থনীতি আরো সংহত হবে। শিল্পায়ন ও বাণিজ্যের বিস্তার ফ্রান্সে এক নব্য পুঁজিপতি বুর্জোয়াশ্রেণির আবির্ভাব ঘটাবে যারা হবে নেপোলিয়নের স্বৈরতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক। এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে শিল্পায়নের প্রচেষ্টাও শুরু করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে ইংল্যান্ডের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে ফরাসী অর্থনীতির বিকাশ সাধনও নেপোলিয়নের লক্ষ্য ছিল।

নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ চালু করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তাই-ই মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা নামে পরিচিত। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন বার্লিন ডিক্রি জারী করে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপর নৌঅবরোধ শুরু করেন। বলা হয় ফ্রান্স বা তার মিত্রদেশ অথবা নিরপেক্ষ দেশের বন্দরগুলিতে ইংল্যান্ডের কোন জাহাজকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না এবং ইংল্যান্ডের কোন পণ্য এই সমস্ত বন্দরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হবে। অন্য কোন দেশের জাহাজের মারফত ইংল্যান্ডের কোন পণ্যদ্রব্য এইসব দেশে এলে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে। রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া এই নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে রাজি হয়। বার্লিন ডিক্রির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যান্ডের বাণিজ্য ধ্বংস করে তাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা।

বার্লিন ডিক্রির প্রত্যুত্তরে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড 'অর্ডারস ইন কাউন্সিল' নামক ঘোষণার মাধ্যমে ফ্রান্স ও ইউরোপের বিরুদ্ধে পাল্টা অবরোধ জারী করে। এতে বলা হয় যে ইউরোপীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য সমস্ত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত শুল্ক দিয়ে লাইসেন্স নিতে হবে। এই আদেশ লঙঘন করা হলে ঐ সমস্ত দেশের জাহাজকে বাজেয়াপ্ত করা হবে। অর্ডারস ইন কাউন্সিলের প্রত্যুত্তরে নেপোলিয়ন ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে 'মিলান ডিক্রি' জারী করে ঘোষণা করেন যে যে সমস্ত জাহাজ অর্ডারস ইন কাউন্সিল অনুযায়ী ইংল্যান্ডের কাছ থেকে লাইসেন্স নেবে তাদের ব্রিটিশ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করা হবে। নেপোলিয়ন এরপর 'ওয়ারশ ডিক্রি' এবং 'ফন্টেনব্লু ডিক্রি' জারী করে বলেন যে ব্রিটিশ সম্পত্তি হিসেবে ফ্রান্স যে সমস্ত জাহাজের পণ্যদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করবে তা প্রকাশ্যে অগ্নিদগ্ধ করা হবে। নেপোলিয়নের এই সমস্ত আদেশনামাকেই একত্রে 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা' বা Continental System নামে অভিহিত করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অর্থনৈতিক অবরোধের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের ক্ষমতা খর্ব করার পরিকল্পনা নেপোলিয়নের পূর্বেও ফ্রান্সে করা হয়েছিল। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সে বিপ্লবের সময় ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ডাচ নৌশক্তির সঙ্গে এক চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপীয় মহাদেশে ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রীর বিক্রয় নিষিদ্ধ করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে হ্যানোভার দখলের পর এলব্ ওয়েজার নদীতে ব্রিটিশ পণ্য বহনকারী জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। তবে এগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা। নেপোলিয়ন প্রথম ব্যাপক ও সুপরিকল্পিতভাবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন। এবিষয়ে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়নের সেনাপতি মন্টজেলার্ড সম্রাটের কাছে অর্থনৈতিক অবরোধের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের শক্তিনাশের প্রস্তাব দিয়ে ছিলেন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করে থাকেন। যাইহোক ১৮০৬-০৭-এ নেপোলিয়নের বিস্ময়কর সামরিক সাফল্য এবং প্রায় সমগ্র ইউরোপে ক্ষমতা বিস্তার নেপোলিয়নের মানসিকতায় এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে যে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জারী করলে ইউরোপীয় দেশগুলির সমর্থন তিনি পাবেন এবং ইংল্যান্ডকেও পর্যুদস্ত করা যাবে।

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা জারী করার পর প্রাথমিক পর্যায়ে ফ্রান্সের সাফল্য পরিলক্ষিত হয়। নেপোলিয়ন ইউরোপের দেশগুলিকে মহাদেশীয় অবরোধ মান্য করতে বাধ্য করেন। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাশিয়া, টিলসিটের সন্ধির পর ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডার, ১৮০৯-এ অস্ট্রিয়ান সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস প্রমুখ মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা মান্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রাথমিক পর্বে ইংল্যান্ডকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ফরাসী বেসরকারী যুদ্ধ জাহাজগুলি ইংল্যান্ডের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি করে। ব্রিটিশ লাইসেন্সধারী নিরপেক্ষ দেশের বহু জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৮০৮ খ্রি. নাগাদ ব্রিটিশ বাণিজ্য অনেকটাই হ্রাস পায়। বেকারী বৃদ্ধি, অর্থ সমস্যা, শিল্পোৎপাদন হ্রাস ইংল্যান্ডকে ভীত করে তোলে। ১৮০৮ ও ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ফসল উৎপাদনে মন্দা ইংলন্ডে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করে। ফলে সেখানে খাদ্যের দাবীতে দাঙ্গা শুরু হয়। নেপোলিয়ন কিন্তু এই অবস্থার সুযোগ নেননি। এছাড়া আমেরিকার সঙ্গে বিভিন্ন কারণে এই সময় ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। অর্ডারস ইন কাউন্সিল জারী করার ফলে আমেরিকা বিশেষ ক্ষুব্ধ হয় এবং ব্রিটিশ পণ্য আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। মহাদেশীয় অবরোধের পাশাপাশি মার্কিন শত্রুতা অর্জনের সম্ভাবনা ইংল্যান্ডের কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। ইউরোপীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ার ফলে ইংল্যান্ড বাধ্য হয়েছিল অর্ডারস ইন কাউন্সিলের কঠোরতা শিথিল করতে। ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যরত দেশের জাহাজগুলিকে অবাধে লাইসেন্স বিতরণ করা হতে থাকে। ১৮১০ থেকে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নেপোলিয়ন মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কঠোরভাবে কার্যকর করেছিলেন। তবে ১৮১০-১১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে গমের অভাব দেখা দিলে নেপোলিয়ন ইউরোপ থেকে ইংল্যান্ডে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে তার উপর কঠোর চাপ সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু নেপোলিয়ন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেননি। ইংল্যান্ডে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে সেখানকার মানুষদের দুর্দশা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। তিনি হল্যান্ড এবং ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে গম রপ্তানির ব্যবস্থা করেন। ১৮১০-১১ সালে ইউরোপ থেকে গমের সরবরাহ ইংল্যান্ডকে খাদ্যাভাব থেকে রক্ষা করেছিল। এছাড়া মহাদেশীয় অবরোধের ফলে ফরাসী খাদ্য ব্যবসায়ীদের কাছে সঞ্চিত খাদ্যশস্য বাণিজ্যের অভাবে পড়ে থাকছিল। ফলে ফরাসী বণিকগোষ্ঠীর ক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডে খাদ্য রপ্তানি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে ঐতিহাসিক মার্কহ্যামের মতে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে ইংল্যান্ডকে নতি স্বীকার করানো সম্ভব ছিল না। কারণ ইউরোপ থেকে আমদানি করা গম ইংল্যান্ডের প্রয়োজনের তুলনায় অল্প ছিল। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইংল্যান্ডে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে খাদ্য সমস্যার কিছুটা উন্নতি হয়। এছাড়া ইংল্যান্ড ইউরোপের বাজারের পরিবর্তে ইউরোপ বহির্ভূত বাজারের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। বুয়েনেস এয়ার্স, ব্রাজিল, নিকট প্রাচ্য, তুরস্ক এবং বালটিক অঞ্চলের সঙ্গে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এছাড়া মাল্টা ও হেলিগোল্যান্ড থেকে প্রাশিয়া, হল্যান্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ইংরেজ বণিকগণ অবৈধ বাণিজ্যিক সম্পর্ক চালাতে থাকে। এছাড়া ফ্রান্সের তুলনায় ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল অনেক উন্নত। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য যে কঠোরতা প্রয়োজন ছিল ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে রুশ অভিযানে ব্যর্থতার পর নেপোলিয়নের পক্ষে তা বজায় রাখা সম্ভবপর হয়নি।

নেপোলিয়নের মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা ফ্রান্স তথা ইউরোপে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা হ্রাসের এটি একটি বড় কারণ। নেপোলিয়ন চেয়েছিলেন ইউরোপে ইংল্যান্ডের বাজার ধ্বংস করে ফ্রান্সের জন্য তা দখল করা। প্রাথমিক পর্যায়ে ফরাসী সমাজ উৎসাহিত হয়েছিল কিন্তু ইউরোপের বাজারে ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্যের যা চাহিদা ছিল তা পূরণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল ফ্রান্সে দ্রুত শিল্পায়ন। কিন্তু ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দেখা যায় যে ইংল্যান্ডের অর্ডারস ইন কাউন্সিল জারী করার ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি থেকে ফ্রান্সে কাঁচামাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আশানুরূপ শিল্পায়ন সম্ভব হল না। শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর অভাবে ইউরোপের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। ১৮১০-১২ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কট ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণিকে নেপোলিয়নের বিরোধী করে তোলে। এই পরিস্থিতিতে এবং অনেকটাই ফরাসী জনগণের চাপে নেপোলিয়নকে শত্রু দেশে রপ্তানির জন্য লাইসেন্স বিক্রয় করতে হয়। সেক্ষেত্রেও শুধুমাত্র ফরাসী বণিকদের বিশেষ সুবিধে দেওয়ায় মিত্ররাষ্ট্রগুলি বিশেষত রাশিয়া, অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। স্পেন, পর্তুগাল এবং রাশিয়া ফ্রান্স বিরোধী হয়ে পড়ে। হল্যান্ডের বণিক সম্প্রদায়, সুইজারল্যান্ড এবং বাল্টিক অঞ্চলের দেশগুলি মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার ফলে নিদারুণ অসুবিধের মধ্যে পড়ে। প্রাশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডার ব্রিটেনের ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর থেকে সমস্ত বিধিনিষধে প্রত্যাহার করে নেন। পর্তুগাল মহাদেশীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকৃত হয়। প্রায় সমগ্র ইউরোপে নেপোলিয়ন বিরোধিতা বিস্তার লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা ব্রিটেনের চেয়ে ইউরোপ মহাদেশকেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। সমুদ্রবক্ষে ইউরোপের নিরপেক্ষ দেশগুলির বাণিজ্য জাহাজের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে পড়লে ব্রিটিশ জাহাজ বিশ্বের সর্বত্র পণ্যসামগ্রী বহন করে। ফলে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের এক অভূতপূর্ব বিস্তার লাভ করে। নেপোলিয়ন ভেবেছিলেন ব্রিটেনের বাণিজ্যিক প্রাধান্য থেকে মুক্তিলাভের জন্য ইউরোপ সাময়িক ক্ষতি স্বীকার করেও ঐক্যবদ্ধ থাকবে। কিন্তু ইউরোপের দেশগুলি ক্রমশই এই মুক্তির প্রতি আস্থা হারাচ্ছিল। ব্রিটিশ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে ফরাসী অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ যে একই জিনিস একথা ইউরোপের মানুষ বুঝতে পারছিল।

নেপোলিয়নের এই মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। প্রথমত ইংল্যান্ডের পণ্যসামগ্রীর রপ্তানি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজন ছিল এক শক্তিশালী নৌবহর যারা ইউরোপের উপকূলভাগে কড়া নজরদারি করতে পারবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ফ্রান্সের এটিরই অভাব ছিল। ফলে অবৈধভাবে চোরাপথে ব্রিটিশ পণ্য ইউরোপের বাজারে চালান হওয়া বন্ধ করার কোন ক্ষমতাই নেপোলিয়নের ছিল না। বরং চোরাচালানকে বৈধ রূপ দেবার জন্য তিনি 'exemption' এবং লাইসেন্সপ্রথা চালু করেছিলেন। এছাড়া ইংল্যান্ডের মত শিল্পোন্নত দেশের পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ছিল বিশ্বব্যাপী। ফ্রান্সের পক্ষে এই চাহিদা পূরণ করা আদৌ সম্ভব ছিল না। মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা কার্যকরী করতে গিয়ে নেপোলিয়ন ইউরোপকে তাঁর বিরোধী করে তুলেছিলেন। নেপোলিয়নের মিত্র রাজ্যগুলি যখন দেখল যে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং বন্দরগুলি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে তখন তারা মহাদেশীয় অবরোধ মানতে অস্বীকার করল এবং নেপোলিয়নের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠল। তাই বলা

যায় যে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা ছিল একটি দ্বিমুখী অস্ত্র যা এর প্রতিপক্ষের তুলনায় উদ্ভাবককেই বেশি আঘাত করেছিল।

(ঙ) উপদ্বীপের যুদ্ধ

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে গিয়ে নেপোলিয়ন 'উপদ্বীপের যুদ্ধে' জড়িয়ে পড়েছিলেন। 'মহাদেশীয় ব্যবস্থা' কার্যকরী করার জন্য স্পেন এবং আইবেরিয় উপদ্বীপের উপকূল অঞ্চলে ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল। নেপোলিয়ন অশা করেছিলেন যে স্পেনের সম্পদ ব্যবহার করে তিনি নবরূপে ফরাসী নৌবহরকে গড়ে তুলতে পারবেন যা না হলে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার সাফল্য সম্ভবপর ছিল না।

আইবেরিয় অঞ্চলে অন্যতম রাষ্ট্র পর্তুগালকে অধীনস্থ করার প্রচেষ্টা থেকেই উপদ্বীপের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রদ করার জন্য ও অঞ্চলের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহের ব্রিটিশ পণ্যবাহী জাহাজের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার এর প্রয়োজন ছিল। এখানকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ ছিল পর্তুগাল এবং স্পেন। নেপোলিয়ন ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র পর্তুগালের ওপর 'বার্লিন ডিক্রী' মেনে চলার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য পর্তুগাল নেপোলিয়নের নির্দেশ অমান্য করলে নেপোলিয়ন পর্তুগালকে ফ্রান্সের অধীনে আনার প্রচেষ্টা শুরু করেন। এ প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি স্পেনের সঙ্গে গোপন চুক্তির মাধ্যমে স্থির করেন যে ফ্রান্স এবং স্পেনের যুগ্ম বাহিনী পর্তুগাল আক্রমণ করে পর্তুগাল ও তার উপনিবেশসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। কারণ পর্তুগাল আক্রমণ করতে হলে ফরাসী বাহিনীর স্পেনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল। স্পেনের সামরিক শক্তি যে বিশেষ ছিল তা নয়। আর স্পেনের রাজা চতুর্থ চার্লসের দুর্বলতার সুযোগে সেখানে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তগত করেছিলেন রানীর প্রিয়পাত্র গোদয়। গোদয় এবং স্পেনের যুবরাজ ফার্দিনান্দের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইও শুরু হয়েছিল। পর্তুগালের দক্ষিণাংশ গোদয়কে দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে নেপোলিয়ন গোদয়কে নিজ পক্ষে আনেন। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে মার্শাল জুনোর নেতৃত্বে নেপোলিয়ন পর্তুগাল অভিমুখে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ফ্রান্স ও স্পেনের যুগ্ম বাহিনীর আক্রমণে পর্তুগাল পরাজিত হয় এবং মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা মেনে নিতে স্বীকৃত হয়।

পর্তুগাল দখলের জন্য ফরাসী বাহিনীকে স্পেন অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং সে সময় স্পেনের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট নেপোলিয়নকে স্পেন অধিকারে উৎসাহী করে তোলে। ফরাসী সৈন্যবাহিনী স্পেনে প্রবেশ করলে যুবরাজ ফার্দিনান্দ নেপোলিয়নের কাছে আবেদন করেন গোদয়কে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। কারণ গোদয় স্পেনীয় জনগণের কাছে আদৌ জনপ্রিয় ছিলেন না। ইতিমধ্যে স্পেনরাজ চতুর্থ চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করেন। স্পেনের এই অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের পূর্ণ সুযোগ নেন নেপোলিয়ন। ফরাসী বাহিনী স্পেনে প্রবেশ করে গোদয়কে কারারুদ্ধ করে এবং চার্লস ও ফার্দিনান্দ উভয়কেই ক্ষমতাচ্যুত করে স্পেন দখল সম্পূর্ণ করে। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন স্পেনের সিংহাসনে তাঁর ভ্রাতা জোসেফ বোনাপার্টকে অধিষ্ঠিত করেন।

নেপোলিয়নের স্পেন দখলের পরিকল্পনার পশ্চাতে যে শুধুমাত্র স্পেনের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট দায়ী

ছিল তা নয়। আরো অন্যান্য কারণও ছিল। প্রথমত ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের পর তাঁর উচ্চাকাঙক্ষা এবং ক্ষমতালোভ গগনচুম্বী হয়ে উঠেছিল। স্পেনের নৌবহরকে দখলে এনে নিজেকে আরো শক্তিশালী করে তোলার আকাঙক্ষা নেপোলিয়নের মনে জাগ্রত হয়েছিল বলে মনে করেন ঐতিহাসিক মার্কহ্যাম। নেপোলিয়নের ধারণা ছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত স্পেনীয় জনগণও তাঁকে মুক্তির দূত হিসেবে গ্রহণ করবে এবং স্পেনের মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদ করে আধুনিক সংস্কার প্রতিষ্ঠা বুর্জোয়া সম্প্রদায়কে তাঁর সমর্থকে পরিণত করবে। কিন্তু নেপোলিয়নের অহমিকা তাঁকে স্পেনীয় জনগণের মানসিকতা বুঝতে দেয়নি। স্পেনীয় জনগণের আশা ছিল নেপোলিয়ন জনপ্রিয় ফার্দিনান্দকে স্পেনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবেন এবং বিতাড়িত করবেন গোদয়কে। কিন্তু স্পেনের সিংহাসনে জোসেফকে বসানোর ফলে স্পেনীয় জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নেপোলিয়নকে প্রথম একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র জাতির জাতীয়তাবোধের বিরুধে দাঁড়াতে হয়।

১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে জোসেফ মাদ্রিদে পৌঁছবার পূর্বেই স্পেনে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। সেখান থেকে এই বিদ্রোহ স্পেনের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। স্পেনের প্রতিটি প্রদেশে প্রতিরোধের জন্য জনগণের সংগঠন বা 'জুন্টা' (Junta) গঠন করা হয়। এমনকি ইংল্যান্ডের কাছেও সাহায্যের আবেদন করা হয়। ফরাসী সেনাপতি মুরাত স্পেনীয় জনগণের প্রথম বিদ্রোহ দমন করলেও মাদ্রিদে উপস্থিত হওয়ার পরেই জোসেফকে গণপ্রতিরোধের চাপে স্পেন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ভিমিয়োরোর যুধে পরাজিত হয়ে মার্শাল জুনো পর্তুগাল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। স্পেনীয় আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয় ডিউক অফ ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে এক ইংরেজ বাহিনী পর্তুগালে উপস্থিত হলে। ইংরেজ বাহিনী পর্তুগালের রাজধানী লিসবন দখল করে। এই পরিস্থিতিতে নেপোলিয়ন স্বয়ং সসৈন্যে স্পেনে উপস্থিত হন। তিনি ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার জন মূরকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন। ইতিমধ্যে স্পেন কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার মোকাবিলা করার জন্য স্পেন ত্যাগ করেন। মার্শাল সুলের নেতৃত্বে ফরাসী বাহিনী স্যার জন মূরের কাছে পরাজিত হয়। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়েলিংটন পুনরায় লিসবনে ফরাসী সেনাপতি ভিক্তরকে পরাজিত করেন। নেপোলিয়ন ওয়াগ্রামের যুধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করার পর সেনানায়ক ম্যাসেনা-র নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী স্পেনে পাঠান। কিন্তু টরেস ভেড্রাসের রক্ষাব্যূহ ভেদ করা ফরাসী বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হল না। নেপোলিয়ন মস্কো অভিযান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ডিউক অফ ওয়েলিংটন ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে স্যালাম্যাঙ্কা এবং ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ভিক্টোরিয়ার যুধে ফ্রান্সকে বিপর্যস্ত করেন এবং স্পেন পরিত্যাগে বাধ্য করেন। নেপোলিয়নের স্পেন জয়ের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

স্পেনীয় অভ্যুত্থানের প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এই অভ্যুত্থানকে জাতীয় সংগ্রাম বলা সঙ্গত কিনা তাও বিতর্কিত। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন মনে করেন যে, স্পেনীয়দের আঞ্চলিক আনুগত্যের বন্ধন ছিল দৃঢ়। তারা নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সম্পর্কে গর্বিত ছিল। স্পেনের রাজতন্ত্র দুর্নীতিগ্রস্ত বা দুর্বল হলেও তারা ছিল রাজতন্ত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। ফলে নেপোলিয়ন কর্তৃক অবৈধভাবে স্পেন দখল তাদের ঐক্যবন্ধ করেছিল। সমকালীন ইংল্যান্ডে স্পেনের এই সংগ্রামকে স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় অভ্যুত্থান হিসেবেই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে উদারতাবাদ

কিংবা জাতীয়তাবাদের যে আদর্শ পরবর্তীকালের জাতীয় আন্দোলনগুলির প্রেরণা ছিল স্পেনের আন্দোলনে তা ছিল অনুপস্থিত। ফ্রান্সের বৈপ্লবিক মতাদর্শ বা জাতীয়তাবাদের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি স্পেনীয় অভ্যুত্থানের মূল শক্তি রক্ষণশীল কৃষক সম্প্রদায়। ফ্রান্সের মত শক্তিশালী বুর্জোয়া শ্রেণির অস্তিত্বও স্পেনে ছিল না বলেই মত প্রকাশ করেছিল ঐতিহাসিক জর্জ বুড়ে। এইজন্যই জাতীয়তাবোধ স্পেনে তেমন সক্রিয় ছিল না। সাধারণ কৃষক সমাজকে ধর্মগত বন্ধন ও জাত্যভিমান বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। বিপ্লবপ্রসূত আদর্শ বা জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব তাদের উপর ছিল না। আর এই গণ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিল যাজক সম্প্রদায়, চার্চের সম্পত্তির ওপর আক্রমণ যাঁদের ক্ষুব্ধ করেছিল। অভিজাতদের আশঙ্কা ছিল ফ্রান্সের উদারতন্ত্র তাঁদের বিশেষ অধিকার লোপ করতে পারে। জর্জ বূড়ের মতে, যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় এছাড়াও দেশপ্রেমিক উদারনৈতিক বুর্জোয়ারাও এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। ধর্মীয় বন্ধন ছাড়াও এক ধরনের ঐক্যবোধ ও দেশপ্রেম না থাকলে স্পেনীয়দের পক্ষে দীর্ঘ আন্দোলন চালানো অসম্ভব ছিল বলেই মনে হয়।

স্পেনের বা উপদ্বীপের যুদ্ধে নেপোলিয়নের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে বলা যায় যে স্পেনেই তিনি প্রথম এক জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। নেপোলিয়ন যদি ফার্দিনান্দকে স্পেনের সিংহাসনে বসিয়ে স্পেনের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট অবসানের প্রচেষ্টা চালাতেন তাহলে সম্ভবত রাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল স্পেনীয়দের সমর্থন পেতেন। কিন্তু বিদেশী জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা স্পেনীয়দের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল। অতিরিক্ত অহমিকা ও আত্মবিশ্বাস নেপোলিয়নকে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে দেয়নি, স্পেনীয়দের মানসিকতা তিনি বোঝেননি। এছাড়া স্পেনের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে সামরিক নেতাদের ওপর তিনি নির্ভর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। স্পেনের ভৌগোলিক পরিস্থিতি স্পেনবাসীর গেরিলা যুদ্ধের সহায়ক হলেও তা ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অনুকূল ছিল না। উপদ্বীপের যুদ্ধে নেপোলিয়নের ব্যর্থতা তাঁর গৌরব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের চিরশত্রু ইংল্যান্ড ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করার দুর্লভ সুযোগ অর্জন করে। 'স্পেনীয় ক্ষত' নেপোলিয়েনের শক্তি নিঃশেষিত করে দেয়। স্পেনের দৃষ্টান্ত সমগ্র ইউরোপে এক প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত করে যা প্রতিরোধ করা নেপোলিয়নের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

(চ) মস্কো অভিযান

নেপোলিয়নের পতনের চূড়ান্ত পর্ব সূচিত হয়েছিল তাঁর বহু আলোচিত রুশ অভিযানের মাধ্যমে। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের টিলসিটের চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মৈত্রী স্থাপিত হয়। কিন্তু এই চুক্তির ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। রুশ অভিজাত শ্রেণি এই চুক্তিকে সমর্থন করেনি। তাছাড়া নেপোলিয়ন এবং রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডার উভয়েরই লক্ষ্য ছিল কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করা। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার চুক্তি নেপোলিয়নকে সন্দিগ্ধ করেছিল। অপরদিকে ১৮১০ সালে নেপোলিয়ন ওল্ডেনবার্গ দখল করেন যা ছিল টিলসিটের চুক্তির পরিপন্থী। নেপোলিয়ন কর্তৃক 'গ্র্যান্ড ডাচি অফ ওয়ারশ' গঠন রাশিয়াকে অসন্তুষ্ট করে, কারণ এই ঘটনার মাধ্যমে নেপোলিয়ন রাশিয়ার

অধীনস্থ পোল্যান্ডের জাতীয়তাবাদকে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। এছাড়া জারের আশঙ্কা ছিল নেপোলিয়ন সম্ভবত স্বাধীন পোল্যান্ড গঠন করতে চান। রাশিয়া ও ফ্রান্সের সম্পর্কের অবনতির পেছনে আরো একটি কারণ ছিল মহাদেশীয় অবরোধ কার্যকরী করার জন্য নেপোলিয়নের রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করা। ১৮১০--১১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আর্থিক সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য জার প্রথম আলোকজনান্ডার তাঁর দেশের বন্দরগুলিকে নিরপেক্ষ বাণিজ্য জাহাজ সমূহের জন্য খুলে দেন। ফ্রান্স থেকে আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক স্থাপন করা হয়। ইংল্যান্ডে প্রস্তুত পণ্যসমূহের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। রাশিয়া ইংল্যন্ডের সঙ্গে নবরূপে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। জারের এই অসহযোগিতা নেপোলিয়নকে ক্ষুণ্ণ করে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্রান্সকে সাহায্য না করায় নেপোলিয়ন রাশিয়ার প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। এছাড়া নেপোলিয়ন জারের ভগ্নী ক্যাথরিনকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। অস্ট্রিয়ার রাজকন্যা মারি লুইসের সঙ্গে নেপোলিয়নের বিবাহও উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। প্রকৃতপক্ষে রুশ-ফরাসী মৈত্রী ভেঙে যাবার জন্য কোন বিশেষ একটি কারণ দায়ী ছিল না। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে। তবে ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে প্রথম আলেকজান্ডারের অনিচ্ছা নেপোলিয়েনের রুশ অভিযানের প্রধান কারণ বলে মনে করেন।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন মস্কো অভিযানের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য যে সময় তিনি নিয়েছিলেন তারমধ্যে আলেকজান্ডার সুইডেন ও তুরস্কের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে নিজশক্তি বৃদ্ধি করেন। ইংল্যান্ড রাশিয়াকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া নেপোলিয়নের সমর্থনে থাকলেও প্রয়োজনে তারা নেপোলিয়নের বিপক্ষে যোগ দিতে পারে এমন সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ছয় লক্ষ সৈন্যবাহিনীর 'Grand Army' সহ নেপোলিয়ন রাশিয়া অভিযান শুরু করেন। নেপোলিয়নের সৈন্যসংখ্যা রুশ বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি হলেও তা ছিল বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত। এই বাহিনীতে অর্ধেকের কম সৈন্য ছিল ফরাসী। ফলে তাঁর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ঐক্যবোধের অভাব ছিল। অপরদিকে সমগ্র রুশবাহিনী ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেপোলিয়েনর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। নেপোলিয়নের ধারণা ছিল তিনি সহজেই রুশ বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবেন। আর রাশিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ তাঁকে প্রাচ্যে প্রবেশের পথ খুলে দেবে, মহাদেশীয় অবরোধ পুনরায় চালু করা যাবে যার ফলশ্রুতি হবে ইংল্যান্ডের আত্মসমর্পণ।

চূড়ান্ত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নেপোলিয়নের বিশাল সৈন্যবাহিনী রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তবে রুশ সেনা নায়ক কুটুঝফ ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে বোরোদিনোর যুদ্ধে পরাজিত হলেও আত্মসমর্পণ করলেন না। পরিবর্তে রুশ বাহিনী খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শস্যক্ষেত প্রভৃতি অগ্নিদগ্ধ করে দেয় যাতে ফরাসী সৈন্যবাহিনী চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়। নেপোলিয়ন বিনা বাধায় মস্কোতে উপস্থিত হলেও জার প্রথম আলেকজান্ডার নেপোলিয়নের কাছে নতিস্বীকার করলেন না। ইতিমধ্যে রাশিয়ার ভয়ঙ্কর শীত নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীকে হতোদ্যম করে দেয়। ফরাসী বাহিনী পিছু হটতে থাকে। ক্রুদ্ধ কসাক ও কৃষকদের আক্রমণে বহু সৈন্য নিহত হয়। শেষপর্যন্ত নেপোলিয়নের বিশাল সৈন্যবাহিনীর মাত্র তিরিশ হাজার সৈন্য ফ্রান্সে ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

নেপোলিয়নের জীবনের সবচেয়ে ক্ষতিকর অভিযান হিসেবে রাশিয়া আক্রমণকে বর্ণনা করেছিল ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন। নেপোলিয়নের এই ব্যর্থতা ছিল স্বাভাবিক। রুশ শক্তিকে অবহেলা করে নেপোলিয়ন সুবিবেচনার পরিচয় দেননি। উপরন্তু ইংল্যান্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া সম্পূর্ণ করার পূর্বেই নেপোলিয়নের রুশ অভিযান ছিল মারাত্মক ভুল। রুশ যুদ্ধনীতি, জার আলেকজান্ডারের অনমনীয় মনোভাব, ফরাসী সৈন্যবাহিনীর পক্ষে রাশিয়ার প্রতিকূল জলবায়ু, খাদ্যাভাব, ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা, ফরাসী সৈন্যবাহিনী এবং তাদের সরবরাহ কেন্দ্রের মধ্যে বিশাল দূরত্ব নেপোলিয়নের ব্যর্থতার কারণ ছিল।

রুশ অভিযানের ব্যর্থতা নেপোলিয়নের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। এর ফলে নেপোলিয়নের অপরাজেয় ভাবমূর্তি আহত হয়েছিল। সক্রিয় হয়ে উঠেছিল নেপোলিয়নের বিরোধী শক্তিসমূহ। ইংল্যান্ড এবং রাশিয়া ইউরোপের দুই প্রান্তের দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রকে শত্রু করে রেখে নেপোলিনেয়র পক্ষে বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব ছিল না। তবে এই পরিস্থিতিতেও নেপোলিয়ন মনোবল হারাননি প্যারিসে ফিরে এসে নব উদ্যমেন সৈন্যবাহিনী গঠন করে তিনি পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। যদিও ফ্রান্সে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা ক্রমশই হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। আর নেপোলিয়ন অধিকৃত রাষ্ট্রগুলিতে নেপোলয়িন বিরোধী জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগ্রত হচ্ছিল।

৪.৭ ❐ নেপোলিয়নের বিরুধে মুক্তিযুদ্ধ ও নেপোলিয়নের নির্বাসন

রুশ অভিযানে নেপোলিয়নের ব্যর্থতা তাঁর বিরোধী পক্ষকে উজীবিত করে। ১৮০৮ সালে নেপোলিয়নের মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা মানতে পোপ অস্বীকার করায় তিনি পোপকে বন্দী করে পোপের রাজ্য অধিকার করেছিলেন। এর ফলে ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় নেপোলিয়নের ওপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়েছিল। নেপোলিয়ন শেষ পর্যন্ত পোপকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পোপের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলাকালীনই নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। প্রেসবার্গের সন্ধির অপমানজনক শর্ত মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। নেপোলিয়ন রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডারের সঙ্গে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে এরফুর্টের চুক্তির মাধ্যমে অস্ট্রিয়ার বিরুধে যুধে রাশিয়ার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হন। নেপোলিয়ন ওয়াগ্রামের যুধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করলেও তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা নেপোলিয়নের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৮০৯ সালে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে স্কনব্রনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে অস্ট্রিয়া ফ্রান্সকে ইলিরিয়া প্রদেশ এবং আরো কিছু অঞ্চল দিতে বাধ্য হয়।

নেপোলিয়নের রুশ অভিযানের ব্যর্থতা প্রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের সূত্রপাত করে। রাশিয়া থেকে নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তনের পর রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডার প্রাশিয়াতে উপস্থিত হয়ে জার্মান জাতির জাগরণের পটভূমি তৈরি করে দেন। প্রাশিয়ার বহিষ্কৃত সংস্কারপন্থী মন্ত্রী স্টেইনকে জার আলেকজান্ডার তাঁর পরামর্শদাতা রূপে নিয়োগ করে প্রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদী জাগরণের দায়িত্ব দেন। উল্লেখযোগ্য যে কোড নেপোলিয়ন ও অন্যান্য প্রগতিশীল সংস্কারের মাধ্যমে নেপোলিয়নই একসময় জার্মান ঐক্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। জার্মানির ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও জটিলতাও অনেকটা শিথিল করা হয়েছিল। সংস্কারপন্থী মন্ত্রী স্টেইন এবং হার্ডেনবার্গ প্রাশিয়ায় কিছু প্রগতিশীল সংস্কার শুরু করলে জার্মান জাতীয়তাবাদীদের

মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু নেপোলিয়ন স্টেইনকে ক্ষমতাচ্যুত করলে তিনি অস্ট্রিয়া হয়ে রাশিয়া যান এবং জার প্রথম আলেকজান্ডারের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মৈত্রীর ওপর জোর দেন।

রুশ অভিযানে নেপোলিয়নের ব্যর্থতা প্রাশিয়ায় জার্মান জাতীয়তাবাদীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে জার প্রথম আলেকজান্ডার প্রাশিয়ার সেনানায়ক ইয়র্কের সঙ্গে টুরুজেনের সন্ধির মাধ্যমে স্থির করেন যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়া ও সুইডেনের সঙ্গে প্রাশিয়া সহযোগিতা করবে। তার পরিবর্তে জেনার যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত অঞ্চল প্রাশিয়ার অধিকারে ছিল সেগুলি প্রাশিয়াকে প্রত্যর্পণ করা হবে। প্রাশিয়ার সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডরিক উইলিয়ম এই চুক্তি অনুমোদন করে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমেই জার্মান জনগণের মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়। কনফেডারেশন অফ রাইন ভেঙে দেওয়া হয়। জার্মানির সর্বত্র গণ অভ্যুত্থান শুরু হয়। প্রাশিয়ারাজ তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম বার্লিন ত্যাগ করে ব্রেসলু নগরে জার আলেকজান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই সুযোগে ফরাসী বাহিনী বার্লিন দখল করে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ক্যালিসের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে স্থির হয় যে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রাশিয়ার হৃত রাজ্যাংশ তাকে প্রত্যর্পণ করা হবে। এই পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হলে প্রথম দিকে ফরাসী বাহিনী সাফল্য লাভ করে। লুটজেন ও বাটজেনের যুদ্ধে নেপোলিয়ন প্রাশিয়া ও রাশিয়ার যুগ্ম বাহিনীকে পরাজিত করলেও ফরাসী সেনানায়কগণ শান্তির জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে এইসময় খাদ্যাভাব এবং রুশ ও প্রাশীয় সেনানায়কদের মতবিরোধ এবং উপর্যুপরি পরাজয় মিত্রপক্ষের মনোবল নষ্ট করেছিল। নেপোলিয়ন আরো কিছুদিন যুদ্ধ চালিয়ে গেলে সম্ভবত তাঁর জয়লাভ নিশ্চিত হত। কিন্তু ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তিনি মিত্রপক্ষের সঙ্গে প্লেস উইৎসের চুক্তি দ্বারা সাময়িক যুদ্ধ বিরতি মেনে নেন। নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল এই সুযোগে ফ্রান্স ও ইটালি থেকে আরো সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসা। কিন্তু এর ফলে মিত্রপক্ষ পুনরায় যন্ধ প্রস্তুতি শুরু করে এবং এই সময়ই (১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে) ইংল্যান্ডের উদ্যোগে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে 'চতুর্থ রাষ্ট্রজোট' গঠিত হয়। এই জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল ইংল্যান্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া।

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রাশিয়া ও রাশিয়ার যুগ্মবাহিনী অগ্রসর হয়। একই সঙ্গে উত্তর দিক থেকে সুইডেন এবং দক্ষিণদিক থেকে অস্ট্রিয়া ফ্রান্সকে আক্রমণ করে। নেপোলিয়ন চতুর্দিক থেকে শত্রুপক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হন। ড্রেসডেনের যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে তিনি লিপজিগে সরে আসেন। ইতিমধ্যে পোল্যান্ড মিত্রপক্ষে যোগদান করে। স্যাক্সনিও নেপোলিয়নের পক্ষ ত্যাগ করে মিত্রপক্ষে যোগদান করে। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বহুজাতির এই সংগ্রামকে জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ বা Battle of Nations বলা হয়। এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় তাঁর সাম্রাজ্যের ভাঙনকে ত্বরান্বিত করে। কনফেডারেশন অফ রাইন ভেঙে যায়। ওয়েস্টফেলিয়া থেকে বিতাড়িত করা হয় সেখানকার শাসক জেরোম বোনাপার্টকে, হল্যান্ড মুক্তি লাভ করে এবং উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ সে দেশের রাজা হিসেবে প্রত্যাবর্তন করেন। ডেনমার্ক মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। অস্ট্রিয়া পুনরায় টাইরল এবং ইলিরিয় প্রদেশগুলি দখল করে ভেনিসিয়া ও সুইজারল্যান্ড অধিকার করে। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সর্বত্র জাতীয় জাগরণ দেখা যায়।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিকের প্রচেষ্টায় মিত্রপক্ষ নেপোলিয়নকে 'ফ্রাঙ্কফোর্ট প্রস্তাব' অনুসারে সম্মানজনক সন্ধির আবেদন জানালেও নেপোলিয়ন তা অগ্রাহ্য করেন। ফলে মিত্রপক্ষ পুনরায় ফ্রান্স আক্রমণ করে। ইংল্যন্ড মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগদান করলে তাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের মধ্যে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে শোমঁ-র সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। মিত্রপক্ষ ফ্রান্সে প্রবেশ করে প্যারিস দখল করলে নেপোলিয়ন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করে মিত্রপক্ষের সঙ্গে ফন্টেনব্লু সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এর শর্তানুসারে তিনি ইটালি এবং অস্ট্রিয়ার ওপর সমস্ত দাবি প্রত্যাহার করেন এবং তাঁকে বাৎসরিক ভাতা ও রাজকীয় উপাধি ধারণের অনুমতি দেওয়া হয়। মিত্রপক্ষ কর্তৃক নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত হন। ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ বংশের ন্যায়সঙ্গত শাসনাধিকারের ভিত্তিতে ষোড়শ লুই-এর ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন।

৪.৮ ❒ একশত দিবসের রাজত্ব

অষ্টাদশ লুই ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্যারিসে আসেন। ঐ সময়ই মিত্রপক্ষ এবং ফরাসী প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে প্যারিসের প্রথম সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ফ্রান্সকে ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের সীমানার প্রত্যাবর্তন করতে হয়। ফ্রান্স রাইন নদীর বাম তীরবর্তী অঞ্চল, বেলজিয়াম, জার্মানি, হল্যান্ড এবং ইটালির অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করে। ইংলন্ড মাল্টা, টোবাগো এবং সেন্ট লুসিয়া ব্যতীত অন্যান্য ফরাসী উপনিবেশগুলি ফ্রান্সকে প্রত্যর্পণ করে। অরেঞ্জ রাজবংশের অধীনে বেলজিয়ামকে হল্যান্ডের সঙ্গে সংযুক্তির এবং জার্মানির স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি নিয়ে একটি রাষ্ট্রসংঘ গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। সুইজারল্যান্ডকে স্বাধীন হিসেবে স্বীকার করা হয়। কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমন্বয়ে ইটালির পুনর্গঠন এবং ভিয়েনায় এক বৈঠকে মিত্রপক্ষ কর্তৃক ইউরোপের পুনর্গঠন সংক্রান্ত আলোচনা হবে স্থির হয়।

অষ্টাদশ লুই ফরাসী জনগণের সমর্থনে সিংহাসনে বসলেও ফরাসী জনগণের নিকট তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। অষ্টাদশ লুই একটি সনদ (Charter) জারী করে ফরাসী জনগণেকে শাসনতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা দান করতে চান। কিন্তু এ সময় যে সকল দেশত্যাগী রাজতন্ত্রী ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করে বিপ্লবী ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন তিনি তাঁদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন। ফলে, নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনী ও নেপোলিয়নের সমর্থকদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। কৃষক সমাজের আশঙ্কা জন্মে যে তাদের ভূসম্পত্তি হয়ত পুনরায় সামন্ত প্রভু বা চার্চকে ফিরিয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামাও শুরু হয়।

নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপে নির্বাসনে থাকাকালীন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও ইউরোপের পুনর্গঠন বিষয়ে বিবাদ দেখা দেয়। এই ধরনের পরিস্থিতি নেপোলিয়নকে পুনরায় ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে উৎসাহিত করে তোলে। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ নেপোলিয়ন অল্প কিছু সৈন্যসহ ফ্রান্সে প্রবেশ করেন। নেপোলিয়নকে প্রতিরোধের জন্য প্রেরিত সৈন্যবাহিনী তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। ফরাসী জনগণের সমর্থনও তিনি লাভ করেন। নেপোলিয়ন ঘোষণা করেন, দেশত্যাগীদের অত্যাচার থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করা, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন, কৃষকদের মালিকানা স্বত্ব রক্ষা ও বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে মার্চ নেপোলিয়ন সম্রাট উপাধি গ্রহণ করে পুনরায় ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। অষ্টাদশ লুই ইংল্যান্ডে পালিয়ে যান। নেপোলিয়ন চেয়েছিলেন উদারতন্ত্রীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় এসে সুযোগ অনুযায়ী পুনরায় ফ্রান্সে তাঁর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি তাঁর পূর্বতন মন্ত্রীদের আনুগত্য অর্জন করেন। ফরাসী সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথও গ্রহণ করেন।

নেপোলিয়নের ধারণা হয়েছিল যে অন্তর্কলহের ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির পক্ষে ঐক্যবন্ধ হওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু তাঁর এই ধারণা সঠিক ছিল না কারণ নেপোলিয়নের পুনরাগমনের সংবাদ মিত্রশক্তিবর্গকে পুনরায় ঐক্যবন্ধ করে। নেপোলিয়নকে অনাকাঙিক্ষত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। উভয়পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। নেপোলিয়নের সাফল্যের একমাত্র উপায় ছিল দ্রুত আক্রমণে মিত্রপক্ষকে বিপর্যস্ত করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি বেলজিয়াম সীমান্তে উপস্থিত হন। মিত্রপক্ষ তিনদিক থেকে নেপোলিয়নকে আক্রমণের পরিকল্পনা করে। উত্তর দিক থেকে ডিউক অফ ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী এবং ব্লুশ্যারের নেতৃত্বে প্রাশিয়া বাহিনী, পূর্বপ্রান্তে জার আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে রাশিয়া এবং শোয়ারজেনবার্গের নেতৃত্বে অস্ট্রিয়া বাহিনী আক্রমণ শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে নেপোলিয়ন লিঞ্জি এবং কোয়ার্টার ব্রার যুদ্ধে প্রশিয়া ও ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাজিত করেন। তারপর ওয়াটারলুর যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনানায়ক ডিউক অফ ওয়েলিংটনের সম্মুখীন হন। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে নেপোলিয়ন ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করলেও ব্লুশ্যারের নেতৃত্বে প্রাশিয়া বাহিনীর যোগদান যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করে দেয়। যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাজিত হন এবং প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করেন। নেপোলিয়নের আশা ছিল তিনি পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন কিন্তু ফ্রান্সে সংসদ (Chamber) তাঁকে সমর্থন করে না। তাঁর বহুদিনের মিত্ররা তাঁকে পরিত্যাগ করেন। শেষপর্যন্ত নেপোলিয়ন নিজের পুত্রকে সিংহাসন দান করতেও রাজি হন। কিন্তু সংসদ তা গ্রহণ না করে এক সাময়িক সরকার গঠন করে। ডিউক অফ ওয়েলিংটনের পরামর্শে অষ্টাদশ লুই প্যারিসে উপস্থিত হয়ে ক্ষমতা দখল করেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জুলাই নেপোলিয়ন মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এলবা থেকে প্র্যতাবর্তনের পর ওয়াটারলুর যুদ্ধ (১৮ই জুন ১৮১৫) পর্যন্ত নেপোলিয়নের এই 'একশত দিবসের রাজত্বের' সমাপ্তি ঘটে। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ২০শে নভেম্বর মিত্রপক্ষ প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধির মাধ্যমে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হয়। স্থির হয় ফ্রান্সকে তার ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের সীমারেখার মধ্যে ফিরে যেতে হবে। ফ্রান্সে আগামী পাঁচ বছরের জন্য মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকবে যার ব্যয়ভার বহন করতে হবে ফ্রান্সকে। এছাড়া ফ্রান্সকে সাতশ মিলিয়ন ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নেপোলিয়নকে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে আটলান্টিক মহাসাগরের দুর্গম সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ১৮২১ সালে নেপোলিয়নের মৃত্যু ঘটে। এখানে বসেই তিনি লিখেছিলেন তাঁর আত্মজীবনী যা প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সালে। এই আত্মজীবনী তাঁকে ঘিরে এক কিংবদন্তীর সৃষ্টি করে। মৃত্যুর পরেও ফ্রান্স তথা ইউরোপ তাঁর সম্মোহনী ভাবমূর্তি অপসৃত হয়নি। নেপোলিয়নকে নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক ও আলোচনার তাই অন্ত নেই।

৪.৯ ❐ নেপোলিয়নের পতনের কারণ

অদম্য মানসিক শক্তি, কর্মক্ষমতা এবং বাস্তব পরিস্থিতির উপযুক্ত মূল্যায়নের দক্ষতাই নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে কোন প্রকার রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য ব্যতীতই একজন সামান্য সৈনিক থেকে ফ্রান্সের সম্রাট তথা ইউরোপের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ক্ষমতায় উত্থানের পর থেকে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংল্যান্ড ব্যতীত ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলি তাঁর কাছে নতি স্বীকার করেছিল। আর তারপর থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল তাঁর পতনের পর্ব, তাঁর ব্যর্থতার ইতিহাস। নেপোলিয়নের পতন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আলোচনার অন্ত নেই। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে নেপোলিয়নের পতনকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেগুলি থেকে নেপোলিয়নের পতনের কারণ সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের গঠন এবং প্রশাসনিক পদ্ধতি তাঁর পতনের অন্যতম কারণ ছিল। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে যে পদ্ধতিতে নেপোলিয়ন তাঁর সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন তাই শেষপর্যন্ত তাঁর পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। নেপোলিয়নের আকাঙক্ষা ছিল ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপকে একই আইন ও শাসনব্যবস্থার অধীনস্থ করে এটি অখণ্ড ইউরোপীয় ঐক্য গড়ে তোলা যা প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য বা ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের অনুরূপ হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ধরনের সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টার কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের প্রধান উৎস ছিল ফ্রান্স। ফরাসী জনগণের সমর্থন এবং তাঁর ধারাবাহিক সাফল্য তাঁকে ইউরোপের উপর অধিপত্য বিস্তারে সহায়তা করেছিল। ফ্রান্স ও ইউরোপীয় জনগণের সমর্থন অর্জনের জন্য তিনি কিছু জনকল্যাণকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের প্রাথমিক পর্বে নিরন্তর যুদ্ধে জয় তাঁকে জনপ্রিয়তা এনে দিলেও পরবর্তীকালে তাঁর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে ফ্রান্স একটি পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন। ফলে পরবর্তীকালে সামরিক ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতা তাঁর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। নেপোলিয়নের অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দ এমনকি তাঁর ভাই জোশেফ বোনাপার্ট পযর্ন্ত তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হন। নেপোলিয়ন সাধারণ জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সমর্থন হারান সমগ্র জাতির। এই ঘটনাকেই তাঁর পতনের প্রধান কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন ঐতিহাসিক কোবান।

সাম্রাজ্য গঠনে নেপোলিয়নের সাফল্যের একটি বড় কারণ অবশ্যই ছিল তাঁর সামরিক শক্তি। যে উন্নত রণকৌশল তাঁকে তাঁর শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী করেছিল ক্রমশ সেই রণকৌশল ইউরোপীয় শক্তিগুলি আয়ত্ত করে নেয় এবং নেপোলিয়নের বিরুদ্ধেই তা প্রয়োগ করে। রণকৌশলে ক্ষেত্রে নব্যচিন্তা বা উন্নত ধারণার প্রয়োগ যে নেপোলিয়ন করতে পারেননি একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। এছাড়া যেহেতু তিনি বংশানুক্রমিক সম্রাট ছিলেন না, সেই কারণে নিরন্তর সামরিক সাফল্য এবং জনসমর্থনই তাঁর ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি ছিল। যে মুহূর্তে তিনি এগুলি হারান সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর পতন ত্বরান্বিত হয়।

নেপোলিয়নের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ত্রুটি। অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত এবং ব্যক্তিনির্ভর এই শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে পড়েছিল। আঞ্চলিক স্তরে সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় আঞ্চলিকতাবাদের প্রসার সহজ হয়েছিল আর

সম্রাট নির্ভর এই শাসনব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল অভিজ্ঞ ও যোগ্য উত্তরাধিকারী গঠন করতে। ফলে নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত ত্রুটি বিচ্যুতি এবং নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তাঁর দৈহিক ও মানসিক অবসাদ সাম্রাজ্যের গতিকে স্তিমিত করে দিয়েছিল।

নেপোলিয়নের প্রবল আত্মপ্রত্যয় এবং সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁকে যেমন প্রায় সমগ্র ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করেছিল তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর পতনকেও ত্বরান্বিত করেছিল। অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয়প্রসূত অহমিকা তাঁকে কোন পরামর্শদাতার উপর নির্ভর করা থেকে বিরত করেছিল। ফলে বেশ কিছু ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত তাঁর ব্যর্থতাকে প্রকট করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর স্পেনীয় যুদ্ধ এবং রাশিয়া অভিযানের কথা বলা যায়। লিপজিগের যুদ্ধের পর মিত্রপক্ষ ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রস্তাবের মাধ্যমে হল্যান্ড ও বেলজিয়াম প্রত্যর্পণ করার পরিবর্তে তাঁকে ফ্রান্সের রাজপদ দিতে রাজী ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয় তাঁকে তখনও নিজেকে অপরাজেয় ভাবতে বাধ্য করেছিল। তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন যার পরিণতি ওয়াটারলুর যুদ্ধ এবং তাঁর অন্তিম বিপর্যয়।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের 'অন্তর্নিহিত, আত্মঘাতী স্ববিরোধ' তাঁর পতনের অন্যতম কারণ, এ মন্তব্য ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের। তাঁর নীতি এবং কার্যকলাপের মধ্যে দেখা গিয়েছিল প্রভূত পার্থক্য। ফরাসী বিপ্লবের যে মহান আদর্শের প্রচার করে নেপোলিয়ন ইউরোপে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন সেই আদর্শের মূর্ত ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর সাম্রাজ্য। একথা বলা হয়েছে ইউরোপের যে অঞ্চলেই তাঁর সেনাবাহিনীর প্রবেশ ঘটেছিল সেখানেই অবসান ঘটেছিল পুরাতনতন্ত্র এবং সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার। তাঁর অধিকৃত দেশসমূহে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, মধ্যযুগীয় সমাজ এবং সামাজিক অসাম্যের অবসান ঘটিয়ে, তিনি ইউরোপের জনগণের কাছে নিজের মুক্তিদাতা ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করলেও তিনি স্বয়ং সেইসকল স্থানে তাঁর স্বৈরশাসন এবং বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেছেন। স্বাধীনতার কথা বললেও বিজিত জাতিগুলির উপর কায়েম করেছেন ফরাসী শাসন। নেপোলিয়ন তাঁর অধিকৃত রাজ্যসমূহ থেকে বাধ্যতামূলক সৈন্যসংগ্রহ, যুদ্ধকর এবং সম্পদ শোষণের ফলে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ইউরোপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই স্ববিরোধী নীতি তাঁর মুক্তিদাতা ভাবমূর্তিকে মলিন করে দিয়েছিল। তাঁর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দেখা দিচ্ছিল স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় অভ্যুত্থান। এমনকি ফ্রান্সেও অভ্যন্তরীণ সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি বাহ্যিক গণতন্ত্রের অন্তরালে স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র স্থাপনে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ফলে সর্বত্র তাঁর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করেছিল, যা তাঁর সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের স্ববিরোধিতার বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসেবে জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করা হয়। একথা বলা হয় নেপোলিয়ন তাঁর বিজিত রাজ্যগুলিতে এক শাসন, আইন, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনা তথা আশাবাদ জাগ্রত করেছিলেন, ইটালি, জার্মানী, স্পেন প্রভৃতি দেশ তার প্রমাণ। তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতির সঙ্গে এই সমস্ত অঞ্চলের নবোদিত জাতীয়তাবাদের সংঘাত তাঁর পতনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। তবে ঐতিহাসিকদের একাংশ বিশ্বাস করেন না যে নেপোলিয়নের পতনের জন্য জাতীয়তাবাদী সম্রাজ্যবাদী প্রতিরোধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁদের মতে, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপের সর্বত্র জাতীয় অভ্যুত্থান বা গণঅভ্যুত্থান ঘটেনি। উপরন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয় আন্দোলন বা জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধের চরিত্র ছিল

মূলত আঞ্চলিক এবং অর্থনৈতিক। একথা সত্য যে স্পেনে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে একধরনের জাতীয় আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের এককভাবে সাফল্যলাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর পক্ষে এই আন্দোলন দমন করাও বিশেষ কঠিন ছিল না। কিন্তু স্পেনের যুদ্ধে নেপোলিয়নকে শুধুমাত্র স্পেন নয় সম্মুখীন হতে হয়েছিল বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের জোটবদ্ধ প্রতিরোধের যাতে সাফল্যলাভ নেপোলিয়নের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

নেপোলিয়নের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের পরে তাঁর কিছু ভুল সিদ্ধান্ত এবং আত্মঘাতী কর্মসূচী। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার কথা। মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা সমগ্র ইউরোপে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তাকে হ্রাস করেছিল। নৌশক্তিতে বলীয়ান ইংলন্ডকে দমন করতে না পেরে নেপোলিয়ন মহাদেশীয় অবরোধ প্রথার মাধ্যমে ইংল্যান্ডের বাণিজ্য ধ্বংস করে তাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করতে চেয়েছিলেন। ফ্রান্সের মিত্রদেশ এবং নিরপেক্ষ দেশগুলির ওপর এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। ফ্রান্সের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে তিনি বিসর্জন দেন ইউরোপের স্বার্থ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে ইংল্যান্ডের বাজার ধ্বংস করে সেই শূন্যস্থান ফ্রান্স কর্তৃক পূর্ণ করা। এজন্য প্রয়োজন ছিল ফ্রান্সের দ্রুত শিল্পায়ন, যা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। ফলে, শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর অভাবে ইউরোপে সঙ্কট দেখা দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইউরোপের বণিক সম্প্রদায়। নিত্যব্যবহার্য পণ্যদ্রব্যের অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সংকটের জন্য ইউরোপ মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থাকেই দায়ী করে। এর ফলে নেপোলিয়ন স্বয়ং এই ব্যবস্থাকে কিছুটা শিথিল করতে বাধ্য হলে চোরাপথে পণ্যদ্রব্য ইউরোপের উপকূল দিয়ে মহাদেশের বাজারে প্রবেশ করতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী এবং সামরিক বাহিনীর প্রধানরাও ব্যাপক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ইংল্যান্ড থেকে চোরাপথে পণ্য আমদানি বন্ধ করার জন্য নেপোলিয়ন ইউরোপের উপকূলবর্তী দেশসমূহ ও নিরপেক্ষ দেশগুলিতে তাঁর সেনাবাহিনী ছড়িয়ে দেন যা ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গকে অসন্তুষ্ট করে। অপরদিকে তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে গিয়ে পর্তুগাল এবং স্পেনে সেনা অভিযান করেন। স্পেনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ তাঁর সামরিক শক্তির দুর্বলতাকে ইউরোপের কাছে পরিস্ফুট করে দেয়। পোপ তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ মানতে অস্বীকার করলে তিনি পোপকে বন্দী করে রোমান ক্যাথলিক চার্চকে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলেন। অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া তাঁর নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে। হল্যান্ডেও নেপোলিয়নের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য আমদানি করা শুরু হয়। অর্থাৎ নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি এবং মিত্ররাজ্যগুলি যখন দেখে যে এই ব্যবস্থার ফলে তাদের বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বন্দরগুলি, দেশের অভ্যন্তরে বণিক সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলি নেপোলিয়নের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবার প্রচেষ্টা শুরু করে।

শুধু ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গই নয় তাঁর নিজের দেশ ফ্রান্সেও মহাদেশীয় অবরোধের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একথা সত্য যে এই ব্যবস্থা প্রচলনের প্রথম পর্বে ফরাসী জনগণ উৎসাহিত হয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল এর ফলে ফ্রান্সে শিল্পায়ন হবে, অগ্রগতি হবে ব্যবসাবাণিজ্যের। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ফরাসী অর্থনীতি এক সঙ্কটজনক অবস্থার মুখোমুখি হল। নেপোলিয়নের প্রাথমিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি থেকে কাঁচামাল আমদানি বন্ধ হওয়ায় যেমন দেশে দ্রুত শিল্পায়ন

সম্ভব হল না, তেমনি উন্নতি ঘটল না কৃষিতেও। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ফরাসী বিপ্লবের সময়কার স্তরেও পৌঁছতে পারেনি। সামুদ্রিক বাণিজ্যে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার ফলে ভাঁটা পড়তে শুরু করল। এইসব কারণে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব যে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল ছিল তারাও তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হতে শুরু করল। তাই নেপোলিয়নের ভাগ্য বিপর্যয়ের সময় এই বুর্জোয়া শ্রেণি তাঁকে পরিত্যাগ করতেও দ্বিধা করেনি। এছাড়া শ্রমিক ছাঁটাই এবং বেকার সমস্যা শ্রমিক শ্রেণিকেও তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এই সমস্ত ঘটনা নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যিক ভিত্তিকে দুর্বল করে তুলেছিল। দ্বিমুখী অস্ত্রের ন্যায় মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের উপরেও চরম আঘাত এনেছিল যার মূল্য দিতে হয়েছিল নেপোলিয়নকে।

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে গিয়ে নেপোলিয়ন পর্তুগাল সহ স্পেনের সঙ্গে অহেতুক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। স্পেনে নেপোলিয়নের পরাজয় তাঁর বিপর্যয়ের সূচনা করে। নিজ ভ্রাতা জোসেফকে অবৈধভাবে স্পেনের সিংহাসনে বসানোর দ্বারা একদিকে যেমন নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা প্রকাশিত হয় তেমনি এই ঘটনা প্রমাণ করে যে অতিরিক্ত অহমিকা তাঁকে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে দেয়নি। স্পেনীয় জনগণের মানসিকতা বুঝতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। উপরন্তু ইংল্যান্ড স্পেনকে কেন্দ্র করে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক ইউরোপীয় ভূখণ্ড পেয়ে গিয়েছিল। স্পেনে নেপোলিয়নের বিপর্যয় যেমন ফরাসী রাজকোষ এবং সৈন্যবাহিনীর ক্ষতি করেছিল তেমনি নেপোলিয়নের অপরাজেয় ভাবমূর্তিতে কালিমা লেপন করেছিল। নেপোলিয়নের বিরোধী শক্তিগলুলির মধ্যে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। স্পেনে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় নেপোলিয়ন ইউরোপের অন্য রণাঙ্গনে তাঁর পূর্ণশক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হতে পারেননি। স্পেনে তাঁর পরাজয় অস্ট্রিয়ার পুনরুত্থানের সাহায্য করেছিল বলে মন্তব্য করেছেন ঐতিহাসিক কোবান। সামগ্রিকভাবে তাই 'স্পেনীয় ক্ষত' নেপোলিয়নের পতন ত্বরান্বিত করেছিল।

স্পেনের পর নেপোলিয়নের অদূরদর্শিতার সর্বশেষ উদাহরণ তাঁর রাশিয়া অভিযান। রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা নেপোলিয়নকে পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগের সুযোগ করে দিতে পারত কিন্তু রাশিয়া আক্রমণ করে তিনি ইউরোপের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্তেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। রুশ রণনীতির সামনে বিভ্রান্ত নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটে, বিধ্বস্ত হয় তাঁর বিখ্যাত গ্র্যান্ড আর্মি যা ইউরোপে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিপুল অর্থব্যয় তাঁর আর্থিক প রিস্থিতিকে সংকটজনক করে তোলে। অর্থসঙ্কট মোচনের জন্য নতুন কর স্থাপন সাধারণ মানুষের অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি করে এবং নেপোলিয়নের শত্রুপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করতে থাকে, যার পরিণতি চতুর্থ রাষ্ট্রজোটের কাছে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয়।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উত্থানের মতই তাঁর পতনও ইউরোপের ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন সমরনেতা নেপোলিয়নের পতন আপাতদৃষ্টিতে অভাবনীয় মনে হলেও তা ছিল অনিবার্য। সামরিক শক্তির সাহায্যে যে বিশাল সাম্রাজ্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন তার স্ববিরোধী ও অসঙ্গতিপূর্ণ চরিত্র এই সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে নেপোলিয়নের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

৪.১০ ❒ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট—বিপ্লবের সন্তান?

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মত বর্ণময় চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিতর্ক অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন কালে যে আত্মজীবনী নেপোলিয়ন রচনা করেছিলেন তা থেকেই গড়ে উঠেছিল নেপোলিয়ন সম্পর্কিত কিংবদন্তী বা Napoleonic Legend। এই কিংবদন্তী বা অতিকথন থেকে বাস্তবকে পৃথক করে নিলে স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ এক মানুষের চিত্র পাওয়া যায়। এই স্ববিরোধিতার সৃষ্টি তিনি নিজেই করে গেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লিখিত দুটি পরস্পরবিরোধী মন্তব্যের মাধ্যমে। তিনি যেমন নিজের সম্বন্ধে বলেছেন 'আমিই বিপ্লব' (I am the Revolution) তেমনি একথাও বলেছেন যে 'আমিই বিপ্লবকে ধ্বংস করেছি' (I destroyed the Revolution)। স্বাভাবিকভাবেই নেপোলিয়নের নিজের সম্পর্কে এই পরস্পরবিরোধী উক্তি জন্ম দিয়েছে ঐতিহাসিক বিতর্কের। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ কতটা তাঁর মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, আবার কোথায়ই বা তিনি বিপ্লবের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, কিংবা 'বিপ্লবের সন্তান'—তাঁর প্রতি এই মন্তব্য কতদূর যুক্তিসঙ্গত তা তাঁর কার্যাবলীর আলোকেই বিশ্লেষণ করতে হবে।

নেপোলিয়ন এক অর্থে ছিলেন প্রকৃতই বিপ্লবের সন্তান অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লব পূর্বতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তথা পুরাতনতন্ত্র এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে নেপোলিয়নের ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ এনে দিয়েছিল। পূর্ববর্তী রাষ্ট্রব্যবস্থায় বংশকৌলীন্য এবং রাজরক্তহীন সাধারণবংশজাত নেপোলিয়নের পক্ষে সম্রাট পদ অর্জন সম্ভব ছিল না। বিপ্লবপ্রসূত পরিবর্তিত পরিস্থিতি নেপোলিয়নের সম্মুখে ফ্রান্সের সিংহাসন অধিকারের পথ প্রশস্ত করেছিল। নেপোলিয়নের কার্যাবলীর মধ্যে তাই অনেকক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক আদর্শ রূপায়ণের প্রচেষ্টা দেখা যায়।

ফরাসী বিপ্লবের মহান আদর্শ ছিল স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রী। এগুলির সবকটিই যে তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে রূপায়িত হয়েছিল তা নয়। বাস্তববাদী নেপোলিয়নের একথা বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের পরিবর্তে ফরাসী জাতির অধিক কাম্য হল সাম্যের অধিকার। বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে নেপোলিয়ন ফরাসী জনগণের সেই আকাঙ্ক্ষাকেই তৃপ্ত করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের যুগে বিশেষত, ১৭৯১ থেকে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অভিজাতদের যে সমস্ত বিশেষ অধিকার যথা, সামন্তপ্রথা, বিভিন্ন প্রকার সামন্ততান্ত্রিক কর ব্যবস্থা, স্থানীয় শুল্ক ইত্যাদি লোপ করা হয়েছিল, নেপোলিয়ন তাঁর শাসনব্যবস্থায় এগুলি বজায় রাখেন। বিপ্লবের যুগের আরও কিছু গৃহীত নীতি যেমন, ভূমি ব্যবস্থা, যোগ্যতার ভিত্তিতে ধনী, দরিদ্র বা শ্রেণি নির্বিশেষে কর্ম ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারকে তিনি স্বীকৃতি দেন। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কোড নেপোলিয়ন-এর মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার, চার্চের সম্পত্তির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকেও রক্ষা করা হয়। নেপোলিয়নের উত্থানপর্বে ফরাসী জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল বিপ্লবের আমলের অস্থির পরিস্থিতির অবসান, সামাজিক সাম্য, আইনের আশ্রয় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নেপোলিয়ন তা দিয়েছিলেন। পুরাতনতন্ত্রের 'বিশেষ অধিকার' ভোগী সামাজিক ব্যবস্থা তাঁর সময়ে ফিরে আসেনি। কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষিত সাম্য তাঁর লাভ করেছিলেন।

শুধুমাত্র ফ্রান্সে নয়, ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেপোলিয়ন ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ বিস্তারে সহায়তা করেছিলেন। ইউরোপের যে সমস্ত অঞ্চল তিনি জয় করেছিলেন সেখানেই পুরাতনতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল। নব বিজিত অঞ্চলগুলিতে তিনি প্রবর্তন করেছিলেন বৈপ্লবিক আদর্শভিত্তিক সংস্কার। ঐ সমস্ত অঞ্চলে ঘটেছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস। ফরাসী রাষ্ট্রীয় আদর্শের অনুকরণে নেপোলিয়ন ঐ সমস্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো পুনর্গঠন করেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে বিজিত রাজ্যগুলিতে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটে, লুপ্ত হয় চার্চের প্রাধান্য। কৃষক সমাজ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কর ব্যবস্থার পুনর্গঠন, অভ্যন্তরীণ শুল্কবাধা অপসারণ, শহরাঞ্চলে বণিক সংঘ বা গিল্ডগুলির বিশেষ সুবিধা লোপ, যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রভৃতি সমগ্র ইউরোপে মুক্তির আবহাওয়া নিয়ে আসে। সর্বোপরি কোড নেপোলিয়নের মাধ্যমে বৈপ্লবিক মতাদর্শ এবং রোমান আইনের সমন্বয় ভিত্তিক আইনবিধি সমগ্র ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরোক্ষভাবে নেপোলিয়ন তাঁর বিজিত রাজ্যগুলিতে, বিশেষত ইটালি, জার্মানি এবং পোল্যান্ড জাতীয়তাবাদের প্রসারে সহায়তা করেন। উল্লেখযোগ্য যে নেপোলিয়নের পতনের পরেও ইউরোপের দেশগুলিতে পুরাতনতন্ত্র ফিরে আসেনি। একথা সম্ভবত সত্য যে নেপোলিয়ন নিজ স্বার্থে এবং তাঁর সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে ইউরোপীয় জনগণের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলি যে ইউরোপীয় জনগণকে বিপ্লবমনস্ক করে তুলেছিল একথা অবশ্যই অস্বীকার করে যায় না।

নেপোলিয়নের কার্যাবলীর মধ্যে একদিকে যেমন উপরিউক্ত বৈপ্লবিক আদর্শগুলির রূপায়ণ দেখা যায় তেমনি অনেক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক আদর্শের বিরোধিতাও তিনি করেছিলেন। প্রথম কনসাল হিসেবে নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করে 'সিনেট' এবং 'কাউন্সিল অফ স্টেট' আইনসভার এই দুটি কক্ষকে ক্রীড়নকে পরিণত করে নেপোলিয়ন প্রজাতন্ত্রের ছদ্মবেশে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নেপোলিয়নের কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী শাসন বিপ্লবের আদর্শ নষ্ট করেছিল। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট পদ গ্রহণ, সম্রাট পদকে বংশানুক্রমিক করা, জাঁকজমকপূর্ন রাজসভা, নিজ আত্মীয়স্বজন ও অনুগত ব্যক্তিদের উচ্চপদ দান করে এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করা—এগুলির কোনটিই ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। নেপোলিয়নের কনসাল বা সম্রাট পদ লাভের ঘটনাকে ফরাসী বিপ্লবের অবসান বলেই মত প্রকাশ করেছিলেন ঐতিহাসিক ওলার।

ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শকে ধ্বংস করেছিলেন নেপোলিয়ন। তিনি বুঝেছিলেন যে ফরাসী জনগণের কাছে স্বাধীনতার পরিবর্তে সাম্যই বেশি আকাঙ্ক্ষিত। সেই কারণেই বিপ্লবের যুগের স্বাধীনতার আদর্শকে ধ্বংস করে তিনি পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। আর বুর্জোয়া গণতন্ত্র বা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকেও তিনি অগ্রাহ্য করেন। নিজের এই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রতি জনগণের সমর্থন লাভের জন্য তিনি কিছু বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেণ। আসলে নেপোলিয়ন সচ্ছল কৃষকদের জমির অধিকার দান কিংবা যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের মাধ্যমে বুর্জোয়া সম্প্রদায়কে খুশি করে একটি সমর্থক শ্রেণি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কারণ নেপোলিয়ন চেয়েছিলেন যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি হবে জনসমর্থন। তাই প্রথম কনসাল হিসেবে বা নিজেকে সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সময় তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে জনসমর্থন লাভ করেছিলেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর সংস্কার বিপ্লবের আদর্শের পরিপন্থী ছিল। যেমন

নেপোলিয়নের সংস্কারগুলি প্রধানত বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছিল। দরিদ্র জনসাধারণ এর ফলে বিশেষ উপকৃত হয়নি। তিনি তাঁর অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন প্রধানত সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য এবং অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ধাতুর আমদানি অব্যাহত রাখতে। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে কৃষক বা শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণ না করলে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তা তাঁর সৈন্যবাহিনীর জন্য রসদ সংগ্রহে বাধার সৃষ্টি করবে। তবে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন পুরাতন নীতিকেই কার্যকরী করেছিলেন। 'কোড নেপোলিয়ন' শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মালিকের স্বার্থই রক্ষা করেছিল। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকারও নেপোলিয়ন স্বীকার করেননি। উপরন্তু ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার নীতিগ্রহণ করে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার নীতি অগ্রাহ্য করেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকেও তিনি হরণ করেছিলেন। তাঁর আমলে সংবাদপত্রগুলি ছিল সরকারি প্রচার-মাধ্যম। গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। রঙ্গালয়গুলিকে রাখা হয়েছিল পুলিশ মন্ত্রকের অধীনে। নেপোলিয়নের এই সমস্ত কার্যাবলী স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবী আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বিপ্লবের বাণী ইউরোপের দেশগুলিতে প্রসারিত করার পিছনে নেপোলিয়নের অবদান থাকলেও তিনি তাঁর অধীনস্থ দেশগুলিকে স্বাধীনতা দানের পরিবর্তে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে আবদ্ধ করেছিলেন, যা ছিল ফরাসী বিপ্লবের মৈত্রী নীতির পরিপন্থী।

প্রকৃতপক্ষে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ছিল স্ববিরোধিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক অর্থে তিনি ছিলেন 'বিপ্লবের সন্তান'। কারণ বিপ্লব তাঁকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল। ঐতিহাসিক থিয়ের তাই বলেছেন যে নেপোলিয়নই ফ্রান্সে বিপ্লবকে সফল করেছেন এবং ফরাসী বিপ্লবের বাণী ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এক বিশেষ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি নেপোলিয়নের অভ্যুত্থানকে সম্ভব করেছিল। অপরদিকে নেপোলিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুরাতন। উচ্চাকাঙক্ষা ও ক্ষমতাপ্রিয়তার জন্য তিনি ধ্বংস করেছিলেন বিপ্লব। স্বীকৃতি দেননি স্বাধীনতার অধিকারকে। বিপ্লবের গতি রুদ্ধ করে তিনি পুরাতনতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এ মন্তব্য ঐতিহাসিক ওলারের। আর জর্জ লেফেভ্‌র বলেছেন নেপোলিয়ন পরিস্থিতির চাপে বাস্তব থেকে তাঁর দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। একদিকে তিনি রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছেন অপরদিকে বিপ্লবের আদর্শকেও কার্যকরী করতে চেয়েছেন যার ফলে কোনটিই তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নিজের সম্পর্কে যে দুটি ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন অর্থাৎ তিনিই বিপ্লব এবং তিনিই বিপ্লব ধ্বংস করেছেন—এই দুটিই আপাতদৃষ্টিতে সত্যি বলেই প্রতীয়মান হয়।

৪.১১ ❐ অনুশীলনী

- **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

১। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সমূহ আলোচনা করে দেখান যে সেগুলি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল?

২। 'মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা' কি? এই ব্যবস্থা কি প্রকৃতই ইংল্যান্ডের পরিবর্তে ফ্রান্সকেই বেশি আঘাত করেছিল?

৩। নেপোলিয়নের পতনে উপদ্বীপের যুদ্ধ ও মস্কো অভিযানের ভূমিকা কি ছিল?

- **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

১। ডাইরেক্টরীর বৈদেশিক নীতি নেপোলিয়নকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে কতখানি সহায়তা করেছিল?
২। নেপোলিয়ন কর্তৃক ইউরোপের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৩। নেপোলিয়ন কি প্রকৃতই 'বিপ্লবের সন্তান' ছিলেন?

- **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

১। 'কনকর্ডাট' কি?
২। 'কনফেডারেশন অব রাইন' বলতে কি বোঝায়?
৩। 'একশত দিবসের রাজত্ব' কাকে বলে?

৪.১২ ❒ গ্রন্থপঞ্জী

১। টমসন ডেভিড, ইউরোপ সিন্স নেপোলিয়ন
২। লেফেভ্‌র জর্জ, নেপোলিয়ন
৩। কোবান আলফ্রেড এ হিস্ট্রি অফ ফ্রান্স, ২য় খণ্ড
৪। গেইল পিটার, নেপোলিয়ন ঃ ফর এ্যান্ড এগেনস্ট

ইতিহাস—পঞ্চম পত্র

পর্যায়—২

একক ১ ❑ ইউরোপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রসার

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা
১.১ ফ্রান্সে বুর্জোয়াদের উত্থান ও জুলাই বিপ্লব
 ১.১.১ বিপ্লবের গুরুত্ব
 ১.১.২ ফলাফল
১.২ ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব
 ১.২.১ লুই ফিলিপের ব্যর্থ বিদেশনীতি
 ১.২.২ বিরোধ গোষ্ঠীর উদ্ভব
 ১.২.৩ গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি
 ১.২.৪ বিপ্লবের ঘটনাবলী
১.৩ ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ইউরোপীয় প্রেক্ষিত
 ১.৩.১ বিপ্লবের ঘটনাবলী : অস্ট্রিয়া
 ১.৩.২ হাঙ্গেরী
 ১.৩.৩ বোহেমিয়া
 ১.৩.৪ ইতালি
 ১.৩.৫ জার্মানি
 ১.৩.৬ ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ড
 ১.৩.৭ ফ্রাঙ্কফুর্টে জার্মান জাতীয় সভা
১.৪ বিপ্লবের ব্যর্থতা
 ১.৪.১ বোহেমিয়ায় বিপ্লব বিরোধী সাফল্য
 ১.৪.২ ইতালি
 ১.৪.৩ অস্ট্রিয়া
 ১.৪.৪ হাঙ্গেরি
 ১.৪.৫ প্রাশিয়া
 ১.৪.৬ ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের ব্যর্থতা
১.৫ ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ধরন বা প্যাটার্ন
১.৬ অনুশীলনী
১.৭ সহায়ক বই

১.০ ❑ প্রস্তাবনা

ফ্রান্সে প্রথম বিপ্লব হয়েছিল ১৭৮৯ সাল থেকে ১৭৯৪ সাল পর্যন্ত। এই বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটানো। ১৮৩০ সালে দ্বিতীয় বিপ্লব হয়েছিল অভিজাতদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৃতীয় বিপ্লব হয় বুর্জোয়াদের একচেটিয়া শাসনের বিরুদ্ধে। ফ্রান্সে সূচনা হলেও ১৮৪৮-এর বিপ্লবের প্রভাব ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করেছিল। ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৈপ্লবিক সক্রিয়তা লক্ষ করা গিয়েছিল। ১৭৮৯-এর বিপ্লবের ফলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৩০-এর বিপ্লব সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলে। আর ১৮৪৮-এর বিপ্লব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ফ্রান্সের রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকটাই সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছেছিল। এই অধ্যায়টি পাঠ করলে ফ্রান্সে ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা, প্রসার, ব্যর্থতা ও বিপ্লবের প্যাটার্ন বা ধরন সম্পর্কে জানা যাবে।

১.১ ❑ ফ্রান্সের বুর্জোয়াদের উত্থান ও জুলাই বিপ্লব

পি. এন. স্টার্নস ও এইচ. ও এইচ. চ্যাপম্যান তাঁদের বই 'European Society In Upheaval'-এ দেখিয়েছেন, ১৭৮৯-এর বিপ্লবে বুর্জোয়ারা সমাজের আইনী কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন দাবি করেছিল। এই বিপ্লবে অভিজাতদের ক্ষমতার আইনগত ও অর্থনৈতিক ভিত্তি আক্রান্ত হয়েছিল। ম্যানর সংক্রান্ত অধিকার ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবসান অভিজাতদের অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল করে দেয়। সাম্যের আদর্শ অভিজাত শ্রেণীর মর্যাদার আইনগত ভিত্তিতে আঘাত হানে। চার্চও বঞ্চিত হয়েছিল জমিজমা সংক্রান্ত অধিকার ও বিশেষ ধরনের বহু সুযোগ-সুবিধা থেকে। গিল্ড ব্যবস্থা লুপ্ত হওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ, উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব হয়েছিল। বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতি পুঁজিবাদী বাজারী অর্থনীতির বিকাশে সহায়ক হয়েছিল।

উনিশ শতকে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার দুটি দিক ছিল। প্রথমত, জাতি বা নেশনের ধারণা এবং দ্বিতীয়ত, সংসদীয় বা পার্লামেন্টারী শাসনের আদর্শ। এই শ্রেণি জাতিকে দেখেছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক একক হিসাবে। যার উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য প্রয়োজন একটি জাতীয় বাজারের। এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সংরক্ষণে প্রয়োজন জাতীয় সুরক্ষার। জাতীয়তাবাদী আদর্শের কথা বলে বুর্জোয়া শ্রেণি পুরনো রাজবংশের আবির্ভাব এবং অভিজাততান্ত্রিক ক্ষমতার তত্ত্বকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল। যার প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে। ঐতিহাসিক হেজ উল্লেখ করেছেন, ১৮৩০ সালের এই বিপ্লব ফ্রান্সে ঐশ্বরিক ক্ষমতার দাবি করত যে রাজতন্ত্র, তার মৃত্যুবার্তা ঘোষণা করে। এই বিপ্লবে বুরবোঁ বংশের দশম চার্লসের পতন হয়েছিল। কারণ, তিনি ফ্রান্সে ১৭৮৯-এর বিপ্লবের আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন।

এরপর ফ্রান্সে কি ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন হবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। গডফ্রয় ক্যাভোনার নেতৃত্বে ছাত্র ও শ্রমিকদের একটি দল চেয়েছিল ১৭৯৫-এর মত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। অন্য একটি দল ছিল বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ ও সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের সমর্থক। এদের নেতা ছিলেন

সাংবাদিক অ্যাডলফ থিয়ের ও ব্যাঙ্ক মালিক জ্যাক লাফিতে। শেষ পর্যন্ত যাকে সিংহাসনে বসানো হল তিনি ছিলেন বুরবোঁ বংশেরই ছোট শাখার প্রতিনিধি, ডিউক অফ অরলি ওরফে লুই ফিলিপি। কিন্তু বুরবোঁ বংশের উত্তরসূরী, এটাই তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল না। কারণ তাঁর বাবা ছিলেন ফিলিপ এগালাইট, যিনি ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। ১৭৮৯-এর বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, বাস্তিলের দুর্গের পতনের প্রত্যক্ষদর্শী এবং এক সময়ে জ্যাকোবিন ক্লাবের সদস্য লুই ফিলিপিকে বুর্জোয়ারা নিজেদের লোক বলে মনে করেছিলেন।

ঐতিহাসিক কেটেলবি লিখেছিলেন, "জুলাই বিপ্লবের দিনগুলি ফ্রান্সের বিপ্লবী ঐতিহ্যকে জাগিয়ে তুললেও জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে পারল না।" গণতন্ত্রীরা বিপ্লবের নেতৃত্ব দিলেও রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয়ে যায়নি। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে অচিরেই তা ইউরোপের রক্ষণশীল, বিপ্লব বিরোধী শক্তির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। এই আশঙ্কায় প্রজাতন্ত্রীরা খুব একটা জোরালো দাবি তুলতে পারেনি। উপযুক্ত বিকল্পের অভাবে গণতন্ত্রীরাও উদারনীতিবাদীদের সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হল।

১.১.১ বিপ্লবের গুরুত্ব

কিন্তু ১৮৩০-এর বিপ্লবের প্রভাব অনেক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষত, এই বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অভিজাত শ্রেণির হাত থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলে গিয়েছিল। রক্ষণশীলতার জায়গা নিয়েছিল উদারনীতিবাদ। একথা স্পষ্ট হয়েছিল যে, ফ্রান্সকে আর কখনও ভিয়েনা কংগ্রেসের 'ন্যায্য অধিকারের' নীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। প্যারিসের গণবিপ্লবের নেতারাই লুই ফিলিপিকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এর পর থেকে ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে জনসাধারণের সংঘাত হলে জনসাধারণের ইচ্ছাই প্রাধান্য পেয়েছে। লিপসন দেখিয়েছেন যে, ১৮৩০ সালের বিপ্লবে ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের আদর্শগুলি যেমন, সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাংবিধানিক স্বাধীনতার আদর্শ দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিংহাসনে বসার পর থেকেই লুই ফিলিপি বুর্জোয়াদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বিপ্লবীদের তেরঙা (লাল, সাদা ও নীল) পতাকাকে আবার ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা করেন এবং নিজেকে ফ্রান্সের রাজা না বলে 'ফরাসী জাতির রাজা' (King of the French) বলে ঘোষণা করেন। নিজেকে একটি উদারনৈতিক সনদের অধীনে সাংবিধানিক ব্যবস্থার রাজা বলে মানতে তাঁর আপত্তি ছিল না। জুলাই রাজতন্ত্র 'বুর্জোয়া রাজতন্ত্র' নামে পরিচিতি পেয়েছিল।

১.১.২ ফলাফল

জুলাই বিপ্লব ইউরোপের সর্বত্র উদারনীতিবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের উৎসাহিত করেছিল। বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, জার্মানি, ইতালিতে জাতীয়তাবাদের প্রসার লক্ষ করা যায়। ব্রিটেনে বিপ্লবীরা বিদ্রোহী না হলেও উদারনীতিবাদী চিন্তাভাবনা প্রভাব বিস্তার করেছিল। যার বহিঃপ্রকাশ ছিল চার্টিস্ট আন্দোলন এবং শাসনব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের দাবি।

১.২ ❑ ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব

লুই ফিলিপির ক্ষমতার ভিত্তি ছিল ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণি। এরাই ১৮৩০-১৮৪৮ কালপর্বে ফ্রান্সে একচেটিয়া রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত। সে কারণে জুলাই রাজতন্ত্রকে বুর্জোয়া রাজতন্ত্র বলা হত। সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল মাত্র আড়াই লক্ষ জমিদার ও শিল্পপতিদের। আইন যা কিছু হত মূলত ব্যবসায়ীদের স্বার্থে হত। শ্রমিকদের সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। রাজাকে সাহায্য করেছিল কিছু ধনী মধ্যবিত্ত যাদের জনসাধারণের ওপর খুব একটা প্রভাব ছিল না। বুর্জোয়াদের সন্তুষ্ট করতে রাষ্ট্র শিল্পক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার নীতি নিয়েছিল। সরকারের এই বুর্জোয়া তোষণের নীতি সাধারণ মানুষকে অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল। তবে লিপসনের মতে, লুই ফিলিপির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফ্রান্সের মানুষের জাতীয়তাবাদী আবেগকে মূল্য না দেওয়া এবং অভ্যন্তর ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চেতনার জাগরণকে অবদমনের চেষ্টা করা।

১.২.১ লুই ফিলিপির ব্যর্থ বিদেশনীতি

ফরাসিরা ভেবেছিল জুলাই রাজতন্ত্র ইউরোপের নিপীড়িত জাতিগুলির উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষ নেবে এবং প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করবে। ১৮১৫ সালের ভিয়েনা চুক্তি ফরাসিদের জাতীয় মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। তারা চাইত লুই ফিলিপির শাসনকাল ফ্রান্সের জাতীয় গৌরবের দিনগুলিকে ফিরিয়ে আনুক। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সের বিপ্লব বেলজিয়ামকে হল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রেরণা দিয়েছিল ; পোল্যান্ড বিদ্রোহ করেছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে ; এমনকি জার্মানি ও ইতালিতেও জাতীয়তাবাদী আবেগ লক্ষ করা গিয়েছিল। এইসব আন্দোলনের ভাগ্য অনেকটাই ফ্রান্স কি ভূমিকা নেবে তার ওপর নির্ভর করত। কিন্তু লুই ফিলিপি ইতালি ও পোল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েও নিষ্ক্রিয় থাকেন। কারণ তিনি জানতেন এধরনের পদক্ষেপ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, ও রাশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলবে। যাদের লক্ষ্য হবে ফ্রান্সের অভ্যন্তর ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের সুযোগ সন্ধান করা। ১৮৪০ সালে মিশরের পাশা মেহমেৎ আলি তুরস্ক আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। ফ্রান্সের জনগণের আশা ছিল নেপোলিয়নের মত লুই ফিলিপিও এই সুযোগে নিকট প্রাচ্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করুন। সাময়িকভাবে জনগণের আবেগে বিচলিত হলেও লুই ফিলিপি শেষ পর্যন্ত তাঁর সাবধানী, শান্তিবাদী পররাষ্ট্রনীতি বজায় রাখেন। একমাত্র আলজেরিয়াতে ফ্রান্সের সাফল্য ফরাসিদের জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধারে যথেষ্ট ছিল না। লুই ফিলিপির পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল উদারনৈতিক ইংল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা। কিন্তু ১৮৪৬ সালে স্পেনের রাজবংশের সঙ্গে লুই ফিলিপির পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে তাতেও ফাটল ধরেছিল। ফরাসি জনমানসে এর ফলে রাজার প্রতি অসন্তোষ আরও বেড়েছিল।

১.১.২ বিরোধী গোষ্ঠীর উদ্ভব

এই পরিস্থিতিতে ফ্রান্সে রাজার বিরুদ্ধে ছয়টি গোষ্ঠীকে সংহত হতে দেখা যায়। যেমন—(১) লেজিটিমিস্টিক বা বৈধতাবাদী এই গোষ্ঠীতে ছিল অভিজাত, যাজক, কৃষক ও কিছু বুদ্ধিজীবি যারা লুই

ফিলিপিকে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারী বলে মনে করত। লুই ফিলিপির বুর্জোয়াদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার নীতি কঠোর সমালোচক ছিল তারা। এদের মতে, দশম চার্লসের উত্তরাধিকারী হিসাবে তার নাতিরই ফ্রান্সের সিংহাসন পাওয়া উচিত। উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৩৬ সালে নির্বাসনে থাকাকালীন দশম চার্লসের মৃত্যু হয়েছিল। (২) প্রজাতন্ত্রী—এরা ছিল মূলত বৈপ্লবিক ধ্যানধারণা সম্পন্ন কৃষক, কারিগর ও সাধারণ মানুষ। ১৭৯২ সালের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমর্থক এই গোষ্ঠী ছিল লুই ফিলিপির সরকারের বিরোধী। এর রাজতান্ত্রিক চরিত্র, অগণতান্ত্রিক নীতি এবং বিত্তবানদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা তাদের ঘোরতর অপছন্দ ছিল। এই গোষ্ঠীর সাংগঠনিক দুর্বলতা ছিল। উপযুক্ত নেতৃত্বেরও অভাব ছিল। কিন্তু কলকারখানার শ্রমিকরা ক্রমেই এই মতবাদে আকৃষ্ট হতে থাকে। (৩) সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে একটি বামপন্থী গোষ্ঠী সমাজতন্ত্রী হিসাবে পরিচিত। এদের মধ্যে কেউ কেউ শহুরে শ্রমিকদের অসহনীয় অবস্থা দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সমাজতন্ত্রী লুই ব্লাঁ দাবি করেছিলেন যে, সরকারের উচিত শ্রমিকদের মালিকানা সম্পন্ন সমবায় কারখানা তৈরি করা এবং সব শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী মজুরি পাওয়ার বিষয়টিকে নিশ্চিত করা। অপর এক সমাজতন্ত্রী প্রুধোঁ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও কর্তৃত্বমূলক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সকলের সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। প্রুধোঁ নিজেকে নৈরাজ্যবাদী বলে ঘোষণা করেছিলেন। ব্রিটেনের উইলয়াম গডউইন, জার্মানির ম্যাক্স স্টারনার, নির্বাসিত রুশ বুদ্ধিজীবী মাইকেল বাকুনিন প্রমুখ ছিলেন এই মতবাদের অন্যান্য প্রবক্তা। এরা সব ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধিতা করে রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। লুই ব্লাঁর অনুগামীরা অবশ্য গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে আস্থাশীল ছিল। (৪) ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়—এদের মধ্যে বৈধতাবাদী এবং উদারনীতিবাদী উভয় ধরনের লোক ছিল। বৈধতাবাদীরা পুরনো রাজবংশের শাসন ফিরিয়ে আনার দাবি করত। উদারনীতিবাদীরা জনগণের সার্বভৌমত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থক ছিল এবং 'প্রকৃত ক্যাথলিক উদারনীতিবাদ' ও লুই ফিলিপির 'অন্তঃসারশূন্য উাদরনীতিবাদ'-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করত। এদের মধ্যে কেউ কেউ শ্রমিক শ্রেণির জন্য আইন ও গিল্ড ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি তুলেছিল। কেউ কেউ খ্রিস্টীয় গণতন্ত্রের কথা বলেছিল। তবে বেশির ভাগ ক্যাথলিক, উদারনীতিবাদী বা রক্ষণশীল যাই হন না কেন, লুই ফিলিপির প্রধানমন্ত্রী গুইজোর চরম বিরোধী ছিল। কারণ গুইজোর নীতির ফলে ক্যাথলিক স্কুলগুলির স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। (৫) সংস্কারপন্থী—এরা ছিল প্রধানত মধ্যবিত্ত উদারনীতিবাদী যারা রাজতন্ত্রকে গণমুখী করে তুলতে চাইত। (৬) বোনাপার্টবাদী—এরা নেপোলিয়নের যুগের স্মৃতি রোমন্থন করত। ফ্রান্সের ভেতরে এবং ফ্রান্সের বাইরে নেপোলিয়নের কৃতিত্বে গর্ববোধ করার পাশাপাশি বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের যে কোন মূল্যে শান্তিবাদী হওয়ার চেষ্টার প্রতি এদের নিন্দার মনোভাব ছিল। বিশেষত, ইংল্যান্ডের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা ও যুদ্ধ পরিহারের নীতিতে ফ্রান্সের জাতীয় গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে বোনাপার্টবাদীরা মনে করত।

১.২.৩ গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি

১৮৪৭ সালের মধ্যে রাজা লুই ফিলিপির বিরোধী গোষ্ঠীগুলি অনেক সরব হয়ে উঠেছিল। যার মূলে ছিল, গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপ। গুইজো নির্বাচনে কারচুপি করেছিলেন এবং পার্লামেন্টে

সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য প্রার্থীদের ঘুষ দিয়েছিলেন। সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। এমনকি সমাবেশ বা জমায়েতও নিষিদ্ধ হয়। ফলে গণতান্ত্রিক সংস্কারপন্থীরা নির্বাচন সংস্কারের দাবিতে প্যারিস শহরে এবং প্রদেশগুলিতে 'ভোজসভা' করে তাদের বক্তব্য প্রচার করতে থাকে। প্রজাতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রীরাও এতে যোগ দেয়। এই রকমই একটা বিশাল ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল প্যারিস শহরে, ১৮৪৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে এই ভোজসভা বন্ধ করে দিলে পরিস্থিতি বৈপ্লবিক চেহারা নেয়। ইউরোপের ইতিহাসে এই বিপ্লব ফেব্রুয়ারি বিপ্লব নামে পরিচিত।

১.২.৪ বিপ্লবের ঘটনাবলী

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮ সালে ক্রুদ্ধ শ্রমিক, ছাত্র এবং উদারনীতিবাদীদের একাংশ রাস্তায় নেমে শাসন সংস্কারের দাবি জানাতে থাকে। ঐতিহাসিক লিপসন বর্ণনা দিয়েছেন, 'ফ্রান্সের গণতন্ত্র রাস্তায় নেমে এসেছিল।' পরের দিন প্রধানমন্ত্রী গুইজো জাতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলে তারা তা অমান্য করে জনতার সঙ্গে যোগ দেয়, গুইজো পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সময় একটি ঘটনা বিপ্লবীদের আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে। গুইজোর বাড়ির রক্ষীরা মিছিলকারী জনতার ওপর গুলি চালালে ২৩ জন মারা যায় ও ৩০ জন আহত হয়। এই ঘটনায় জনতা প্রথমে পিছিয়ে এলেও এর পরে শবগুলিকে নিয়ে তারা প্যারিস শহরে মিছিল করে। ২৪ ফেব্রুয়ারি প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড করে শ্রমিকেরা ঘোষণা করে, 'দশম চার্লসের মত লুই ফিলিপিও আমাদের হত্যা করেছে, কাজেই তাকেও দশম চার্লসের কাছে চলে যেতে হবে।' লুই ফিলিপি তার নাতি দশ বছরের বালক প্যারিসের কাউন্টকে সিংহাসনে বসিয়ে মিঃ স্মিথ ছদ্মনামে ইংল্যান্ডে পালিয়ে যান। জনতা প্যারিসের কাউন্টকে অস্বীকার করে একটি সাময়িক সরকার গঠন করে। এই সরকার ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ঘোষণা করে। এই প্রজাতন্ত্র ছিল সমাজতন্ত্রমুখী। বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রী সরকার সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় আইনসভা নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছিল। জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে এতদিন মধ্যবিত্তরা যোগ দিত, এখন তা সকল নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। লুই ব্লাঁর সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার কিছু কিছু কার্যকর হয়েছিল। সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য একটি কমিশন তৈরি করা হয়েছিল।

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী এবং প্যারিস ও অন্যান্য শহরের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। সর্বত্র স্বাধীনতার বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল এবং বিপ্লবের লাল পতাকায় গোটা ফ্রান্স ছেয়ে গিয়েছিল। তবে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পরে ফ্রান্সের যে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রী সরকার তৈরি হয়েছিল তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৮৫২ সালে ফ্রান্সে আবার সম্রাটের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক লিপসন মন্তব্য করেছেন, বিপ্লবেরই একটি শোচনীয় পরিণাম হল, যারা বিপ্লব শুরু করে তাদের পরিকল্পনার বদলে বাস্তব অবস্থা নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। যেমন, ফ্রান্সে প্রত্যেক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই চেষ্টা হয়েছিল জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার। কিন্তু প্রত্যেকবার ফল হয়েছিল সম্রাটের শাসন প্রতিষ্ঠা। ১৮৫২ সালে প্রথম নেপোলিয়নের ভাইপো লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ক্ষমতায় এসেছিলেন।

১.৩ ❑ ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ইউরোপীয় প্রেক্ষিত

১৮৩৩ সালে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে ত্রিশক্তি চুক্তি এবং মেটারনিখের প্রতিক্রিয়াশীল, বিপ্লব বিরোধী দমননীতি সত্ত্বেও মধ্য ইউরোপে উদারনীতিবাদের প্রসার অব্যাহত ছিল। উদারনীতিবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন আঠারো শতকের জ্ঞানদীপ্তির দ্বারা প্রভাবিত। কেউ সহানুভূতিশীল ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের আদর্শের প্রতি, কেউ আবার নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সংস্কারের সুফলভোগী ছিলেন। অনেকে ব্রিটিশ উদারনৈতিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী জাতীয়তবাদী আন্দোলন তাদের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল। উদারনীতিবাদীরা বেশিরভাগই ছিলেন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। মানবতাবাদী জমিদার, প্রগতিশীল যাজক ও অগণিত পেশাজীবী শহুরে সাধারণ মানুষ তাদের সমর্থন করেছিল।

১৮৪৭ সালেই মধ্য ইউরোপে উদারনৈতিক ধ্যানধারণার প্রসার লক্ষ করা যায়। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক জয়েন্ট বা আইনসভাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করলে তৃতীয় এস্টেট পার্লামেন্ট গঠনের দাবি জানিয়েছিল, যে পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজা আইন রচনার ক্ষমতা ভাগ করে নেবেন। সুইজারল্যান্ড বিপ্লবী উদারনীতিবাদীরা উদারনৈতিক সংবিধান চালু করার দাবি তুলেছিল। ইতালিতে পোপ নবম পায়াস উদারনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। টাস্কানির ডিউকও একই ধরনের উদ্যোগ নেন। লোম্বার্ডিতে (যা হ্যাপ্‌সবার্গ সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল) ইতালিয় উদারনৈতিক তামাকের ব্যবসার ওপর অস্ট্রীয় সরকারের একচেটিয়া অধিকারের বিরোধিতা করে সিগারেটের দোকানগুলি বয়কট করে। মিলানেও একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। হাঙ্গেরিতে উদারনীতিবাদীরা সাংবিধানিক সরকার, পুরনো সামাজিক শ্রেণির বদলে করদাতাদের ভোটের ভিত্তিতে গঠিত পার্লামেন্ট, রাজার বদলে পার্লামেন্টের কাছে মন্ত্রীসভার দায়বদ্ধতা, সংবাদপত্রের ও সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, শ্রেণি নির্বিশেষ নাগরিক অধিকার ভোগের সুযোগ, ভূমিদাসপ্রথার অবসান ও জমির মালিকের আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং কোন কোন শ্রেণির করদান থেকে রেহাই বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগের অবসান দাবি করে।

১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে ইউরোপে বৈপ্লবিক আন্দোলনের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। প্রজাতন্ত্র উপনিবেশগুলিতে নিগ্রোদের দাসত্বের অবসান ঘোষণা করে, রাজনৈতিক বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড রদ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকারের (পুরুষদের) ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা বলা হয়। রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ হবে ৪ বছর। একইরকমভাবে আইনসভাও নির্বাচিত হবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের আদলে ফ্রান্সের দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি নিজের ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীসভা গঠনের অধিকারী হবেন। কিন্তু তিনি আইনসভার কোন সিদ্ধান্তে ভেটো প্রয়োগ করতে পারবেন না। পুনর্নির্বাচিত হওয়ার কোন সুযোগও রাষ্ট্রপতির ছিল না। প্রজাতন্ত্রের এইসব উদ্যোগ ইউরোপের উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে উদ্দীপনা জুগিয়েছিল। যদিও প্যারিসের বিপ্লবী সরকার ইউরোপের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে কোন সক্রিয় সহায়তা করেনি।

১.৩.১ বিপ্লবের ঘটনাবলী : অস্ট্রিয়া

১৮৪৮ সালের ১৩ মার্চ ছাত্র এবং শ্রমিকেরা অস্ট্রিয়ার রাজধানী শহরে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছিল। রাজকীয় প্রাসাদ ও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে প্রচুর মানুষ জমায়েত করে। পুলিশও জনগণের পক্ষে চলে যায়। জনতার রোষে মেটারনিখের বাসস্থান ভস্মীভূত হয়। মেটারনিখ লন্ডনে পালিয়ে যান। এর কিছু দিনের মধ্যেই বৈপ্লবিক উদারনীতিবাদ অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া, ইতালি, জার্মানি, ডেনমার্ক এবং ডাচ নেদারল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্য ইউরোপে এর প্রসার ঘটেছিল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

মেটারনিখ লন্ডনে আশ্রয় নেওয়ার পর পরই সম্রাট প্রথম ফার্দিনান্দ ভিয়েনায় সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। প্রতিশ্রুতি দেন নতুন সংবিধানের। হাঙ্গেরি ও লোম্বার্ডি—ভেনেশিয়া ব্যতীত গোটা অস্ট্রিয়ার জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠনের কথা বলা হয়। নাগরিক অধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। এছাড়া জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনেও সম্রাট অনুমতি দেন। কিন্তু ভিয়েনায় জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট উদারনীতিবাদীরা নিজেরাই একটি কমিটি তৈরি করে। এরা সম্রাটের দাক্ষিণ্যে পাওয়া কোন সংবিধানকে মেনে নিতে রাজি হয় না। কারণ এর অস্তিত্ব যে সম্রাটের ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হবে একথা বলাই বাহুল্য। বরং তারা গণসার্বভৌমত্বের ভিত্তির ওপর গঠিত সাংবিধানিক সরকারের দাবি তোলে। উদারনীতিবাদী বিপ্লবীরা সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠনের উদ্যোগ নিলে সম্রাটের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ফার্দিনান্দ কার্যত ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন এবং বাধ্য হয়ে টাইরলের প্রত্যন্ত প্রদেশ ইনসব্রুকে আশ্রয় নেন। ১৮৪৮ সালের জুলাই মাসে ভিয়েনায় গণপরিষদের উদ্যোগে সংবিধান রচনার কর্মকাণ্ড শুরু হয়। ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘোষণা ছিল এই পরিষদের প্রথম পদক্ষেপ।

১.৩.২ হাঙ্গেরি

মেটারনিখের অস্ট্রিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং ফার্দিনান্দের ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ার ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তার সুযোগ নিয়ে হাঙ্গেরির উদারনীতিবাদীরা বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলে। সংবাদপত্রের ওপর থেকে বিধিনিষেধের অবসান ঘটে। গঠিত হয় জাতীয় রক্ষীবাহিনী। ভূমিদাসপ্রথা, সামন্তপ্রভুদের নানা সুযোগ-সুবিধা এবং অভিজাতদের কর ছাড় পাওয়ার দিন শেষ হয়। বুদাপেস্টে ডায়েট বা আইনসভার বাৎসরিক অধিবেশন বসবে বলে স্থির হয়। এতে জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধিদের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত করদাতাদের প্রতিনিধিরাও ছিল। সম্রাট ফার্দিনান্দকে অপসারণের কোন পদক্ষেপ আনুষ্ঠানিকভাবে না নেওয়া হলেও বুদাপেস্টের উদারনৈতিক সরকার একটি জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও হাঙ্গেরির আচরণ একটি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রের মতই ছিল।

১.৩.৩ বোহেমিয়া

পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে প্রাগে ও চেক এবং জার্মান জনগোষ্ঠী স্থানীয় ডায়েটকে পার্লামেন্টে রূপান্তরিত করার দাবি তোলে। জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়। এপ্রিল মাসে সম্রাট

বোহেমিয়ার জন্য স্বশাসিত সরকারের দাবি মেনে নেন। ১৮৪৮-এরই জুন মাসে চেক উদারনীতিবাদী ও জাতীয়তাবাদীরা প্রাগ শহরে চেক, শ্লোভাক, পোলিশ, যুগোশ্লাভ এবং রুশ প্রতিনিধিদের নিয়ে প্যান-শ্লাভিক কংগ্রেস আহ্বান করে। উদ্দেশ্য ছিল শ্লাভ জনগোষ্ঠীর, বিশেষত হ্যাপ্‌সবার্গ সাম্রাজ্যের ভেতর যারা রয়েছে, তাদের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিকে তুলে ধরা।

১.৩.৪ ইতালি

প্যারিসে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হওয়ার আগেই ইতালিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। ১৮৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে সম্রাট ফার্দিনান্দ উদারনৈতিক সংবিধান গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। ফ্রান্সে বিপ্লবের পর পরই সার্ডিনিয়া-পিয়েডমন্টের রাজা চার্লস অ্যালবার্ট (সার্ডিনিয়া-পিয়েডমন্ট ছিল ফ্রান্সের সবচেয়ে কাছে অবস্থিত ইতালীয় রাজ্য এবং এর ওপর অস্ট্রিয়ার প্রভাব ছিল তুলনায় কম) ১৮৪৮ সালের ৪ মার্চ একটি উদারনৈতিক সংবিধান কার্যকর করেন। এতে করদাতাদের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট, মন্ত্রীসভার দায়িত্বশীলতা, সামন্ততান্ত্রিক প্রথার বিলোপ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলা হয়েছিল। ভিয়েনায় মেটারনিখের শাসনের অবসান ঘটলে উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী ইতালির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। মিলান শহরে জনতা পাঁচ দিন ধরে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই করে। অস্ট্রীয় জেনারেল তার ১৮,০০০ সেনা নিয়ে মিলান থেকে পালাতে বাধ্য হয়। অস্ট্রিয়া থেকে লোম্বার্ডি সার্ডিনিয়া রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হলে জনগণ উল্লসিত হয়ে ওঠে। ভেনিস শহরে জনতা জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক ড্যানিয়েল ম্যানিনের নেতৃত্বে অস্ট্রীয় অফিসার ও সেনাবাহিনীকে বহিষ্কার করে। স্বাধীন ভেনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের পুনঃস্থাপনের কথা ঘোষিত হয়।

উত্তর ইতালির চারটি শহর তখনও অস্ট্রীয় সেনা দখলে রেখেছিল। উদারনীতিবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের অন্যতম দাবি ছিল শহরগুলিকে উদ্ধার করা। এই দাবির চাপে সার্ডিনিয়ার রাজা চার্লস অ্যালবার্ট ১৮৪৮ সালের মার্চ মাসে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সিসিলি, পোপের রাজ্য, টাস্কানি এবং লোম্বার্ডি থেকে বহু মানুষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অ্যালবার্টের ৬০,০০০ সেনার সঙ্গে আরও সাধারণ মানুষ যোগ দেয়। জনগণের উন্মাদনা দেখে সেসময় মনে হয় যে, ইতালির জাতীয় স্বাধীনতা এবং উদারনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

১.৩.৫ জার্মানি

জার্মানিতে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি চরম রূপ নিয়েছিল হোহেনজোলার্ন প্রাশিয়াতে। চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের বিরুদ্ধে জনগণ বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ১৮৪৮ সালের মার্চ মাসে রাস্তায় রাস্তায় জনতা ব্যারিকেড তৈরি করে সরকারপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে নামে। উত্তেজনার প্রশমন ঘটাতে উইলিয়াম প্রাশিয়ার পার্লামেন্ট আহ্বান করার এবং জার্মান জাতীয় ইউনিয়ন তৈরির আশ্বাস দেন। কিন্তু শ্রমিক ও ছাত্ররা রাজাকে অভিনন্দন জানাতে প্রাসাদের দিকে এগোতে থাকলে রাজকীয় বাহিনী তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। এর পরিণামে রাস্তায় রাস্তায় জনতা ও সরকারি বাহিনীর সংঘর্ষ আরও বেড়ে যায়। প্রায় ২০০ জন এই সংঘর্ষে মারা যায়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা রাজাকে বাধ্য করে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার

করতে। শুধু তাই নয়, গণপরিষদ ও উদারনৈতিক মন্ত্রীসভা গঠনের আশ্বাসও দেওয়া হয়। রাজা স্বয়ং রাজধানীর পথে তিনরঙা (কালো, লাল ও সোনালি রংয়ের) বিপ্লবী পতাকা উড়িয়ে কুচকাওয়াজ করেন। এভাবে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার পাশাপাশি রাশিয়ার জার নিকোলাসকে গৌরবময় জার্মান বিপ্লবের প্রশংসা করে চিঠিও লিখেছিলেন উইলিয়াম। প্রাশিয়ার সংবিধান রচনার জন্য মে মাসে বার্লিনে গণপরিষদের অধিবেশন বসে।

বিপ্লবের ঢেউ ছোট ছোট জার্মান রাজ্যগুলোকেও স্পর্শ করেছিল। ব্যাভেরিয়াতে রক্ষণশীল রাজা প্রথম লুইস তার ছেলে দ্বিতীয় ম্যাকমিলানকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় ম্যাকমিলান সংবিধানের উদারনীতিকরণের শপথ নিয়েছিলেন। ব্যাডেন, উরটেমবার্গ, স্যাক্সনি এবং অন্যান্য বেশিরভাগ রাজ্যেই রাজারা সাংবিধানিক সরকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মেনে নিয়েছিলেন।

১.৩.৬ ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ড

ডেনমার্ক এবং নেদারল্যান্ডে নতুন পরিবর্তনের দাবি উঠেছিল। কোপেনহেগেনের উদারনীতিবাদী বিপ্লবীরা রাজার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। ফলে, ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডারিক সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন। এটা ছিল ১৮৪৮ সালের মার্চ মাস। অক্টোবরের মধ্যেই পরিষদের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে সংবিধানের খসড়া তৈরিতে হাত দেয়। মধ্যবিত্ত করদাতাদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টে যাবে বলে স্থির হয়। রাজাও এতে সম্মত হন। ১৮৪৯ সালের জুন মাসে নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয়। নেদারল্যান্ডে রাজা দ্বিতীয় উইলিয়ামই উদারনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। ১৮৪৮ সালের অক্টোবরে সংবিধান চালু করার সিদ্ধান্ত হয়। ঠিক হয় যে, সম্পন্ন নাগরিকদের ভোটে পার্লামেন্টে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবে।

১.৩.৭ ফ্রাঙ্কফুর্টে জার্মান জাতীয় সভা

উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা ছিল পরস্পর সংযুক্ত। মধ্য ইউরোপে উদারনৈতিক আদর্শের আপাত সাফল্য এবং অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও অন্যান্য জার্মান রাজ্যগুলিতে উদারনৈতিক মন্ত্রীসভার নীতি কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। এমন এক ঐক্যবদ্ধ জার্মান ইউনিয়নের কথা ভাবা হল যার চরিত্র হবে উদারনৈতিক। এবং এর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হবে। ১৮৪৮ সালের এপ্রিলে ফ্রাঙ্কফুর্টে জার্মান রাষ্ট্রসংঘের ডায়েট জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জার্মান জাতীয় মহাসভা গঠনের প্রস্তাব দেয়। এই জাতীয় মহাসভার কাজ হবে সমগ্র জার্মানির জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করা। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং উদারনীতিবাদীরা বিপুল সমর্থন লাভ করে। মে মাসে ফ্রাঙ্কফুর্টে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসে। আগেকার ডায়েট বাতিল হয়। জাতীয় উন্মাদনা ও উদারনীতিবাদী ধ্যানধারণার জনপ্রিয়তা লক্ষ করে জাতীয় মহাসভা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় জার্মান সাম্রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। সাময়িকভাবে উদারনীতিবাদী হ্যাপ্‌সবার্গ শাসক অস্ট্রিয়ার জন আর্চডিউককে প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে নির্বাচন করা হয়। জাতীয় মহাসভার অধিকাংশেরই মত ছিল নতুন জার্মানিতে অস্ট্রিয়াকে (গোটা অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে নয়, শুধুমাত্র জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চল) অন্তর্ভুক্ত করার। জার্মানিতে

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারে রাজা ও পার্লামেন্ট দুই-ই থাকবে এবং অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার রাজাদের মধ্যেই কেউ সম্রাট হবেন বলে স্থির হয়। পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের একটিতে থাকবেন রাজ্যগুলির প্রতিনিধি ও অন্যটিতে জনগণের। মন্ত্রীসভার দায়বদ্ধতা থাকবে পার্লামেন্টের প্রতি। এইসব চিন্তাভাবনা সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা এবং জার্মানির জনগণ ও রাজাদের প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাড় করা ছিল দুরূহ কাজ। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট প্রায় একবছর এইসব প্রচেষ্টায় ব্যয় করে। অস্ট্রিয়ার রাজা না প্রাশিয়ার রাজা কে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে থাকবেন তা নিয়ে বহু আলাপ-আলোচনা চলে। ইতিমধ্যে জাতীয় মহাসভা 'জার্মান জাতির মৌলিক অধিকারগুলি' ঘোষণা করে। এটি হল ইউরোপীয় উদারনীতিবাদের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ।

১.৪ ❑ বিপ্লবের ব্যর্থতা

মধ্য ইউরোপে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ছিল মূলত শহুরে, মধ্যবিত্ত মানুষের আন্দোলন। পরে অবশ্য গ্রামাঞ্চলেও বিপ্লবের ধারণা প্রসারিত হয়। ১৮৪৮ সাল নাগাদ জার্মানি, ইতালি এবং অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যে শিল্পের বিকাশ তেমন কিছু ছিল না। জনসংখ্যার বেশির ভাগই ছিল গ্রামীণ, জমিতে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। শহুরে লোকদের ওপর তাদের তেমন আস্থা ছিল না। বরং তাদের ওপর প্রভাব ছিল গ্রামের জমিদার, যাজক এবং সরকারি কর্মচারিদের, বেশির ভাগ জমিদার ও পাদ্রী ছিল বিপ্লবের ও উদারনীতিবাদের বিরোধী ; সরকারি কর্মচারি ও সেনাবাহিনীর লোকেরা ঘন ঘন পরিবর্তন সাপেক্ষে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থার সঙ্গো অভ্যস্ত ছিলেন না। ফলে এই ব্যবস্থা তাদের অভিপ্রেতও ছিল না। শহুরে লোকেরাও ঐক্যবদ্ধভাবে বিপ্লবকে নিরন্তর সমর্থন করে যায়নি। দ্বন্দ্ব ছিল মধ্যবিত্তদের সঙ্গো শহুরে শ্রমিকদের, নরমপন্থীদের সঙ্গো চরমপন্থী বিপ্লবীদের। নরমপন্থীরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। চরমপন্থীরা বিপ্লবের পথ নিলে নরমপন্থীদের কাছে স্বাধীনতা থেকে শৃঙ্খলা এবং সুরক্ষাই বেশি আকাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছিল। উদারনীতিবাদীরা জোর দিয়েছিল দেশপ্রেমের আদর্শের ওপর। কিন্তু এই অনুভূতিকে কাজে লাগিয়েই রক্ষণশীলেরা জনগণের সমর্থন আদায় করে নিয়েছিল। রক্ষণশীল সমাজ ও সরকারের প্রধান স্তম্ভগুলি বিপ্লবে নাড়া খেলেও অচিরেই পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়েছিল।

১.৪.১ বোহেমিয়ায় বিপ্লব বিরোধী সাফল্য

বিপ্লব বিরোধী প্রচেষ্টা প্রথম সাফল্য পায় বোহিমিয়াতে। প্রাগে চেকদের বিপ্লবী আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ অস্ট্রিয় গভর্নর ও সেনাপ্রধান শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। পরিণামে আন্দোলন স্তব্ধ হয়, প্যান-শ্লাভিক কংগ্রেস ভেঙে দিয়ে বিপ্লবী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং উদারনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। বোহেমিয়াতে জারি হয় সামরিক শাসন।

১.৪.২ ইতালি

ইতালির রাজ্য সার্ডিনিয়াতে চার্লস অ্যালবার্টের বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কারণ পোপ এবং সিসিলির রাজা অ্যালবার্টকে সেনা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল। বরং এর আগে যাদের পাঠানো হয়েছিল

তাদেরও প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছিল। পোপ নবম পায়াস মনে করেন, যুদ্ধের পথে জাতীয় ঐক্য সাধন আর সম্ভব নয়। ফার্দিনান্দ সিসিলিতে যে নতুন সংবিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রদ করতে এবং স্বৈরাচারী শাসন পুনঃস্থাপনে সেনাবাহিনীর ব্যবহারে আগ্রহী হন। ফলে, ১৮৪৮ সালের জুলাই মাসে চার্লস অ্যালবার্ট অস্ট্রীয় জেনারেলের হাতে পরাজিত হন। লোম্বার্ডিও তাঁর হাতছাড়া হয়। অস্ট্রিয়া লোম্বার্ডি দখল করে নেয়।

স্বাধীনতা ও ঐক্যের সম্ভাবনা নষ্ট হলে চরমপন্থী বিপ্লবীদের ক্ষোভ চরমে ওঠে। রোমে এক উদারনীতিবাদী মন্ত্রীকে হত্যা করা হয়। পোপ নবম পায়াস প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যান। ১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে মাৎসিনির নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রীরা ফ্লোরেন্স এবং নেপলসে আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে। টাস্কানি এবং সিসিলিকে নিরঙ্কুশ প্রজাতন্ত্রে পরিণত করা হয়। প্রজাতন্ত্রীদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়ে সার্ডিনিয়ার রাজা চার্লস অ্যালবার্ট অস্ট্রিয়ার সঙ্গে আবার যুদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। বাধ্য হন অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এক চরম অপমানজনক চুক্তিতে সই করতে। অস্ট্রীয় বাহিনী বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে। চার্লস অ্যালবার্ট তাঁর ছেলে দ্বিতীয় ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। অস্ট্রিয়া ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে বাধ্য করে অস্ট্রো-ইতালি সম্পর্কে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে। ১৮৪৯ সালের মে মাসে সিসিলির রাজা এবং টাস্কানির গ্র্যান্ড ডিউক তাঁদের সিংহাসন ফিরে পান। অস্ট্রীয় বাহিনী ভেনিস দখল করে নেয়। রোমেও ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে যায়। ফরাসি ক্যাথলিকরা ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির কাছে রোমে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছিল। ইতালিতে অস্ট্রিয়ার এতখানি প্রভাব বিস্তার করাটাও ফ্রান্সের মনঃপূত ছিল না। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি রোমে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। ফলে, ১৮৪৯ সালের জুন মাসে ম্যাৎসিনির প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে। পোপ নবম পায়াস স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। ১৮৪৯ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি ইতালিতে রক্ষণশীল নিয়ন্ত্রণ জারি হয়।

১.৪.৩ অস্ট্রিয়া

অস্ট্রিয়াতে রক্ষণশীলরা ক্ষমতা ফিরে পায়। ১৮৪৮ সালের জুনে বোহেমিয়া এবং জুলাইয়ে উত্তর ইতালিতে অস্ট্রীয় সেনানায়কদের বিপ্লব বিরোধী সাফল্য অস্ট্রিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে উৎসাহ জোগায়। ইনসব্রুক থেকে ফার্দিনান্দও বিপ্লব বিরোধী কার্যকলাপে যোগ দেন। ভিয়েনায় রাজতন্ত্রের প্রতি অনুগত সেনাপ্রধানরা উদারনীতিবাদী বিপ্লবীদের দমনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। বিপ্লবের সময় হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে লুই কসুথের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী, উদারনৈতিক সরকার গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই সরকারের সামনে অ-ম্যাগিয়ার জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভ প্রধান সমস্যা হয়ে ওঠে। কারণ সরকার এদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের দাবি মেনে নেয়নি। বরং এদের ওপর ম্যাগিয়ার জনগোষ্ঠীর আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ম্যাগিয়ার বিরোধী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন উদারনীতিবাদী। এই উদারনীতিবাদীরা ক্রোয়েশিয়ান সৈনিক, দেশপ্রেমিক জোশেফ জেলাসিককে তাদের নেতা হিসেবে পেয়েছিল। জেলাসিক ক্রোয়েশিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সম্রাট ফার্দিনান্দের নির্দেশে শ্লাভ সেনাবাহিনী নিয়ে হাঙ্গেরি

আক্রমণ করেন। ভিয়েনা থেকে জার্মান রাজকীয় বাহিনী ওই বাহিনীর সঙ্গো যোগ দিয়েছিল।

ভিয়েনার উদারনীতিবাদীরা বুদাপেস্টের উদারনীতিবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। জেলাসিককে সাহায্য করতে জার্মান বাহিনী যাতে না যেতে পারে তার জন্য তারা বহু পরিকল্পনা করেছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফাঁসিতে ঝোলানোর মত নানা চরমপন্থী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এদের চাপে সেনাবাহিনী পর্যন্ত ছত্রভঙ্গা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুদিক থেকে দুই অস্ট্রীয় জেনারেলের আক্রমণে ভিয়েনার উদারনীতিবাদীদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বেশ কিছু বিপ্লবীর ফাঁসি হয়। অস্ট্রিয়ার উদারনৈতিক সরকারের জায়গা নেয় নতুন মন্ত্রীসভা। যার নেতৃত্বে থাকেন আপাদমস্তক রক্ষণশীল প্রিন্স ফেলিক্স।

১.৪.৪ হাঙ্গোরি

প্রিন্স ফেলিক্স দুজন সেনানায়কের অধীনে ক্রোয়েশিয়ান ও জার্মান বাহিনী হাঙ্গোরি পাঠিয়েছিলেন। ম্যাগিয়ার জনগোষ্ঠীর নেতা লুই কসুথ ১৮৪৯ সালের এপ্রিলে হাঙ্গোরির স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়েছিল স্বদেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ জনতাকে নিয়ে। কিন্তু কসুথের আন্দোলন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাসের সাহায্য পেয়ে অস্ট্রিয়ার বাহিনীর আক্রমণ আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল। জার নিকোলাস পোল্যান্ডে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য মধ্য ইউরোপের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৪৯ সালের আগস্ট নাগাদ হাঙ্গোরি সম্পূর্ণভাবে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সেনাবাহিনীর অধীন হয়েছিল। হাঙ্গোরির প্রজাতন্ত্রের পতন হয়। কসুথ হাঙ্গোরি ত্যাগ করেন। বিপ্লবীদের হয় মৃত্যুদণ্ড নয় নির্বাসন দেওয়া হয়। উদারনৈতিক সংবিধান বাতিল হয়। হাঙ্গোরিকে আবার অস্ট্রিয়ায় একটি প্রদেশ হিসেবে দেখা হতে থাকে।

১.৪.৫ প্রাশিয়া

অস্ট্রিয়ায় রক্ষণশীলদের জয় প্রাশিয়ার জমিদার শ্রেণি, প্রোটেস্ট্যান্ট যাজক, সামরিক ও বে-সামরিক অফিসার এবং কম রক্ষণশীল শহুরে ও গ্রামীণ মানুষকে উৎসাহিত করেছিল। ১৮৪৮ সালের গ্রীষ্মকালের শেষে ফ্রেডারিক চতুর্থ উইলিয়ামও উদারনীতিবাদীদের বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। ইতিপূর্বে দেশপ্রেমের জোয়ারে জার্মানি যখন উত্তাল সেসময় ফ্রাঙ্কফুর্টের জাতীয় মহাসভার অনুরোধে ফ্রেডারিক ডেনমার্কের সঙ্গো শ্লেজউইগ হলস্টিনের অধিকার নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এখন যুদ্ধ প্রত্যাহার করার জন্য তাঁর ওপর বৈদেশিক চাপ আসতে থাকে। প্রাশিয়ার ভেতরে রক্ষণশীলরাও গণপরিষদের কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য চাপ দিতে থাকে। কেননা, উদারনীতিবাদীরা গণপরিষদে অভিজাত শ্রেণির বিলুপ্তির, রাজাকে নামমাত্র শাসকে পরিণত করার এবং ভিয়েনাতে বিপ্লবীদের সাহায্যের নীতি নিয়েছিল।

ফ্রেডারিক চতুর্থ উইলিয়াম উদারনৈতিক মন্ত্রীসভাকে সরিয়ে দিয়ে গোঁড়া রক্ষণশীলদের মন্ত্রীসভায় আনেন। মন্ত্রীসভার নেতৃত্বে ছিলেন কাউন্ট ব্র্যান্ডেনবার্গ। গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া হল, রাজা নিজের মত করে সংবিধান তৈরি করলেন। মূল রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকল রাজা এবং মন্ত্রীসভার হাতে ; যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজা পার্লামেন্টের সঙ্গো পরামর্শ করবেন ; পার্লামেন্টে সমাজের উঁচুতলার মানুষ

ও সম্পন্ন মধ্যবিত্তরা প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে বলে স্থির হয়।

প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়াতে রক্ষণশীলদের জয় ফ্রাঙ্কফুর্টের জার্মান জাতীয় সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ উদারপন্থীদের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছিল। ১৮৪৯ সালের এপ্রিল মাসে তারা যে সংবিধান ঘোষণা করে তাতে ঐক্যবন্ধ জার্মানির প্রধান হিসেবে প্রাশিয়ার রাজার কথা বলা হয়। কারণ, তাদের আশা ছিল প্রাশিয়ার রাজা জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণায় কিছুটা প্রভাবিত হওয়র ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত উদারনীতিবাদীদের প্রতি ততটা বিরূপ হবেন না।

১.৪.৬ ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের ব্যর্থতা

প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়াম দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কারণ তিনি জানতেন যে, ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের প্রস্তাব গ্রহণ করলে অচিরেই তিনি ব্যাভেরিয়া, উরটেমবার্গ, স্যাক্সনি, হ্যানোভারের রাজাদের এবং অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্সবার্গ সম্রাটের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠবেন। ফ্রেডারিক ১৮৪৯ সালে সম্রাটের পদ প্রত্যাখ্যান করেন। ফ্রাঙ্কফুর্টের সংবিধান বাতিল করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় বিপ্লবীরা ১৮৪৯ সালের মে মাসে জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চলে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রাশিয়ার সরকারি সেনাবাহিনীর তাণ্ডবে সেসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বহু বিপ্লবীর জেল হয় ; অনেককে নির্বাসনে পাঠানো হয়। চতুর্থ ফ্রেডারিক কিন্তু প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান জাতীয় ইউনিয়ন তৈরির আশা তখনও পোষণ করতেন। তাঁর উদ্যোগে ১৮৫০ সালে রাজাদের প্রতিনিধি সভা এবং জাতির প্রতিনিধিত্বকারী পার্লামেন্টকে নিয়ে এরফুর্টে অধিবেশন বসে। সতেরটি জার্মান রাজ্য এতে প্রতিনিধি পাঠায়। কিন্তু অস্ট্রিয়ার সামরিক বাহিনী এই উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়। ১৮৫০ সালে ফ্রেডারিকের সঙ্গো অস্ট্রিয়ার ওলমুজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অস্ট্রিয়া জার্মান রাষ্ট্রসংঘের ওপর আবার নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। আনুষ্ঠানিকভাবে 'জার্মান-জাতির মৌলিক অধিকারের' ঘোষণা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। যাতে বৈপ্লবিক ধ্যানধারণাকে গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য বিশেষ কমিশন তৈরি করা হয়।

১.৫. ❑ ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ধরন বা প্যাটার্ন

১৮৪৮ সালে শুরু হয়ে ১৮৯৩-১৮৫০ সাল জুড়ে ফ্রান্স ও মধ্য ইউরোপে বিপ্লবী কার্যকলাপ এত বিচিত্র রকমের ছিল যে তাকে একটিই বিপ্লব বলা যায় কিনা তা নিয়ে সংশয় হতে পারে। কিন্তু উৎপত্তি, লক্ষ্য, গতিধারা এবং পরিণামগত দিক থেকে আবার কিছু মিলও ছিল। বৈচিত্র্যের কথা বলতে গিয়ে ডেভিড টমসন দেখিয়েছেন এতগুলি ইউরোপীয় রাষ্ট্রে সরকার কেন বৈপ্লবিক আন্দোলনের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল তার ব্যাখ্যা স্থানভেদে ভিন্ন। ফ্রান্স ও ইতালিতে রাজনৈতিক হতাশা থেকে সরকারের প্রতি আনুগত্যহীনতার জন্ম হয়েছিল। জার্মানি বা অস্ট্রিয়ার ছবিটা ঠিক এরকম ছিল না। অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গোরিতে আবার সামন্ততন্ত্র বিরোধী মানসিকতা ছিল তুঙ্গো। ফ্রান্স ও ইতালিতে পরিস্থিতি হুবহু সেরকম ছিল না। পূর্ব ইউরোপে শিল্পায়ন এবং সমাজতন্ত্র রাজনৈতিক বিক্ষোভের মূলে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়নি। যদিও রেলপথ প্রবর্তনের কিছু প্রভাব ছিল। সর্বত্রই বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এবং

ছাত্ররা সক্রিয় হয়েছিল। অবশ্য ডেভিড টমসনের মতে ভীতসন্ত্রস্ত শাসকেরা এদের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছিল, বাস্তবে তা ততটা ব্যাপক ছিল না। বিদ্রোহীরাও কৃষক বা শ্রমিকদের নিয়ে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার সময় নিজেদের ক্ষমতাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করত। জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার তুলনায় ইতালি ও ফ্রান্সে গুপ্ত সমিতিগুলি অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। এসব বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ ও পরিণতিতে কিছু সাদৃশ্য ছিল। ডেভিড টমসন বিপ্লবের তিনটি প্রধান প্যাটার্ন বা ধরন লক্ষ করেছেন। যেমন, স্থান ও কালের, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্যাটার্ন। সময়ের বিচারে ফ্রান্স ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে বিপ্লব হয়েছিল ১৮১৫ সালের ভিয়েনা চুক্তির এক প্রজন্ম পরে। অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এই চুক্তির বিরোধিতা করা ও একে নাকচ করে দেওয়া। স্থানগত দিক থেকে বিপ্লবের দুটি ঝটিকা কেন্দ্র ছিল ফ্রান্স ও ইতালি। ইতালির অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে দক্ষিণ ইতালির পালারমো ও অন্যান্য শহরে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৪৯ সালের প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলনে ইতালি এগিয়ে ছিল। সারা ইউরোপে যখন বিপ্লবের জোয়ার চারটি দেশ তা থেকে মুক্ত ছিল। পশ্চিমে ইংল্যান্ড ও বেলজিয়াম, পূর্বে রাশিয়া ও পোল্যান্ড। বিপ্লবের দ্বিতীয় ছকটি হল আর্থ-সামাজিক। অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্প ও পরিবহনে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সঙ্গো বিপ্লবী আদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। উৎপত্তি ও অনুপ্রেরণার দিক থেকে বলা যায়, ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ছিল শহুরে বিপ্লব। শহরের শিল্পশ্রমিক ও মধ্যবিত্ত পেশাজীবীরা বিপ্লবে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। নেতৃত্ব দিয়েছিল অধ্যাপক, সাংবাদিক, ছাত্র ও কবিরা। নেমিয়ার এই বিপ্লবকে 'বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব' বলেছেন। এসময় ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল। এই বিপ্লবের তৃতীয় প্যাটার্নটি ছিল রাজনৈতিক। বিপ্লব প্রমাণ করেছিল ইউরোপের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক আদর্শ হল জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদীরা নতুন জাতিরাষ্ট্র গঠনে আগ্রহী ছিল। উদারনীতিবাদী ও গণতন্ত্রীরাও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নতুন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়তে চেয়েছিল। এদের মধ্যে ঐক্য ও বন্ধুত্ব ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ১৮৪৮-৫০ কালপর্বে এই দুই গোষ্ঠী পরস্পর সহযোগী হলেও ১৮৫০-এর পর এই বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

১.৬ ❑ অনুশীলনী

১. ফ্রান্সে বুর্জোয়া রাজতন্ত্র ক্ষমতায় টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়েছিল কেন?
২. ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পটভূমি আলোচনা করুন।
৩. ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
৪. ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের প্রকৃতি আলোচনা করুন।

১.৭ ❑ সহায়ক বই

১. Thomson David—Europe Since Napoleon.

২. Hayes C. J. H.—Modern Europe to 1870.

৩. Lipson E.—Europe in the XIXth & XXth Centuries. 1815-1939.

৪. Harman Chris—A People's History of The World.

৫. Stearns P. N. & Chapman H.—European Society in Upheaval Social History Since 1750.

৬. Ketelby—History of Modern Times.

৭. Blanning T.C.W.—The Oxford History of Modern Europe.

৮. Kranzberg M.—1848 : A Turning Point.

একক ২ ❑ ইউরোপীয় রাজনীতির ওপর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব

গঠন

২.০ প্রস্তাবনা
২.১ জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা
২.২ উদারনীতিবাদের প্রসার
২.৩ গণতন্ত্রের ধারণার ব্যাপ্তি
২.৪ সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা
২.৫ অনুশীলনী
২.৬ সহায়ক বই

২.০ ❑ প্রস্তাবনা

১৭৮৯ সাল ছিল এক নতুন যুগের সূচনাপর্ব। ফরাসি বিপ্লবের সমসাময়িক কাল থেকেই এমন একটি ধারণা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এমনও বলা হয়ে থাকে যে, ১৭৮৯-এর বিপ্লব পরের ১০০ বছরের ইউরোপের ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছিল। বিপ্লবের আদর্শ ও ধ্যানধারণা পরবর্তী শতকের ইতিহাসে ফিরে ফিরে দেখা দিয়েছে। ঐতিহাসিক লিপসন ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবকে ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের পরিপূরক বলেছেন। ডেভিড টমসন ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে দেখেছেন ১৭৮৯-এর বিপ্লবের সচেতন পুনরাবৃত্তি হিসেবে। রাজনীতির ভাষা থেকে প্রতিষ্ঠান—সমস্ত ক্ষেত্রেই আসে নতুন পরিবর্তন। ১৭৮৯ সালে গণতন্ত্র কথাটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হত, আর এটাই আবার ১৯১৯ সালে বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম সবচেয়ে বড় যুদ্ধের বিজয়ীদের উচ্চ আদর্শে পরিণত হয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে 'রেভলিউশন' বা বিপ্লব কথাটি নতুন ব্যঞ্জনা পেয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এর অর্থ, আরো প্রসারিত হতে থাকে। ১৭৮৯ সালের অর্ধশতক পরে কার্লাইল লিখেছিলেন, ফরাসি বিপ্লব সম্পূর্ণ হয় নি। আরও দশ বছর পরে তকভিল বললেন, বিপ্লবের প্রবাহ নিরন্তর বহমান। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের গোড়ার দিকে ফ্রান্সের বিরোধী দলনেতা থিয়ের জনগণকে আশ্বস্ত করার জন্য বলেছিলেন, পরিস্থিতি যদি নরমপন্থীদের আয়ত্তের বাইরেও চলে যায় তাহলেও কোন অবস্থাতেই তিনি বিপ্লবের আদর্শ ছাড়তে পারবেন না। এমনকি এর বহুকাল পরে ইংল্যান্ডের জন মর্লে, বিপ্লবী হিসাবে যাঁর আদৌ কোন তকমা ছিল না, ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর উপলব্ধি, "যেখানেই কান পাতি বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যায়।" বৈপ্লবিক পরিকল্পনা আর গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা উনিশ শতকে ইউরোপের রাজনীতির অঙ্গা হয়ে উঠেছিল। এযুগের সবচেয়ে বড়ো শহুরে অভ্যুত্থান ছিল ১৮১৭ সালের প্যারি কমিউন। বহু বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিল ইউরোপ। কার্বোনারি সংগঠন থেকে প্রথম আন্তর্জাতিক, অটোম্যান বল্কান অঞ্চলের আধা-অপরাধী দস্যুদল থেকে সার্বিয়ার ব্ল্যাক হ্যান্ড। এই অধ্যায়টিতে ইউরোপীয় রাজনীতির ওপর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব আলোচনা করা হল।

২.১ ❑ জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা

১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতির মুখ্য বৈশিষ্ট্য জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব। ই. জে. হব্‌সবমের মতে অর্থনৈতিক প্রগতি, উদারনীতিবাদ, গণতন্ত্রের ধারণা বিকশিত হলেও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। ১৮৪৮-এর জার্মান, ইতালিয়, হাঙ্গেরিয়, পোল, রুমানিয়—সকলেই তাদের স্বাধীনতার অধিকার ঘোষণার, নিজের জাতির সব সদস্যকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠনের দাবি উত্থাপনের এবং অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা পেয়েছিল। ফ্রান্স সেসময় এক স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র।

১৮৪৮-এর বিপ্লব ব্যর্থ হল। কিন্তু পরের ২৫ বছরে ইউরোপীয় রাজনীতিতে জাতিয়রাষ্ট্রের দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। জাতি-রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ছিল আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর একই 'জাতি' হিসাবে স্বীকৃতি, যা নির্ধারিত হয় তাদের অতীত ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, নৃতাত্ত্বিক গঠনগত সাদৃশ্য বিচারের মাধ্যমে। কোথাও বিপ্লবের পথে, কোথাও আবার বিপ্লবের পথ অনুসরণ ব্যতিরেকেই ইতালি এবং জার্মানি যথাক্রমে স্যাভয় এবং প্রাশিয়ার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৮৬৭ সালে হাঙ্গেরি স্বায়ত্তশাসন পায়। দুটো ড্যানিয়ুব অঞ্চল এক হওয়ায় রুমানিয়া রাষ্ট্র হয়ে উঠল। পোল্যান্ড ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে সেরকম কোন ভূমিকা নিতে পারেনি। ১৮৬৩ সালের অভ্যুত্থানেও স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য পেতে ব্যর্থ হল।

ইউরোপের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তেও 'জাতীয় সমস্যা' প্রবল আকার নিয়েছিল। আয়ারল্যান্ডের ফেনিয়রা এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে সামিল হয়েছিল। যার পেছনে ছিল তাদের দেশের কয়েক লক্ষ মানুষের সমর্থন। যারা দুর্ভিক্ষের প্রকোপে আর ব্রিটেনের বিদ্বেষমূলক আচরণের শিকার হয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিল। বহু জাতি অধ্যুষিত অটোমান সাম্রাজ্যে বহু ধরনের খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ দেখা গেল। গ্রিস ও সার্বিয়া ইতিমধ্যে স্বাধীন হয়েছিল। ১৮৫০-এর দশকের শেষে রুমানিয়া স্বাধীনতা পেয়েছিল। ১৮৭০-এর দশকের শেষে স্বাধীন হয়েছিল বুলগেরিয়া। যা বল্কান অঞ্চলের বল্কানাইজেশন বা টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে নানা আয়তনের অগণিত রাষ্ট্র, যেগুলি নিজেদেরকে জাতির প্রতিনিধিত্বকারী বলে দাবি করত। এদের মাঝখান দিয়ে তুরস্কের যে অংশ ইউরোপে রয়েছে তার সীমানা নির্ধারণই সমস্যা হয়ে উঠেছিল। হ্যাসবার্গ বা হ্যাপ্‌সবার্গ সাম্রাজ্যের ভেতর থেকে নানা ধরনের জাতীয়তাবাদী দাবি-দাওয়া উঠতে শুরু করেছিল। এর মধ্যে কোনটা ছিল সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি তো কোনটা বিচ্ছিন্নতার। ইউরোপে জাতিরাষ্ট্র গঠনের দাবির প্রাবল্য সম্পর্কে টি. সি. ডব্লিউ. ব্ল্যানিং দেখিয়েছেন, ১৭৮৯ সালে পর্তুগাল ছিল ইউরোপের এককমাত্র দেশ যেখানে সরকার ছিল মোটামুটি একই ভাষাভাষিদের নিয়ে। সেসময় মাত্র দুটো থেকে তিনটে রাজতন্ত্রকে (ইংল্যান্ডের, স্পেনের এবং ফ্রান্সের) আপাতভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যেত। কিন্তু ১৩০ বছর পরে ইউরোপে এমন কোন রাষ্ট্র ছিল না যারা জাতীয়তাবাদের ধারণাকে কোন না কোন কারণে ব্যবহার করেনি।

হব্‌সবম দেখিয়েছেন, ইউরোপীয় মহাদেশের বাইরেও জাতি-গঠন প্রক্রিয়া দৃশ্যমান হয়। তিনি প্রশ্ন

তুলেছেন যে, আমেরিকার গৃহযুদ্ধে কি ভাঙনের হাত থেকে আমেরিকার জাতীয় ঐক্য রক্ষার চেষ্টা দেখা যায়নি ? জাপানে ১৮৬৮ সালের মেইজি রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতেও নতুন গঠিত জাপানি জাতির উত্থান লক্ষ করা যায়। ওয়াল্টার বেজহটের (১৮২৬-১৮৭৭) বক্তব্য ছিল, সারা বিশ্ব জুড়েই জাতি গঠন চলছে। আর এটাই এ যুগের অন্যতম লক্ষণ।

২.২ ❑ উদারনীতিবাদের প্রসার

১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৭০ কালপর্বে ইউরোপে উদারনীতিবাদের প্রসার লক্ষ করা যায়। বিশেষত, পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং ইতালির পশ্চিম প্রান্তের রাজ্য সার্ডিনিয়ায়। গ্রেট ব্রিটেন এবং বেলজিয়ামেও উদারনীতিবাদ ক্রমেই প্রাধান্য পাচ্ছিল। সুইডেনেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এই ভাবধারা। স্পেন এবং পর্তুগালে প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও উদারনীতিবাদ নিজের জায়গা করে নেয়। ঐতিহাসিক হেজ মনে করেন, উনিশ শতকের মাঝামাঝি পশ্চিম ইউরোপে রক্ষণশীলতা ও উদারনীতিবাদ, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও বিপ্লবী ধ্যানধারণার সংঘাতের মধ্যে উদারনীতিবাদ ও বিপ্লবী ধ্যানধারণাই প্রাধান্য পেয়েছিল। উদারনীতিবাদের ক্ষেত্রে মধ্য ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপের তুলনায় পশ্চিম ইউরোপের এগিয়ে থাকার মূলে দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, সতেরো শতকের ইংল্যান্ডের বিপ্লব এবং আঠারো শতকের আমেরিকান ও ফ্রান্সের বিপ্লবের ঐতিহ্য। পশ্চিম ইউরোপের এসব বিপ্লব উদারনৈতিক ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটিয়েছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার উন্মেষ হয়। যা উনিশ শতকের মাঝামাঝি উদারনীতিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ তখনও মূলত কৃষিপ্রধান। ব্রিটেন সেসময় যথেষ্ট শিল্পোন্নত। বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং পশ্চিমের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে দ্রুত শিল্পায়ন হচ্ছিল। শিল্প-শহর এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব উদারনীতিবাদের বিকাশে সহায়ক ছিল।

বিশ শতকে উদারনীতিবাদ শব্দটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বহু বিষয়কে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, এমনকি তার মধ্যে অনেক পরস্পর বিরোধী ধারণাও এসে যায়। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি উদারনীতিবাদের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ ছিল। বৌদ্ধিক দিক থেকে উদারনীতিবাদ বলতে বোঝাত চিন্তার স্বাধীনতা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়গান, ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় হিসাবে গণ্য করা এবং চার্চের সমাজ নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অস্বীকার করা। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ, পেশা বাছাইয়ের ও ব্যবসাবৃত্তি গ্রহণের স্বাধীনতা, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের স্বাধীনতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলা হয়েছিল। উদারনীতিবাদের প্রবক্তারা ভূস্বামী শ্রেণীর অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিরোধী ছিলেন।

রাজনৈতিক দিক থেকে উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রের সীমিত ভূমিকার পক্ষপাতী ছিল। রাষ্ট্রের কাজ হবে শুধুমাত্র 'পরোক্ষ পুলিশি' ব্যবস্থা নেওয়া। রাষ্ট্র ব্যক্তি নাগরিকের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। শৃঙ্খলারক্ষা, ব্যক্তির সম্পত্তিকে সুরক্ষা দেওয়া, জনশিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এধরনের কিছু জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যেই রাষ্ট্রের ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকবে। সাংবিধানিক, প্রতিনিধিত্বমূলক এবং সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা উদারনীতিবাদীদের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। যে শাসন ব্যবস্থায় সম্পত্তির অধিকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রাধান্য

বিস্তার করবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদ শান্তির আদর্শকে তুলে ধরে। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং অবদমিত জাতির জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রতি উদারনীতিবাদ সহানুভূতিশীল ছিল। এবং উদারনীতিবাদীদের সবচেয়ে জোরালো দাবি ছিল সাংবিধানিক সরকারের। কিন্তু যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী হয়েও ১৮৪৮-৪৯ সালে ইউরোপে জাতীয়তাবাদী সংঘর্ষে উদারনীতিবাদীরা যোগ দিয়েছিল। এটাই ছিল উদারনীতিবাদের অন্তর্নিহিত জটিলতা ও বৈপরীত্য—যা পরবর্তী ৩০ বছরে আরও বেড়েছিল।

ঐতিহাসিক হেজ দেখিয়েছেন, ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হলেও কিছু কিছু উদারনৈতিক ধ্যানধারণা ইউরোপের ইতিহাসে চিরস্থায়ী পরিবর্তন এনেছিল। যেমন, অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে ভূমিদাস প্রথার অবসান স্থায়ী হয়েছিল। সাংবিধানিক সরকারের কয়েকটি রূপ পরবর্তী সময়েও সার্ডিনিয়া, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং প্রাশিয়ায় দেখা গিয়েছিল। সার্ডিনিয়াতে ১৮৪৮ সালের মার্চ মাসে রাজা চার্লস অ্যালবার্ট যে উদারনৈতিক শাসনবিধি চালু করেছিলেন, অস্ট্রিয়া কর্তৃপক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল তা বজায় রেখেছিলেন। ১৮৫০-এর দশকে সার্ডিনিয়া ছিল ইতালির একমাত্র রাজ্য যেখানে সাংবিধানিক ও উদারনৈতিক শাসনের অস্তিত্ব ছিল। ১৮৪৮ সালে রাজা দ্বিতীয় উইলিয়ামের চালু করা ডাচ সংবিধান ও ১৮৪৯ সালের ড্যানিশ সংবিধান কম বেশি উদারনৈতিক চরিত্রের ছিল। তবে সার্ডিনিয়ার সংবিধানের মত এই দুটি সংবিধানে মন্ত্রীদের আইনসভার কাছে দায়বদ্ধতার শর্ত ছিল না। ব্রিটেনের সংবিধান ও এই তিনটি সংবিধানের প্রত্যেকটিতে ভোটাধিকারের ভিত্তি ছিল সম্পত্তির মালিকানা। এবং এইভাবে সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। প্রাশিয়াতে ফ্রেডারিক চতুর্থ উইলিয়াম ১৮৫০ সালে যে সংবিধান কার্যকর করেছিলেন তাতে আইনসভার নিম্ন কক্ষে সম্পত্তির মালিকানা ভিত্তিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা বলা হলেও বাস্তবে জটিল, ত্রিস্তর বিশিষ্ট এবং পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিদার ও সম্পন্ন বুর্জোয়াদের পার্লামেন্টে আধিপত্য করার সুযোগ দেওয়া হত।

১৮৪৮ সালে ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে—সিসিলি থেকে শ্লেজউইগ, হল্যান্ড থেকে হাঙ্গেরি—উদারনীতিবাদ আলোড়ন তুলেছিল। সে তুলনায় উদারনীতিবাদের সাফল্য তেমন কিছু ছিল না। ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে উদারনীতিবাদীরা যথেষ্ট সোচ্চার হতে পারেনি। ঐতিহাসিক হেজ লিখেছেন, নেপথ্যে থাকলেও উদারনীতিবাদের অবসান হয়নি। বরং তা শক্তি অর্জন করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জাতীয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

২.৩ ❑ গণতন্ত্রের ধারণার ব্যাপ্তি

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের মত গণতন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় কাজে সাধারণ মানুষের ভূমিকার ধারণা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব দেখিয়েছিল জনগণ কীভাবে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তক্‌ভিল ১৮৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি প্যারিস শহরকে নিজের চোখে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছিলেন, এই বিপ্লব সত্যিই জনগণের বিপ্লব। সারা শহরে ঘুরেও কোন পুলিশ, প্রহরী, পূর্বতন সরকারের রক্ষীবাহিনী, এমনকি ন্যাশনাল গার্ড বা

জাতীয় রক্ষীবাহিনীর হদিশ পাওয়া যায়নি। গোটা শহরটাই চলে গিয়েছিল জনতার দখলে। এটা আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল যে, এতবড় শহরটা সেইসব মানুষের হাতে, যাদের বিত্ত বা ক্ষমতা কোন কিছুই নেই।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শাসক শ্রেণীর কাছে গণতন্ত্র শব্দটিই ছিল আপত্তিকর। ইংল্যান্ডের হুইগ ঐতিহাসিক মেকলে বলেছিলেন, 'সর্বজনীন ভোটাধিকারের তত্ত্ব সরকারের সব ধরনের উপযোগিতাকে ব্যর্থ করে দেবে। কারণ কোন সভ্যতার সঙ্গেই সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতির সহাবস্থান সম্ভব নয়।' কিন্তু শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের দাবি ক্রমেই জোরালো হচ্ছিল। হব্‌সবম তার 'The Age of Capital 1848–1875' বইতে দেখিয়েছেন যে, শুধুমাত্র বিপ্লবের দিনগুলিতে নয়, আপাত শান্তির সময়েও এই দাবি অস্বীকার করা যাচ্ছিল না। বিশেষত, ফ্রান্সে তিনটে বিপ্লবের (১৭৮৯, ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের বিপ্লব) পর রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রগতিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করলে তার ব্যর্থতা ছিল অবশ্যম্ভাবী। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ফলে রাজা লুই ফিলিপ যে সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে মধ্যবিত্ত শাসন প্রবর্তন করেছিলেন, তার অবাসান হয়। ফিলিপের শাসনকালে যাঁরা বছরে ২০০ ফ্রাঁ কর দিতেন তাঁরাই ভোটাধিকারী ছিলেন, আর ৫০০ ফ্রাঁ কর দিলে তবেই আইনসভার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া যেত। ১৮৩০-১৮৪৮ সাল এই বুর্জোয়া শ্রেণীই একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করত। বিপ্লবের পর সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ফ্রান্সের রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকটাই সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছেছিল। অতঃপর ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর যিনি ক্ষমতায় এলেন সেই লুই নেপোলিয়নের বা তৃতীয় নেপোলিয়নের তথাকথিত দ্বিতীয় সাম্রাজ্য আধুনিক রাজনৈতিক ধ্যানধারণার পরীক্ষাগার হয়ে উঠল। তিনি নিজে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আবহে বড়ো হয়েছিলেন। এমনকি একসময় কার্বোনারি দল ও সেন্ট সাইমনপন্থীদের (খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা) সঙ্গে যোগও দিয়েছিলেন। ফলে, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের মত ঐতিহাসিক শক্তিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। বৈপ্লবিক পরিস্থিতিই তাঁকে ক্ষমতায় আসার সুযোগ করে দিয়েছিল। ১৮৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সে যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়, লুই নেপোলিয়ন তার গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে তিনি ভোটে জিতে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে কাভেন্যাক, লামার্টি প্রমুখ ছিলেন। এরপরই তিনি একটি নতুন সংবিধানের খসড়া ফ্রান্সের জনসাধারণের সামনে পেশ করেন। তাঁর এই খসড়া বিপুল ভোটে গৃহীত হয়েছিল। লুই নেপোলিয়ন এতে একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাব করেছিলেন। নতুন সংবিধান স্বীকৃতি পাওয়ার পর ১৮৫১ সালের ২১ ডিসেম্বর তিনি আবার ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এর এক বছর পরেই তিনি তৃতীয় নেপোলিয়ন উপাধি নিয়ে সম্রাট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে ভোট পড়েছিল ৭৮ লক্ষ ২৪ হাজার। আর বিপক্ষে ২ লক্ষ ৫৩ হাজার। সম্রাট হওয়ার পর ক্ষমতায় থাকার জন্য লুই নেপোলিয়নের কাছে আর ভোটের গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই তিনি প্রথম ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। ইউরোপে লুই নেপোলিয়নই ছিলেন প্রথম শাসক যিনি সর্বজনীন ভোটাধিকার (শুধুমাত্র পুরুষদের) ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলেন। এরপর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নামে তিনি ফ্রান্সে স্বৈরতন্ত্র কায়েম

করতে চেয়েছিলেন। মন্ত্রীদের তাদের কাজকর্মের জন্য দায়বন্ধ থাকতে হত সম্রাটের কাছে, আইনসভার কাছে নয়। কিন্তু জনপ্রিয়তা হারানোর আশঙ্কায় ১৮৬০ সাল থেকে তিনি পার্লামেন্টের অধিকার ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হন। মন্ত্রীদের পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল করা হয়। সংবাদপত্র ও সভাসমিতির ওপরে নিয়ন্ত্রণও শিথিল হয়েছিল।

সুইজারল্যান্ডে ১৮৫০-এর দশকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার (পুরুষদের) স্বীকৃত হয়েছিল। সম্পত্তির মালিকানা ভোটদাতা হওয়ার আবশ্যিক শর্ত ছিল না। ২০ বছর ও তার বেশি বয়সী পুরুষদের ভোটদানের অধিকার সংবিধানের বিধিতে পরিণত হয়েছিল। তবে পার্লামেন্টের দ্বিতীয় কক্ষটিতে প্রার্থীরা বিভিন্ন রাজ্য (ক্যান্টিন) থেকে মনোনীত হত। এসময় ব্রিটেন তো বটেই, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, স্পেন ও স্যাভয়, সর্বত্রই প্রতিনিধিসভার অস্তিত্ব ছিল। যদিও হয় এগুলোতে প্রতিনিধিরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসত, নয়ত এগুলো ছিল পুরনো জমানার 'এস্টেটের' মত। অনেকক্ষেত্রে ভোটদাতাদের এবং নির্বাচনের প্রার্থীদের বয়স ও সম্পত্তি সংক্রান্ত নানা শর্ত দেওয়া হত। নির্বাচিত প্রতিনিধিসভাকে অন্য একটি রক্ষণশীল সভার সাপেক্ষে গুরুত্বহীন করে রাখা যেত। বেশিরভাগ সময় এটি হত পার্লামেন্টের প্রথম কক্ষ। যার সদস্যরা কোন না কোন পদাধিকারবলে বা এক্স-অফিসিও মেম্বার হিসেবে ওই কক্ষে যোগ দিতেন। এর ওপর ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হাউস অফ লর্ডস বা সেনেট অফ নোবেলসের ভেটো প্রয়োগের অধিকার। রাজার কাজ হত সরকারের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের মনোনীত করা। জনসংখ্যার নগণ্য অংশই ভোটদানের অধিকার পেত। ১৮৩২ সালে ব্রিটেনের সংস্কার আইনে ২ লক্ষ থেকে ভোটদাতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১০ লক্ষে, তাতেও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই বিশেষ অধিকার পেয়েছিল। প্রাশিয়া ও জার্মান রাজ্যগুলিতে পার্লামেন্টের বেশির ভাগ আসন দখল করত মোট জনসংখ্যার তুলনায় সংখ্যালঘু, বিত্তবান শ্রেণী।

১৮৬০-এর দশকে জনগণের অধিকার সংক্রান্ত দাবিদাওয়া এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে রাজনীতির আঙিনা থেকে এদের দূরে রাখার নীতি অনুসরণ আর সম্ভব ছিল না। ১৮৭০-এর দশকে শুধুমাত্র জারশাসিত রাশিয়া আর তুরস্কে স্বৈরাচারী শাসনের শেষ চিহ্ন রয়ে গিয়েছিল। এই দশকে বেশির ভাগ দেশই ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল। ১৮৬৭ সালে ব্রিটেনে দ্বিতীয় সংস্কার আইনের পর ভোটদাতাদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল। যদিও তখনও প্রায় ৮ শতাংশ অধিবাসীর ভোটাধিকার ছিল না। ১৮৭০-এর দশকে ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্রে জনসংখ্যার ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ভোটাধিকার পেয়েছিল। ভোটাধিকার সম্প্রসারণের গতি ছিল মন্থর। অনেক সময়ই সমাজের উঁচুতলার মানুষ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ১৮৩২ সালে ব্রিটেনের শাসকশ্রেণী মধ্যবিত্তদের ভোটদানের অধিকার স্বীকার করেছিল। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার মেনে নিতে শাসকশ্রেণীর আরও ৯৫ বছর সময় লেগেছিল। বেলজিয়ামে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবিতে দুটো সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল। জার্মানিতে বিশ শতকের সূচনায় এই দাবিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারপক্ষের সংঘর্ষ হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের ভোটাধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল। মেয়েদের ভোটাধিকার অর্জনও ছিল দীর্ঘ সংগ্রামের ফল।

ডেভিড টমসন দেখিয়েছেন, ১৮৪৮ সাল থেকে ইউরোপে জনতার যুগ শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের সরকার এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিল যে, রাজনীতির চাবিকাঠি আসলে জনতার হাতেই রয়েছে। সর্বজনীন ভোটাধিকার জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল, জনমতকে অগ্রাহ্য করা সরকারের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। জনমত গঠন হয়ে উঠেছিল রাজনীতিবিদদের কাছে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২.৪ ❑ সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা

১৮৪৮ সালের বিপ্লব রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হওয়ায় শুধুমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণী নয়, সাধারণ মানুষও রাজনৈতিক অধিকারের শরিক হয়। লিপসন দেখিয়েছেন যে, সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনার ফলে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ইতিহাসেও যুগান্তর ঘটে যায়। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব প্রথম সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আসে। লুই ব্লাঁ (১৮১১-১৮৮২) ছিলেন উনিশ শতকের ফরাসি রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিক যিনি ১৮৪৮-এর বিপ্লবে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। ব্লাঁ বলেছিলেন, দারিদ্রই মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটায়। দুটো জিনিসের দাসত্ব থেকে জনগণের মুক্তি প্রয়োজন—অজ্ঞতা আর দারিদ্র। ব্লাঁর 'Organisation du Travail' বইটি ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। রুশোর 'Contract Social' ১৭৮৯-এর বিপ্লবে যে ভূমিকা নিয়েছিল, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে ব্লাঁর বইয়ের গুরুত্বও ছিল সেইরকম। প্রুধোঁ (১৮০৯-১৮৬৫) ছিলেন আরেক জন ফরাসি দার্শনিক ও সাংবাদিক। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে তাঁরও প্রভাব ছিল। যিনি 'দারিদ্রের দর্শন' নামে বই লিখেছিলেন। প্রুধোঁ বলেছিলেন, "সম্পত্তি মানেই চুরি"। একথা খুব একটা জনপ্রিয় না হলেও লুই ব্লাঁর 'কাজের অধিকার'-এর দাবি বহু মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি সমবায়ের নীতির ভিত্তিতে শ্রমিকদের যে কর্মশালার পরিকল্পনা করেছিলেন সেটি ছিল 'ইন্ডাসট্রিয়াল সিন্ডিক্যালিজম' নিয়ে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ফ্রান্সে উনিশ শতকের একটি সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্ব সিন্ডিক্যালিজম নামে পরিচিত। সিন্ডিক্যালিজমের সদস্যরা উৎপাদনের সব উপকরণের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের বদলে শ্রমিক সংঘগুলির হাতে দেওয়ার কথা বলতেন।

ফ্রান্সে নতুন যে সরকার ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর গঠিত হয় তার একটি প্রথম কাজই হয়েছিল লুকসেমবুর্গে লুই ব্লাঁর নেতৃত্বে একটি 'শ্রমিক পার্লামেন্ট' গঠন। এটি গঠনের সময় ঘোষণা করা হয়েছিল—বিপ্লবের ফল এমন হওয়া উচিত যাতে যারা বিপ্লব করেছিল তাদের দাবিদাওয়া পূর্ণ হয়। শ্রমজীবী মানুষেরা দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগ করেছে। এখন তার সমাধান করতেই হবে। একটি কমিশন তৈরি করে শ্রমিকদের জন্য জাতীয় বীমা, বসবাসের উপযুক্ত বাড়ি, দশ ঘণ্টার কর্মদিবস প্রভৃতির উদ্যোগ নেওয়া হয়। সরকার 'জাতীয় কর্মশালা'-র পরিকল্পনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে কাজ করায় এবং উপযুক্ত সাংগঠনিক ক্ষমতার অভাবে সব উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়।

জাতীয় কর্মশালায় ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১,২০০ শ্রমিক যোগ দিয়েছিল। সরকার তাদের কোন গঠনমূলক কাজে লাগাতে পারেনি। শুধুমাত্র সামান্য ভাতা দিয়েই কর্তব্য সেরেছিল। লুই

ব্লাঁ জাতীয় কর্মশালার শোচনীয় পরিস্থিতি দেখেছিলেন। সেগুলো তাঁর ভাষায় 'প্রায় বিশৃঙ্খল ভঘুরেদের আস্তানা' হয়ে উঠেছিল। এদের কাছে দুমুঠো খাবার জোটাটাই যথেষ্ট ছিল। তাদেরকে গঠনমূলক কোন কাজে লাগানো হল কিনা তা নিয়ে তাদের কোন চিন্তাভাবনা ছিল না। জনগণের পয়সা অনর্থক ব্যয় করা ছাড়া সরকার কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি। ব্লাঁর মতে, মজুরির নামে যা দেওয়া হত তা ছিল ভিক্ষারই সামিল। ক্রমে জাতীয় কর্মশালাগুলো উঠে যেতে থাকে। উল্লেখ্য যে, ১৮৪৮ সালের মে মাসের নির্বাচনে যাঁরা ক্ষমতায় এসেছিলেন তাঁরা 'রক্ষণশীল' প্রজাতন্ত্র চেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সমর্থক ছিলেন এবং জাতীয় কর্মশালাগুলো বন্ধ করে সরকারি তহবিলের অপচয় বন্ধ করার কথা বলেন। শ্রমিকদের হতাশা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্রায় ৪ দিন ধরে শ্রমিক ও সরকারপক্ষে সংঘর্ষ চলে। সরকারপক্ষের সাফল্য ছিল অবধারিত। কিছু বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। প্রায় ৪,০০০ জন নির্বাসিত হয়েছিল। লুই ব্লাঁ প্রাণদণ্ডের আশঙ্কায় ইংল্যান্ডে আশ্রয় নেন। প্রুধোঁ কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

ইউরোপের অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি ও ইতালিতে শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছিল। ১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্যারিস ছাড়াও প্রাগ শহরে এবং অক্টোবরে ভিয়েনাতে শ্রমিক বিদ্রোহ ঘটেছিল। সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা শহরে জনতার এই বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল বলে দাবি করে। কার্ল মার্ক্স 'The Class Struggle in France 1848–1850' এবং 'The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte' বইদুটিতে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ঘটনার বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই বিপ্লবকে দেখেছেন আধুনিক সমাজের দুই শক্তির—বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রথম ব্যাপক যুদ্ধ হিসেবে। এতে সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্তৃত্বের সংরক্ষণের ওপর আঘাত হানার ক্ষেত্রে ১৮৪৮-এর বিপ্লব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় থেকে সমাজতন্ত্রবাদ ও গণতন্ত্রবাদের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকে।

ইউরোপীয় রাজনীতির ওপর ১৮৪৮-এর বিপ্লবের সার্বিক প্রভাব ছিল এটাই যে, ১৮৫০ সালের পর আরও দু দশক ধরে ইউরোপে রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রাধান্য পেলেও এই পর্বের সঙ্গে ১৮১৫-৩০ পর্বের মৌলিক পার্থক্য তৈরি হয়েছিল। মেটারনিখ ব্যবস্থার মত কোন রক্ষণশীল ব্যবস্থা আর ফিরে আসেনি। শাসকদের বংশানুক্রমিক অধিকার বা ন্যায্য অধিকার আর কার্যকর করা যায় নি। রাশিয়া ও প্রাশিয়ার বাইরে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র মর্যাদা হারিয়েছিল। ইউরোপের বেশিরভাগ দেশেই শাসিতের প্রতি দায়বদ্ধতার নীতি শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল।

২.৪ ❑ অনুশীলনী

১. ইউরোপীয় রাজনীতির ওপর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা করুন।

২. বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাবে উনিশ শতকের ইউরোপে উদারনীতিবাদ ও গণতন্ত্রের ধারণার প্রসার পর্যালোচনা করুন।

৩. বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূত্র ধরে উনিশ শতকের ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিকশিত হয়েছিল—ব্যাখ্যা করুন

২.৬ ❑ সহায়ক বই

১. Thomson David—Europe Since Napoleon.
২. Hayes C. J. H.—Modern Europe to 1870.
৩. Lipson E.—Europe in the XIXth & XXth Centuries. 1815-1939.
৪. Hobsbawm E. J.—The Age of Capital 1848-1875.
৫. Harman Chris —A People's History of The World.
৬. Stearns P. N. & Chapman H.—European Society in Upheaval Social History Since 1750.
৭. Ketelby—History of Modern Times.
৮. Blanning T.C W.—The Oxford History of Modern Europe.

একক ৩ ❑ বিসমার্কের নেতৃত্বে ঐক্যবন্ধ জার্মানী (১৮৭১-৯০)

গঠন

৩.০ প্রস্তাবনা

৩.১ বিসমার্কের নেতৃত্বে ঐক্যবন্ধ জার্মানীর শাসনব্যবস্থা

৩.২ কুলটুর কাম্ফ বা সংস্কৃতির সংগ্রাম

৩.৩ সংখ্যালঘুদের উপর আগ্রাসন

৩.৪ সমাজতন্ত্রীরা ও বিসমার্ক

৩.৫ বিসমার্কের শিল্প ও শ্রমিক কল্যাণ নীতি

৩.৬ বিসমার্কের নেতৃত্বাধীন জার্মানীর বৈদেশিক নীতি ও ত্রিশক্তি চুক্তি

৩.৭ গ্রন্থাবলী

৩.৮ অনুশীলনী

৩.০ ❑ প্রস্তাবনা

ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের পর ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল কথা ছিল ইউরোপের একটি শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে জার্মান রাইখ বা রাষ্ট্রের উত্থান। জার্মানী তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামরিক শক্তির সাহায্যে অতি দ্রুত ইংলন্ড ও ফ্রান্সের উপনিবেশ ও বাণিজ্যের ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দেয়।

৩.১ ❑ বিসমার্কের নেতৃত্বে ঐক্যবন্ধ জার্মানীর শাসনব্যবস্থা

জার্মানী ঐক্যবন্ধ হওয়ার পর বিসমার্ক জার্মানীর জন্য একটি নতুন সংবিধান রচনায় উদ্যোগী হন। ২৫টি অঙ্গারাজ্যের সমন্বয়ে জার্মানীকে একটি যুক্তরাষ্ট্র (জার্মান রাইখ) হিসাবে ঘোষণা করা হয়। জার্মান অঙ্গারাজ্যগুলিকে কিছুটা স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। প্রতিটি অঙ্গারাজ্যই নিজস্ব শাসনব্যবস্থা বজায় রাখার অধিকার পায়, তবে কয়েকটি সাধারণ বিষয় কেন্দ্র তার নিজস্ব এক্তিয়ারে রাখে। সেনাবাহিনী, রেলপথ, বৈদেশিকনীতি, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, শুল্ক, রাজস্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান হিসাবে থাকেন স্বয়ং জার্মান সম্রাট বা কাইজার। সংবিধানে তিনি বংশানুক্রমিকভাবে রাজত্ব করার অধিকার পান। তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রী বা রাইখ-চ্যান্সেলর এবং মন্ত্রীসভাকে নিয়োগ ও বরখাস্তের অধিকার প্রাপ্ত হন। সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি প্রধানমন্ত্রী কাইজার অথবা আইনসভা—কার কাছে দায়বন্ধ থাকবেন। বিসমার্ক ঘোষণা করেন যে তিনি একমাত্র সম্রাটের প্রতি দায়বন্ধ। সংবিধানে জার্মানীর প্রায় চার লক্ষ সেনার ব্যয়বরাদ্দ আইনসভা প্রতি সাত বছর অন্তর করবে বলা হয়। একবার বরাদ্দ হলে ৭ বছরের জন্য সামরিক খাতের খরচার জন্যে প্রধানমন্ত্রী আইনসভার

দ্বারস্থ হবেন না। এই আইনটির নাম ছিল 'Septiennat.'

কেন্দ্রে যে দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাটি গঠিত হয় তার ঊর্ধ্বকক্ষের নাম ছিল বুন্ডসরাট (Bundesrat)। জার্মানীর অঙ্গারাজ্যগুলির শাসকরা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিকে এই সভার সদস্য হিসাবে পাঠাত। নিম্নকক্ষ বা রাইখস্ট্যাগের (Reichstag) সদস্যরা জার্মানীর জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতেন। এই সভার মোট ৩৯৭ জন সদস্যের মধ্যে প্রাশিয়া থেকেই আসতেন ২৩৫ জন সদস্য। এইভাবে জার্মানীর আইনসভার উপর বিসমার্ক প্রাশিয়ার কর্তৃত্ব স্থাপন করেন।

জার্মানীর আইনসভাও প্রকৃতপক্ষে সম্রাট ও চ্যান্সেলরের কার্যনির্বাহী প্রতিষ্ঠানমাত্র ছিল। সম্রাট, প্রধানমন্ত্রী (চ্যান্সেলর) বা তাঁর মন্ত্রীসভাকে তাঁদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে হতো না। আইনসভায় অনাস্থা প্রস্তাবে পরাজিত হলেও প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য ছিলেন না। আইনসভা শুধুমাত্র আইন রচনা ও বাজেট পাশ করতে পারত। প্রাশিয়ার রাজাই হন ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সম্রাট, প্রাশিয়ারই প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক হলেন নবোদিত জার্মানীর চ্যান্সেলর এবং রাইখস্ট্যাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন বরাদ্দ হয় প্রাশিয়ার জন্য। জার্মানীকে একটি যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর উপর প্রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিসমার্ক ক্রমশ অঙ্গারাজ্যগুলির ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়াতে থাকেন। যেহেতু তিনি সংবিধানের নিকট দায়বন্ধ ছিলেন না, ক্রমশ বিসমার্ক জার্মানীর একচ্ছত্র একনায়কে পরিণত হন।

ঐক্যবন্ধ জার্মানীর উন্নতির জন্য বিসমার্কের গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিল্পবিপ্লব পূর্ববর্তী জার্মান সংস্কৃতি সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল ; ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহকে অসম্মানজনক মনে করা হত। বিসমার্কের উৎসাহে জার্মানীতে যে প্রবল শিল্পোদ্যোগ শুরু হয় তার প্রতিক্রিয়ায় জার্মানীতে ক্রমশ উদ্যোগপতিরা সামাজিক সম্মান লাভ করতে থাকেন। জার্মানীতে দ্রুত শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। বিসমার্কের আমলে বিভিন্ন অঙ্গারাজ্যগুলির বিভিন্ন রকমের মুদ্রার অবসান ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় মুদ্রার প্রচলন ঘটে। ১৮৭৬ সালে জার্মানীতে রাইখ ব্যাঙ্ক ও বৃহদায়তন শিল্প-ব্যাঙ্ক বা হাইপার ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্কগুলি একদিকে মূলধন সরবরাহ ও অন্যান্য শিল্প স্থাপনের উদ্যোগে পেশাদারী পরামর্শ দিত। জার্মানীতে এইসময় ডাক ও তার ব্যবস্থা, রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। সর্বোপরি দেশীয় শিল্পগুলিকে রক্ষার জন্য বিসমার্ক শিল্প-শুল্ক সংরক্ষণ নীতি চালু করেন ; অর্থাৎ বিদেশী পণ্য আমদানীর উপর চড়া হারে শুল্ক ধার্য করা হয় এবং রপ্তানীশুল্ক হ্রাস করা হয়। বিদেশী দ্রব্যের উপর চড়া হারে শুল্ক ধার্য করায় সাধারণ মানুষ সস্তায় দেশীয় পণ্য কিনতে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং জার্মান শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। সারা জার্মানীতে একই প্রকারের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন ও বিচারব্যবস্থা গঠিত হলে জার্মানীর ঐক্য দৃঢ়তর হয়।

বিসমার্ক জার্মানীতে বসবাসকারী সমস্ত অ-জার্মান ভাষাভাষীদের জার্মান-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন এবং জার্মান উত্তরাধিকার আইন মানতে বাধ্য করেন। বিসমার্কের এই বলপূর্বক জার্মানীকরণের নীতি পোল ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল ; কিন্তু বিসমার্ক দৃঢ়ভাবে তাঁর জার্মান আধিপত্য বিস্তারের নীতিতে অটল থাকেন।

৩.২ ❑ কুলটুর কাম্‌ফ (Kultur Kampt) বা সংস্কৃতির সংগ্রাম

বিসমার্ক শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অস্তিত্বকে গ্রহণ করতে পারেননি। ক্যাথলিক, ভাষাগত বা জাতিগত সংখ্যালঘু, ইহুদি, সমাজতন্ত্রী—যাঁরাই তাঁর স্বৈরতন্ত্রী জার্মানীকরণের প্রকল্পকে মেনে নিতে পারেনি, তাদেরই তিনি রাইখের শত্রু বলে চিহ্নিত করেন। ক্যাথলিক গীর্জার সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য।

ঐক্যবদ্ধ ইটালী ও জার্মানীর উত্থান ও তৎকালীন ইউরোপের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পোপ বা রোমান ক্যাথলিক গীর্জার অনুকূলে ছিল না। ইটালী ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় সেখানে পোপ তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও তাঁর নিজস্ব অঞ্চলের উপর অধিকার হারান। ডেভিড টমসনের মতে পোপ নিজেকে ভ্যাটিকানের গীর্জা ও প্রাসাদে বন্দী বলে মনে করতেন। অন্যদিকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীতে প্রোটেস্টান্ট প্রভাবিত উত্তর জার্মানীর ক্যাথলিক প্রভাবিত দক্ষিণ জার্মানীর উপর আধিপত্য পোপের ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। ইতিপূর্বেই ইউরোপে তৎকালীন জনপ্রিয় নতুন মূল্যবোধগুলি—উদারনীতিবাদ, যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি, প্রগতির ধারণা—প্রভৃতি সবগুলিকেই পোপ অধার্মিক বলে ঘোষণা করেছিলেন। ১৮৬৪ সালে পোপ নবম পায়াস Syllabus of Errors নামে ঘোষণা জারি করে আধুনিক সভ্যতার উপরোক্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভ্রান্ত ও দোষাবহ বলে মনে করেন। এরই একটি চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় ১৮৭১ সালে পোপের জারি করা ইনফলিবিলিটি ডিক্রির (Infallibitiy Decree) মধ্যে। এই ঘোষণায় বলা হয় ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় নৈতিকতার প্রশ্নে পোপের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং তার বিরোধিতা করা হল ধর্মদ্রোহিতা। জাতিরাষ্ট্র (Nation state) গঠনের যুগে এই ঘোষণা পোপ ও নবগঠিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরী করে। কারণ এই ঘোষণায় রাষ্ট্রের আইনের সঙ্গে পোপের সিদ্ধান্তের বিরোধ দেখা দিলে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীরা পোপের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকবেন বলা হয়।

এই ঘোষণার ফলে আগেই ইটালীয় জাতীয়তাবাদী ও পিডমন্টের মন্ত্রী কাউন্ট কাভ্যুরের সঙ্গে পোপের বিবাদ দেখা দিয়েছিল। বিসমার্ক ক্যাথলিকদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতায় শঙ্কিত হন। জার্মান ক্যাথলিকরা সেন্টার পার্টি নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করে আইনসভায় তাদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করতে থাকেন। বিসমার্ক পোপকে গোপনে সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েও ব্যর্থ হলে জার্মান জাতীয়তাবাদী, উদারপন্থী ও র‍্যাডিকাল রাজনৈতিক দলগুলির সাহায্য নিয়ে ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। পোপ তথা ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে বিসমার্কের এই প্রতিরোধ প্রচেষ্টাকেই বিসমার্ক কুলটুর কাম্‌ফ্ (Kultur Kampf) নাম দেন। জার্মান ভাষায় কুলটুর শব্দের অর্থ সংস্কৃতি (Culture)। বিসমার্কের এই তথাকথিত সাংস্কৃতিক সংগ্রাম শুরুর উদ্দেশ্যগুলিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—

(১) বিসমার্কের আশঙ্কা ছিল ক্যাথলিক গীর্জা শক্তিশালী হয়ে উঠলে জার্মানীর ঐক্য বিনষ্ট হতে পারে এবং পোপ অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপের সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন।

(২) বিসমার্ক মনে করতেন ক্যাথলিক প্রভাবিত দক্ষিণ জার্মানীতে সেন্টার পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পেলে প্রাশিয়ার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবে।

(৩) ক্যাথলিক ফ্রান্স ছিল পোপের সমর্থক ; আবার বিসমার্ক ও ফ্রান্সের সম্পর্ক ছিল চরম বিদ্বেষপূর্ণ। সেই কারণে তিনি ফ্রান্স সমর্থিত পোপকে সহ্য করতে পারতেন না।

(৪) কুলটুর কাম্‌ফ্‌ বিসমার্কের তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক। আইনসভায় তিনি প্রধানত নির্ভরশীল ছিলেন উদারপন্থী দলের উপর। উদারপন্থী দল ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং স্বাধীন মতামতের পক্ষপাতী হলে পোপ ও ক্যাথলিক গীর্জার পশ্চাদ্‌পদ মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার বিরোধী ছিলো। লিন আব্রাম্‌স্‌ (Lynn Abrams)-এর মতে বিসমার্ক তাঁর মন্ত্রীসভার পক্ষে উদারনৈতিক সমর্থন দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বিসমার্ক তাঁর আসল উদ্দেশ্য গোপন করে ক্যাথলিকদের প্রগতি ও জাতীয়তা বিরোধী বলে প্রচার করেন এবং সংস্কৃতি সংগ্রাম নাম দিয়ে তাঁর পক্ষে প্রগতিশীল গোষ্ঠীগুলিকে আনার চেষ্টা করেন। বিসমার্ক প্রথমে দমনমূলক আইনের সাহায্য নেন। তিনি আইন করে জেসুইটদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেন। 'মে আইন' নামক আইন প্রণয়ন করে জার্মান ক্যাথলিকদের জার্মান আইন মানতে বাধ্য করা হয়। ক্যাথলিক পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। সিভিল ম্যারেজ বা রেজিস্ট্রি বিবাহের নিয়ম চালু করে গীর্জার ও ক্যাথলিকদের অধিকারকে খর্ব করার চেষ্টা হয়। এমনকি প্রোটেস্টান্ট অন্তর্বিবাহকে রেজিস্ট্রি দ্বারা বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়।

জার্মান বিশপদের শাস্তিদানের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। গীর্জার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। পোপের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। ফ্রান্স পোপকে সমর্থন করায় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিসমার্ক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দেন।

ক্যাথলিকরা এবং সেন্টার পার্টি বিসমার্কের দমননীতির বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ চালাতে থাকে। তারা স্বেচ্ছায় কারাবাস ও জরিমানা বরণ করে। ক্যাথলিকদের শক্ত ঘাঁটি রাইনল্যান্ডে হাজার হাজার মানুষের মিছিল বের হয়, ক্যাথলিকরা বড় বড় জনসভা সংগঠিত করতে থাকেন এই দমননীতির প্রতিবাদে। জনসভাগুলিতে পোপের পতাকা উড়িয়ে, পলাতক ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে সরাসরি জার্মান আইন ভাঙা হতে থাকে। ক্যাথলিকদের উপর দমনপীড়ন তাদের আরও সংগঠিত হতে সাহায্য করে। ক্যাথলিকরা নানা ধরনের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন, সর্বোপরি সেন্টার পার্টির ছত্রছায়ায় সংগঠিত হতে থাকে। সেন্টার পার্টি ক্রমশ জনপ্রিয় হতে থাকে এবং রাইখস্ট্যাগে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

লিন আব্রাম্‌স্‌ মনে করেন যে সেন্টার পার্টির উত্থানই বিসমার্ককে কুলটুর কাম্‌ফের নিষ্ফল প্রয়াস থেকে সরে আসতে এবং সর্বোপরি উদারনৈতিক মুখোশ ত্যাগ করে রক্ষণশীলতায় ফিরে যেতে বাধ্য করে। ক্রমশ জাতীয়তাবাদী উদারনৈতিক দলের বদলে সেন্টার পার্টিকেই বিসমার্ক সরকারের সহযোগী দল হিসাবে গ্রহণীয় মনে করতে থাকেন।

৩.৩ ❑ সংখ্যালঘুদের উপর আগ্রাসন

ক্যাথলিকদের মতো পূর্ব-প্রাশিয়ার পোল অধিবাসীরা, স্লেজউইগ-হলস্টিন অঞ্চলের ড্যানিশ ভাষাভাষীরা

এবং আলসাস-লোরেনের ফরাসীরা বিসমার্কের আগ্রাসী জার্মানীকরণের নীতির শিকার হয়েছিল। জার্মানীতে বসবাসকারী পোলরা পোলিশ জাতীয়তাবাদ এবং তাদের ক্যাথলিক ধর্মাবিশ্বাসের জন্য বিসমার্কের বিরাগভাজন হয়েছিল। ১৮৮৬ সালের একটি আইন দ্বারা তিনি পূর্ব জার্মানীর পোল অধ্যুষিত এলাকায় পোল অভিজাত ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনে উৎসাহ যোগান। জার্মানীর খনিশিল্পে অসংখ্য পোল শ্রমিক কাজ করতেন যাঁরা শুধুমাত্র পোলিশ জাতীয়তাবাদের প্রতি অনুরক্তির জন্য বিসমার্কের বৈষম্যমূলক নীতির শিকার হন—এমনকি তাঁদের মাতৃভাষা ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। একাধিক আইন জারি করে জার্মান ভাষাকে সরকারী ও বাধ্যতামূলক ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। যদিও এর প্রতিক্রিয়ায় পোলিশ জাতীয়তাবাদ আরও সংগঠিত হয়ে ওঠে—অসংখ্য পোলিশ ক্লাব, পোলভাষী সংবাদপত্র, এমনকি পোলদের নিজস্ব রাজনৈতিক দলও গড়ে ওঠে। আলসাস-লোরেনের ফরাসী ভাষাভাষীরা এবং শ্লেজউইগ-হলস্টিনের ডেনভাষীরা একইভাবে বিসমার্কের দমনমূলক নীতি ও চাপিয়ে দেওয়া জার্মান ভাষার শিকার হয়।

ইহুদী ধর্মাবলম্বীরা জার্মানীতে আর্থিকভাবে সম্পন্ন শ্রেণি হিসাবেই গণ্য হতেন। ১৮৭৩ সাল নাগাদ জার্মানীতে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিলে সম্পন্ন ইহুদী ব্যবসায়ীরা জাতিবিদ্বেষের শিকার হন। ১৮৭৩-৯০ সময়কালে প্রায় ৫০০ সেমেটিক বিরোধী রচনা জার্মানীতে প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ সাল নাগাদ এই জাতিবিদ্বেষ সংগঠিত রূপ নেয় এবং অ্যাডল্ফ স্টকারের নেতৃত্বে ইহুদী বিদ্বেষী ক্রিশ্চান-সোশাল পার্টি গঠিত হয় এবং স্টকার ১৮৮১ সালে রাইখস্ট্যাগে নির্বাচিত হন। বিসমার্ক সরকারীভাবে সেমেটিক বিরোধী প্রচারকে সমর্থন না করলেও গোপনে একে তিনি উৎসাহ প্রদান করেন। ১৮৮১ সালে একটি বিদ্বেষমূলক সেমেটিক বিরোধী আইনের বলে পূর্ব প্রাশিয়া থেকে প্রায় দশহাজার ইহুদীকে তিনি বিতাড়ন করেন। বিসমার্কের পুত্র হুবার্ট একজন ঘোষিত ইহুদী বিদ্বেষী ছিলেন। শুধু তাই নয়, বিসমার্কের রক্ষণশীল দল জার্মানীতে ইহুদী বিরোধিতায় প্রথম সারিতে ছিল। ১৮৯২ সালে এই দল টিভোলি প্রোগ্রাম (Tivoli Programme) নামক প্রস্তাবের দ্বারা ইহুদী বিরোধিতাকে পার্টির কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। বিসমার্ক সুকৌশলে ইহুদী বিরোধিতায় মদত দিয়ে জার্মানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে ইহুদীদের সরানোর চেষ্টা করেন। এটিকে বিসমার্কের জার্মানীকরণ নীতিরই একটি রূপ বলা যেতে পারে।

৩.৪ ❑ সমাজতন্ত্রীরা ও বিসমার্ক

বিসমার্কের নিপীড়নমূলক নীতির নিষ্ঠুরতম শিকার ছিলেন জার্মানীর সমাজতন্ত্রীরা। ১৮৬০-৭০ খ্রিঃ সময়কালে সমাজতন্ত্রীরা জার্মানীর শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন। জার্মান সমাজতন্ত্রীরা মূলত দুটি দলে বিভক্ত ছিলেন। মার্কসবাদী আইসেনাখ দলের (Eisenach party) নেতৃত্বে ছিলেন অগুস্ত বেবেল এবং উইলিয়ম লাইবনেক্ট। তাঁরা মার্কসীয় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। লাসালের নেতৃত্বাধীন ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন কেবলমাত্র জার্মানীতেই সমাজতান্ত্রিক বিকাশের কথা ভাবত। ১৮৭৫ সালে জার্মানীর গোথাতে (Gotha) উভয় দল মিলিত হয়ে সোসালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি গঠন করে। এটি 'গোথা প্রোগাম' নামে সমাজতান্ত্রিক ইতিহাসে বিখ্যাত। বিসমার্কের স্বৈরতান্ত্রিক এবং বিশেষ

কিছু শ্রেণিকে সুবিধাদান ও পৃষ্ঠপোষণার নীতির বিপরীতে সমাজতন্ত্রীরা গণতন্ত্র ও সাম্যের কথা বলতেন। বিসমার্কের প্রকল্পে সমাজতন্ত্রীরা তাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শত্রু বলে বিবেচিত হন। ১৮৭৭ সালের নির্বাচনে রাইখস্ট্যাগ সমাজতন্ত্রীরা মাত্র ১২টি আসন দখল করলেও তৃণমূল স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁরা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকেন। ১৮৭৭ সালে সমাজতন্ত্রী দল নিয়ন্ত্রিত Free Trade Union-এর সদস্যসংখ্যা ৫০,০০০-এ পৌঁছে যায়। পার্লামেন্টে বিসমার্কের নীতিগুলি সমাজতন্ত্রীদের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়ে। বিসমার্ক সমাজতন্ত্রীদের দমনের অজুহাত খুঁজতে থাকেন। ১৮৭৮ সালে কাইজার প্রথম উইলিয়মকে দুবার হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা হয়। দুটি ঘটনার সঙ্গেই সমাজতন্ত্রীদের কোন যোগ ছিল না; কিন্তু বিসমার্ক এই ঘটনাটিকে সুচতুরভাবে ব্যবহার করেন। লিন আব্রাম্‌সের মতে বিসমার্ক এক ঢিলে দুই পাখী মারেন। সমাজতন্ত্রীদের দায়ী করে বিসমার্ক তাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেন এবং রাইখস্ট্যাগ ভেঙে দিয়ে উদারনৈতিক দলকেও দুর্বল করার চেষ্টা করেন। মনে রাখা দরকার, এই সময় থেকেই বিসমার্ক ক্যাথলিকদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে সেন্টার পার্টির সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করতে থাকেন। উদারনৈতিক দলের একটা অংশ বিসমার্কের সমাজতন্ত্রী দল বিরোধী আইনগুলিকে সমর্থন করতে থাকেন। এইভাবে উদারনৈতিক দল বিভক্ত হয়ে পড়ায় বিসমার্ক সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তাঁর দমননীতি প্রয়োগ করার অবাধ সুযোগ পেয়ে যান। গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড, নির্বাসন দ্বারা তিনি সমাজতন্ত্রীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বিসমার্ক তাঁদের রাইখস্ট্যাগের নির্বাচনে লড়াইয়ের অধিকার হরণ করেননি ঠিকই, কিন্তু সমাজতন্ত্রী দলের সভা-সমিতি, মিছিল, পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, দলীয় প্রচারের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। ৯০০ ব্যক্তিকে নির্বাসিত করা হয়। ১৪টি সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয়। পুলিশের হাতে সমাজতন্ত্রীদের দমনের জন্য বিশেষ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়।

বিসমার্কের ক্যাথলিক দমনের নীতির মতো সমাজতন্ত্রী নিপীড়নের প্রকল্পও ব্যর্থ হয়। ১৮৮০-র দশকে জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়লে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তীব্রতর হয়। ১৮৯০ সালের নির্বাচনে সমাজতন্ত্রীরা সোসাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব জার্মানী (SDP) নামে পার্টির নতুন নামকরণ করে ভোটে অংশগ্রহণ করে। জনগণের ভোটের ২০% তাদের দিকে যায় এবং রাইখস্ট্যাগে তারা ৩৫টি আসন লাভ করে। বিসমার্কের নীতি সমাজতন্ত্রীদের দমন করতে ব্যর্থ হয়েছিল—তারা উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে এবং ১৯১৪ সালে সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য সংখ্যা দশ লক্ষে পৌঁছয় এবং ৩৯৭ আসনের রাইখস্ট্যাগে তারা ১১০টি আসন দখল করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

৩.৫ ❑ বিসমার্কের শিক্ষা ও শ্রমিক কল্যাণ নীতি

১৮৭১ সালে জার্মান শিক্ষাব্যবস্থা তৎকালীন ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে জার্মানীর প্রদেশগুলি প্রাথমিক শিক্ষায় উৎসাহ দিয়ে নানা ধরনের আইন জারি করেছিল। ১৮৭১ সালে শুধুমাত্র প্রাশিয়াতেই ৩৩ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় (Volkssdnnlen) ছিল যেখানে ৪০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করত। ১৯১১ সালে এই সংখ্যাটা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৯

হাজার এবং ৬৫ লক্ষ। উনবিংশ শতকের শেষে এক হাজারে মাত্র পাঁচজন জার্মান নিরক্ষর ছিলেন।

কুলটুর কাম্ফের দ্বারা জার্মানীতে ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক, ভাষাগত ও ধর্মীয় বিভাজনে দীর্ণ জার্মানীতে বিসমার্ক শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের উদ্দীপন চাইছিলেন। বিজয় দিবসগুলিতে (সেডান দিবস ইত্যাদি) ছাত্রছাত্রীদের মিছিলে অংশগ্রহণ, পতাকা ওড়ানো প্রভৃতি করানো হত। পাঠ্যপুস্তক ছিল জার্মান জাতির এবং কাইজারের গুণকীর্তন সমৃদ্ধ। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম চাইতেন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে রাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের আনুগত্যকে আরও দৃঢ়তর করে যে কোন বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে নির্মূল করতে।

যদিও বিসমার্ক ও কাইজারের এই শিক্ষাব্যবস্থা সামাজিক সাম্য আনতে ব্যর্থ হয়েছিল। খুব অল্পসংখ্যক মানুষই মাধ্যমিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ে আগ্রহী হত, কারণ উচ্চশিক্ষা ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। তবে প্রযুক্তিশিক্ষার প্রসারের ফলে জার্মানীতে দক্ষ শিল্পশ্রমিকের চাহিদা পূরণ হয়। একমাত্র ধনী এবং প্রভাবশালী পরিবারের সন্তানরাই গ্রামার স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে পারতো। ১৯০০ সাল পর্যন্ত মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ত্রুটি ছিল যে এই শিক্ষা সমাজকে বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে (critical) দেখাতে শেখাত না। উচ্চশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিজাত পেশাদার রাজনীতিক ও আমলা তৈরী করা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অন্যতম বিষয় ছিল অভিজাত আদবকায়দা শেখানো, এমনকি 'ডুয়েল' লড়াইও উচ্চশিক্ষার বিষয় ছিল। বিসমার্ক ও কাইজার পরিকল্পিত শিক্ষা তাই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার একটি পরিকল্পনা মাত্র ছিল।

সমাজের প্রতিটি শ্রেণিকে জার্মান রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত রাখার অভিপ্রায়ে বিসমার্ক 'আঘাত ও উপশম' (Carrot & stick) নীতি গ্রহণ করেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বদলের যেকোন বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মান অভিজাত ও শিল্পগোষ্ঠী কিছু সামাজিক সংস্কার এবং সমাজকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ করেন। বিসমার্ক জার্মান বুর্জোয়া উদ্যোগপতিদের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন। সেই কারণে কাজের ঘণ্টা কমানো, নারী ও শিশু শ্রমিকদের শ্রমসাধ্য কাজে অন্তর্ভুক্ত না করা, ন্যূনতম মজুরীর হার বেঁধে দেওয়া প্রভৃতি সংস্কারমূলক কাজে আগ্রহী ছিলেন না। কারণ তাতে শিল্পপতিরা বিরূপ হতে পারেন। কিন্তু ১৮৭৫ পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে, শ্রমিক অসন্তোষ অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। সমাজতন্ত্রী পার্টির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকলে বিসমার্ক প্রমাদ গোনেন। ১৮৮০-র দশকে বেশ কিছু শ্রমিককল্যাণমূলক নীতি নেওয়া হয়—যার ফলে শ্রমিকরা সীমিত মাত্রায় লাভবান হলেও ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি অত্যন্ত প্রগতিশীল নীতি বলে এগুলিকে অভিনন্দিত করে। ১৮৮১ সালে একটি সামাজিক বীমাগুচ্ছের নীতি ঘোষণা করা হয়। ১৮৮৩ সালে শ্রমিকদের অসুস্থতা বীমা, ১৮৮৪ সালে দুর্ঘটনা বীমা এবং ১৮৮৯ সালে বার্ধক্য বীমা চালু করা হয়।

বিসমার্কের এইসব তথাকথিত কল্যাণমূলক কাজের ফলাফল সন্তোষজনক ছিল না। তাঁর বার্ধক্য পেনসন প্রকল্পে দেয় টাকার পরিমাণ খুবই কম ছিল। দুর্ঘটনা বীমার মাত্র ১০% ক্ষেত্রে দাবী মেটানো হয়েছিল। বরং বিসমার্কের পরবর্তী চ্যান্সেলর ক্যাপ্রিভি কিছু কার্যকরী নীতি নিয়েছিলেন। ১৮৯১ সালে

রবিবার ছুটির দিন হিসাবে ঘোষিত হয়। ১৯০১ সালে শিল্প ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়, শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মাণ, শ্রমিকদের সন্তানদের ভরণপোষণ, বীমা ব্যবস্থার প্রসারণ প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্র বেশ কিছু সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে।

৩.৬ ❑ বিসমার্কের নেতৃত্বধীন জার্মানীর বৈদেশিক নীতি ও ত্রিশক্তি চুক্তি

ইউরোপের দুই বৃহৎ শক্তি অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সকে পর পর পরাস্ত করে ঐক্যবন্ধ জার্মানী ইউরোপের রাজনৈতিক নেতৃত্বে চলে আসে। কিন্তু ঐক্যবন্ধ জার্মানীর চ্যান্সেলর হিসাবে বিসমার্ক একটি যুদ্ধেও জার্মানীকে জড়িয়ে পড়তে দেননি। এর মূল কারণ ছিল সদ্য ঐক্যবন্ধ জার্মানীর অভ্যন্তরীণ গঠন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত না হতে দেওয়া। বিসমার্ক উপলব্ধি করেন যে আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করলে সমস্যাসঙ্কুল জার্মানীর অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ভেঙে পড়তে পারে। বিসমার্কের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য ছিল অস্ট্রিয়া এবং বিশেষত ফ্রান্সের মতো জার্মানীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলির হাত থেকে নবগঠিত জার্মানীকে রক্ষা করা। তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধির অধিকারী বিসমার্ক যুদ্ধের বদলে এই কাজে কূটনীতির আশ্রয়কে শ্রেয় মনে করেছিলেন।

তিনি জার্মানীর আগ্রাসী মনোভাব সম্পর্কে ইউরোপের আশঙ্কা নিরসনের জন্য ঘোষণা করেন যে, 'জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ' ; তার আর যুদ্ধ বা রাজ্যবিস্তারের প্রয়োজন নেই। বিসমার্কের এই ঘোষণা রাশিয়া, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশের আশঙ্কা দূর করে।

বিসমার্ক জার্মানীকে কেন্দ্র করে ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলিকে নিয়ে মিত্রজোট গঠনের চেষ্টা শুরু করেন। জোট গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষা করা। বিংশ শতকে রাশিয়ার সাম্যবাদকে ইউরোপীয় শক্তিগুলি যেমন সন্দেহের চোখে দেখত, ঊনবিংশ শতকে ফ্রান্সের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য, প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিও ইউরোপের রাজবংশগুলি বিদ্বিষ্ট ছিল। বিসমার্ক ফ্রান্সের এই বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের প্রতি সন্দেহকে জার্মানীর স্বার্থে ব্যবহার করেন। তিনি রাশিয়ার রোমানভ বংশের জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার, অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বার্গ বংশীয় সম্রাট ফ্রন্সিস যোসেফকে প্যারিস কমিউনের বৈপ্লবিক মতবাদ, রাশিয়ার নিহিলিজম, জার্মানীর সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি রাজতন্ত্রের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক তা সবিস্তারে বোঝান। বিসমার্কের প্রভাবে জার্মান সম্রাট কাইজার প্রথম উইলিয়ম, অস্টিয়ার কাইজার যোসেফ এবং রুশ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ১৮৭৩ সালে ড্রেই-কাইজার-বুন্ড (Drei-Kaiser-Bund) অর্থাৎ তিন কাইজারের লীগ নামে একটি মৈত্রীজোট গঠন করেন। এই চুক্তির ফলে ফ্রান্স ইউরোপে মিত্রহীন হয়ে পড়ে। তখনও পর্যন্ত ইংলন্ডের রাজনীতিকরা ফ্রান্সকেই প্রধান শত্রু মনে করতেন। বিসমার্ক উপনিবেশ বিস্তার এবং নৌবাহিনী গঠন না করার প্রতিশ্রুতি দিলে ইংলন্ড নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে।

ড্রেই-কাইজার-বুন্ড একটি অস্পষ্ট চুক্তি ছিল। তিনটি পক্ষ ইউরোপে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক শান্তি বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মাত্র। অচিরেই এই চুক্তিতে ফাটল ধরে। ফ্রান্স তার সামরিক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব পেশ করলে বিসমার্ক শঙ্কিত হয়ে

পড়েন। ১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসে বিসমার্কের প্ররোচনায় বার্লিনের একটি সংবাদপত্রে 'Is war in sight?' (যুদ্ধ কি আসন্ন ?) নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই অজুহাতে তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। বিসমার্কের আশা ছিল ড্রেই-কাইজার-বুন্ডের বাকী সদস্যরা তাঁকে সমর্থন করবেন। কিন্তু রুশ মন্ত্রী গোরচাকফ্ মনে করতেন, ফ্রান্সের পতন ঘটলে ইউরোপে জার্মানীর একাধিপত্য স্থাপিত হবে। গোরচাকফ্ জার্মানীকে সতর্ক করে বলেন যে ফ্রান্স আক্রান্ত হলে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকবে না। ইংলন্ড একই আশঙ্কা করে জার্মানীকে প্রতিবাদপত্র পাঠায়। বিসমার্ক ফ্রান্স আক্রমণের পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হন।

অন্যদিকে পূর্বাঞ্চল সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার সঙ্গে ইংলন্ড ও অস্ট্রিয়ার বিরোধ দেখা দেয়। বিসমার্ক আশঙ্কা করেন রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ দেখা দিলে তিন কাইজারের জোট ভেঙে যেতে পারে ; সর্বোপরি ফ্রান্সের সঙ্গে কোনো পক্ষ যুক্ত হয়ে যেতে পারে। এই আশঙ্কায় বিসমার্ক ১৮৭৮ খ্রিঃ বার্লিনে একটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেস আহ্বান করেন। বিসমার্ক বলেন যে এই কংগ্রেসে তাঁর ভূমিকা হল 'নিরপেক্ষ দালালের' (Honest Broker)। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করে ইউরোপের শক্তিসাম্য বজায় রাখা এবং ফ্রান্সকে সঙ্গীহীন রাখা।

কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর সম্পর্ক অন্য কারণে খারাপ হতে থাকে। ১৮৭০-এর দশকের শেষভাগে জার্মানীতে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে বিসমার্ক শুল্ক সংরক্ষণের নীতি নেন। বিসমার্ক জার্মানীতে রাশিয়ার শস্য আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করেন। তাছাড়াও বার্লিনের স্টক এক্সচেঞ্জে রুশ শেয়ার কেনাবেচা নিষিদ্ধ করা হয়। রাশিয়া এই সময় শস্য রপ্তানী এবং বৈদেশিক পুঁজির উপর নির্ভর করে শিল্পায়নের কাজ শুরু করেছিল। বিসমার্কের আভ্যন্তরীন নীতি এইভাবে রাশিয়াকে ক্রমশ জার্মানীর মৈত্রীজোট থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

তিন সম্রাটের লীগ ভেঙে লেগে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে দ্বিশক্তি মৈত্রী চুক্তি (১৮৭৯) সম্পাদন করেন। এই চুক্তিতে স্থির হয় যে,

(১) জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে কোন পক্ষ যদি রাশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে অন্যপক্ষ আক্রান্ত মিত্রকে সাহায্য করবে।

(২) দুই স্বাক্ষরকারীর মধ্যে কোন পক্ষ যদি তৃতীয় শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে অন্য পক্ষ নিরপেক্ষ থাকবে।

(৩) যদি এই আক্রমণকারীর সঙ্গে রাশিয়া যোগ দেয় তবে উভয় পক্ষ সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করবে।

(৪) এই সন্ধির শর্তাবলী অত্যন্ত গোপনে থাকবে। ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলর এই চুক্তির সমালোচনায় বিসমার্কের ভাষা ধার করেই বলেছেন যে, জার্মানীর ফ্রিগেটের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার পোকায়

খাওয়া গ্যালিয়নকে যুক্ত করা হল। টেইলরের মতে, ১৮৭৯ সালে রাশিয়া ও ফ্রান্সের তৎক্ষণাৎ জোটবন্ধ হওয়ার মত কোন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, বরং অস্ট্রো-জার্মান চুক্তি এই মৈত্রীর সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছিল। অস্ট্রিয়ার সঙ্গো জার্মানীর ভাগ্য জুড়ে বিসমার্ক ভুল চাল দিয়েছিলেন। অস্ট্রিয়া পরবর্তীকালে বলকান অঞ্চলে আগ্রাসী নীতি নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গো যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, ফলে জার্মানীকেও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার, দ্বৈত চুক্তির ফলে মধ্য ইউরোপে বিসমার্ক শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হন। সর্বোপরি জার্মানীর অভ্যন্তরে তিনি সেন্টার পার্টির সমর্থন লাভ করেন কারণ এই পার্টি চাইত অস্ট্রিয়ায় বসবাসকারী ক্যাথলিক এবং জার্মানভাষী মানুষদের সঙ্গো মৈত্রী।

বিসমার্ক সবসময়ই ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে রাখতে চাইতেন। যেহেতু দ্বিশক্তি মৈত্রীর (১৮৭৯) অন্যতম শর্ত ছিল গোপনীয়তা, বিসমার্ক তাই নিশ্চিন্তে রাশিয়ার সঙ্গো মৈত্রীর জন্য উদ্যোগী হন। তাঁর এক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ ছিল রাশিয়ার সঙ্গো ফ্রান্সের কোনরকম জোটবন্ধতা সম্ভাবনাকে নির্মূল করা। বিসমার্ক আবার ড্রেই-কাইজার-বুন্ডকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন এবং ১৮৮১ সালে ড্রেই-কাইজার-বুন্ড-নিস (Drei-Kaiser-Bund-Nis) বা তিন সম্রাটের মৈত্রীজোট স্বাক্ষরিত হয় জার্মানী, রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে। জার্মানী ও অস্ট্রিয়া উভয়েই পরস্পরের মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বৈত চুক্তির তথ্য রাশিয়ার কাছে গোপন করে যায়।

বিসমার্ক ফ্রান্সের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে তিন সম্রাটের জোটকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এ. জে. পি. টেইলরের মতে, ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে এসে রাশিয়ার নতুন জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার মেটারনিকের মত ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক ঐতিহ্য অথবা ১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক উত্থানের ভয়ে আচ্ছন্ন ছিলেন না। টেইলরের মতে, রাশিয়া এই জোটে যোগদান করে এই অঙ্ক কষে যে, বলকান সমস্যায় ইংলন্ডের সঙ্গো তার সংঘর্ষ অনিবার্য হলে অস্ট্রিয়া ও জার্মানী নিরপেক্ষ থাকবে। বিসমার্ক তাঁর ফ্রান্স-আতঙ্ক থেকে এই জোটকে পুনরুজ্জীবিত করেন; যেহেতু জার্মান-ফ্রান্স যুদ্ধের কোন বাস্তব সম্ভাবনা ছিল না টেইলরের মতে 'ড্রেই-কাইজার-বুন্ড-নিস' থেকে প্রকৃতপক্ষে লাভবান হয় রাশিয়া। তবে এই চুক্তির ভিত প্রথম চুক্তিটির মত দৃঢ় ছিল না। বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার স্বার্থ পরস্পর বিরোধী হওয়ার এই চুক্তি ক্রমশ অর্থহীন হয়ে পড়েছিল।

বিসমার্কের আশঙ্কা ছিল যে, ইটালী ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করতে পারে। ইটালী তার ঐক্যের জন্য ফ্রান্সের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। বিসমার্ক ইটালীকে ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেন। ইটালীর সঙ্গো ফ্রান্সের আফ্রিকার টিউনিস উপনিবেশ সংক্রান্ত বিবাদ ছিল। টিউনিসে প্রায় ২০ হাজার ইটালীয় এবং মাত্র দুশো ফরাসী বাস করতো। ইটালী টিউনিসে রেলপথ নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পেও জড়িয়ে ছিল। কিন্তু ফ্রান্স তার গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ আলজিরিয়ার কাছে অন্য কোশ ইউরোপীয় শক্তির উপনিবেশ গড়ে উঠতে দিতে রাজী ছিল না। ফ্রান্স টিউনিস দখল করলে ইটালী বিসমার্কের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ১৮৮২ সালে ত্রিশক্তি চুক্তিতে (Tripple alliance) যোগ দেয়। এই চুক্তি অন্য সদস্যরা ছিলেন অস্ট্রিয়া ও জার্মানী।

ত্রিশক্তি চুক্তি পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিল; কারণ, মধ্যযুগে জার্মানীর সব রাজাই চাইতেন ইটালীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে এবং রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান হতে। কিন্তু ত্রিশক্তি চুক্তিতে

এই স্মৃতির কোন তাৎপর্য ছিল না। ত্রিশক্তি চুক্তিতে স্থির হয় যে,

(১) যদি ফ্রান্স ইটালীকে আক্রমণ করে তবে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া একযোগে ইতালীর পক্ষ নেবে।

(২) ফ্রান্স যদি জার্মানীকে আক্রমণ করে তবে ইটালী জার্মানীর পক্ষ নেবে—এই ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়া কোনও প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

(৩) যদি একাধিক শক্তি কোন মিত্রকে আক্রমণ করে তবে তিন মিত্র একত্রে যুদ্ধ করতে অঙ্গীকার করে। ইটালীর পর রুমানিয়া (১৮৮৩) এবং তুরস্কও এই চুক্তিতে যোগ দেয়। যদিও তুরস্ক ও ইতালী স্বার্থ ছিল পরস্পর-বিরোধী তথাপি ইটালী ত্রিশক্তি-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। এই তথ্য গোপন করে যাওয়ায় তুরস্ক এই চুক্তিতে যোগদান করে। ত্রিশক্তি চুক্তিতে ইটালী ফ্রান্সের ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যথাক্রমে জার্মানী ও অস্ট্রিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ইটালীর ক্ষমতা ছিল অতি সামান্য যা থেকে বিসমার্কের তথা জার্মানীর কোনও লাভ হয়নি। অস্ট্রিয়া ও ইটালী ছিল স্বভাবশত্রু। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ক্ষোভবশতঃ ইটালী সাময়িকভাবে ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইটালী এই চুক্তি ভেঙে বেরিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে বলকান সমস্যা বুলগেরিয়াকে নিয়ে আবার জটিল আকার ধারণ করে এবং অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। জার্মান জনমত ছিল অস্ট্রিয়ার পক্ষে। কিন্তু রাশিয়া যাতে ফ্রান্সের পক্ষে না চলে যায় সেইজন্য বিসমার্ক রাশিয়ার সঙ্গে ১৮৮৭ সালে রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি করেন। টেইলর এই চুক্তিকে অর্থহীন নিরপেক্ষতার চুক্তি বলে বর্ণনা করেছেন (Neutrality of a meaningless kind)। জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ না করলে রাশিয়া জার্মানীর ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে। অন্যদিকে রাশিয়া অস্ট্রিয়া আক্রমণ না করলে জার্মানী রাশিয়ার ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে। এছাড়াও বিসমার্ক বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়াকে নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দেন এবং দার্দানেলিস ও বসফোরাস প্রণালীতে রুশ আধিপত্য মেনে নেন।

বিসমার্ক উপনিবেশ গঠনে উৎসাহ প্রদর্শন না করে তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ইংলন্ডের নিরপেক্ষতা লাভ করেন। তিনি জনৈক উপনিবেশ সমর্থকের কাছে মন্তব্য করেন যে, "তোমাদের পরিকল্পিত আফ্রিকার মানচিত্র পাতা রয়েছে ইউরোপের মাটিতে।" বিসমার্ক আফ্রিকা ও এশিয়ায় উপনিবেশ বিস্তারের চেয়ে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তিগুলির হাত থেকে জার্মানীকে রক্ষা করার কাজে বেশী উৎসাহী ছিলেন বিসমার্কের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ছিল নেহাতই অভ্যন্তরীণ চাপ থেকে মুক্তির উপায়। ১৮৭৫ পরবর্তী সময়ে জার্মানীতে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে এবং কলোনিয়াল ইউনিয়ন, সোসাইটি ফর জার্মান কলোনাইজেশন প্রভৃতি সংগঠন সরকারের উপর উপনিবেশ বিস্তারের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকলে, বিসমার্ক ১৮৮২-৮৪ সালের মধ্যে আফ্রিকার ক্যামেরুন, টোগোল্যান্ড, দঃ পঃ আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু অঞ্চলে প্রটেক্টরেট স্থাপন করেন। চীনের কিয়াও-চাওতেও উপনিবেশ স্থাপিত হয়। তবে বিসমার্কের দৃষ্টি সাধারণভাবে ইউরোপেই নিবদ্ধ ছিল এবং জার্মানীতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্রিটেন বা ফ্রান্সের মতো ঔপনিবেশিক উন্মাদনা ছিল না।

বিসমার্ক ৬টি চুক্তির দ্বারা জার্মানীর নিরাপত্তা রক্ষা করেন এবং ফ্রান্সকে মিত্রহীন রাখার চেষ্টা

চালান। কিন্তু বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতিতে বহু পরস্পর বিরোধিতা ছিল। তাঁর সম্পাদিত অস্ট্রিয়ার সঙ্গো দ্বিশক্তি চুক্তি ও এবং তিন সম্রাটের চুক্তি (১৮৮১) ছিল একে অপরের বিরোধী। প্রথম চুক্তিটিতে অস্ট্রিয়া রাশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হলে জার্মানী অস্ট্রিয়ার পক্ষ নিতে অঙ্গীকার করে। দ্বিতীয় চুক্তিতে এরকম ক্ষেত্রে জার্মানী নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়।

বিসমার্কের সন্ধিগুলি ছিল অত্যন্ত জটিল কূটনীতির ফল। কেটেলবি লিখেছেন, বিসমার্ক সর্বদা পাঁচটি বল নিয়ে খেলতেন যার তিনটিকে হাতে এবং দুটিকে শূন্যে রাখতেন। বিসমার্কের মতো ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই এতগুলি চুক্তিকে সামলানো সম্ভবপর ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরাধিকারীর পক্ষে এই কূটনৈতিক প্রক্রিয়া চালানো সম্ভবপর ছিল না।

বিসমার্ক বিভিন্ন ধরনের চতুর চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত জার্মানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন ঠিকই, কিন্তু এর ফলে জার্মানী সম্পর্কে সমগ্র ইউরোপে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

সর্বোপরি বিসমার্ক ফ্রান্সকে মিত্রহীন করার প্রচেষ্টায় নানা রকম ইউরোপীয় জোট তৈরীর চেষ্টা করেন। জোটের রাজনীতির পাল্টা জোটও গড়ে উঠতে থাকে। ত্রিশক্তি চুক্তির প্রতিক্রিয়াতেই পরবর্তীকালে ত্রিশক্তি আঁতাত গড়ে ওঠে।

তবুও একথা অনস্বীকার্য যে বিসমার্ক তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে জার্মানীকে নিরাপত্তা দানে এবং ইউরোপে শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হন।

৩.৭ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১. Taylor A. J. P—Bismarck : The Man and the Statesman.
২. Taylor A. J. P—The Struggle for Mastery in Europe.
৩. Thompson David—Europe Since Napoleon.
৪. Eyck Eric—Bismarck.
৫. Hobsbawn Eric—The Age of Capital.
৬. Craig Gordon A—Germany 1866-1945.
৭. Martel Gordon (ed)—Modern Germany Reconsidered (1870-1945)
৮. W ehler Hans-Ulrich—The German Empire (1871-1918)
৯. Ketlby—History of Modern Times.
১০. Lynn Abrams—Bismarck and the German Empire (1871-1918).
১১. Seamann—Vienna to Versailles.

৩.৮ ❑ অনুশীলনী

১. ঐক্যবন্ধ জার্মানীতে বিসমার্ক অনুসৃত অভ্যন্তরীণ নীতি বিশ্লেষণ কর।

২. বিসমার্কের সঙ্গো ক্যাথলিক ও সমাজতন্ত্রীদের সংঘাত বেধেছিল। কোন পক্ষকে বিসমার্ক বড় শত্রু মনে করতেন বলে তুমি মনে কর।

৩. ক্যাথলিক, সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে বিসমার্ক কি নীতি নিয়েছিলেন ?

৪. বিসমার্ক কি গণতন্ত্রী ছিলেন ?

৫. বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতিকে কি আগ্রাসী বলা চলে ?

৬. সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, জার্মানীকে রক্ষা করাই ছিল বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য : আলোচনা কর।

৭. বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতি কতটা 'ফরাসী আতঙ্ক' দ্বারা পরিচালিত।

৮. বিসমার্ক ১৮৭১ খ্রিঃ পর থেকে কিভাবে ফ্রান্সকে মিত্রহীন করেন তা আলোচনা কর।

৯. ত্রিশক্তি চুক্তি কি ? কিভাবে দেশগুলি এই চুক্তিতে আবন্ধ হয় ?

১০. ঐক্যবন্ধ জার্মানীতে বিসমার্কের বৈদেশিক নীতি কতদূর সফল হয়েছিল ? এই নীতির বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটিগুলি আলোচনা কর।

একক ৪ ❑ জার্মানীতে শিল্প বিপ্লব, বিসমার্কের যুগের অবসান ও কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের নেতৃত্বে জার্মানীর পররাষ্ট্র নীতি

গঠন

৪.০ প্রস্তাবনা
৪.১ ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর শিল্পায়ন
৪.২ বিসমার্কের যুগের অবসান
৪.৩ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের পররাষ্ট্র নীতি
৪.৪ ফ্রাঙ্কো-রুশ মৈত্রী
৪.৫ ফ্রাঙ্কো-ব্রিটেন জোট
৪.৬ রুশ-ব্রিটেন মৈত্রী ও ত্রিশক্তি আঁতাত
৪.৭ গ্রন্থাবলী
৪.৮ অনুশীলনী

৪.০ ❑ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জার্মানী ছিল ৩৮ রাজ্যে বিভক্ত, সমস্যাসঙ্কুল এক কৃষিপ্রধান দেশ। মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ, কোনো কোনো অঞ্চলে ৭৫ ভাগ মানুষ ছিল কৃষির সঙ্গো যুক্ত। অথচ ১৯১৪ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানী শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনে ও রপ্তানী বাণিজ্যে ব্রিটেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে। ১৮৭০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত জার্মানীর শিল্প উৎপাদনের বিকাশের হার ছিল চমকপ্রদ। ডেভিড টমসনের ভাষায় যুদ্ধপূর্ব ইউরোপের ইতিহাসে জার্মানীর এই অর্থনৈতিক প্রাধান্য অর্জনই ছিল সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

জার্মানীর এই অগ্রগতির ইতিহাসকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— ১৮১৫-১৮৭০ খ্রিঃ প্রাক্-ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর শিল্প গঠনের যুগ এবং ১৮৭০-১৯১৪ ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর শিল্প গঠনের যুগ। প্রথম পর্যায়ের শিল্পায়ন ছিল মন্থরগতি এবং আঞ্চলিক সমতাহীন। পরবর্তী পর্যায়ের গতি ছিল চমকপ্রদ এবং সর্বব্যাপী। জার্মানীর এই অকস্মাৎ অর্থনৈতিক উত্থানের সঙ্গো একমাত্র তুলনীয় জাপানের অতিদ্রুত হারে শিল্পের বিকাশ।

১৮১৫ খ্রিঃ জার্মানীতে শিল্প গঠনের পথে প্রচুর বাধা ছিল।

প্রথমত, জার্মানী ৩৮ রাজ্যে বিভক্ত থাকার ফলে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কাঁচামাল সরবরাহের অসুবিধা ছিল। বিভিন্ন রাজ্যের শুল্কের হার আলাদা হওয়ায় মালের উপর শুল্কের বোঝা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত, জার্মানীতে কোন কেন্দ্রীয় মুদ্রা না থাকায় রপ্তানী বাণিজ্য ছিল অত্যন্ত জটিল।

তৃতীয়ত, জার্মানীতে বিভিন্ন অঙ্গারাজ্যে বিভিন্ন আইন চলত, এর ফলে বাণিজ্যিক বা শুল্ক বিরোধের নিষ্পত্তি করা কষ্টকর ছিল।

চতুর্থত, জার্মানীর যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। জার্মানীর তিনটি প্রধান নদী রাইন, রোন ও এল্‌ব ছিল উত্তরবাহিনী এবং তারা বাল্টিক সাগরে পড়েছিল। এই তিন নদী ও তাদের শাখানদীগুলি জার্মানীকে তিনটি আলাদা ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছিল। জার্মানীর পুব সীমায় সাইলেসিয়ায় ছিল প্রধান কয়লাখনিগুলি এবং পশ্চিম সীমায় রূঢ় অঞ্চলে ছিল লোহার খনিগুলি। কয়লাকে লৌহ অঞ্চলে পরিবহণ করা ছিল অত্যন্ত দূরুহ।

পঞ্চমত, জার্মানীর কোন উপনিবেশ না থাকায় এবং অভ্যন্তরীণ বাজার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় শিল্প উৎপাদনে তেমন কোন উৎসাহ দেখা দেয়নি।

ষষ্ঠত, কৃষিপ্রধান জার্মানীতে ছিল মূলধনের অভাব। মূলধনের অভাবে শিল্প গঠনের কাজ পিছিয়ে যায়।

এই অসুবিধাগুলির পাশাপাশি জার্মানীতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কিছু অনুকূল পরিস্থিতিও ছিল।

(১) নেপোলিয়নের আমলে জার্মানীতে সামন্তপ্রথা, ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটে। কোড নেপোলিয়ন চালু করার ফলে পশ্চিম জার্মানীতে সামন্তপ্রথা, ভূমিদাসপ্রথা অবলোপ পায়। ফলে পশ্চিম জার্মানীর সমাজে আধুনিক চিন্তাধারা ও জীবনবোধ দেখা দেয়।

(২) জার্মানীর ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রামীণ জীবনের মূল্যবোধ একটি দেশে অতি দ্রুত শিল্প বিপ্লব রূপায়নের মানসিক ভিত্তি রচনা করেছিল। জার্মানীর আদর্শবাদী গ্রামীণ কৃষক সম্প্রদায়, পরিবারিক ও গীর্জা কেন্দ্রিক জীবন, ঐতিহ্যপূর্ণ সামাজিক নিয়ম, আচার প্রভৃতি জার্মানীর অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী মূল্যবোধসম্পন্ন জাতির সৃষ্টি করেছিল।

(৩) জার্মানীর সাক্ষরতার হার ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার তৎকালীন ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অগ্রসর ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই জার্মানীর প্রদেশগুলি প্রাথমিক শিক্ষায় উৎসাহ দিয়ে নানা ধরনের আইন জারি করেছিল। ১৮৭১ সালে শুধুমাত্র প্রাশিয়াতেই ৩৩ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং ৪০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়াশোনা করত।

(৪) ১৮৪০-১৮ খ্রিঃ সময়কালে জার্মানীর কৃষিতে বাণিজ্যিক ফসল চাষ বৃদ্ধি পায়। এই সময় জার্মানীতে কৃষিজমিরও সম্প্রসারণ ঘটে। আলু, সুগারবিট চাষ করে জার্মানীর ভূ-স্বামী শ্রেণি বা জুঙ্কাররা অর্থনৈতিকভাবে সম্পন্ন হয়ে ওঠে। এই শ্রেণি শস্য রপ্তানীর স্বার্থে জার্মানীর ঔপনিবেশিক বিস্তারের পক্ষপাতী ছিল। কৃষির বাণিজ্যকরণের ফলে জার্মান কৃষক বিশ্ববাজারের সঙ্গো পরিচিত হয়ে ওঠে।

(৫) জার্মানীর বুর্জোয়া ও বণিকশ্রেণির উদ্যোগে ১৮টি রাজ্য নিয়ে ১৮৩৫ সালে জোলভারেন বা

শুল্কসঙ্ঘ স্থাপিত হয়। ক্রমে জার্মানীর প্রায় সব রাজ্য এই শুল্কসঙ্ঘে যোগ দেয়। সারা জার্মানীতে একই হারে শুল্ক ও শুল্ক আইন চালু হওয়ায় পণ্য ও কাঁচামাল চলাচল সহজসাধ্য হয়। জার্মানী ঐক্যবন্ধ হলে কেন্দ্রীয় মুদ্রা চালু হয়, ফলে একটি প্রধান অর্থনৈতিক বাধা দূর হয়।

(৬) উনিশ শতকে জার্মানীতে রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল। জার্মানীর রেলপথ গঠনে ফ্রেডরিক লিস্ট সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। আমেরিকার মত জার্মানীর দুর্গম ও সম্পদশালী অঞ্চলগুলি রেলপথের দ্বারা যুক্ত হয়। গোটা জার্মানীতে রেলপথ পাতা হলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ বৃহত্তর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গো যুক্ত হতে সক্ষম হল। জোলভারেন দ্বারা জার্মানীর কৃত্রিম শুল্ক প্রাচীর ভাঙা হয়, আর রেলপথের মাধ্যমে জার্মানীর প্রাকৃতিক বাধা দূর করে জার্মানীর সংহতি ও অর্থনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। সর্বপ্রথম লাইপজিগ শহর থেকে ড্রেসডেন পর্যন্ত রেলপথ পাতা হয়। ক্রমে বার্লিনকে কেন্দ্র করে আরও নতুন নতুন রেলপথ তৈরি হয়। এই রেলপথগুলি জার্মানীর প্রধান শহরগুলিকে যুক্ত করে। কাঁচামাল রেলযোগে শহরের কারখানায় পৌঁছয়, তৈরি মাল কারখানা থেকে শহরের বাজারে বাহিত হয়।

(৭) জার্মানীর ভূপ্রকৃতি উন্নত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। পূর্ব সীমায় সাইলেসিয়া অঞ্চল কয়লা সমৃদ্ধ, পশ্চিমে রূঢ় ছিল উন্নতমানের লোহার আকরিকসমৃদ্ধ। অর্থনীতিবিদ কেইন্‌স্ সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে জার্মানীর ঐক্য রক্ত ও লৌহে হয়নি, হয়েছে কয়লা ও লৌহে।

যাতায়াত ব্যবস্থা ও শুল্ক ব্যবস্থার সংস্কার হলে জার্মানীতে কয়লা ও লোহার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। জার্মানীর বিখ্যাত ইস্পাত ও অস্ত্র তৈরীর কারখানা ক্রাপ (Krupp) কোম্পানী স্থাপিত হয়। ১৮৫০ খ্রিঃ জার্মানীর ইস্পাত উৎপাদন দাঁড়ায় ২০০, ০০০ টনে। জার্মানীর শিল্পের বিকাশ শুরু হলেও ঐক্যবন্ধ হওয়ায় তা পূর্ণতা পায়নি।

৪.১ ❑ ঐক্যবন্ধ জার্মানীর শিল্পায়ন

১৮৭০ খ্রিঃ পরে রাজনৈতিক ঐক্য আসার পরই জার্মানী দানবের মত বিশাল পদক্ষেপে শিল্প উৎপাদন ও বিশ্ব বাজারে ঢুকে পড়ে। জার্মানী সম্পদ সৃষ্টিতে ইউরোপের সমস্ত দেশকেই ছাপিয়ে যায় ; যদিও মনে রাখা দরকার ইউরোপের কোন দেশই সেই সময় স্থির হয়ে ছিল না।

জার্মানীর এই উড্ডয়নের পিছনে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছিল জার্মানীর অর্থনৈতিক সংগঠন। শিল্পের ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নত ঋনদান ব্যবস্থা। জার্মান ব্যাঙ্কগুলি উদ্যোগীদের এই পুঁজির যোগান দিয়েছিল। ১৮৪৭ সালেই প্রাশিয়ান ব্যাঙ্ক একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানী হিসাবে গঠিত হয়। জার্মানীর একীকরণের পর এই ব্যাঙ্কের নাম হয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব জার্মানী। কোলন, ম্যাগডেবার্গ, ড্যানজিগ, প্রসেন প্রভৃতি অঞ্চলে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর ধাঁচে বহু ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার এই দ্রুত সম্প্রসারণ জার্মানীতে শিল্প পুঁজির যোগানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১৮৭১ সালে রাইখ্‌স্ ব্যাঙ্ক (Reichs Bank) স্থাপিত হলে জার্মানীর ব্যাঙ্কিং শক্তি চরম পর্যায়ে ওঠে। জার্মানীর ব্যাঙ্কগুলি অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, আফ্রিকা, নিকটপ্রাচ্যেও পুঁজি সরবরাহ করতে থাকে। ১৮৭০ সালে জর্জ ফন সিমেন্স ডয়েশ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যাঙ্ক বিখ্যাত বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করে। বিশ্বযুদ্ধপূর্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে এই প্রকল্প গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ডেভিড টমসন দেখাচ্ছেন যে ১৮৭০ সালে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে জার্মানী এতটাই শিল্পসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যে তার প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে জার্মানীর শিল্প অর্থনীতির তুলনা করলে অনুপাতটি দাঁড়ায় এইরকম, জার্মানী ৩ ঃ ব্রিটেন ২ ঃ ফ্রান্স ১। ১৮৭০ থেকে ১৯১৪-র মধ্যে ফ্রান্স তার ব্লাস্ট ফার্নেসের উৎপাদন ক্ষমতা ছয় গুণ বাড়ালে জার্মানী বাড়িয়েছিল দশ গুণ। টমসন তাই মন্তব্য করেছেন যে "জার্মানীর লৌহমানব চ্যান্সেলর জার্মানীকে লৌহ ও ইস্পাতের যুগে পৌঁছে দিয়েছিলেন; চ্যান্সেলর তাঁর রাইখটিকে এমনভাবে ঢালাই করেছিলেন যা পণ্য উৎপাদনে দারুণভাবে সক্ষম হয়ে উঠেছিল।"

বিসমার্কের প্রথম কাজ জার্মানীর পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করা। তিনি ডাক, তার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান। একীকরণের সময় যে জার্মানীর রেলপথের বিস্তার ছিল ১৯,৫০০ কি.মি. ১৮৯০ সালে বিসমার্ক তাকে পৌঁছে দেন ৪৩,০০০ কি.মি.-তে। ১৯১০ সালে জার্মানীতে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৬১,০০০ কি.মি.। ১৮৭৯-১৮৮৪ খ্রিঃ মধ্যে প্রাশিয়ার অধিকাংশ সড়ককে রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয়। জার্মানীর কয়লা উৎপাদন ১৮৭১-১৯১৩ সালের মধ্যে সাত গুণ এবং লিগনাইট উৎপাদন দশ গুণ বৃদ্ধি পায়। কয়লা এবং লোহার এই মিলিত শক্তিতে জার্মানী অচিরেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠইস্পাতশিল্প-সমৃদ্ধ দেশ হয়ে ওঠে। জার্মানীর বিখ্যাত শিল্প গোষ্ঠীগুলি ক্রাপ (Krupp), থাইসেন (Thyssen), স্টাম-হ্যালবার্গ (Stumm-Helberg), ডনার্সমার্ক (Donnersmark) বিশ্বব্যাপী ইস্পাত সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ব্রিটেন কয়লা উৎপাদনে জার্মানীর তুলনায় এগিয়ে থাকলেও, ইস্পাত শিল্প বিকাশের যেটি প্রধান সূচক সেই পিগ আয়রন উৎপাদনে জার্মানী ব্রিটেনকে ছাড়িয়ে যায়। জার্মানীতে পরে শিল্পায়ন শুরু হলেও ইংলন্ড ও বেলজিয়মে ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত কারিগরি জ্ঞানের সুফল জার্মানী কাজে লাগিয়েছিল। ইংলন্ডে আবিষ্কৃত টমাস-গিলক্রিস্ট পদ্ধতিতে লোরেন অঞ্চলে প্রাপ্ত ফসফরাস সমৃদ্ধ লৌহ আকরিক থেকে জার্মান শিল্পপতিরা ইস্পাত তৈরী করতেন। রূঢ়, সার, লোরেন, সাইলেসিয়ায় গড়ে ওঠা ভারী শিল্পগুলিই ছিল ইউরোপে জার্মানীর সমৃদ্ধি ও ক্ষমতার ভিত্তি।

১৮৮০ পরবর্তীকালে জার্মানীতে ইস্পাত শিল্প ছাড়াও আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের বিকাশ হয়—ইলেকট্রনিক ও রাসায়নিক। ওয়ার্নার ফন সিমেন্স (Warner Von Siemens) ইলেকট্রিক ডায়নামো আবিষ্কার করেন। তিনি সিমেন্স অ্যান্ড হ্যালস্কি (Siemens & Halske) নামে একটি কোম্পানী তৈরী করেন যারা উচ্চমাত্রায় তড়িৎপ্রবাহের প্রযুক্তিতে বিশেষজ্ঞ ছিল। এমিল র‍্যাটেন্যু (Emil Rathenau) জার্মান এডিসন কোম্পানী তৈরী করেন ১৮৮৩ সালে যেটি পরবর্তীকালে বিখ্যাত AEG কোম্পানী নামে পরিচিত হয়। এই দুই কোম্পানী জার্মানীতে ব্যাপক উন্মাদনা সৃষ্টি করে। ১৯০৬ সালের মধ্যে

বিদ্যুৎ শিল্পে জার্মানীতে লক্ষেরও বেশী মানুষের কর্মসংস্থান হয়। ১৯১৩ সাল নাগাদ বিদ্যুদায়নের যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের ব্যবসায়ে জার্মানী প্রথম স্থানে চলে আসে।

সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদ এবং উন্নত মানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জন্যে জার্মানী রাসায়নিক শিল্পেও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। সালফিউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, পটাসিয়াম লবন, শিল্পে ব্যবহৃত রঞ্জক, কৃত্রিম রবার, প্লাস্টিক, সার, জীবনদায়ী ওষুধ নির্মাণে জার্মানী অসাধারণ দক্ষতা দেখায়। ১৮৮৫ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়টি হল জার্মান শিল্পের স্বর্ণযুগ। শুধুমাত্র রাসায়নিক শিল্পে এই সময়কালে কর্মীসংখ্যা চার গুণ বৃদ্ধি পায়। বিদ্যুৎ এবং রসায়ন এই দুটি অত্যাধুনিক শিল্পে দক্ষতা অর্জনের ফলে জার্মানী অন্য দেশগুলির তুলনায় জাতীয় অগ্রগতিতে এবং রপ্তানী বাণিজ্যে অনেক সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে যায়।

এই পরিস্থিতিতে খুব স্বাভাবিকভাবেই জার্মান বাণিজ্য প্রসারিত হতে থাকে। গোটা ইউরোপ রেলপথ দ্বারা গ্রথিত হলে জার্মানী বিশেষভাবে লাভবান হয়। ভৌগোলিকভাবে জার্মানী খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না। তার নদীগুলি বাল্টিক সাগরের দিকে উত্তরবাহিনী হওয়ার জার্মানী নদীপথকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করতে পারত না। দক্ষিণ দিকে ছিল পর্বতের প্রাচীর, সমুদ্র উপকূলও জার্মানীর যৎসামান্য ছিল। জার্মানীর অবস্থান ইউরোপের প্রায় মধ্যভাগে হওয়ায় ইউরোপের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুলি জার্মানীর নিকট দিয়েই গিয়েছিল। জার্মানীর বিখ্যাত খালগুলির সংস্কার করা হয় এবং বিখ্যাত কিয়েল খাল কাটা হয়। ১৮৮৬ সালে অ্যালবার্ট বালিন (Albert Ballin) বিখ্যাত 'Hamburg-Amerika' নৌপথের ক্ষমতা বাড়ান, এই পথে ২২টি স্টীমার যা ৬০,৫০০ টন মাল বহন করত। বালিন ১৯১৩ সালের মধ্যে এই ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ১৭২টি স্টীমার চালাতে থাকেন যার মোট মালবহন ক্ষমতা ছিল ১ লক্ষ টনের উপর। বালিন দক্ষিণ আমেরিকা, দূরপ্রাচ্যের সঙ্গেও জার্মানীর নৌ-যোগাযোগ ঘটান। বালিন ক্রমে কাইজারের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হয়ে ওঠেন। ব্রেমেনের নর্থ জার্মান লয়েড কোম্পানী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে নিয়মিত জাহাজ পরিবহণের ব্যবস্থা করে। হামবুর্গ, ব্রেমেন প্রভৃতি বন্দরগুলির মালবহনের ক্ষমতা বারংবার বাড়ানো হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী যাত্রীবাহী এবং মালবাহী জাহাজের নিরিখে ব্রিটেনের পরই ২য় শ্রেষ্ঠ স্থানে ছিল। ১৯১৩ সালে পণ্য রফতানীতেও জার্মানী (১০২১ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং) ব্রিটেনের (১১৮৬ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং) প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল।

জার্মানীর শিল্পগুলি একচেটিয়া বাজার ধরে রাখতে, নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় শক্তিক্ষয় রোধ করতে কার্টেল, কম্বাইন, ট্রাস্ট প্রভৃতি নামে ঐক্যবন্ধ হয়। জার্মানীর সবচেয়ে বড় দুটি কার্টেলের নাম ছিল রেনিশ-ওয়েস্টফ্যালিয়ান সিন্ডিকেট (Rhenish-Westphalian Syndicate) এবং স্টীলওয়ার্কস ইউনিয়ন (Steelworks Union)। বিখ্যাত বিদ্যুৎ কোম্পানী সিমেন্স অ্যান্ড হ্যালস্কি পরবর্ত্তীকালে সিমেন্স-শুকার্টওয়েরেক (Siemens-Schuckert werke) নামক কম্বাইনে মিশে যায়।

বৃহৎ কোম্পানীগুলি কার্টেলে আবন্ধ হত তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে। অর্থনৈতিকভাবে এই কার্টেলগুলি এত শক্তিশালী ছিল যে কোনো সরকারই তাদের শ্রমিক, বেতন, জাতীয় নিরাপত্তা ইত্যাদি

বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হত না। বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলি অনেক সময় সংবাদপত্র প্রকাশ করে নিজেদের স্বার্থে জনমত তৈরী করত। ১৮৯৮ সালে জার্মান নেভি লীগ জার্মানীর নৌ বাহিনীর সম্প্রসারণ, পুরনো জাহাজ ভেঙে ফেলে নতুন জাহাজ তৈরী ইত্যাদির দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। এদের পিছনে ছিল জার্মানীর রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল, জাহাজ কোম্পানীগুলি এবং সর্বোপরি ক্রাপ কোম্পানী তথা রাইন অঞ্চলের ইস্পাত কার্টেলটি। টমসন মন্তব্য করেছেন গণতন্ত্র, ব্যক্তি ও বাক্ স্বাধীনতার উত্থানের যুগে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই বৃহৎ অর্থনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠীগুলি এগুলিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে থাকে।

৪.২ ❑ বিসমার্কের যুগের অবসান

১৮৯০ সালের ১৮ই মার্চ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের কাছে বিসমার্ক তাঁর পদত্যাগপত্র দেন। ১৮৮৯ সালের মে মাসে সারা জার্মানী জুড়ে খনিশ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করলে বিসমার্ক তাঁর চিরাচরিত পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র বিরোধী আইন জারি করে বলপূর্বক এই ধর্মঘটকে প্রতিরোধ করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম নমনীয় নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৯০ সালে উইলিয়ম শ্রমিকদের সুরক্ষা সংক্রান্ত কিছু কল্যাণমূলক আইন জারির উদ্যোগ নেন। তিনি উপলব্ধি করেন দ্রুত শিল্পায়ন এবং আধুনিকীকরণের দিকে ধাবমান জার্মানীতে শ্রমিকদের উপর নির্মম দমননীতি উন্নয়নের গতির পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। বিসমার্ক এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর জার্মানীর চ্যান্সেলর হিসাবে শাসন চালানোর পর কাইজার কর্তৃক বিসমার্কের নীতির বিরোধিতা এবং তাঁর পদত্যাগকে 'Dropping of the pilot' বা 'জাহাজের ক্যাপ্টেনকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ' বলে অভিহিত করা হয়।

৪.৩ ❑ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের পররাষ্ট্র নীতি

১৮৯০ খ্রিঃ থেকে ১৯১৮ খ্রিঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম। পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে উইলিয়ম বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির মূল সূত্রগুলি ত্যাগ করেন। এটিকে বলা হয় New cource policy বা কাইজার উইলিয়মের জার্মানীর নবনীতি। এই নতুন নীতি গ্রহণের জন্য কাইজারের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে একমাত্র দায়ী করা অনৈতিহাসিক হবে। বিসমার্কের পতনের পর জার্মান রাজনীতিতে বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীগুলি জার্মানীর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করে। বিসমার্ক তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure group) গুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। তাঁর অবর্তমানে এই গোষ্ঠীগুলি জার্মান রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে।

(১) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির অন্যতম ছিল কৃষিলবি। ১৮৯৩ সালে জুঙ্কার প্রভাবিত অ্যাগ্রেরিয়ান লীগ স্থাপিত হয়। এই ধনী ভূ-স্বামী নিয়ন্ত্রিত লীগটি ছিল জার্মানীর রক্ষণশীল রাজনৈতিক দলের প্রধান

শক্তি। এঁরা শস্য আমদানীর উপর চড়া শুল্ক চাপিয়ে জার্মানীর অভ্যন্তরীণ বাজারটি ধরে রাখতে চাইতেন। অ্যাগ্রেরিয়ান লীগ উপনিবেশ বিস্তারের সমর্থক ছিলেন বহির্দেশীয় বাজার দখল করার উদ্দেশ্যে। সেই লক্ষ্যে তাঁরা সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধির সরকারী নীতিকে সমর্থন করেন।

(২) উপনিবেশবাদী অনেকগুলি সংগঠন এই সময় গজিয়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জার্মান কলোনিয়াল সোসাইটি (১৮৮৭), প্যান জার্মান লীগ (১৮৯১), লেভি লীগ (১৮৯৮) এবং আর্মি লীগ (১৯১২)। এদের মধ্যে প্যান-জার্মান লীগের সদস্য সংখ্যা ১৯০২ সালে ২২ হাজারে পৌঁছায়। এরা জার্মানীর যুদ্ধ জাহাজ তৈরীর দাবীতে জনমত গঠন করতে থাকে। অ্যাডমিরাল ফন তিরপিৎস্ (Von Tirpits) কাইজারকে প্রত্যক্ষভাবে নৌবাহিনীর পুনর্নির্মানের জন্য উৎসাহিত করেন। এজন্য ব্রিটেনের সঙ্গে জার্মানীর তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। অ্যাডমিরাল তিরপিৎসের প্রধান সহায়ক ছিল নেভি লীগ; মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে এর সদস্য সংখ্যা ২ লক্ষে পৌঁছে যায়। নেভি লীগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জার্মানীর ইস্পাত শিল্পের উদ্যোগপতি ক্রাপ (Krupp)। ক্রাপের কোম্পানীই একমাত্র যুদ্ধজাহাজে ব্যবহৃত আর্মার প্লেট (Armour plate) তৈরী করত। সুতরাং সরকার যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করলে ক্রাপের সরাসরি লাভের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অন্যান্য শিল্পপতিরাও যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের পরিকল্পনার সমর্থক ছিলেন কারণ এর ফলে উৎপাদন শিল্পের প্রসার ঘটবে এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হবে। ১৮৯০-এর দশকে জার্মানীতে শিল্পের অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটে। কয়লা, লোহা ও রাসায়নিক শিল্পে জার্মানী ইংলন্ডকে ধরে ফেলে। জার্মানীর শিল্পপতি ও বুদ্ধিজীবিরা দাবী জানাতে থাকেন যে উদ্বৃত্ত মাল বিক্রীর জন্য উপনিবেশ দরকার। হ্যানস ডেলব্রুক উপনিবেশ গঠনের জন্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। কাইজার উপলব্ধি করেন যে শিল্প বিস্তারের ফলে শহুরে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; এদের মধ্যেই ক্রমশ উপনিবেশ বিস্তারের দাবী ছড়াচ্ছে।

(৩) কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের 'ওয়েল্ট পলিটিক' (Welt politik) উপরোক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফসল। সাধারণভাবে ওয়েল্ট পলিটিক বলতে বোঝায় ইউরোপ মহাদেশে জার্মানীকে শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করা, বলকান ও আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তার, নৌবহরের সম্প্রসারণ এবং সামুদ্রিক শক্তি হিসাবে জার্মানীর উত্থান প্রভৃতি। ওয়েল্ট পলিটিক তত্ত্ব 'প্যান-জার্মান' তত্ত্বের খুবই কাছাকাছি। ১৮৯১ সালে কার্ল পিটার্সের (Karl Peters) প্যান-জার্মান লীগ গঠিত হয়। শিল্পপতি, আমলা, বুদ্ধিজীবিরা ছিলেন এর সদস্য। এঁরা ইউরোপের প্রাণকেন্দ্রে এক বৃহত্তর জার্মানীর স্বপ্ন দেখতেন। নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, সার্বিয়া এবং সুইজারল্যান্ডের কিছু অংশ তাঁদের বৃহত্তর জার্মানীর পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। দ্বিতীয়ত, তাঁরা এই বৃহত্তর জার্মানীকে সারা পৃথিবীর শাসক হিসাবে দেখতে চাইতেন। ম্যাক্স ওয়েবারের ওয়েল্ট পলিটিক তত্ত্বেও বলা হয় যে জার্মানীর ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতিই হল জার্মানীর বিশ্ব আধিপত্য। যেভাবে ব্রান্ডেনবার্গ রাজ্য প্রাশিয়াতে পরিণত হয়েছে, প্রাশিয়া পরিণত হয়েছে জার্মানীতে সেভাবেই জার্মানী একটি বিশ্বশক্তিতে পরিণত হবে। ম্যাক্স ওয়েবারের উপনিবেশবাদ ও সম্প্রসারণের তত্ত্ব গোটা জার্মানীতে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কুর্ট রিজলার

(Kurt Reisler) ওয়েল্ট পলিটিকের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেন যে, প্রতি বছর বর্ধমান জার্মানীর লোকসংখ্যার জন্য বাসস্থান চাই। জার্মানীর উদ্বৃত্ত শিল্পের বাজার চাই। তাই উপনিবেশ দখল প্রয়োজন।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আত্মম্ভরিতা নিয়ে বহু ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার, কাইজার অত্যন্ত সাধারণ মেধার মানুষ ছিলেন, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল না ; বরং ঘটনাস্রোতে তিনিও গা ভাসিয়ে দিতেন। ঔপনিবেশিক বিস্তারের নীতির জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করে তিনিও বলতে থাকেন যে "জার্মানী আদৌ কোন পরিতৃপ্ত দেশ নয়—বিশ্বের চারিদিকে শুধুই ব্রিটিশ ও ফরাসী উপনিবেশ দেখতে পাই। জার্মানীও সূর্যের নীচে বাস করে।"

৪.৪ ❑ ফ্রাঙ্কো-রুশ মৈত্রী

কাইজার উইলিয়ম বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতি থেকে ক্রমশ সরে আসতে থাকেন। ১৮৯০ সালে বিসমার্কের পতনের পর কাইজার রুশ-জার্মান অনাক্রমণমূলক রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি নবকরণে অস্বীকার করেন। রুশ জার নিশ্চিত হন যে বলকানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করতে জার্মানী বেশী ইচ্ছুক। বলকান সমস্যায় নিরপেক্ষ থাকার বিসমার্কের নীতি থেকে উইলিয়ম সরে আসেন, বুলগেরিয়ার সিংহাসনে কাইজার এক জার্মান রাজবংশকে স্থাপন করার পর, জার্মান সেনাপতিদের দ্বারা বুলগেরীয় সেনাদল গঠনের চেষ্টা করা হলে, রাশিয়া অসন্তুষ্ট হয়। পূর্ব-ইউরোপে জার্মান অনুপ্রবেশ রাশিয়ার স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। এছাড়াও ১৮৯৭ সালে রাশিয়ায় অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে রুবলের দাম পড়ে যায় এবং জার জার্মানীর কাছে ঋণ চান। কাইজার তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং জার্মান সংবাদপত্রে লেখা হয় যে রাশিয়া দেউলিয়া হয়ে গেছে। জার এতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন।

ফরাসী মন্ত্রী ডেলক্যাসি রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর আগ্রহ দেখান। এরপর রুশ সেনাপতি ওব্রুচেভ এবং ফরাসী সেনাপতি বউসড্রাফির মধ্যে প্রথমে এক সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয় (১৮৯১)। এরপর ১৮৯৩ খ্রিঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা স্থির হয় যে যদি জার্মানী রাশিয়াকে আক্রমন করে, অথবা জার্মান সমর্থন নিয়ে অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে আক্রমণ করে তবে ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অন্যদিকে যদি জার্মানী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে অথবা জার্মানীর সমর্থন নিয়ে ইটালী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে তবে রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করবে। স্থির হয় ফ্রান্স বা রাশিয়ার মধ্যে কেউ স্বতন্ত্রভাবে জার্মানীর সঙ্গে শান্তিচুক্তি করবে না। ফ্রাঙ্কো-রুশ মৈত্রীর তাৎপর্য অন্যদিক থেকেও অনুভব করা যায়। জার্মানী অনুভব করে যে ইউরোপে সে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। এর ফলে জার্মানী সামরিক প্রস্তুতি বাড়িয়ে দেয়। ১৮৯৪ সালে জার্মান সেনাপতি স্লিফেন তাঁর সামরিক পরিকল্পনা পেশ করেন। ইতিপূর্বে জার্মান সেনাপতি ফন মল্টকি মনে করতেন যে পূর্বদিকে দুর্বল রাশিয়াকে আক্রমণ করাটাই হবে শ্রেষ্ঠ রণকৌশল। কিন্তু রাশিয়ার বিশাল পশ্চাদ্ভূমির কথা মাথায় রেখে স্লিফেন একই সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম—দুটি রণাঙ্গান খোলার পরামর্শ দেন। স্লিফেনের প্রাথমিক

পরিকল্পনা ছিল জার্মানী একই সঙ্গো পূর্বদিকে রাশিয়াকে এবং পশ্চিমে ফ্রান্সকে আক্রমণ করবে। যদিও সীমান্তে ফ্রান্সের দুর্গসমাবেশ লক্ষ্য করে পরবর্তীকালে স্লিফেন বেলজিয়াম সীমান্তে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রস্তাব দেন।

৪.৫ ❑ ফ্রাঙ্কো-ব্রিটেন জোট

ব্রিটেনের সঙ্গোও কাইজারের জার্মানীর কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। ব্রিটেনের সঙ্গো বুয়রদের যুদ্ধে কাইজার উইলিয়ম অযথা জার্মানীকে জড়িয়ে ফেলেন। তিনি ট্রান্সভালের প্রেসিডেন্ট ক্রুগারকে টেলিগ্রাম (১৮৯৬) করে সাহায্যের ইঙ্গিত দেন। অবশ্যই এটা কাইজারের ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের পরিকল্পনার অঙ্গা ছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা বিশেষত উত্তমাশা অন্তরীপে ব্রিটেনের একাধিপত্যের প্রয়োজন ছিল ; কারণ ভারতে আসার জন্য ভূমধ্যসাগর ছাড়া এটাই ছিল ব্রিটেনের নিরাপদতম সমুদ্রপথ। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের তীব্র প্রতিবাদে এবং তাদের সামরিক প্রস্তুতি অনুভব করে কাইজার পিছু হটেন। ১৮৯৭ সালে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে জার্মানী চীনের বন্দর কিয়াও-চাও অধিকার করে। এ. জে. পি টেইলরের মতে, কিয়াও-চাও দখলের মাধ্যমে জার্মানী প্রথম তার ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্যকে প্রকাশ্যে আনল। এই সময় থেকে ব্রিটেন ও রাশিয়ার বিশ্ব রাজনীতিতে যেখানেই কোন ভূমিকা থাকত জার্মানী সেখানেই হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করতে থাকে। কাইজার তুরস্ক ভ্রমণে গিয়ে, তুরস্ক সুলতানের সঙ্গো মিত্রতা স্থাপন করেন। ১৮৯৮ সালে বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা হয়। এই রেলপথ তৈরী হলে বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্যের বাজার ও কাঁচামাল জার্মানীর দখলে আসবে ভাবা হয়। তুর্কী সাম্রাজ্য বিশেষত নিকটপ্রাচ্য রাশিয়া ও ব্রিটেনের পক্ষে ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল অঞ্চল। বিসমার্ক প্রাচ্য সমস্যায় নিরুৎসাহী থেকে রাশিয়ার মিত্রতা ও ব্রিটেনের নিরপেক্ষতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এই অঞ্চলে জার্মান অনুপ্রবেশ এই দুই শক্তিকে বিশেষভাবে শঙ্কিত করে।

ইতিমধ্যে জার্মান নৌসেনাপতি তিরপিৎস যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ শুরু করলে ব্রিটেনেও এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা। ব্রিটেনের সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও বেশী যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের দাবী উঠতে থাকে। ইংলন্ডের নৌমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল কাইজারের কাছে যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের প্রকল্প বন্ধ রাখার আর্জি জানান। চার্চিলের যুক্তি ছিল যে ভৌগোলিকভাবে ইংলন্ড সমুদ্রবেষ্টিত দেশ ; সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তার নৌশক্তির প্রয়োজন। বিপুল স্থলবাহিনীসমৃদ্ধ জার্মানীর নৌবাহিনীর প্রয়োজন নেই—তা জার্মানীর কাছে বিলাসিতা মাত্র। কাইজার এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী ফন বুলো ইংলন্ডের আর্জিতে কর্ণপাত করেননি। এসব সত্ত্বেও ইংলন্ডের চেম্বারলেন, হলডেন প্রমুখ নেতা ও কূটনীতিজ্ঞ জার্মানীর সঙ্গো সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী হন। এশিয়ার আফগানিস্তান, পারস্য, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে ইংলন্ডের সঙ্গো রাশিয়ার বিরোধ২ ছিল। রাশিয়া যেহেতু ফ্রান্সের সঙ্গো মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ ছিল, ইংলন্ডের এই নেতারা মনে করতেন ফ্রাঙ্কো-রুশ জোটের পাল্টা ইঙ্গ-জার্মান জোট গঠন করা গেলে ইউরোপে শক্তিসাম্য বজায় থাকবে।

চেম্বারলেনের মিত্রতা প্রস্তাব এবং জার্মানীতে হলডেনের মৈত্রী মিশন কাইজার অগ্রাহ্য করেন। এই পরিস্থিতিতেই ইংলন্ড ক্রমশ ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গো ঔপনিবেশিক বিরোধ মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগী হন। ১৯০৪ খ্রিঃ ইঙ্গা-ফরাসী কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিকে আঁতাত বা ঘনিষ্ঠ মিত্রতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তিতে স্থির হয় যে—

(১) মিশরে ব্রিটেনকে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় ফ্রান্স বাধা দেবে না।

(২) ব্রিটেন মরক্কোতে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক বিস্তারে বাধা না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

(৩) থাইল্যান্ড, মাদাগাস্কার, নিউ ফাউন্ডল্যান্ডে উভয় দেশ নিজ নিজ কর্তৃত্বের এলাকা নির্দিষ্ট করে এই সমস্ত অঞ্চলে তাদের ঔপনিবেশিক বিরোধ মিটিয়ে নেবে।

(৪) ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সমুদ্রে ইংলন্ড তার নৌবহর এবং ভূমধ্যসাগরে ফরাসী নৌবহর দ্বারা জার্মান নৌশক্তির বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা হয়।

৪.৬ ❑ রুশ-ব্রিটেন মৈত্রী ও ত্রিশক্তি আঁতাত

দূরপ্রাচ্যে রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-০৫) জাপানের কাছে রাশিয়া পরাজিত হয়। এর ফলে দূর প্রাচ্যে রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা লুপ্ত হয়। রাশিয়া আবার বলকান অঞ্চলে তার দৃষ্টি ফেরায়। জাপানের কাছে পরাজয়ের ফলে মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল নিয়ে ব্রিটেনের রুশ ভীতি দূর হয়। বলকান অঞ্চলে রাশিয়া পুনরায় উৎসাহী হয়ে পড়ায় অস্ট্রিয়ার সঙ্গো রাশিয়ার বিরোধের পুরনো কারণগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়। ব্রিটেনও জার্মানীর মতো বিশাল স্থলশক্তির সঙ্গো পাল্লা দেওয়ার জন্য রাশিয়ার মিত্রতার প্রত্যাশা করে। রাশিয়ার সঙ্গো ব্রিটেনের বিরোধের বিষয়গুলি মধ্যস্থতা করার জন্য এগিয়ে আসেন ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ডেলক্যাসি। অবশেষে ১৯০৭ সালে ইঙ্গা-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে উভয় দেশ আফগানিস্তান ও তিব্বতের স্বাধীনতা রক্ষায় সম্মত হয়। পারস্যের ক্ষেত্রে উভয় স্বাক্ষরকারী নিজ নিজ কর্তৃত্বের অঞ্চল আপোসে স্থির করে নেয়। রাশিয়ার সঙ্গো ব্রিটেনের মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ইংলন্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স এই ত্রিপক্ষীয় আঁতাত গঠিত হয়। ত্রিশক্তি মৈত্রী ও ত্রিশক্তি আঁতাত ইউরোপে শান্তি আনার বদলে উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই দুটি যুযুধান পক্ষের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল।

৪.৭ ❑ কাইজার ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আগ্রাসী মনোভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। কাইজারের ওয়েল্ট পলিটিক, মিটেল ইওরোপা, মিটেল আফ্রিকা নীতি ইউরোপের উন্নত

দেশগুলির শঙ্কা সৃষ্টি করেছিল। ১৯০৫-১৯০৬, ১৯১১-য় মরক্কোর সঙ্কট জার্মানীর আগ্রাসী মনোভাব বিশ্বের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছিল। আলজেরিয়ার ফরাসী উপনিবেশের সঙ্গে মরক্কোর সুলতানের সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধ দেখা দিলে কাইজার উইলিয়াম অকস্মাৎ ১৯০৫ খ্রিঃ টাঞ্জিয়ার বন্দরে অবতরণ করেন এবং মরক্কোর সুলতানকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাহায্য দানের কথা বলেন এবং ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী ডেলক্যাসির পদত্যাগ দাবী করে চরমপত্র দেন। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধের ভয়ে ডেলক্যাসিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এ. জে. পি. টেইলরের মতে, সেডানের যুদ্ধের পর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানীর-এতবড় সাফল্য আর আসেনি। কিন্তু এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ফ্রান্সে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং প্রধান আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি প্রায় সবাই ফ্রান্সের পাশে এসে দাঁড়ায়। ১৯০৬ সালে মরক্কো সঙ্কট নিরসনে আলজেরিয়াতে এক সম্মেলন হয় এবং কাইজার উইলিয়মকে মরক্কো থেকে প্রায় শূন্য হাতে ফিরতে হয়। মরক্কোর সঙ্গে জার্মানীর স্বার্থ কোনও ভাবেই জড়িত ছিল না। কিন্তু কাইজার যেকোন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনায়, বিশেষত যেখানে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া আছে, হস্তক্ষেপ করে জার্মানীর তথা নিজস্ব শক্তি প্রদর্শন করতে চাইতেন। ১৯১১ সালে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের দমন করতে গিয়ে ফ্রান্স মরক্কোর ফেজ শহর দখল করে। কাইজার তৎক্ষণাৎ জার্মান রণপোত 'প্যান্থার'কে মরক্কোর আগাদির বন্দরে প্রেরণ করেন। কাইজার ফরাসী অধিকৃত কঙ্গো ফ্রান্সের কাছে দাবী করেন। জার্মানীর এই কর্তৃত্বপূর্ণ এবং আগ্রাসী মনোভাবে গোটা ইউরোপ বিরক্ত হয়ে ওঠে। জার্মানীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের পক্ষপাতী, বুয়র যুদ্ধ বিরোধী ব্রিটিশ নেতা লয়েড জর্জ পর্যন্ত আবেগময় ভাষণে জার্মানীর তীব্র নিন্দা করে চরমপত্র দেন। শেষ পর্যন্ত জার্মানী অতি সামান্য ক্ষতিপূরণ লাভ করে মরক্কো থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়।

বিসমার্ক অনুসৃত Satiation বা আত্মতৃপ্তির নীতিকে ত্যাগ করে কাইজার ভুল করেন। কাইজারের উচিত ছিল অন্য বিশ্বশক্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে ঔপনিবেশিক বিস্তার ঘটানো। কিন্তু কাইজারের নীতিই ছিল 'Either whole or nothing'—হয় সব চাই, নয় কিছুই চাই না। এর ফলে জার্মানী বিশ্বরাজনীতিতে একঘরে হয়ে পড়ে।

জার্মান ঐতিহাসিক ওলফ্‌গ্যাং হেগ (Wolfgang Haig) মনে করেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির জন্য কাইজারকে একা দোষী করা উচিত হবে না। ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ জার্মানীর নবোদিত শক্তিকে সহ্য করতে পারেনি। জার্মানী একটি প্রধান ইউরোপীয় শক্তি হতে চাওয়ায় তাদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগে। জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিগুলির প্রতিহিংসামূলক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলীর মধ্যে।

জন ফে (John Fay) মনে করেন আঁতাতপন্থী শক্তিগুলিও শান্তির জন্য আগ্রহ দেখায়নি। ১৯১৩ খ্রিঃ পর কাইজারের ধারণা হয় যে অস্ট্রিয়া বলকানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অস্ট্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় দেখে তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করেন। ফ্রান্সের সঙ্গে আপোসের আশায় তিনি তাঁর মা রানী ফ্রেডরিকাকে ফ্রান্সে শুভেচ্ছা সফরে পাঠান। কিন্তু রানী সেখানে অপমানিত হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

১৯৬১ সালে ফ্রিৎজ ফিশার (Fritz Fischer) বিশ্বযুদ্ধের যাবতীয় দায়ভার জার্মানীর উপর চাপিয়ে দেন। তাঁর মতে, কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম বিশ্বশক্তি হিসাবে সম্মান লাভের জন্য যুদ্ধের পরিকল্পনা ছকেছিলেন।

ফিশারের পাল্টা তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন হান্‌স্ উলরিখ ওয়েলার (Hans, Ulrich Wehler, 1970)। ওয়েলারের মতে, কাইজারের কাছে বৈদেশিক নীতি প্রথম স্থানে ছিল না, তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতিই বৈদেশিক নীতিকে পরিচালিত করেছিল। ওয়েলারের মতে অতিদ্রুত উন্নত হওয়া জার্মানীতে কৃষক, শ্রমিক সহ নানা ধরনের বিশাল সামাজিক শক্তির উত্থানকে নিয়ন্ত্রণ করা শিল্পপতি, শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। জার্মানীর বুর্জোয়ারা ক্রমশ নানা ধরনের সামাজিক আন্দোলনের দ্বারা বিদ্ধ হচ্ছিলেন। এর থেকে বাঁচার একটাই উপায় তাঁদের কাছে খোলা ছিল—জার্মানীকে যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়া।

৪.৮ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১. Taylor A. J. P—The Struggle for Mastery in Europe.
২. Black hourn, D. Eley G.—The Peculiarities of German History : Boiurgeois and Politics in Nineteeth Century Germany.
৩. Thompson D.—Europe Since Napoleon.
৪. Hobsbawm E.—The Age of Capital.
৫. Fischer Fritg—Germany's Aims in the First World war.
৬. Craig Gordon A—Germany, 1866-1945.
৭. Martel Gordon (ed)—Modern Germany Reconsidered (1870-1945)
৮. Wehler Hans-Ulrich—The German Empire (1871-1918)
৯. Rohl J. and Sombart N. (ed)—Kaiser Wilhelm II : New Interpretations.
১০. Ketlby—History of Modern Times.
১১. Henig R.—The Origins of the First World War.
১২. Henderson W. O.—The Rise of German Industrial Power (1834-1914)

৪.৯ ❑ অনুশীলনী

১. জার্মানীতে শিল্প বিপ্লবের উপর একটি নিবন্ধ লেখ।
২. জার্মানীতে শিল্প বিপ্লবের অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলি আলোচনা কর।

৩. জার্মানীতে শিল্পায়নের প্রধান ক্ষেত্রগুলি আলোচনা কর। শিল্পায়ন কি কোনোভাবে জার্মানীর বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করেছিল ?

৪. কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম কিভাবে বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতি থেকে সরে আসেন তা উপযুক্ত তথ্য সহকারে সহকারে দেখাও।

৫. কোন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ত্রি-শক্তি আঁতাত গঠিত হয় ?

৬. কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের বৈদেশিক নীতির মূল্যায়ন কর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটাবার জন্য এই নীতি কতটা দায়ী ছিল ?

ইতিহাস—পঞ্চম পত্র

পর্যায়—৩

একক ১ ❑ ইউরোপে শিল্পবিপ্লব : সংজ্ঞা ও ধারাবাহিকতা

গঠন

১.০ ভূমিকা
১.১ ফিলিস ডীন-এর মত
১.২ আর্নল্ড টয়েনবি-র মত
১.৩ নতুন ব্যাখ্যাসমূহ
১.৪ রস্টো-র মডেল
১.৫ কার্লো. এম. চিপোলা-র মত
১.৬ উপসংহার
১.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলী
১.৮ প্রশ্নাবলী

১.০ ❑ ভূমিকা

শিল্পবিপ্লব শব্দবন্ধটি ১৭৫০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক ঘটনাবলীকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। ইংলন্ড ছিল প্রথম রাষ্ট্র যেখানে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া সূচিত হয় যদিও উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যেই বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও শিল্পবিপ্লব দেখা গিয়েছিল। শিল্পবিপ্লব সম্পর্কিত গবেষণায় নানা তাত্ত্বিক ও বিষয়বস্তুগত বিশ্লেষণ দেখা যায় যা থেকে বোঝা যায় যে তার কারণ ও উৎসের বিষয়টি সম্পর্কে অদ্যাবধি বহু বিতর্ক থেকে গেছে। ধারাবাহিক তাত্ত্বিক গবেষণার অগ্রগতি কিন্তু অর্থনীতিবিদ অথবা ইতিহাসবিদদের মধ্যে ঐকমত্য আনতে ব্যর্থ হয়েছে। অধুনা উন্নততর গবেষণা পদ্ধতির সাহায্যে বিস্তৃততর পুনর্মূল্যায়নের নতুন নতুন গবেষণা সূচিত হয়েছে।

১.১ ❑ ফিলিস ডীন-এর মত

ফিলিস ডীন-এর মতে শিল্পবিপ্লব বলতে কোন সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা ঘটনাকে বোঝায় না, যা সকল দেশেই একইভাবে সংঘটিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও, এই শব্দবন্ধ দ্বারা সাধারণত এটাই বোঝায় যে অর্থনৈতিক সংগঠনের পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যগত ক্ষেত্রে যে সকল বিভিন্ন চিহ্নিতকরণযোগ্য পরিবর্তন ঘটা সম্ভব সেগুলিকে একত্রিত করলে এক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া গঠিত হয়। এই ধরনের সম্পর্কিত পরিবর্তনগুলিকে ডীন তাঁর গ্রন্থ 'The First Industrial Revolution'-এ এইভাবে চরিত্রায়িত করেছেন—

১। বাজারের জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক ও পরিকল্পিত প্রয়োগ।

২। পারিবারিক চাহিদা পূরণের পরিবর্তে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার অভিমুখে চালিত কারখানা ব্যবস্থার বিকাশ

৩। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি যা গ্রাম থেকে শহরের পথে জনসাধারণের অগ্রসরমানতাকে সুবিধাজনক করে তোলে।

৪। সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার নৈর্ব্যক্তিকীকরণ যাতে করে তা ক্রমশ পরিবার বা গোষ্ঠীর পরিবর্তে গণউদ্যোগের উপর অধিকমাত্রায় ভিত্তিশীল হয়ে ওঠে।

৫। প্রাথমিক পণ্যসমূহ উৎপাদনের সঙ্গো সম্পর্কিত কার্যকলাপ থেকে প্রস্তুত পণ্য ও সেবার দিকে শ্রমের অগ্রগতি।

৬। উৎপাদন ক্রমশ শ্রমনিবিড় থেকে পুঁজিনিবিড় হয়ে ওঠা।

৭। নতুন সামাজিক ও আন্তর্জাতিক শ্রেণীগুলির উদ্ভব।

সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে উপরিউক্ত পরিবর্তনগুলি অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রাক্-শিল্পায়ন থেকে শিল্পায়নের রূপে বিবর্তনকে সূচিত করেছিল।

১.২ ❑ আর্নল্ড টয়েনবি-র মত

আর্নল্ড টয়েনবি সর্বপ্রথম শিল্পায়ন সম্পর্কে ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাকে এক বিপ্লবের ধারণা হিসাবে আলোচনা করেন। ১৮৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উপরিউক্ত বিষয়ে এক বক্তৃতামালা পেশ করেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে টয়েনবি মারা যান এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ছাত্ররা এই বক্তৃতাগুলি প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গো উল্লেখ্য যে টয়েনবি ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দকে তাঁর শিল্পবিপ্লব সম্পর্কিত আলোচনার সূচনাবিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। টয়েনবি-র মতে চিরাচরিত প্রাক্-শিল্পায়ন কৃষিগত সামাজিক ব্যবস্থা বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং যন্ত্রচালিত তাঁতের প্রবল আঘাতে অকস্মাৎ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। টয়েনবি মনে করেন শিল্পবিপ্লবের প্রধান ক্ষেত্র ছিল সূতিবস্ত্র শিল্প। জেমস হারগ্রীভস ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'স্পিনিং জেনি' আবিষ্কার করেন যা একসঙ্গো আটটি সূতা কাটতে পারতো। রিচার্ড আর্করাইট ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'ওয়াটার ফ্রেম' আবিষ্কার করেন। এটি ছিল 'স্পিনিং জেনি'-র উন্নততর রূপ। এটি জলের সাহায্যে চালানো হত এবং বিভিন্ন গতিতে ঘূর্ণায়মান রোলারের সাহায্যে সূতা পাকানোর কাজ করতো। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্যামুয়েল ক্রম্পটন এক নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেন যা পূর্বেকার যন্ত্রদুটির তুলনায় আরো সূক্ষ্ম সূতা কাটতে পারতো। এটি স্পিনিং জেনি এবং ওয়াটার ফ্রেমের কাজ একযোগে সম্পন্ন করতে পারতো। যাইহোক, পুরাতন হস্তচালিত তাঁত প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে এডমন্ড কার্টরাইট যন্ত্রচালিত তাঁত আবিষ্কার করে এইসব সমস্যার সমাধান করেন। এটি জলশক্তি দ্বারা চালিত হত। এইসকল আবিষ্কার পূর্বেকার চিরাচরিত ব্যবস্থাকে প্রবলভাবে আঘাত করে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। গৃহে পরিচালিত উৎপাদন পদ্ধতির স্থলে আসে কারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থা যা সুনিশ্চিতভাবেই অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল।

টয়েনবি-র এই মতের বিরুদ্ধে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক জে. ইউ. নেফ নামে এক আমেরিকান ঐতিহাসিক কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ইতিহাসের অতিপ্রয়োজনীয় ধারাবাহিকতার ওপর জোর দিতে গিয়ে তিনি বৃহদায়তন শিল্প ও পরবর্তী প্রযুক্তিগত পরিবর্তনগুলির উৎস হিসাবে ষোড়শ শতক ও সপ্তদশ

শতকের প্রারম্ভিক লগ্নকে চিহ্নিত করেছেন। নেফ দেখিয়েছেন যে অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত এক আকস্মিক ঘটনার পরিবর্তে গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে এক দীর্ঘায়িত বিষয়—যা ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে শুরু হয়ে ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে ব্রিটেনকে এক শিল্পপ্রধান দেশ হিসাবে গড়ে তোলায় শেষ হয়—হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে।

১.৩ ❑ নূতন ব্যাখ্যাসমূহ

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের গবেষণা থেকে নূতন ধরনের ব্যাখ্যা উঠে আসতে থাকে। তাঁরা অর্থনৈতিক উন্নতির হারকে প্রভাবিত করতে পারে এমন নানা তথ্যাগত প্রমাণগুলি আরো বেশী করে আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্কিত দলিলগুলি সমগ্র অষ্টাদশ শতক বিষয়ে নানাবিধ তথ্যপ্রমাণ সরবরাহ করে। এ থেকে একথা বলা যায় যে শিল্পবিপ্লবের তথ্যগত ব্যাখ্যা বহুলাংশে বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।

পল মান্টু তাঁর 'The Industrial Revolution In the Eighteenth Century' নামক গ্রন্থে ১৯২০-র দশকেই দেখিয়েছিলেন যে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বিশেষত ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় ব্রিটিশ বন্দরগুলি থেকে প্রেরিত পণ্যদ্রব্য ও আমদানি দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অধ্যাপক টি. এস. অ্যাশটন তাঁর 'The Eighteenth Century' নামক গ্রন্থে উপরিউক্ত বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের পর উৎপাদনশীলতা সম্পর্কিত প্রায় সকল প্রাপ্তব্য তথ্যপ্রমাণাদি শিল্পোৎপাদনের এক বর্ধমান গতিকেই তুলে ধরে। অষ্টাদশ শতকের শেষ আঠারো বছর জাহাজে কয়লা পরিবহন এবং খনি থেকে তামা উত্তোলন অর্ধেকেরও বেশী, থান কাপড়ের রপ্তানি তিন-চতুর্থাংশের বেশী, ছাপা কাপড়ের রপ্তানি চার-পঞ্চমাংশের বেশী ছিল না অথবা নিয়মিত ও পরিকল্পিতভাবে কার্যকরী করা হত না। এই ধরনের সমাজগুলিকে তাদের মোট সম্পদের এক অতি বৃহদংশ, অর্থাৎ ৭৫%-এরও বেশী কৃষিতে নিয়োগ করতে হত। সামাজিক কাঠামোয় ক্রমোচ্চ স্তরভেদ বর্তমান ছিল এবং রাজনৈতিক শক্তি ভূস্বামীদের হাতে সঙ্কুচিত ছিল।

২। এরপর চিরাচরিত সমাজের স্থলে আসে পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ 'উড্ডয়নকালের পূর্বশর্তসমূহ'। এই ধাপের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি হল—

ক। কৃষির বিবর্তন এবং তার ফলে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তার মাধ্যমে শিল্পে ব্যবহারের জন্যে উদ্বৃত্ত শ্রম, খাদ্য ও কাঁচামাল সহজলভ্য করে তোলা।

খ। পরিবহন-সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা যেমন বন্দর, ডক, খাল ও রেলপথের সহায়ক রূপে সামাজিক পুঁজির বিকাশ। এগুলি বাজারের বিস্তার এবং চাহিদা ও জোগানের দ্রুত ও কার্যকরী আদানপ্রদানের সহায়তা করবে।

গ। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবামূলক কাজ যেমন ব্যাঙ্কিং ইত্যাদির উন্নতিসাধন।

ঘ। অ-চিরাচরিত ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক উদ্যোগপতিদের উপস্থিতি।

ঙ। দক্ষ শ্রমিক ও শক্তির উৎসগুলির উপস্থিতি।

চ। দেশীয় কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থা অথবা বিদেশ থেকে কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি।

৩। এর পরে আসে উড্ডয়নের স্তর যখন রানওয়ে থেকে বিমানের উড্ডয়ন বা নিক্ষেপণ ক্ষেত্র থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো উৎপাদন ক্ষেত্র তার অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে উড্ডয়নের দিকে যায়। উড্ডয়নের সূচনাকালের স্তরের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপঃ

ক। ইহার স্বল্প সময়কাল।

খ। উৎপাদনযোগ্যভাবে বিনিয়োজিত জাতীয় আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া এবং তুলা রপ্তানি নয়-দশমাংসের বেশী বৃদ্ধি পাওয়া।

অধ্যাপক ডব্লিউ হফম্যান, একজন জার্মান অর্থনীতিবিদ, তাঁর 'British Industry 1700–1950', নামক গ্রন্থে ব্রিটেনের শিল্পোৎপাদনের এক সূচি সংকলন করেছেন, এবং শেষে বলেছেন যে সম্ভবতঃ ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দেই সর্বপ্রথম শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার ২%-এর বেশী হয় এবং একশতকের বেশী সময়কাল ধরে তা এই স্তরেই থেকে গিয়েছিল।

১.৪ ❑ রস্টো-র মডেল

প্রথম শিল্পবিপ্লবের সূচনাকাল হিসাবে অনেক সময়েই ১৭৮০-র দশককে চিহ্নিত করা হয়, যখন ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্যাবলী থেকে এর উর্দ্ধগতির প্রমাণ পাওয়া যায়। W.W. Rostow-র মতে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে ব্রিটিশ অর্থনীতির 'take-off into sustained growth' হিসাবে বর্ণনা করা যায়। এই পর্যায়েই আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া দ্বারা এক স্বয়ংক্রিয় ও অপরিবর্তনীয় অর্থনৈতিক বিকাশের প্রক্রিয়া সূচিত হয়। বস্তুত রস্টো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Stages of Economic Growth'-এ শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ভাগ বা স্তরে বিভক্ত করেছেন।

১। প্রাথমিক স্তর, যেখান থেকে বিস্তারমান অর্থনীতির উদ্ভব ঘটবে, তা হল প্রাক্-নিউটনীয় যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর ভিত্তিশীল এক চিরাচরিত সমাজ, রস্টোর মতে সেই চিরাচরিত সমাজ কোন স্থাণু ব্যবস্থা নয় যদিও মাথাপিছু উৎপাদনের সম্ভাব্য স্তরের এক সীমারেখা বর্তমান থাকে। এই সীমারেখা থাকার কারণ হল আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে উদ্ভূত সম্ভাবনাগুলি হয় সুলভ ছিল না, অথবা নিয়মিত ও পরিকল্পিতভাবে কার্যকরী করা হত না। এই ধরনের সমাজগুলিকে তাদের মোট সম্পদের এক অতি বৃহদংশ, অর্থাৎ ৭৫%-এরও বেশি কৃষিতে নিয়োগ করতে হত। সামাজিক কাঠামোয় ক্রমোচ্চ স্তরভেদ বর্তমান ছিল এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ভূস্বামীদের হাতে সঙ্কুচিত ছিল।

২। এরপর চিরাচরিত সমাজের স্থলে আসে পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ 'উড্ডয়নকালের পূর্বশর্তসমূহ'। এই ধাপের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি হল—

ক। কৃষিতে বিবর্তন এবং তার ফলে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তার মাধ্যমে শিল্পে ব্যবহারের জন্য উদ্বৃত্ত শ্রম, খাদ্য ও কাঁচামাল সহজ লভ্য করে তোলা।

খ। পরিবহন সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা যেমন বন্দর, ডক, খাল, ও রেলপথের রূপায়ণে সামাজিক

পুঁজির বিকাশ। এগুলি বাজারের বিস্তার এবং চাহিদা ও জোগানের দ্রুত ও কার্যকরী আদানপ্রদানে সহায়তা করবে।

গ। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবামূলক কাজ যেমন ব্যাঙ্কিং ইত্যাদির উন্নতিসাধন।

ঘ। অ-চিরাচরিত ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক উদ্যোগপতিদের উপস্থিতি।

ঙ। দক্ষ শ্রমিক ও শক্তির উৎসগুলির উপস্থিতি।

চ। দেশীয় কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার অথবা বিদেশ থেকে কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি।

৩। এর পরে আসে উড্ডয়নের স্তর যখন রানওয়ে থেকে বিমানের উড্ডয়ন বা নিক্ষেপণ ক্ষেত্র থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের নিক্ষেপের মতো উৎপাদন ক্ষেত্র তার অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে উড্ডয়নের দিকে যায়। উড্ডয়নের সূচনাকালের স্তরের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ :

ক। ইহার স্বল্প সময়কাল।

খ। উৎপাদনযোগ্যভাবে বিনিয়োজিত জাতীয় আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া।

গ। কয়েকটি প্রধান শিল্পের বিকাশ যেগুলি অর্থনীতির মধ্যে নেতৃত্বদানের ভূমিকা পালন করবে।

৪। উড্ডয়নকালের পরে অর্থনীতি তার পরের ধাপে যায় অর্থাৎ 'পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসরতা'। এটি হল বয়ঃপ্রাপ্তিকাল ও ক্রমবর্ধমান পরিশীলতার প্রক্রিয়া যখন শিল্পবিকাশের প্রক্রিয়া ধারাবাহিক অথবা অপরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে।

৫। অর্থনীতি দীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিকতার মধ্যে থাকার পর চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছানো যায় অর্থাৎ উচ্চ গণভোগের সময়কাল।

১.৫ ❑ কার্লো. এম. চিপোলা-র মত

চিপোলা 'The Fontana Economic History of Europe' গ্রন্থে বলেছেন কোনও ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা কখনোই চূড়ান্ত বা নির্বিকল্পরূপে বিচার করা যায় না। কোনও সংজ্ঞা পরীক্ষাধীন ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে। তাঁর মতে বিপ্লব শব্দটি অনেক সময়েই ঐতিহাসিকদের দ্বারা এক আমূল পরিবর্তন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তিনি মনে করেন যে সম্ভবত একমাত্র নব্যপ্রস্তরযুগীয় বিপ্লব ব্যতিরেকে আর কোনও বিপ্লবই শিল্পবিপ্লবের মতো এত নাটকীয় পরিবর্তন সাধন করেনি। উপরিউক্ত দুটি ঘটনাই ইতিহাসের গতিধারাকে পরিবর্তিত করেছিল, এই অর্থে, যে প্রতিটিই ছিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় এক ছেদচিহ্নস্বরূপ। নব্যপ্রস্তরযুগীয় বিপ্লব মানবসমাজকে এক বন্য শিকারীদলের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংগঠন—যাদের জীবনকে দার্শনিক হব্সের বিখ্যাত শব্দবন্ধ দ্বারা 'একক, দরিদ্র, অসভ্য, বন্য ও সংক্ষিপ্ত' বলা যায়—থেকে কমবেশী পরস্পর নির্ভরশীল কৃষিজীবী সমাজে বিবর্তিত করেছিল। অন্যদিকে শিল্পবিপ্লব মানুষকে কৃষক-পশুপালক থেকে কৃত্রিম শক্তি দ্বারা চালিত যন্ত্রসমূহের চালকে পরিণত করেছিল। সুতরাং চিপোলার মতে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয় একমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা হল নব্যপ্রস্তরযুগীয় বিপ্লব।

১.৬ ❑ উপসংহার

একদিকে আছেন অধ্যাপক জে. ইউ. নেফ যিনি যোড়শ শতকের মধ্যভাগকে শিল্পবিপ্লবের সূচনাকাল বলে ধরেছেন। অন্যদিকে রয়েছেন অধ্যাপক ডব্লিউ. ডব্লিউ. রস্টো যিনি মূল ও প্রয়োজনীয় বিবর্তনগুলি অষ্টাদশ শতকের শেষদিকের দু-তিন দশকে সম্পন্ন হয়েছিল বলে মনে করেন। এই বিতর্ক এখনো শেষ হয়নি। অধ্যাপক নেফকে যাঁরা সমর্থন করেন তাঁরা শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে কয়েক শতক পূর্বে সূচিত ঘটনা বলে উল্লেখ করে ইতিহাসের অন্তর্নিহিত ধারাবাহিকতার উপর জোর দিয়েছেন। অন্যদিকে যাঁরা অধ্যাপক রস্টোর মতের সমর্থক তাঁরা ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ছেদবিন্দুগুলির উপর জোর দিতে চান এবং এক অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত সময়কালের মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহের বৈপ্লবিক চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ফিলিস ডীন যথার্থভাবেই বলেছেন যে বাস্তবে ইতিহাসে যা ঘটেছে তার তুলনায় ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক বেশী পার্থক্য বর্তমান। অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বুঝতে গেলে উভয় দৃষ্টিভঙ্গীকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১.৭ ❑ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Deane Phyllis : The First Industrial Revolution.

২। Cipolla Carlo M. (ed) : The Fontana Economic History of Europe : The Industrial Revolution.

৩। Hobsbawm E. J. : Industry and Empire.

১.৮ ❑ প্রশ্নাবলী

১। ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের আলোকে শিল্পবিপ্লবের কালপঞ্জী নির্ণয় করুন।

২। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক কিভাবে শিল্পবিপ্লব বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন ?

একক ২ ❑ শিল্পবিপ্লবের কারণসমূহ : এটি কেন ইংল্যান্ডে প্রথম ঘটেছিল ?

গঠন

২.১ ভূমিকা
২.২ বাহ্যিক উপাদান
২.৩ অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহ
২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী
২.৫ প্রশ্নাবলী

২.১ ❑ ভূমিকা

ইংলন্ড ছিল ইয়োরোপে শিল্পবিপ্লবের অগ্রদূত। শিল্পবিপ্লব সম্পর্কিত মূল আলোচনাগুলি করেছেন আর্নল্ড টয়েনবি, পল মান্টু, টি. এস. অ্যাশটন প্রমুখ। ঐতিহাসিক। ডব্লিউ. ডব্লিউ. রস্টো, ফিলিস ডীন, ডব্লিউ. এ. কোল. এইচ. জে. হ্যাবাকুক এবং অন্যান্য পন্ডিতগণ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এই সকল ঐতিহাসিক যে পরিস্থিতি ইংলন্ডের শিল্পায়নের উদ্ভবে সহায়তা করেছিল সেগুলি সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেখানে বেশীরভাগ ঐতিহাসিকই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন, সেখানে কয়েকজন পন্ডিত পুঁজি সংগ্রহ, মুক্ত অর্থনীতি এবং বাজারের বিস্তারের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বিভিন্ন অর্থনৈতিক মাপকাঠির সঙ্গে ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লবকে প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতা ও ইংরাজ সামাজিক ব্যবস্থার উদারতার ফলশ্রুতি হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২.২ ❑ বাহ্যিক উপাদান

কোনও কোনও তত্ত্বানুসারে আবহাওয়া, ভুগোল, জনসমাজের জৈবিক পরিবর্তন ও অন্যান্য বাহ্যিক উপাদানগুলিকেও শিল্পবিপ্লব সৃষ্টির জন্য দায়ী করা হয়েছে। একথা বলা হয়েছে যে ইংলন্ডের ভৌগোলিক অবস্থান ও বন্দরগুলি তাকে বৃহদায়তন শিল্প ও সমৃদ্ধ বৈদেশিক বাণিজ্য গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ ও স্বল্পব্যয় সম্পন্ন, কারণ ব্রিটেনের কোনও বন্দরই সমুদ্র থেকে ৭০ মাইলের বেশী দূরে ছিল না। এমনকি কোনও কোনও বন্দর নাব্য জলপথ থেকে আরো কাছে ছিল।

একথা বলা হয়েছে যে ইংলন্ড প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদে বলীয়ান ছিল যা তার শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেছিল। নর্দাম্বারল্যান্ড এবং ডারহ্যাম, পশ্চিম রাইডিং এবং দক্ষিণ ল্যাঙ্কাশায়ার, স্কটিশ নিম্নভূমি এবং উত্তর স্ট্যাফোর্ডশায়ার, দক্ষিণ ওয়েলস ইত্যাদি স্থান থেকে পর্যাপ্ত কয়লার সরবরাহ ছিল। তবে ই. জে. হবসবম বলেছেন যে যদি ব্রিটেনের বিপুল পরিমাণ কয়লা সম্পদ তাকে শিল্পায়নে অগ্রণী

করে থাকে তাহলে শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাঁচামালের ক্ষেত্রে তার তুলনামূলক ঘাটতি, যেমন আকরিক লৌহ, কেন তাকে একইভাবে বাধা দেয়নি অথবা অন্যদিকে গ্রেট-সাইলেশীয় কয়লাখনিগুলি কেন একই ধরনের দ্রুত শিল্পায়নের সূচনা করেনি। অধিককন্তু হব্‌সবম উল্লেখ করেছেন যে অর্থনৈতিক উপাদান, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন ইত্যাদি বিষয়গুলি নিজে নিজে কাজ করতে পারে না, তার জন্য এক সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো প্রয়োজন হয়।

E. J. Hobsbawm-এর মতে শিল্পবিপ্লবকে 'ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা' হিসাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা বাতিল করা উচিত। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে বহির্বিশ্বের আবিষ্কারগুলিকেই কেবল শিল্পায়নের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না, একইভাবে সপ্তদশ শতকে বিজ্ঞান বিপ্লবকেও একক রূপে এই কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। অধ্যাপক হব্‌সবম আরো উল্লেখ করেছেন যে কেন শিল্পবিপ্লব সপ্তদশ শতকে, যখন বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ইয়োরোপীয় জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি শিল্পায়নের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, তখন না হয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষে হল তা ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রোটেস্টান্ট ধর্মসংস্কারকেও শিল্পবিপ্লবের জন্য দায়ী করা যায় না। হব্‌সবমের মতে শিল্পবিপ্লবের দুই শতকেরও বেশী পূর্বে ধর্মসংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। কোনভাবেই যে সকল অঞ্চলে ধর্মসংস্কার ঘটেছিল, সেইসব অঞ্চলেই শিল্পবিপ্লব একই সঙ্গে সূচিত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নেদারল্যান্ডসের যে সকল অংশ ক্যাথলিক থেকে যায়, যেমন বেলজিয়াম, প্রোটেস্টান্ট অংশগুলির অনেক আগেই শিল্পায়িত হয়েছিল।

শেষত, প্রকৃত রাজনৈতিক উপাদানগুলিকেও অবশ্যই বাদ দেওয়া উচিত। একথা বলা হয়েছে যে ইংলন্ডের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিশেষত, প্রথম দুই হ্যানোভারীয় শাসক প্রথম জর্জ (১৭১৪-১৭২৭) এবং দ্বিতীয় জর্জ (১৯২৭-৬০)-এর রাজত্বকাল, তার শিল্পায়নে সহায়তা করেছিল। কিন্তু হব্‌সবম যেমন বলেছেন যে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকৃতপক্ষে ইয়োরোপের সকল রাষ্ট্রই শিল্পায়িত হতে চেয়েছিল, কিন্তু কেবলমাত্র ব্রিটিশরাই সফল হয়েছিল। অন্যদিকে, ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সকল ব্রিটিশ সরকারই অন্য সবকিছু থেকে লাভের চেষ্টাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, কিন্তু শিল্পবিপ্লব তার অন্তত একশ বছরেরও বেশী পরে ঘটেছিল।

অধিকন্তু, হব্‌সবম দেখিয়েছেন যে বহিরাগত উপাদানগুলিকে সহজ, একক বা এমনকি প্রাথমিক ব্যাখ্যা বলে বাতিল করা অথবা তাদের কোনও গুরুত্ব না দেওয়া মূর্খামি হবে। তাঁর মতে এটি কেবলমাত্র আপেক্ষিক গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঘটনাচক্রে বর্তমানে তুলনাযোগ্য এবং শিল্পায়নে সচেষ্ট কয়েকটি রাষ্ট্রের সমস্যাগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্যই ব্যবহৃত হয়।

২.৩ ❑ অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহ

ব্রিটিশ বিপ্লব ছিল ইতিহাসে প্রথম এরূপ ঘটনা। এর অর্থ এই নয় যে এর আগে দ্রুত শিল্পায়ন বা প্রযুক্তিগত উন্নতির কোন পর্যায় দেখা যায়নি। তৎসত্ত্বেও, এর কোনটিই সামাজিক বিবর্তন ও প্রযুক্তিগত উন্নতির দ্বারা স্বনির্ভরশীল অর্থনৈতিক উন্নতি, যা ইতিহাসের আধুনিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য, তাকে সূচিত করেনি। ফিলিস ডীন দেখিয়েছেন যে শিল্পায়নের আদি যুগ, অর্থাৎ যে সময়ে শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল বলা

হয়, তাদের মধ্যে দুই ধরনের পার্থক্য বর্তমান। **প্রথমতঃ,** প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ছিল অপেক্ষাকৃত ধীরগতিসম্পন্ন ; এবং দেশের শিল্পক্ষেত্রের অপেক্ষাকৃত সীমিত অংশকেই প্রভাবিত করেছিল ও তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রতর প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটিয়েছিল। **দ্বিতীয়ত** শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায় কৃষি উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তার, যা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল, তাদের সহায়তা পায়নি।

ডব্লু কানিংহাম, তাঁর 'The Growth of English Industry and Commerce in Modern Times' নামক গ্রন্থে বর্ধমান পুঁজি সংগ্রহ এবং বিস্তারমান বাজারের মিলনকে ইংলন্ডের অর্থনৈতিক উন্নতির কৌশলগত উপাদান বলে তুলে ধরেছেন। আরেকজন প্রখ্যাত অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক ডব্লিউ. জে. অ্যাশলে তাঁর 'The Economic Organisation of England' নামক গ্রন্থে শিল্পবিপ্লবের উপর একটি অধ্যায় লিখেছিলেন। তিনি কৃষিবিপ্লব, যা খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধি বিপুল বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল, তার আগে থেকেই এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল বলে মনে করেন। খাদ্যোৎপাদনের এই জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সহায়তা করে যা শিল্পকারখানার উন্নতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এই কারখানাগুলি তাদের সন্তানসন্ততির জীবিকা লাভের সহায়ক হয়। অ্যাশলের মতে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি উভয়ত শিল্পায়নের পূর্বশর্ত এবং বৃদ্ধির সহায়ক ছিল।

শিল্পায়ন সম্পর্কিত সর্বাধিক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন পল মান্টু, যা ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। মান্টুর কাছে শিল্পবিপ্লব ছিল 'প্রধানত এক বাণিজ্যিক ঘটনা'। বাণিজ্য ঋণের প্রভূত বিস্তার কেবলমাত্র তার সহায়ক ছিল না, তাকে প্রস্তুতও করেছিল। যন্ত্রশিল্পের আগমন অবশ্যম্ভাবীরূপে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিল। কিন্তু মান্টু কৃষির গুরুত্বের উপরেও সমান জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে বৃহৎ শিল্প-কেন্দ্রগুলির উন্নতি সম্ভব হত না যদি না কৃষি উৎপাদন বিপুল সংখ্যক শিল্পকেন্দ্রিক জনসমাজের প্রয়োজন পূরণের জন্য এতটা সংগঠিত হত। ডব্লিউ. বাওডেন এবং ই. ডব্লু. গিলবয়ও প্রায় একই মত ব্যক্ত করেছেন যদিও তাঁরা চাহিদার বিস্তারের বিষয়টির উপর আরো বেশী করে জোর দিয়েছেন। বাওডেনের মতে দেশে ও বিদেশে সম্পদের বৃদ্ধি চাহিদাকে এমনভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল যা চিরাচরিত শিল্পের জোগানক্ষমতাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। অভ্যন্তরীণ চাহিদা এত বিস্তারলাভ করে এবং ইংরাজদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক বাজার এত বৃহদাকার ধারণ করে যে উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার ব্যতিরেকে উৎপাদকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বাণিজ্যিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব ছিল না।

ই. লিপসন এবং টি. এস. অ্যাশটন শিল্পবিপ্লবের উৎস সম্পর্কে ভিন্নতর ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। লিপসন দেখিয়েছেন যে আমেরিকা, ভারতবর্ষ, ও আফ্রিকায় এক দূরবিস্তৃত বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের সঙ্গো বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তারের মধ্যেই এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। এই সকল অঞ্চলের সাথে মহাদেশীয় ইয়োরোপ উৎপাদকদের জন্য বাজার গড়ে তোলে। লিপসন এর সাথে আরো পাঁচটি উপাদান যোগ করেন যথা—পুঁজি সংগ্রহ, উদ্যোগপতির সক্ষমতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কয়লাখনিগুলি আগে ব্যবহারের সুবিধা এবং দেশীয় বাজার। টি. এস. অ্যাশটন তাঁর 'The Industrial Revolution' গ্রন্থে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের পরে ইংলন্ডে সংঘটিত বৃহৎ পরিবর্তনগুলির কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে জমি, শ্রম ও মূলধনের ক্রমবর্ধমান জোগানের মিলনই শিল্পের বিস্তারকে সম্ভব করেছিল। কয়লা ও বাষ্পশক্তি বৃহদায়তন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও শক্তি সরবরাহ করে। কিন্তু এইসকল বস্তুগত ও

অর্থনৈতিক উপাদানগুলির বাইরেও আরো বেশী কিছু ছিল। বস্তুত বহির্জগতের সঙ্গো ব্যবসাবাণিজ্য পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করেছিল এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে তাদের ধারণাকে বিস্তৃত করেছিল। শিল্পবিপ্লব ধারণার ক্ষেত্রেও বিপ্লব এনেছিল।

শিল্পবিপ্লবের বেশীরভাগ ঐতিহাসিক দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধি অপেক্ষা বহির্বাণিজ্যের বৃদ্ধিকেই অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গো উল্লেখ্য যে অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় ভাগে রপ্তানির পরিমাণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। রপ্তানীকৃত পণ্যের মধ্যে বেশীরভাগটাই ছিল উৎপাদিত দ্রব্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশ রপ্তানি করা হত। তবে বর্ধিত বাণিজ্যের অনেকটাই উত্তর আমেরিকা এবং ওয়েস্টইন্ডিজ, অর্থাৎ যে সকল উপনিবেশের ইংরাজ পণ্যের জন্য চাহিদা অনেকটাই ঔপনিবেশিক পণ্যের জন্য ইংরাজদের চাহিদা থেকেই গড়ে উঠেছিল বা আহরিত হয়েছিল, সেখান থেকেই এসেছিল। তৎসত্ত্বেও ঔপনিবেশিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ তা ইংরাজ উৎপাদকের বাজারের মোট আয়তন বৃদ্ধি করেছিল। তবে শিল্পবিপ্লব শুরুর আগের বছরগুলিতে মোট শিল্পজাত উৎপাদনের এক ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যপূর্ণ অংশই বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা গড়ে উঠেছিল। দেশীয় চাহিদার অবিরত বৃদ্ধিই এক বিস্তৃত ক্ষেত্রে শিল্পের বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেকার বছরগুলিতে মোট অভ্যন্তরীণ চাহিদার এই ক্রমবর্ধমান স্তর বৈদেশিক বাণিজ্যের ওঠাপড়াভিত্তিক বিস্তারের তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সুতরাং উপরিউক্ত সকল উপাদানগুলি মিলিতভাবে ইংলন্ডে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার বিকাশে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল।

২.৪ ❑ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Deane Phyllis : The First Industrial Revolution.

২। Hobsbawm E. J. : Industry and Empire.

৩। Marshall R. M. : The Causes of the Industrial Revolution : As Essay in Methodology (Article).

৪। Bhattacharyaa Pranjal Kumar : England as the Harbinger of the Industrial Revolution (Article published in the Journal of History, J. U).

২.৫ ❑ প্রশ্নাবলী

১। ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের জন্য দায়ী বহির্দেশীয় ও অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। শিল্পবিপ্লব কেন ইংলন্ডে প্রথম দেখা দিয়েছিল? একে কি কেবলমাত্র বহির্দেশীয় উপাদানগুলির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়?

একক ৩ ❑ কৃষি, পরিবহন, জনসমাজগত বিপ্লব

গঠন

৩.১ কৃষিবিপ্লব
৩.২ পরিবহন বিপ্লব
৩.৩ জনসমাজগত বিপ্লব
৩.৪ সহায়ক গ্রন্থতালিকা
৩.৫ প্রশ্নাবলী

৩.১ ❑ কৃষি বিপ্লব

ইংলন্ডে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ও কৃষিবিপ্লবের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনাকালে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে দুটি বিষয়ই এক বৃহত্তর অর্থনৈতিক বিবর্তন প্রক্রিয়া, যা শিল্পবিপ্লব নামে পরিচিত, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। বেশীরভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন যে অষ্টাদশ শতকের প্রাথমিক লগ্নে কৃষিবিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। ১৭৫০ খ্রিঃ মধ্যে ইংলন্ডে কৃষি উৎপাদন এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে অভ্যন্তরীণ খাদ্যভোগের ১৩% পরিমাণ রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে কি বিপুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল উপরিউক্ত তথ্যই তার যথেষ্ট সাক্ষ্যবহন করে। অধিকন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার ভিত্তিতে বলা যায় যে ১৭০০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ৫% থেকে ৭% বৃদ্ধি পেয়েছিল। মাথাপিছু ভোগের পরিমাণও বেড়েছিল এবং কৃষিতে যুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছিল।

একথা সর্বজনবিদিত যে ব্রিটিশ বিপ্লব এক কৃষিবিপ্লবের সঙ্গেও জড়িত ছিল। ব্রিটিশ কৃষিবিপ্লবের চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, এটি মধ্যযুগীয় মুক্ত কৃষিক্ষেত্রগুলিতে কৃষকদের দ্বারা কৃষিকর্মের স্থলে বৃহদায়তন সুপ্রতিষ্ঠিত একক ভূমিখণ্ড গঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল। দ্বিতীয়ত, এর সঙ্গে সাধারণ জমির উপরে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং নিবিড় প্রাণীপালন ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টি যুক্ত ছিল। তৃতীয়ত, এর সঙ্গে প্রধানত স্বনির্ভর কৃষকদের এক গ্রামীণ সম্প্রদায় থেকে এক কৃষিশ্রমিক সম্প্রদায়ে বিবর্তিত হওয়ার বিষয়টিও যুক্ত ছিল। চতুর্থত, এর সঙ্গে কৃষি উৎপাদনশীলতা অর্থাৎ পূর্ণসময়ের শ্রমশক্তির প্রতি একক পিছু উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির ব্যাপারটিও জড়িত ছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইংলন্ডের কৃষিবিপ্লব উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি গ্রহণের সঙ্গে জড়িত ছিল। এই নতুন পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল নিরবচ্ছিন্ন চাষ, নতুন নতুন ফসল উৎপাদন এবং চাষের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার। ১৭০০ সালে বীজ পোঁতার যন্ত্র তৈরী হয় এবং ১৭৩০-এর দশকের প্রথম দিকে তার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। অন্যদিকে রদারহ্যাম ত্রিকোণাকৃতি লাঙল ১৭৩০ সালে পেটেন্ট করা হয়। এর ফলে চিরাচরিত আয়তক্ষেত্রাকৃতি লাঙল যা টানতে চার বা ছয় বা আটটি বলদ এবং একজন বলদচালক ও একজন লাঙলচালক লাগতো তার স্থলে দুটি ঘোড়া এবং একজন মানুষের সাহায্যে অনেক দ্রুত ও কার্যকরীরূপে জমিকর্ষণ সম্ভব হয়। এছাড়া ১৭৮০-র দশকে

পরীক্ষামূলকভাবে ঝাড়াইযন্ত্রের ব্যবহারও সূচিত হয়। তবে শিল্পবিপ্লবের যুগে কৃষিজ বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রায়নের থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল কৃষি হাতিয়ারের উন্নতি এবং পূর্বতন ফসল কাটার পদ্ধতির পরিবর্তন। ১৭৯০-১৮৭০ খ্রিঃ মধ্যে এইসব উন্নতিগুলি ঘটেছিল। ড. ই. জে. টি. কলিন্স ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে Economic History Review পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর Harvest Technology and Labour Supply in Britain 1790–1870 নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে উপরিউক্ত পরিবর্তনগুলো হাতে করে ফসল কাটা পদ্ধতি, যা ষোড়শ শতক থেকে প্রায় অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল, তাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। এছাড়া এগুলি ব্রিটেনে কৃষিকর্মে কায়িক শ্রমশক্তি হ্রাস করার পথে এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে।

ইংলন্ডে কৃষিবিপ্লবের সঙ্গো জমিবেষ্টনী ব্যবস্থাও জড়িয়ে ছিল। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যক্তিগত বেষ্টনী প্রথা টিউডর যুগ বা তারও আগে থেকে প্রচলিত ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের আগে ভূমি মালিকানার দৃঢ়ীকরণে প্রচলিত ব্যবস্থা হিসাবে সংসদীয় বা আইনী জমিবেষ্টন শুরু হয়নি। ফিলিস ডীনের মতে ১৭০০ খ্রিঃ নাগাদ দেশের অর্ধেক কৃষিযোগ্য জমি মুক্তক্ষেত্র পদ্ধতিতেই কর্ষিত হত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষদিক নাগাদ ইংরাজ কৃষি বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে নিশ্চিত হন যে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গো তাল রেখে চলতে গিয়ে কৃষিযোগ্য জমির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে মুক্তক্ষেত্রে জমিগুলিকে ভাগ করতে হবে এবং সাধারণ জমিগুলিকে লাভজনক বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করতে হবে। ১৮০১ সালে প্রথম সাধারণ জমিবেষ্টন আইন (General Enclose Act) পাশের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক জমিবেষ্টনের প্রক্রিয়া সূচিত হয়। এই আইনটি সাধারণ জমিবেষ্টনের জন্য সংসদীয় রীতিনীতির সরলীকরণ ঘটায় এবং তার ব্যয় হ্রাস করে।

টি. এস. অ্যাশটনের মতে এ বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে কৃষিপ্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাপ্তব্য তথ্য থেকে জানা যায় এই সময়ে এই ক্ষেত্রে প্রায় সকল উন্নতিই ইতিমধ্যে বেষ্টিত বা বেষ্টনীর পথে অগ্রসরমান জমিখণ্ডগুলিতেই হয়েছিল। একথা অনস্বীকার্য যে জমিবেষ্টনী ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদনযোগ্য জমির আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছিল। একথা বলা হয়েছে যে ১৭২৭ থেকে ১৭৬০ খ্রিঃ মধ্যে যখন শস্যের দাম সাধারণভাবে কম, তখন ৭৫,০০০ একরের কম সাধারণ পশুচারণ ক্ষেত্র এবং পতিত জমিকে সংসদীয় আইন দ্বারা বেষ্টন করা হয়েছিল। ১৭৬১ থেকে ১৭৯২ খ্রিঃ মধ্যে তার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৪,৭৮,০০০ একর। ফরাসী ও নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের সময়ে তা ১০ লক্ষেরও বেশী একরে গিয়ে দাঁড়ায়। যদিও ১৮১৬-৪৫ সালের মধ্যে তা ২,০০,০০০ একরেরও নীচে নেমে আসে। ফিলিস ডীন দেখিয়েছেন যে, বেষ্টনী ব্যবস্থা সস্তা শ্রমের এক ভাণ্ডার সৃষ্টি করে যা ছাড়া শিল্পবিপ্লব অসম্পূর্ণ, এমনকি অসম্ভব হয়ে পড়তো।

ইংলন্ডে কৃষিবিপ্লবকে প্রথম শিল্পবিপ্লবের বাস্তবায়নে বিপুলভাবে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। প্রথমত, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং বিশেষত শিল্পোন্নত দেশের এইরূপ জনসংখ্যার খাদ্য জোগানে কৃষিবিপ্লব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ শিল্পের বিকাশ ঘটে। তৃতীয়ত, শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির একটা বড় অংশ কৃষিক্ষেত্র থেকে সরবরাহকৃত হয়, ফলে এমনকি বৃহৎ যুদ্ধবিগ্রহের কালেও শিল্পোৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

শেষত, একথা বলা যায় যে প্রযুক্তি এবং কৃষি সংগঠনে আনীত পরিবর্তনগুলি, যা কৃষিবিপ্লবকে

গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল, তা ১৭৫০-১৮৫০ সালের মধ্যে অনেকটাই উন্নত হয়েছিল। এই সময়-কালেই শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

৩.২ ❑ পরিবহন বিপ্লব

শিল্পায়িত ইংলন্ডে যে ঘটনাটি যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক মৌলিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন এনেছিল তা হল পরিবহন বিপ্লব। এই কাজে সামাজিক ওভারহেড পুঁজির একটা বড় পরিমাণ বিনিয়োজিত হয়। এই সামাজিক ওভারহেড পুঁজি মূল অর্থে ছিল পরিবহন সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা যথা—বন্দর, রাস্তাঘাট, সেতু, খাল এবং রেলব্যবস্থায় বিনিয়োজিত পুঁজির সমষ্টি। ফিলিস ডীন দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ অভিজ্ঞতার একটি কৌতূহলোদ্দীপক দিক হল এই যে প্রায়-সম্পূর্ণ দেশীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগই ব্রিটিশ শিল্পব্যবস্থার পক্ষে অত্যাবশ্যক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল এবং পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল।

অষ্টাদশ শতক নাগাদ ইংলন্ডের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। সমকালীন পর্যটকদের রচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে যানবাহনের তুলনায় রাস্তা ছিল অপর্যাপ্ত। বস্তুত শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক পর্বে উদ্যোগপতিদের কাছে প্রধান সমস্যা ছিল উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থার অভাব। বিশেষত ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্প এলাকায় এই সমস্যা প্রকট ছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিক থেকে বেসরকারী সংস্থার হাতে, রাস্তা ব্যবহারের জন্য, যাতায়াতকারীদের কাছ থেকে টোল আদায়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়। তবে এই ব্যবস্থা একটি পথকাঠামো বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। ১৭৫০ সাল নাগাদ লন্ডন শহরের প্রধান রাস্তাগুলির মধ্যে অনেকগুলি সারানো হয় যদিও এর সবগুলির অবস্থা ভালো ছিল না। তার কারণ রাস্তা সারাইকারীদের অনেকেই ছিল অদ্যক্ষ, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। এই পরিস্থিতিতে রাস্তা তৈরীর নতুন কৌশল উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যে রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে ভারী যান চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত হবে এবং স্বাভাবিক ব্রিটিশ শীত মরসুমে ব্যবহারযোগ্য হবে। বিজ্ঞানসম্মত রাস্তা তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব জন মেটকাফ, জন ম্যাকডাম, টমাস টেলফোর্ড প্রমুখের মতো ইঞ্জিনিয়ারদের প্রাপ্য। তবে ঊনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা উদ্ভাবিত বিজ্ঞান-সম্মতভাবে রাস্তা তৈরীর পদ্ধতিগুলি সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। এমনকি ১৮১৫ সাল নাগাদও নতুন নিয়ম মেনে ১০০০ মাইলের বেশী প্রশস্ত সড়ক তৈরী হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে যদিও ভালো রাস্তার সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল, তবুও এ বিষয়ে বহু প্রমাণ পাওয়া যায় যে ১৭৫০-১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের মান অনেকটাই উন্নত হয়েছিল। অধিকন্তু কয়েকটি প্রধান রাস্তার মানোন্নয়ন, পরিবহনের গতি, সময়ানুবর্তিতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করেছিল। এটি ছিল ইংলন্ডে ঘোড়ার গাড়ির যুগ। ১৭৪৫ সালে যেখানে লন্ডন থেকে ইয়র্কে যেতে একজনের চারদিন সময় লাগতো, সেখানে ১৭৮৫ সাল নাগাদ তিনদিনে লন্ডন থেকে নিউকাস্‌লে পৌঁছানো সম্ভব হত। ১৭৪০-এর দশকে লন্ডন থেকে বার্মিংহাম যেখানে ছিল দুদিনের দূরত্ব সেখানে ১৭৮০-র দশকে তা মাত্র ১৯ ঘন্টায় যাওয়া যেত। যাতায়াত ব্যবস্থা গতিশীল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ১৭৫৬ সালে যেখানে লন্ডন থেকে বার্মিংহামে

মাত্র একটি গাড়ি যেত সেখানে ১৮১১ সাল নাগাদ একদিনে আটটি গাড়ি এই কাজ করতো।

১৭৫০-এর দশক থেকে, শিল্পবিপ্লব গতিশীল হয়ে ওঠার আগেই, নগরায়ণের বিকাশের ফলে রাস্তাগুলির অনেকটাই উন্নতি হয়েছিল। নগরগুলির মৌলিক খাদ্য ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে কৃষি পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে এগুলি সংগ্রহের তাগিদ বাড়তে থাকে। ক্রমবর্ধমান নগরগুলি ৩০-৩৫ মাইল দূরবর্তী অঞ্চলে খাদ্য ও জ্বালানি সরবরাহের জন্য এবং প্রধান শহরগুলির মধ্যে যাত্রী পণ্যদ্রব্যের স্বাচ্ছন্দ্যময়, নিরাপদ ও দ্রুত চলাচলের জন্য দ্রুতগতিসম্পন্ন ও নিয়মিত পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করে। নতুন রাস্তাগুলির বেশীরভাগই দেশের প্রদান বাণিজ্যিক কেন্দ্র, লন্ডন অভিমুখী ছিল। এছাড়া লিভারপুল, বার্মিংহাম এবং ম্যানচেস্টারের মত শহরের রাস্তাগুলি ফিডার পথ হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ফিলিস ডীন-এর মতে, ব্রিটেন যদি তার ভারী পণ্য পরিবহনের জন্য কেবলমাত্র তার নিজের রাস্তাগুলির উপরেই নির্ভর করতো তাহলে শিল্পবিপ্লবের কার্যকরী প্রভাব অনেক বিলম্বিত হত। সৌভাগ্যের বিষয়, ব্রিটেনের পরিবহন ব্যবস্থা তার অন্যান্য সমকালীন প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। ভারী পণ্য পরিবহনের জন্য সর্বাধিক স্বল্পব্যয়সম্পন্ন পরিবহন ছিল জলপথ এবং ব্রিটেনের ভৌগোলিক অবস্থান এ বিষয়ে তার সবিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের কোন অংশই সমুদ্র থেকে ৭০ মাইলের বেশী দূরে ছিল না। লন্ডন বস্তুত সমুদ্রপথগুলির ক্ষমতার উপরেই নির্ভরশীল ছিল। ডীন আরো দেখিয়েছেন যে লন্ডনের উন্নতি ইংলন্ডকে এক আঞ্চলিক ভিত্তিসম্পন্ন টিঁকে থাকার অর্থনীতি থেকে এক সুসংহত বিনিময়ের অর্থনীতিতে বিবর্তনের পথ প্রশস্ত করে। ২০০টনের কিছু বেশী ওজনসম্পন্ন বহু জাহাজ নিউকাস্‌ল, হাল, ইয়ার মাউথ ও লন্ডনের মধ্যে সমুদ্রের উপকূল ধরে কয়লা, পাথর, স্লেট, মাটি ও শস্য আনা-নেওয়া করত। অষ্টাদশ শতকীয় ইংলন্ডে স্থলপথে এইসব পণ্য আনা-নেওয়া করতে গেলে পরিবহন ব্যয় অনেকটাই বৃদ্ধি পেত। ক্ল্যাপহ্যাম -এর মতে উপকূল বাণিজ্যের বৃহদংশই লন্ডনের অধিবাসীদের উপযুক্ত বাসস্থান, খাদ্য ও গরম পোশাকের সংস্থানে সহায়তা করেছিল।

যাইহোক, অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভিক লগ্নে উপকূলবর্তী জাহাজ পরিবহনে কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। অন্যদিকে শিল্পবিপ্লবের জন্য এক নির্ভরযোগ্য, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ও স্বল্পব্যয়সম্পন্ন পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। খালগুলি এই কাজে সহায়তা করেছিল। দুটি পর্যায়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গো খাল খনন শুরু হয়। প্রথম পর্যায়, যা ১৭৬০ ও ১৭৭০-এর দশকে শুরু হয়েছিল, তার প্রেরণা ছিল ওরস্‌লে কয়লা খনি ও ম্যানচেস্টারের মধ্যে ডিউক অব ব্রিজওয়াটারের খালের সাফল্য। এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে কয়লা পরিবহনের জন্য তাঁর একটি স্বল্পব্যয়সম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য পথের প্রয়োজন ছিল এবং এজন্য তিনি শেষ পর্যন্ত খাল খননের জন্য তাঁর স্বপক্ষে একটি সংসদীয় আইন প্রণয়ন করাতে সক্ষম হন। ব্রিজওয়াটারের সাফল্যের পরে খুব দ্রুত অসংখ্য নতুন খাল খনন করা হতে থাকে। ১৭৭২ খ্রিঃ মধ্যে মার্সে নদীর সঙ্গো সেভার্ন নদীর সংযোগ সাধিত হয় এবং এর পাঁচ বছর পরে মার্সে ও ট্রেন্ট নদী দুটির মধ্যে সংযোজন ঘটে। ১৭৮৯ সালে সেভার্ন ও টেম্‌স নদীর মধ্যে সংযোগ গড়ে ওঠে। খাল খননের প্রথম পর্যায়টি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বাণিজ্যিক অধোগতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৭৮০-র দশকে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় এবং ১৭৯০-এর দশকে তা জাতীয় উন্মাদনায় পরিণত হয়। খাল

খননের পিছনে প্রাথমিক চালিকাশক্তি ছিল আবারও সেই নগরগুলির বিকাশ। পরবর্তীকালে ক্রমশ বৃহদায়তন শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা খালখননের পরিকল্পনাকে এক জাতীয় উন্মাদনায় পরিণত করতে সাহায্য করে যদিও ফিলিস ডীনের মতে প্রথমদিকে এর পিছনে কার্যকরী শক্তি ছিল শেয়ারহোল্ডার, ব্যাঙ্কার ও নগর কর্পোরেশন সহ শহরগুলি এবং কখনো কখনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। আসা ব্রিগ্স তাঁর "The Age of Improvement' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে কয়েকটি খাল নির্মাণে বিনিয়োগ অত্যন্ত লাভজনক হয়েছিল। অক্সফোর্ড খালের শেয়ারহোল্ডার ৩০ বছরের বেশী সময় ধরে ৩০% ডিভিডেন্ড পেয়েছিলেন। পুরাতন বার্মিংহাম খালের শেয়ার, যার মূল দাম ছিল শেয়ার পিছু ১৪০ পাউন্ড, তা ১৭৯২ খ্রিঃ খাল সংক্রান্ত উন্মাদনার কালে ৯০০ পাউন্ডে পৌঁছায়। তবে শেয়ার হোল্ডারদের লাভের হিসাবের দ্বারা ব্রিটিশ অর্থনৈতিক উন্নতিতে খালগুলির অবদানকে বিচার করা উচিত নয়। যেটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা হল ভোক্তাগণ কম দামে কয়লা পেয়েছিল ফলে লোহা ফাউন্ড্রি এবং কুমোরের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছিল। শ্রমিকদের পারিবারিক প্রয়োজনেও কয়লা দেওয়া হত। ফিলিস ডীনের মতে, খাল খননের যুগ প্রথম শিল্পবিপ্লবে এক বিশাল অবদান রেখেছিল এবং রেলপথ যুগের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল।

খালখননের দীর্ঘ সময়কালীন সুফলগুলি হল নিম্নরূপঃ

১। খালগুলি মনুষ্যশক্তি এবং অশ্বশক্তির বিপুল পরিমাণ সঞ্চয়কে সম্ভব করে। এর ফলে উৎপাদন পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিবহন ব্যবসায়ের উপর উৎপাদনের প্রধান উপকরণসমূহ, যথা, শ্রম, মূলধন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথাক্রমিক অবদান বৈপ্লবিক বিবর্তন নিয়ে আসে। এছাড়াও এটি কাঁচামালের প্রভূত সঞ্চয়েও সহায়তা করে।

২। খালগুলি এক নতুন শ্রেণীর বিনিয়োগকারী সৃষ্টি করে, যথা, খাল শেয়ারহোল্ডারগণ, যা এক গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন অগ্রগতি ছিল। শিল্পায়নের প্রথম স্তরে বেশীরভাগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধান সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তকে বৃহদায়তন বিনিয়োগের পথে চালিত করা। সুতরাং যৌথ মূলধনী কোম্পানীগুলির উদ্ভব, যেখানে কয়েকজন ব্যক্তি এক বাণিজ্যিক উদ্যোগে মিলিতভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে, ব্যয়সাপেক্ষ মূলধনী উদ্যোগগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে চালিত করার পথে প্রধান পদক্ষেপ ছিল।

৩.৩ ❑ জনসমাজগত বিপ্লব

'ডেমোগ্রাফি' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'ডেমস' থেকে এসেছে যার অর্থ হল জনগণ। 'ডেমোগ্রাফি' শব্দটি মানবসমাজ বিষয়ে এক তথ্যগত ও গাণিতিক গবেষণা অর্থে ব্যবহৃত হয়। জনসমাজগত বিপ্লব বলতে বোঝায় জনসমাজগত রেখার এক নাটকীয় ঊর্ধ্বগতি। অষ্টাদশ শতকের শেষ নাগাদ, ইংলন্ডে জন্ম ও মৃত্যুহার এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যাকে ফরাসী জনসমাজবিদ এ্যাডলফ ল্যাড্রি এক 'জনসমাজগত' বিপ্লব বলেছেন। ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদগণ দীর্ঘদিন ধরে জনসমাজগত ও শিল্পবিপ্লবের মধ্যেকার সম্পর্ক অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন।

ফিলিস ডীন 'The First Industrial Revolution' গ্রন্থে বলেছেন যে প্রাথমিকভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার মূলত প্রাকৃতিক বৃদ্ধি, অর্থাৎ, জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যকার পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। একটি প্রাক্-শিল্পায়ন অর্থনীতিতে, জন্মহার সাধারণ প্রতি বছরে প্রতি হাজারে ৩৫ থেকে ৫০-এর মধ্যে

থাকে। এই হার কয়েকটি উপাদান যথা সামাজিক অবস্থা, বিবাহের গড় বয়স, শিশুশ্রমের চাহিদা, সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা, ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে মৃত্যুহারের বৃদ্ধি ও পতন আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও শান্তি, মহামারী এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উপর নির্ভরশীল। এ সত্ত্বেও একটি প্রাক্-শিল্পায়ন অর্থনীতিতে জনসংখ্যা প্রতি বছর ৫-১০% হারে বৃদ্ধি পেতে পারে।

জি. টি. গ্রিফিথ তাঁর 'Population Problems of the Age of Malthus' (১৯২৬) নামক গ্রন্থে বলেছেন যে শিল্পবিপ্লব শুরুর আগে ইংলন্ডের জনসংখ্যা ছিল বাস্তবত স্থিতিশীল এবং অবস্থাগত পরিবর্তন অত্যন্ত ধীর গতিতে ঘটেছিল। তবে, ১৭৬০ খ্রিঃ পরে উন্নতির হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জনসংখ্যাও দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। গ্রিফিথের মতে, চিকিৎসাক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং জীবনযাপনের মানোন্নয়নের ফলে মৃত্যুর হার হ্রাস পেতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচলিত মতটি ছিল এই যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি এবং ১৭৬০ বা ১৭৭০ খ্রিঃ পরে শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও শ্রমের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে জন্মহারে অবশ্য কিছু বৃদ্ধি ঘটেছিল। এই ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট বিতর্ক আবর্তিত হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রশ্ন জাগে যে মৃত্যুহার নাকি জন্মহার কোনটি ১৭৪০ খ্রিঃ পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সূচিত করেছিল। অধ্যাপক হ্যাবাকুকের মতে, উন্নততর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ব্যাপকতর অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার ফলে বিবাহের বয়স হ্রাস পাওয়ার কারণেই জন্মহার বৃদ্ধির বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। এই বক্তব্যের সমর্থনে বহু তথ্য পাওয়া যায়। সমকালীন লেখকদের রচনা থেকে বোঝা যায় শিল্প বিপ্লব শুরুর অনেক আগে থেকেই দরিদ্র শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটতে শুরু করেছিল। এই পর্যায়ে শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। টি. আর. ম্যালথাস, তাঁর 'Principles of Political Economy' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে অষ্টাদশ শতকের শেষ চল্লিশ বছরে খাদ্যশস্যের গড় মূল্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ১৭২০-১৭৫০ সালের মধ্যে গমের দাম অত্যন্ত কমে যায় এবং তার তুলনায় মজুরি অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথও একই মত প্রকাশ করেছেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছিল এবং তার সঙ্গে তৎকালীন ব্রিটেনের প্রধান শিল্প, বস্ত্রশিল্পেরও বৃদ্ধি ঘটেছিল।

১৭৩০ থেকে ১৭৫৫ খ্রিঃ মধ্যবর্তী সময়কালে ফসল উৎপাদন অভাবনীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, ফলে শস্যের দাম যেমন কমেছিল তেমনই ফসল কাটার জন্য শ্রমিকদেরও চাহিদাও হ্রাস পেয়েছিল। ফলে বিবাহের বয়স কমেছিল এবং বৃহৎ পরিবার সৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল। ফিলিস ডীন লিখেছেন যে, এই শতকের শেষদিকে শিল্পক্ষেত্রে শিশুদের নিয়োগের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা সৃষ্টি এবং স্প্রীনহ্যামল্যান্ড ব্যবস্থায় পারিবারিক আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা বৃহৎ পরিবারের জন্য চাপ বৃদ্ধি করেছিল। স্প্রীনহ্যামল্যান্ড ব্যবস্থা, যা ১৭৯৫ সালে সূচিত হয়েছিল, বৃহৎ পরিবার গঠনে উৎসাহ জোগায় কারণ গ্রামীণ রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ পরিমাণ প্রতি সন্তান পিছু বৃদ্ধি পেত। অধ্যাপক জে. চেম্বারস দ্বারা কৃত নটিংহ্যাম রেজিস্টারের উপর গবেষণা অধ্যাপক হ্যাবাবুকের মতামতকেই সমর্থন করে যে আলোচ্য সময়কালে মৃত্যুর হ্রাস পাওয়ার কারণ চিকিৎসাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির মধ্যে যত না নিহিত ছিল তার থেকে উচ্চ মৃত্যুহারের এক অধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ও সাময়িক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অনেক বেশী ছিল। অন্যদিকে অষ্টাদশ শতকে জন্মহার বৃদ্ধিকে

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে তুলে ধরার উদ্যোগের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে যখন জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই উচ্চ থাকে, যা অষ্টাদশ শতকের ইংলন্ডে ঘটেছিল, তখন মৃত্যুহার কম হওয়ার ব্যাখ্যাটিকেই জন্মহার বৃদ্ধির ধারাবাহিকতার সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বলে তুলে ধরা উচিত। প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঐতিহাসিকদের দ্বারা কৃত মূল্যায়ন থেকে একথা বলা যায় যে ১৭৫০ খ্রিঃ প্রায় এক দশক আগে থেকেই মহামারীর প্রকোপ কমে যাওয়ায় মৃত্যুহার অনেকটাই হ্রাস পায় এবং অংশত ১৭৫০ খ্রিঃ পরে শিশুমৃত্যুর হার কমার ফলে জন্মহার বৃদ্ধি পায়।

একটি মত, যা একসময় বহুল প্রচলিত ছিল কিন্তু বর্তমানে বাতিল হয়েছে তা হল চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পায়। তবে, ফিলিস ডীন দেখিয়েছেন যে, এই সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি যা অষ্টাদশ শতকে মৃত্যুহার ব্যাপকভাবে হ্রাসে সক্ষম হয়েছিল। উনবিংশ শতক পর্যন্ত টীকাকরণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে বলা যায় যে অষ্টাদশ শতকে বসন্ত রোগে মৃত্যুর হারেও বিশেষ তারতম্য ঘটেনি। হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়গুলি রোগ নিরাময় অপেক্ষা তার বিস্তারের কাজেই সহায়তা করত। যদিও মনে হয় অষ্টাদশ শতকে রোগের কারণ সম্পর্কে চিকিৎসকদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছিল। চিকিৎসার ক্ষেত্রে আরো বেশি স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি গ্রহণের মধ্যে এর প্রতিফলন দেখা যায়। ইহা সম্ভবত সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটা হ্রাস করে যদিও এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণাদি পাওয়া কঠিন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৭০০ থেকে ১৭৪১ খ্রিঃ মধ্যে ইংলন্ড এবং ওয়েলেসের জনসংখ্যা মোটামুটিভাবে ৫৮ লক্ষ থেকে ৬০ লক্ষের মধ্যে প্রায় স্থিতিশীল থেকে গিয়েছিল। ১৭৪১ থেকে ১৭৫১ সালের মধ্যে তা প্রায় ৩১/২% বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৫১ থেকে ১৭৬১ সালের মধ্যে বৃদ্ধির গতি বাড়তে থাকে। এইসময় বৃদ্ধির হার ছিল সম্ভবতঃ প্রতি দশকে ৭% যে হার পরবর্তী প্রায় এক দশককাল যাবৎ বজায় ছিল। তারপরে তা ১৭৮০-র দশকে প্রায় ১০%, ১৭৯০-এর দশকে প্রায় ১১% এবং উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রায় ১৬%-এ গিয়ে পৌঁছায়। সুতরাং, এ থেকে মনে হয় সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি না বাড়লে, ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লব শ্রমিকের অভাবে হয়ত বাধাপ্রাপ্ত হত। ফিলিস ডীন-এর মতে, ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও পণ্যমূল্য, যা জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে, ব্যতিরেকে ব্রিটিশ উৎপাদকগণ তাঁদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও নতুন নতুন আবিষ্কারে উৎসাহ পেতেন না এবং শিল্পবিপ্লব সাধনের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হত না।

৩.৪ ❑ সহায়ক গ্রন্থতালিকা

১। Deane Phyllis : The First Industrial Revolution.

২। Habsbawn E. J. : Industry and Empire.

৩। Cipolla Carlo (ed) : The Fontana Economic History of Europe : The Industrial Revolutions.

৩.৫ ❑ প্রশ্নাবলী

১। জনসমাজগত বিপ্লব ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল ?

২। রেলপথের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ইংলন্ডে পরিবহন বিপ্লবের একটি মূল্যায়ন করুন।

৩। শিল্পায়িত ইংলন্ডে যোগাযোগের ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তনগুলির উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।

৪। কৃষি প্রযুক্তি এবং কৃষি সংগঠনে পরিবর্তনগুলি কিভাবে ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গো সম্পর্কিত ছিল ?

৫। ইংলন্ডে কৃষিবিপ্লব শিল্পবিপ্লবের সঙ্গো কতদূর সম্পর্কিত ছিল ?

একক ৪ ❑ শিল্পবিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবসমূহ

গঠন

৪.১ ভূমিকা
৪.২ নিরাশাবাদী মত
৪.৩ আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী
৪.৪ ফিলিস ডীনের মত
৪.৫ উপসংহার
৪.৬ সহায়ক গ্রন্থসমূহ
৪.৭ প্রশ্নাবলী

৪.১ ❑ ভূমিকা

শিল্পবিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্পর্কে মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি হল জীবনযাপনের মানের উপর তার প্রভাবের প্রেক্ষিতে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা। বস্তুত, শিল্পায়নের ইতিহাসে একটি স্থায়ী বিতর্ক হল শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত মতামতসমূহ। এ বিষয়ে দুটি স্পষ্ট পরস্পর বিরোধী মতামত লক্ষ করা যায়। একটি হল নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গী, যা সমকালীন সমালোচক থেকে আধুনিক ঐতিহাসিকবৃন্দ যথা, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, কার্ল মার্কস, আর্নল্ড টয়েনবি, হ্যামন্ড এবং ড. এরিক হব্‌সবম তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে যদিও ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক পর্ব কিছু মানুষকে সচ্ছল করেছিল, কিন্তু তা দরিদ্র শ্রমিকের জীবনযাত্রা মানে এক সামগ্রিক অবনতিকেই সূচিত করেছিল। অন্যদিকে ম্যাককুলক, টুকে, গিফেন, ফ্ল্যাপহ্যাম, অ্যাশটন এবং সাম্প্রতিককালে ড. হার্টওয়েল এক আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে যদিও অর্থনৈতিক পরিবর্তন কিছু শ্রমিকের কর্মচ্যুতি ও হতাশার কারণ হয়েছিল, কিন্তু তাদের বেশীরভাগই এক উন্নততর জীবনযাপন ও বিস্তৃততর অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। পণ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাস এবং নিয়মিত কাজের সুযোগ এই পরিস্থিতি তৈরী করেছিল। ফিলিস ডীন তাঁর 'The First Industrial Revolution' নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে রাজনৈতিক গোঁড়ামির কারণেই এই বিতর্ক আরো ঘনীভূত হয়েছে। সাধারণত বামপন্থী লেখকরাই এ বিষয়ে এক হতাশাব্যাঞ্জক চিত্র তুলে ধরেন কারণ তাঁদের পক্ষপাত দুর্দশাগ্রস্ত সর্বহারাদের দিকে থাকে। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী লেখকবৃন্দ, যাঁরা মুক্ত পুঁজিবাদী উদ্যোগের সুফল সম্পর্কে অধিকতর নিশ্চিত ছিলেন, তাঁরাই এক আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেন।

৪.২ ❑ নিরাশাবাদী মত

শিল্পায়িত কারখানা ব্যবস্থার কুফলগুলি সম্পর্কে যে সকল মত প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থটির কথা

উল্লেখযোগ্য। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে ইংরাজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে গণহত্যা, ব্যাপক লুণ্ঠন ও আরো নানা ধরনের জঘন্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। এই অবক্ষয়ের তত্ত্ব শিল্পপূর্ববর্তী এক সুবর্ণযুগের চিত্র দ্বারা সমর্থিত হয়েছে যখন ইংরাজ সাধারণ মানুষ এক সমৃদ্ধ জীবনযাপন করত এবং স্বাধীন দেশীয় কারিগরশ্রেণী শোষণ ও অত্যাচার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তবে ফিলিস ডীন দেখিয়েছেন যে দেশীয় কারিগরগণ ওস্তাদ কারিগরদের দ্বারা কম শোষিত হত না। কারখানা মালিকগণ কর্তৃক কারখানার শ্রমিকদের মতোই ওস্তাদ কারিগর দেশীয় কারিগরদের সূতা কাটার জন্য তুলা বা কাপড় বোনার জন্য সূতা দিতেন। অধিকন্তু পরিবারের মহিলা ও শিশুরাও দেশীয় শিল্পের শ্রমসাধ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কারখানায় কাজের মতোই দীর্ঘসময় ধরে কাজ করত।

নানা নৈতিক ও নান্দনিক এবং অন্যান্য অ-অর্থনৈতিক আলোচনাও এই বিতর্ককে আরো জটিল করে তুলেছে। জে. এল. হ্যামন্ড এবং বারবারা হ্যামন্ড ইতিহাসের নৈতিককরণে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের গ্রন্থ 'The Rise of Modern Industry'-তে তাঁরা দেখিয়েছেন যে নগরগুলি ছিল নিজস্ব লাভজনক নোংরা, লাভজনক বস্তি, লাভজনক ধোঁয়া, লাভজনক বিশৃঙ্খলা, লাভজনক অজ্ঞতা ও লাভজনক হতাশা কারণ ইংলন্ডে সবকিছুই লাভের নিক্তিতে হিসাব করা হত। নতুন নগর, কারখানা ও চুল্লিগুলি ছিল পিরামিডের মতো—মানুষের ক্ষমতা নয় তার দাসত্বের প্রতীক—যে সমাজ তাদের নিয়ে গর্ব করে তার উপরেই তাদের দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করে। ফিলিস ডীন যেমন দেখিয়েছেন যে, যদি আমরা শিল্পবিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ওঠাপড়ার সঙ্গো জড়িত শ্রমিকরা প্রকৃতপক্ষে অধিকতর সুখী বা সভ্য হয়েছিল কিনা সেই সম্পর্কিত দার্শনিক বা নৈতিক বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে নাও চাই, তাহলেও তাদের জাগতিক জীবনযাত্রার মান উন্নত, স্থিতিশীল বা অধঃপতিত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে যথার্থ বিতর্কের এক বিস্তারিত ক্ষেত্র বর্তমান থাকে।

জার্মান পণ্ডিত ডব্লিউ. হফম্যান তাঁর 'British Industry 1700–1950' নামক গ্রন্থে ব্রিটিশ শিল্প উৎপাদন সম্পর্কে যে তথ্যাদি সংকলিত করেছেন, তা থেকে দেখা যায় যে অষ্টাদশ শতকের প্রথম তিন-চতুর্থাংশে মোট শিল্পোৎপাদন বার্ষিক গড় ১ শতাংশের কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৮০-র দশক ও ১৭৯০-এর দশকের প্রথমদিকে তা প্রায় লাফ দিয়ে ৩ শতাংশে উঠে যায়, ১৭৯৩-১৮১৭ খ্রিঃ মধ্যে সম্ভবত যুদ্ধের কারণে কিছুটা হ্রাস পায় এবং ১৮১৭ খ্রিঃ পরে তা পুনরায় ৩ শতাংশের উপরে উঠে যায়। ফিলিস ডীনের মতে, এই তথ্য প্রমাণ করে যে জনসাধারণের মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা সম্ভবত ১৭৮০-র দশকে শুরু হয়েছিল, ফরাসী ও নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের ফলে তা কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে শক্তিশালী ভাবে পুনঃসূচিত হয়েছিল। তাঁর মতে এর দ্বারা গড় জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

৪.৩ ❑ আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

আশাবাদী মতামতের বহু সমর্থক দেখিয়েছেন যে অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে মৃত্যুহারের দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্তি একথা প্রমাণ করে যে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেছিল। জনসাধারণের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ ছিল সম্ভবত চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিসাধন। তবে টি. ম্যাককিউন এবং আর. জি. ব্রাউনের মতো চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঐতিহাসিকগণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির তত্ত্ব মানেন না। তাঁদের মতে, এই সময়ে অর্থনৈতিক উন্নতির ফলেই জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেছিল। জনগণের আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভালো রাস্তা, খাল ও অন্যান্য পরিবহন সুযোগসুবিধার মতো যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি। শেষোক্ত সুবিধাটি শিল্পে বা কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির থেকেও খাদ্যশস্যের নিয়মিত বাজারজাতকরণের মাধ্যমে অনেক বেশী অবদান রেখেছিল। জন ব্রাউনলি তাঁর 'History of the Birth Rates and Death Rates in England and Wales' নামক প্রবন্ধে (Public Health জার্নালে প্রকাশিত, জুলাই ১৯১৬) দেখিয়েছেন যে মৃতদেহ কবরস্থ করার হিসাব থেকে বোঝা যায় যে মৃত্যুহার ১৭৩০-এর দশকে প্রতি হাজারে ৩৫.৮ থেকে ১৮১১-২০ সালের মধ্যে গড়ে প্রতি হাজারে ২১.১-এ নেমে এসেছিল। ১৮৩১-৪০-এর দশকে তা বেড়ে ২৩.৪-এ পৌঁছেছিল এবং ১৮৪০, ১৮৫০, ও ১৮৬০-এর দশকে প্রতি হাজারে ২২-এর কিছু বেশী হিসাবে প্রায় স্থিতিশীল থেকে গিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে জাতীয় মৃত্যুহার বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল নগরগুলিতে অধিক সংখ্যক মানুষের আগমন। লন্ডনের বাইরে পাঁচটি বৃহত্তম নগর যথা, বার্মিংহাম, ব্রিস্টল, লিড্স, লিভারপুল এবং ম্যাঞ্চেস্টারে গড় মৃত্যুহার ১৮৩১ সালে ২০.৭ থেকে ১৮৪১ সালে ৩০.৮-এ পৌঁছায়। অর্ধেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ ছিল কেবলমাত্র সংক্রামক ব্যাধিসমূহ। শিশুরোগ, যা ধূলাময়লা, অজ্ঞতা, খারাপ খাদ্য এবং ঘনবসতির ফল ছিল, তা নগরগুলিতে পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের প্রতি দুজনের মধ্যে একজনকে আক্রমণ করেছিল। নগরগুলির আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে গ্রামের দিকে বিস্তৃত হতে শুরু করলে, এবং নগরবাসী জনগণের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলে, বর্তমান নিকাশী ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে যা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরো ক্ষতিকারক প্রভাব বহন করে আনে। বেশীরভাগ নগরাঞ্চলে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে মানুষের বসবাসের পরিবেশের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে এবং ১৮৭০ ও ১৮৮০-র দশকের আগে সাধারণভাবে তার উন্নতি ঘটেনি।

৪.৪ ❑ ফিলিস ডীনের মত

শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি বা অবনতি ঘটেছিল কিনা সেই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিতে গেলে মজুরি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ফিলিস ডীনের মতে, অষ্টাদশ শতকে বিশেষ বিশেষ জীবিকা বা শিল্পক্ষেত্রে মজুরি সংক্রান্ত যে তথ্য পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে বলা যায় যে এই শতকের শেষ পর্যন্ত শ্রমের কোনও সুসংহত জাতীয় বাজার ছিল না। ডীনের মতে, অষ্টাদশ শতকের মজুরি সংক্রান্ত ইতিহাসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল মজুরির স্তর এবং প্রবণতায় ব্যাপক আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের উপস্থিতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ল্যাঙ্কাশায়ারে ১৭৫০ ও ১৭৯০-এর দশকের মধ্যে গৃহনির্মাণের কাজে যুক্ত শ্রমিকদের মজুরি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। লন্ডনে তা সম্ভবত ৫ শতাংশেরও কম বেড়েছিল। ফিলিস ডীন মনে করেন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে

একজন যথার্থ মজুরিভোগী শ্রমিক ছিল শিল্পশ্রমিক নয়, কৃষিশ্রমিক। কৃষিজ আয় সম্পর্কে এ. এল. বাউলে-র প্রদত্ত তথ্যাদি থেকে মনে হয় ১৭৬০-এর দশক থেকে ১৭৯৫ সালের মধ্যে গড় কৃষি মজুরি প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইয়র্কশায়ার, রাইডিং, ল্যাঙ্কাশায়ার, নর্দারল্যান্ড এবং স্ট্যাফোর্ডশায়ারে এই বৃদ্ধি ছিল সর্বাধিক—৫০ শতাংশেরও বেশী। যাইহোক, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ ইংলন্ডের বিস্তৃত অঞ্চলে কৃষি মজুরি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল। ১৭৯০-এর দশকের প্রথমদিকে, যখন ফ্রান্সের সঙ্গো যুদ্ধ শুরু হয়, তখন অর্থনীতির উন্নতি সূচিত হয়, অপেক্ষাকৃত নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং কৃষিক্ষেত্রে মজুরি বাড়তে থাকে। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ শেষের আগে কৃষিক্ষেত্রে মজুরির একটি জাতীয় তালিকা থেকে দেখা যায় যে তা প্রায় ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে যুদ্ধের পরে এই চিত্রের প্রায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। গড় মজুরির সঙ্গো সঙ্গো পণ্যমূল্যও হ্রাস পায়। ১৮১৬ থেকে ১৮২৪ সালের মধ্যে মজুরি ১০ শতাংশেরও বেশী হ্রাস পায় এবং ১৮৪০-এর দশকের মধ্যে এই হ্রাস ছিল ১৫ শতাংশ।

ফিলিস ডীন ১৭২০-র দশক থেকে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পক্ষে তিনটি দৃঢ় ধারণার কথা তুলে ধরেছেন। **প্রথমত,** ১৮২০-র দশকে শিল্পায়ন বৃদ্ধি পেলে, কর্মনিয়োগের সুযোগ নিয়মিত হয়ে আসে। **দ্বিতীয়ত,** কাঁচামালের থেকে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হ্রাস পায়। **তৃতীয়ত,** করভার হ্রাস পাওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়।

৪.৫ ❑ উপসংহার

অন্যদিকে, অধ্যাপক টি. এস. অ্যাশটন দেখিয়েছেন যে ১৮২০-র পর থেকে শিল্পশ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। বেশীরভাগ পণ্ডিতই এ বিষয়ে একতম যে ১৭৯০-এর দশকে, যুদ্ধের কারণে, ফসল নষ্ট হওয়ার ফলে, এবং জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংরাজ শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। আশাবাদী মতপন্থী আরেকজন পন্ডিত, ক্ল্যাপহ্যাম ১৭৯৫ সালকে 'কৃষ্ণতম বছর' বলে অভিহিত করেছেন। ফিলিস ডীনের মতে, ১৭৮০ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সপক্ষে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না। ফসল নষ্ট, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, বড় যুদ্ধের কারণে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক শিথিলতার কারণে সৃষ্ট সমস্যাদির কথা মনে রাখলে একথা বলা যায় যে জীবনযাত্রার মানের উন্নতির বদলে অবনতি-ই ঘটেছিল। ১৮২০ থেকে ১৮৪০-এর মধ্যবর্তী সময়কাল সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া কঠিন কারণ প্রকৃত আয়বৃদ্ধির সপক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে ১৮৪০-এর দশকের শুরুতে এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী তথ্য পাওয়া যায় যা শ্রমিকশ্রেণীর গড় প্রকৃত আয় বৃদ্ধির চিহ্ন বহন করে। এই শতকের মধ্যভাগে গড় জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের বিষয়ে মতামত অনেকটাই শ্রমিকশ্রেণীর গঠনগত পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করা হয়।

৪.৬ ❑ সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১। Deane Phyllis : The First Industrial Revolution.

২। Hobsbawm E. J. : Industry and Empire.

৩। Taylor A. J. (Ed.) : The Standard of Living in Britain in the Industrial Revolution.

৪.৭ ❑ প্রশ্নাবলী

১। আশাবাদী ও নিরাশাবাদী মতামতের আলোকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ইতিহাস—পঞ্চম পত্র

পর্যায়—৪

একক ১ ❑ ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উত্থান

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা
১.১ আধুনিক জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের পর্ব বিভাজন
১.২ ইউরোপে জাতীয়তাবাদের বিকাশ
১.৩ জার্মান জাতীয়তাবাদ
১.৪ ইতালিতে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ
১.৫ অনুশীলনী
১.৬ গ্রন্থাবলী

১.০ ❑ প্রস্তাবনা

জাতিসত্ত্বার চেতনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি আদর্শ বা কর্মসূচীকে আমরা 'জাতীয়তাবাদ' আখ্যা দিতে পারি। জাতিসত্ত্বার উপলব্ধি বা চেতনা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। কোনো জনগোষ্ঠী তাদের ভাষাগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত এবং জাতি (race) গত বৈশিষ্ট্যে একটি জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, অভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঐকান্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ভবিতব্যে বিশ্বাসী মানবসমাজ বিভিন্ন দলভুক্ত হলেও একত্রে একটি জাতি গঠন করেছে। ডেভিড থম্পসনের মতে, বৃহত্তর অর্থে বিচার করলে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের কয়েক শতাব্দী আগেই জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে টিউডর যুগে ইংলন্ডে একটি প্রাণবন্ত জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব ছিল ; এমনকি ফ্রান্সেও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের যুগে একই ধরণের জাতীয়তাবাদের ধারণা বা জাতীয়তাবোধের অনুভূতি গড়ে ওঠে। যাইহোক, ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের সম্পর্কে যে আধুনিক চিন্তাভাবনা করা হয়েছে তা প্রধানত ঊনবিংশ শতকের ফসল। আধুনিক অর্থে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ হল, কোনো এক বা একাধিক গোষ্ঠীবন্ধ মানুষের ঐক্য ও স্বাধীনতার অধিকার অর্জন করার দুর্নিবার প্রয়াস। এই জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় অধ্যায়ের সংযোজন করেছে যার সময়সীমা ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

১.১ ❑ আধুনিক জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের পর্ব বিভাজন

আধুনিক জাতীয়তাবাদের ইতিহাসকে দুটি পর্বে বিন্যস্ত করা যায়। খ্রিস্টীয় ১৮০০ অব্দ ১৮৫০ অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভিক অর্ধশত বছর অবধি এটি ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতিমনা জনগোষ্ঠীর আবেগসঞ্জাত বিশ্বস্ততা এবং বিদেশী শক্তির শোষণের হাত থেকে মুক্তির দীর্ঘ প্রতীক্ষার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পর সাংস্কৃতিক এবং জাতিগতভাবে ঐক্যবন্ধ প্রতিটি

মানুষের অধিকার অর্জন করার জন্য, জাতীয় মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে সরব এবং সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে। জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় রাজনৈতিক শক্তির প্রতি উন্মত্ত ভজনায় এবং সমাজে উচ্চবর্গীয় জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত বিধি-বিধানগুলির প্রতি সাধারণ মানুষের দাস-সুলভ অনুগত্যে ও জাতীয় মর্যাদা প্রাপ্তির অলীক কল্পনায়। ডেভিড থম্পসনের মতে, ফরাসি বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সাম্প্রতিক অর্থে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ প্রথম তার সফল ক্রমবিকাশের পথ খুঁজে পায়।

১.২ ❑ ইউরোপে জাতীয়তাবাদের বিকাশ

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জার্মানী ও ইতালিতে জাতীয়তাবোধের অনুভূতি বা ভাবাবেগ ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। যদিও নেপোলিয়নীয় রাজতন্ত্র স্পেন, পোল্যান্ড, রাশিয়া এবং বেলজিয়ামকে একইভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমদিকে অবশ্য জাতীয়তাবাদ বিদেশী শক্তির অবদমন ও আগ্রাসনকে প্রতিহত করার মন্ত্র হিসাবে কাজ করেছে যা নিঃসন্দেহে ফ্রান্স-বিরোধী। এর ফলস্বরূপ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, দেশজ আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এবং জাতীয় ভাষা সর্বত্র নবমূল্যায়নের ঢেউ ওঠে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফরাসি বিপ্লব এবং তৎ-সম্পর্কিত যুদ্ধবিগ্রহ উনবিংশ শতকে জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে। ফরাসি সৈন্যদলের সাহায্যে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের সার্বভৌমত্ব বিষয়ক যে বৈপ্লবিক আদর্শের প্রসার ঘটে তা বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত মানুষজনকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করে। ডেভিড থম্পসন তাঁর 'Europe since Napoleon' গ্রন্থে বলেছেন জনগণের সার্বভৌমত্ব-সংক্রান্ত 'Jacobin doctrine' ছিল এমন একটি অস্ত্র যার দুই প্রান্তই ক্ষুরধার। একদিকে এটি সামগ্রিকভাবে রাজার বিরুদ্ধে জাতির ন্যায্য দাবি আদায়, সরকার নির্বাচন ও সেই সঙ্গে সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ; অপরপক্ষে এই doctrine একটি গণতান্ত্রিক আদর্শের বার্তা বহন করে যেখানে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের বৈপ্লবিক একত্রীকরণে একটি সরকার জনগণের কণ্ঠস্বর হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, এই আদর্শবার্তায় ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সমান অধিকার দাবি করা হয়েছে। রক্তক্ষয়ী ফরাসি বিপ্লবের যুগে জ্যাকোবিন শাসনের চরম নিষ্ঠুরতা বিপ্লব-প্রসূত গণতান্ত্রিক আদর্শকে ব্যাহত করেছিল। নেপোলিয়নের ইউরোপ-বিজয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও ভাবাবেগকে সুদৃঢ় করে তোলে। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইউরোপে গণতান্ত্রিক চেতনার থেকেও জাতীয়তাবাদ অনেক অনেক বেশি কার্যকরী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

১.৩ ❑ জার্মান জাতীয়তাবাদ

জার্মানিতে জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় তার স্বর্ণযুগে। এইসময় জার্মানি সুদক্ষ সাংগীতিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে, প্রথিতযশা মনীষীদের সমাবেশে এবং দার্শনিক চিন্তাভাবনার সাংস্কৃতিক দীপ্তিতে ভাস্বর ছিল।

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে জার্মানি সংস্কৃতি ও রুচিশীলতায় শীর্ষস্থান দখল করে থাকার ফলে ফ্রান্স সেখানে কোনোভাবে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। জার্মান দার্শনিক Fichte জার্মান জনগণকে 'Volksgeist' নামক একটি বিচিত্র জাতীয় চরিত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা বলেছেন যা সকল মহৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিস্বরূপ। বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানত প্রাশিয়ার পুনরুত্থান এবং জার্মান জাতীয়তাবাদের বিকাশের উদ্দেশ্যে বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই হেগেল কর্তৃপক্ষ ও রাজ্যের ক্ষমতা নিয়ে একটি নতুন দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করেন, যা শুধুমাত্র জার্মানদেরই নয়, সেই সাথে ইতালীয় এবং উনবিংশ শতকের ইংরেজ চিন্তাবিদগণকেও উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রাশিয়ার পুনর্গঠন করা হয়েছিল অনেকাংশে ফ্রান্সের বৈপ্লবিক সংস্কারের অনুকরণে। ফ্রান্সের সাফল্যে প্রাশিয়ার সংস্কারকরা আকৃষ্ট হয়ে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন গঠনের কাজ শুরু করেন। একটি বিশ্বস্ত জাতীয় সৈন্যদল গঠনের প্রচেষ্টা হয় এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াস দেখা যায়, যা জনগণের মধ্যে সামগ্রিকভাবে জার্মান ঐতিহ্য পরম্পরা দেশভক্তি জাগ্রত করবে এবং জার্মান জাতীয়তাবাদ রক্ষার জন্য সমগ্র জাতি আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবে।

ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পবিত্র রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করে জার্মানির বৃহত্তর ঐক্য সাধনে তৎপর হন। বাভেরিয়া, বাডেন, স্যাক্সনি ও আরও বারোটি ছোট রাজ্যকে একত্রিতভাবে রাইন জোটের অন্তর্ভুক্ত করে এবং জটিল আইন ও বিচার ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সমগ্র পশ্চিম জার্মানিতে 'নেপোলিয়ন কোড'-এর সূচনা করে জার্মানির ঐক্য সাধনের প্রয়াস শুরু হয়। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে লিপ্‌জিগে সংঘটিত জাতি যুদ্ধে (Battle of Nations) প্রাশিয়ার বিজয় জার্মানির জাতীয়তাবাদকে আরও জনপ্রিয় করে তোলে। এটি সম্মিলিত বা যৌথ বিজয় হলেও জাতীয় মুক্তির আদর্শে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। এই জয়ের ফলস্বরূপ নেপোলিয়ন জার্মানির অধিকাংশ অঞ্চল, এমনকি রাইনের বামতীরস্থ অঞ্চল থেকেও পিছু হইতে বাধ্য হন।

১.৪ ❑ ইতালিতে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ

ইতালিতে নেপোলিয়ন যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন, ফলপ্রসূতার নিরিখে বিচার করলে জার্মানীতে তার কিছুটা বিপরীত প্রভাব পড়েছিল। ইতালিতে নেপোলিয়নীয় শাসন ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত, নিরবচ্ছিন্ন ও স্থায়ী ছিল ; কারণ ইতালীয় জনগণের মনোভাব জার্মান ও স্পেনীয়দের মত তীব্র ফ্রান্স-বিদ্বেষী ছিল না। সেজন্য নেপোলিয়ন তাদের কাছে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন। নগরবাসী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নেপোলিয়নের নেতৃত্বে প্রাপ্ত এই দক্ষ ফরাসী প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিল। ফরাসি শাসনের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হল, ইতালিতে ক্ষুদ্র ক্ষমতাধর যুবরাজদের ও পোপের আধিপত্য বিলুপ্ত হবার সুযোগে করণিক শ্রেণির যে অবাঞ্ছিত প্রভাব ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল, ফরাসি জমানায় তা দুর্বল হয়ে পড়ে।

জার্মানী ও ইতালিতে জাতীয়তাবোধের গৌরব এবং আকাঙ্ক্ষাকে নব উদ্দীপনায় সুপরিব্যাপ্ত করার মহান চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল ফরাসি শাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। ডেভিড থম্পসনের মতে, জার্মানি

ও ইতালি—এই দুই রাজ্যের ঐক্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এই রাজ্যদ্বয় ইউরোপীয় রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১.৫ ❑ অনুশীলনী

(১) ইউরোপে ১৯ শতকে জাতীয়তাবাদের বিকাশ বিশ্লেষণ করো।
(২) জার্মান জাতীয়তাবাদের বিকাশের পটভূমি ব্যাখ্যা করো।

১.৬ ❑ গ্রন্থাবলী

(১) Thompson David : Europe Since Napoleon.
(২) Lipson E. : Europe in the 19th and 20th Centuries.
(৩) Ketelby D. M. : A History of Modern Times.
(৪) Anderson Benedict : Imagined communities

—

একক ২ ❑ ইতালির ঐক্য

গঠন

২.০ প্রস্তাবনা
২.১ ইতালির উপর নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির প্রভাব
২.২ ইতালির ঐক্য আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়
২.৩ অনুশীলনী
২.৪ গ্রন্থাবলী

২.০ ❑ প্রস্তাবনা

বিগত কয়েক শতক ধরে ইতালির শুধুমাত্র একটি ভৌগোলিক অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় ছিল না। সাম্রাজ্যের গণ্ডির মধ্যে পেনিনসুলাকে অন্তর্ভুক্ত করার একাধিক প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে। উনবিংশ শতকে পেনিনসুলা কতকগুলি পৃথক রাজ্যে বিভক্ত হয় (১) দক্ষিণে ন্যাপল্‌স্‌ এবং সিসিলির বুরবোঁ রাজ্য (২) প্যাপ্‌ল্‌ রাজ্যসমূহ এবং (৩) টাসকানির মহান ডাচি সাম্রাজ্য, যার রাজধানী ফ্লোরেন্স ; এবং এই সাম্রাজ্যের উত্তরে মডেনা ও জারমা নামক দুই ক্ষুদ্র প্রতিবেশী ডাচি রাজ্য। উপরিউক্ত তিনটি রাজ্যই হ্যাপ্‌স্‌বার্গ শাসকদের অধীনস্থ ছিল।

২.১ ❑ ইতালির উপর নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির প্রভাব

ইতালির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় নেপোলিয়নের বিজয়ের পর। অস্ট্রিয় ও বুরবোঁগণ পেনিনসুলা থেকে বিতাড়িত হন, প্যাপ্‌ল্‌ রাজ্যসমূহ একত্র সংযুক্ত হয়, দেশের সর্বত্র এক এবং অভিন্ন আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিয়েনা কংগ্রেসে অবশ্য জাতীয়তাবোধের সংবেদনশীলতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল। এই কূটনৈতিক পাশাখেলায় ইতালিকে একটি নিরীহ হরিণশাবকের মত অন্যায়ভাবে বর্ধ করা হয়েছিল। ক্ষমতাশালী দেশ হিসাবে ইতালির ভাগ্যনিয়ন্তা অস্ট্রিয়া পেনিনসুলার সঙ্গে মিলিত হয়।

২.২ ❑ ইতালির ঐক্য আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়

শুধুমাত্র লোম্বার্ডি (Lombardy) এবং ভেনেসিয়ায় নয়, অস্ট্রিয়ার প্রভাব অপরাপর সকল রাজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করত। ভিয়েনা কংগ্রেসের দীর্ঘ বিশ বছর অতিবাহিত হবার পর ইতালি অস্ট্রিয় আধিপত্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়। অস্ট্রিয় শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য ইতালিতে সেই সময় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে আন্দোলন হয় তা 'জ্বলন্ত অঙ্গারবাহী সমিতি' (Society of Charcoal Burners) বা 'কার্বোনারি' আন্দোলন নামে পরিচিত। এটি ছিল একটি গোপন বিপ্লবী সমিতি যার সদস্যগণ ইতালি থেকে অস্ট্রিয়

আধিপত্যকে বিতাড়িত করার ব্রতে নিজেদের উৎসর্গ করে। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে ইতালীয় দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

ইতালীয় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন Giuseppe Mazzini (ম্যাৎসিনি)। ম্যাৎসিনি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে 'ইয়ং ইতালি' নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। Gordon Craig-এর মতে, এদের আন্দোলন আঞ্চলিকতার গন্ডি পার হয়ে অনেক বেশী জাতীয়তাবাদী ছিল। এটি ম্যাৎসিনি-র নেতৃত্বে জাতীয় পরিচালন-কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত আমজনতার আন্দোলন হয়ে ওঠে যা উদার, স্বাধীন ও প্রজাতান্ত্রিক ইতালীয় জাতি গড়ার লক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত ছিল। ম্যাৎসিনি ইতালীয়দের আত্ম-উপলব্ধির শিক্ষা দেন যাতে তারা জাতির প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে। সমগ্র পেনিনসুলা কৃত্রিম রাজনৈতিক গণ্ডিতে বহুধাবিভক্ত হলেও অভিন্ন পরম্পরাগত সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক স্মৃতির অংশীদার হবার ফলে তাদের মধ্যে অচ্ছেদ্য ঐক্য গড়ে উঠেছিল। ম্যাৎসিনির আদর্শ যথেষ্ট প্রচার ও প্রসার লাভ করে। এই মতবাদ ইতালির অধিবাসীদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মহৎ ও উদার করে তোলে, যা জাতির মুক্তি-কামনায় আরও সংহত জনমত গঠনের অনুকূল ও সহায়ক ছিল। সুতরাং ম্যাৎসিনিকে নিঃসন্দেহে Risorgimento-র সর্বাপেক্ষা সফল এক অনন্য চিন্তাবিদ বলা যেতে পারে। ভবিষ্যত প্রজন্ম, যারা ইতালির ঐক্যসাধনে সার্থক হয়, অবধারিতভাবে তাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল ম্যাৎসিনির রচনা ও প্রচার-পুস্তিকা। তাই ইতালির ঐক্যসাধনে ম্যাৎসিনির অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মানসিক অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

১৮৪৮ সালে সংঘটিত বিপ্লব সমগ্র ইউরোপকে যেন বন্যার জলে ধুয়ে মুছে নতুন করে দিয়েছিল। ইতালি এই বিপ্লবে প্রভাবিত হয়; পিড্মন্ট্, টাসকানি এবং প্যাপল্ রাজ্যে বিপ্লব দানা বাঁধে। ১৮৪৮ সালের মার্চ মাসে একমাত্র প্যাপল্ রাজ্য ছাড়া উল্লিখিত অপরাপর দেশসমূহে সংবিধানের অধিকার এবং সংসদীয় শাসনতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। সমসাময়িক অস্ট্রিয়া অবশ্য ইতালির এই সাফল্যে চিন্তিত হয়ে পড়ে। মেটারনিকের ক্ষমতার শক্তিশালী দুর্গ ভিয়েনা পর্যন্ত তাঁর অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং অনতিবিলম্বে মেটারনিক মন্ত্রীত্ব থেকে অপসারিত হন। মেটারনিকের ভিয়েনা ত্যাগ এবং সেখানে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সংগঠিত বিদ্রোহের সংবাদ ইতালিতে আসে। সেই মুহূর্তে ইতালির ঐক্যসাধনের প্রয়াসে গ্যারিবল্ডীর জীবন ও কার্যকলাপ (১৮০৭-১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ) একটি বিশেষ অধ্যায় সংযোজিত করে। গ্যারিবল্ডীর সঙ্গে ম্যাৎসিনির সাক্ষাৎ হয় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে; তিনি 'ইয়ং ইতালি'-র সদস্য হন। অবিচার, অত্যাচার এবং নিষ্ঠুর দমনমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইতালিকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার মহান শপথ নেন গ্যারিবল্ডী। ইতালিতে বিপ্লবের সংবাদ প্রথম পৌঁছবার পর এক লিজিয়ন দেশসেবকের সৈন্যবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি লোম্বার্ডির অস্ট্রিয় সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এটি নিঃসন্দেহে গ্যারিবল্ডীর বীরত্বের পরিচায়ক।

১৮৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব ব্যর্থ হলেও কয়েকটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলনেই সর্বপ্রথম ইতালির জনগণ আপন মাতৃভূমির ঐক্যের জন্য লড়াই করেছিল। এই বিপ্লব প্রমাণ করে যে উপযুক্ত একজন রাষ্ট্রনেতা ছাড়া ইতালীয় ঐক্য সুদূর পরাহত।

অবশেষে ইতালীর ঐক্যসাধনে একজন সুদক্ষ রাষ্ট্রনেতার আবির্ভাব হয়; তাঁর নাম কাভুর

(Cavour)। কাভুর ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে তুরীনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশনার কাজে ব্রতী হন যার মাধ্যমে সাংবিধানিক সংস্কার, ইতালির স্বাধীনতা এবং ইতালির কতকগুলি দেশের মধ্যে Federal League গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছিল। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে একটি উপনির্বাচনে তিনি পিড্‌মন্টের প্রথম পার্লামেন্টে তুরীনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে কৃষি ও বাণিজ্য-বিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করা হয়। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্য ও কৃষি ছাড়াও নৌবাহিনী এবং অর্থ-বিষয়ক দপ্তরের ভার কাভুর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। ইউরোপে কাভুরের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। এইসময় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পশ্চিমের বৃহৎশক্তিসমূহ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাভুর চেয়েছিলেন ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের পক্ষে পিড্‌মন্ট্ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক। তাঁর ইচ্ছানুসারে পিড্‌মন্টের সৈন্যদল সফলভাবে যুদ্ধ করে তারা যে অন্য কোনো দেশের সেনাবাহিনীর থেকে নিকৃষ্ট নয় তা প্রমাণ করেছিল।

যুদ্ধ সমাপ্তির পর ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কাভুর প্যারিস সম্মেলনে পিড্‌মন্টের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি এই সম্মেলনে ইউরোপের রাষ্ট্রনেতাদের সামনে ইতালির সমস্যাকে উপস্থাপিত করেন—বস্তুত ইতালির সমস্যা ইউরোপীয় সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কাভুর এবং ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ন গোপনে Plombieres নামক স্থানে মিলিত হয়ে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির দ্বারা ইতালি থেকে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করার প্রশ্নে নেপোলিয়ন পিড্‌মন্টকে সাহায্যদানে সম্মত হন এবং স্যভয় পরিবারের অধীনে উত্তর ও মধ্য ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে সহায়তা করার অঙ্গীকার করেন। অবশ্য প্যাপল রাজ্যগুলি পোপের অধীনস্থ ছিল ; ন্যাপল্‌স্ ও সিসিলি পূর্ববৎ ২য় ফার্দিনান্ডের অধীনেই থাকবে বলে স্থির হয়। পরিবর্তে কাভুর ফ্রান্সকে নাইস ও স্যভয় ছেড়ে দিতে সম্মত হন। কিন্তু যতদূর মনে হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাস নাগাদ আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রবল চাপে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্লমবিয়ার্সের চুক্তি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এপ্রিলের আঠারো তারিখে ফরাসী সম্রাট, কাভুরকে সৈন্যদল ভেঙে ফেলার (demobilization) কাজ শুরু করার সম্মতি চেয়ে প্রস্তাব দেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ইতালি-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের বাতাবরণ তৈরী করা। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী পিড্‌মন্ট্ সরকারকে একটি চরমপত্র মারফৎ জানান, নিরস্ত্রীকরণ অথবা যুদ্ধ—এই দুটির মধ্যে যে-কোনো একটি পথ পিড্‌মন্ট্‌কে বেছে নিতে হবে। এইভাবে ইতালীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়। কাভুরের কাছে এই সংগ্রাম ছিল একটি প্রস্তরখণ্ড বিশেষ, যে সাফল্যে পা ফেলে বছরখানেকের মধ্যে তিনি শুধুমাত্র রোম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল ছাড়া সমগ্র ন্যাপল্‌স্ সিসিলি এবং প্যাপ্‌ল্ রাজত্ব ইতালীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করেন। শুধুমাত্র ভৌগোলিক ঐক্যই নয়, রাজনৈতিক একতা সাধনেও ইতালি সক্ষম হয়েছিল। সিসিলি ও ন্যাপল্‌সে গণভোট নেওয়া হয় এবং উভয়ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নির্ধারক ভোটটি সংযুক্তির পক্ষেই পড়ে। এই সময় অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়া যুদ্ধের সুযোগে ইতালি তার চিরদিনের শত্রুকে চরম আঘাত করে। ফলে ভেনিস অধিকৃত হয় ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৭০ সালে রোম সাম্রাজ্যও ইতালির অধিকারে আসে। কিন্তু কাভুর তাঁর জীবন-সাধনার পরিপূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারেননি। ১৮৬১ সালের জুন মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। কাভুর তাঁর সুদীর্ঘ জীবনকালে ইতালীয়দের স্বভূমি অর্জনের সংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইতালির জন্য, ইতালিবাসীর জন্য তাঁর আজীবন নিরলস সংগ্রাম দেশবাসীর কাছে আজও কাভুরকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে রেখেছে।

২.৩ ❑ অনুশীলনী

(১) ইতালির ঐক্য আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি বিশ্লেষণ করো।

(২) ইতালির ঐক্য আন্দোলনে ম্যাৎসিনীর ভূমিকা আলোচনা করো।

(৩) ইতালির ঐক্য আন্দোলনে কাভুরের কৃতিত্ব আলোচনা করো।

২.৪ ❑ গ্রন্থাবলী

(১) Thompson David : Europe Since Napoleon.

(২) Davis John A. & Ginsborg Paul (ed) : Society and Politics in the Age ofRisorgimento.

(৩) Lovett Clare M. : The Democratic Movement in Italy 1830-76.

একক ৩ ❑ জার্মানির ঐক্য

গঠন

৩.০ প্রস্তাবনা
৩.১ জার্মানির উপর নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির প্রভাব
৩.২ ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ও জার্মানির ঐক্য প্রচেষ্টা
৩.৩ বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন
৩.৪ বিসমার্কের কৃতিত্ব
৩.৫ অনুশীলনী
৩.৬ গ্রন্থাবলী

৩.০ ❑ প্রস্তাবনা

ফরাসি বিপ্লবের যুগে ইউরোপের সর্বাধিক বিভাজিত দেশ ছিল জার্মানি। দ্বিশতাধিক রাজ্যের সমাহারে গঠিত এই দেশ সম্রাটের প্রতি নামে মাত্র অধীনতা প্রদর্শন করত। বস্তুত এই রাজ্যগুলি পারস্পরিকভাবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। তারা প্রেসিডেন্সির সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত ; হ্যাব্স্বার্গ পরিবারকে রাজকীয় সম্মান জানানো হত ; কিন্তু প্রাশিয়া বৃহত্তর সামরিক শক্তিসম্পন্ন দেশ হিসাবে জার্মানির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। অবশিষ্ট জার্মান রাজ্যগুলি নিজেদের সার্বভৌম অধিকার ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে অস্ট্রিয়া বা প্রাশিয়াকে কেন্দ্র করে জোটবন্ধ হয়েছিল। সম্রাটের সঙ্গো অলিখিত একটি বোঝাপড়া ছাড়াও বহুসংখ্যক এই রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র ছিল জার্মান যুবরাজদের প্রেরিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি যৌথ আইনসভা।

৩.১ ❑ জার্মানির উপর নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির প্রভাব

আধুনিক জার্মানির স্রষ্টা হলেন নেপোলিয়ন। ই. লিপসনের মতে, এটি ইতিহাসের একটি নির্মম পরিহাস। নেপোলিয়ান সর্বপ্রথম জার্মান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক শক্তিসমূহের ব্যাপক রদবদল করেন। দ্বিশতাধিক রাজ্যের সংখ্যা হ্রাস করে নেপোলিয়ন মাত্র ঊনচল্লিশটি রাজ্য গঠন করেন। তবে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল, দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের ও জাতীয় চেতনার সঞ্চার করা। বিদেশী শাসকের অবদমনের হাত থেকে মুক্তি পেতে জনগণ জাতীয়তাবাদকেই আশ্রয় করেছিল।

জার্মানির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর মূল বৈশিষ্ট্য হল, সমাজে প্রজ্ঞাবান, শিক্ষিত ও রুচিশীল শ্রেণির প্রভাব যা জার্মানির উন্নতির সহায়ক হয়েছিল। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে এই মননশীল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী অনুপ্রেরণা জোগায়। তৎকালীন জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক প্রতিফলন ঘটানোর কাজে জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ফেডারেল আইনসভা (Diet) Carlsbad ডিক্রি জারি করে। এই আইনবলে সকল সরকারকে কমিশনার

নিযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়, যাদের কর্তব্য হল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধান এবং সেই সঙ্গো সবরকম প্রকাশনার ক্ষেত্রে কঠোর বিধিনিষেধ (Censorship) বলবৎ করা। Mainz রাজ্যে একটি কেন্দ্রীয় কমিশনও গঠন করা হয়। এর কাজ ছিল গোপন সমিতিগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ও বিচারবিষয়ক ট্রাইবুনালগুলির জন্য তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর এবং জাতীয়তাবাদের চরম পরিপন্থী মেটারনিক জার্মানদের জাতীয়তাবোধ ও উদারনৈতিক চেতনাকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে তাঁর ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করেন।

৩.২ ❑ ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্ট ও জার্মানির ঐক্য প্রচেষ্টা

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম জার্মানিকে জাতীয়তাবাদী ও উদারনৈতিক করার লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই বছরই ফ্রান্সে সংঘটিত হয় ফরাসি বিপ্লব। ফ্রান্সের প্রভাবে অস্ট্রিয় জাতি উদ্বুদ্ধ হয় ; ১৮৪৮-এর মার্চে বিপ্লবের ঝড় তোলপাড় করে তোলে ভিয়েনাকে। জার্মানি সমসাময়িক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি শক্তিশালী ফেডারেশন গঠন এবং প্রগতিশীল সরকার গঠনের বাসনায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। দেশের সর্বত্র দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা, সংবাদ-মাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতা, জুরীগণ কর্তৃক বিচারকার্য পরিচালনা এবং ধর্মীয় সহাবস্থানের ডাক দেওয়া হয়। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৮৪৮ সালের ফরাসি বিপ্লব জার্মানির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমগোত্রীয় ছিল না। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতাকামী প্রতিনিধিবৃন্দের একটি সভায় জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়। এই দাবি অনুযায়ী ঐ সালের ৩১ মার্চ ফ্রাঙ্কফুর্টে একটি স্ব-নিযুক্ত সংসদ প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংসদের প্রথম কাজ ছিল একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা। কিন্তু বৈপ্লবিক কাঠামোয় তৈরী ফ্রাঙ্কফুর্ট সংসদ অচিরেই বাতিল হয়ে যায়। এর পর প্রাশিয়ার ফ্রেডরিক উইলিয়ম প্রাশিয়ার রাজতান্ত্রিক রাজ্যসমূহ, হ্যানোভার, স্যাক্সনি, ওরটেনবার্গ, বাভেরিয়া এবং জার্মানির কিছু ক্ষুদ্র রাজ্যকে নিয়ে একত্রিতভাবে সংযুক্তিকরণের পরিকল্পনা করেন। এরফুর্ট (Erfurt) -এ একটি জার্মান সংসদ আহূত হয়। অস্ট্রিয়া এতে আপত্তি জানায়। ফলত এই রাজ্য ঐক্যজোট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়া লড়াই করার উদ্যম সঞ্চয় করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে অলমুজে অস্ট্রিয়ার নির্দেশিত অপমানকর শর্তগুলি প্রাশিয়া মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই বছরের শেষে অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বে পুরানো মৈত্রীজোট পুনর্গঠিত হয়। কিন্তু জার্মানী পূর্ববৎ পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখে। এই সময় জার্মানির জাতীয়তাবাদের উত্থানে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল দৃঢ় মনোবল ও প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের, যা বিসমার্কের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।

প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ম এবং বিসমার্কের রাজনৈতিক সমঝোতা ইউরোপের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই দ্বৈতমিলন জার্মানির ঐক্যস্থাপনে সাহায্য করেছিল।

৩.৩ ❑ বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানির ঐক্য আন্দোলন

প্রথম উইলিয়ম ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজা হন। প্রাশিয়ার সাহায্যে জার্মানির ঐক্য সম্ভব-এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। অটো ভন বিসমার্ক-এর জন্ম ব্র্যান্ডেনবার্গের অল্টমার্ক নামক অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত

এক জমিদার পরিবারে। ১৮৪৭ সালে তিনি প্রাশিয়ার ডায়েটের সদস্য হন। একটি শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ সময় জুড়ে বিসমার্ক জার্মানির ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে কাজ করেছেন। জার্মানি ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিসমার্কের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, একাগ্রতা, অমিত উদ্দীপনা ও নিরলস প্রচেষ্টায়। ই. লিপ্‌সন্ বলেছেন, বিসমার্ক জার্মান রাজনৈতিক ধারার প্রচলিত দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। সেই বাসনায় অস্ট্রিয়াকে মৈত্রীজোট থেকে বিতাড়িত করতে বিসমার্ক কোনো শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়া না করে যুদ্ধের পথ বেছে নিতে উদ্যোগী হন। একটি শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করে জার্মানির মৈত্রীজোট ভেঙে দিয়ে তিনি প্রাশিয়া-নিয়ন্ত্রিত উত্তর-জার্মান জোট গঠন করেন। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিসমার্কের যুদ্ধের কারণ শ্লেস্‌উইগ্-হলস্টেন সমস্যা। এই দুটি ডাচিস্ রাজ্য ডেনমার্কের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। আলোচ্য রাজ্যদ্বয় ডেনমার্কের শীর্ষে থাকলেও প্রায় চার শতক ধরে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় এবং আশ্চর্যজনকভাবে 'Eider Danes' নামে পরিচিত ডেনমার্কের জাতীয় দলের আগ্রাসী প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে সফল হয়। রাজতন্ত্রের যে ধারা পুরুষানুক্রমিক প্রচলিত ছিল কার্যত তা মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে, স্যালিক বিধি অনুসারে, কোনো নারী রাজসিংহাসনে বসার অধিকার লাভের যোগ্য বিবেচিত হত না। এই ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ডাচির একচ্ছত্র আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে ডেনমার্ক ও ডাচি রাজ্যের পারস্পরিক সংযুক্তি অচিরেই ভেঙে পড়ত। জার্মান ফেডারেশনের সদস্য হিসাবে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে হলস্টেন ডেনমার্কের বিরুদ্ধে জার্মান জনগণের সাহায্য প্রার্থনা করে আর্জি জানায়। এর ফলস্বরূপ, হলস্টেন ও শ্লেস্‌উইগ্ জাতীয় উদ্দীপনার বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হয়, যার ঢেউ লাগে জার্মানিতে। জার্মান জাতির সঙ্গে এই দুই রাজ্যেরও ভাগ্য একই চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু সমস্যা, শুধু জার্মান নয়, এতে ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যও ছিল। কারণ, ডেনমার্ককে প্রতিহত করে বাল্টিক সাগরে জার্মানির নৌ-শক্তি প্রতিষ্ঠা করার অভিসন্ধি প্রবল বিরোধীরা ভাল চোখে দেখেনি। প্রাশিয়া অবিলম্বে ডাচির পক্ষ অবলম্বন করে ১৮৫২ সালে একটি চুক্তিভিত্তিক মীমাংসা করে, যা 'লন্ডন প্রোটোকল' নামে পরিচিত। এই পদক্ষেপে ড্যানিশ রাজতন্ত্রের বিশ্বস্ততা স্বীকৃত হলেও ডাচিস্‌দের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু এই প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়নি, উপরন্তু ডেনমার্ক এবং জার্মান কনফেডারেশনের সম্পর্ক এতে আরও তিক্ত হয়ে ওঠে। শ্লেস্‌উইগ-হলস্টেন রাজ্যে বলপূর্বক সংবিধান আরোপ করতে অগ্রণী হয় পোল্যান্ড। ঘটনাচক্রে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ড্যানিশ জাতীয় দল অনুধাবন করেছিল যে, ইউরোপীয় শক্তিসমূহ এই ঘটনায় যথেষ্ট চিন্তিত, কারণ সংবিধান কার্যকরী হলে Schleswig সম্পূর্ণভাবে তার স্বাধীনতা হারাবে, লন্ডন প্রোটোকলেরও কোনো মূল্য থাকবে না। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন বিসমার্ক। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাপ্রবাহ থেকে প্রাশিয়া শিক্ষা লাভ করেছিল যে, ইউরোপীয় হস্তক্ষেপের মোকাবিলার জন্য একটি মৈত্রীজোট বিশেষ প্রয়োজন। বিসমার্ক সেই উদ্দেশ্যে ডাচিরাজ্যের সপক্ষে একটি যৌথ সাহায্যের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য অস্ট্রিয়ার প্রতি আবেদন জানান। সেই মুহূর্তে তৃতীয় নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতিতে অস্ট্রিয়া এতটাই ভীত ও চিন্তাগ্রস্ত ছিল যে প্রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে কোনো দ্বিধা করে নি। 'প্রোটোকল' উপেক্ষা করার ন্যায্য অধিকার ডেনমার্কের ছিল, সুতরাং ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া প্রতিবাদের কোনো বৈধ ভিত্তি না পেয়ে পশ্চাদসরণে বাধ্য হয়। ১৮৬৪ খিস্টাব্দে একটি যুদ্ধে ডেনমার্ক পরাস্ত হয়, ডাচিরাজ্যও বঞ্চিত হয়। সর্বপ্রথমে দুটি রাজশক্তি যৌথভাবে তাদের শাসন করত, পরবর্তীকালে ১৮৬৫ সালে Gastein সম্মেলনে

তা পুনর্বিবেচিত হয়। বিসমার্ক বুঝেছিলেন, প্রাশিয়া যদি ডাচি রাজ্য দখল করতে চায়, অস্ট্রিয়া তাতে কোনদিনই সম্মতি দেবে না, তাই যুদ্ধের প্রস্তুতি ছাড়া গত্যন্তর নেই। অস্ট্রিয়াও এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল বাধ্য হয়ে। ১৮৬৬ খিস্টাব্দের জুলাই মাসে সাদোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার সৈন্যদল অসম সাহসিকতার পরিচয় দেয়। অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার কাছে পরাজিত হয়। এই যুগান্তকারী বিজয় জার্মানির রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে এক লহমায় আমূল পাল্টে দেয়। নতুন জমানায় বিসমার্ক আধুনিক জার্মান সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হিসাবে প্রাশিয়াকে ক্ষমতার চরমশীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তবে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্য গঠনের প্রথম সোপান। দ্বিতীয় পর্যায় হল প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের যুদ্ধ। সুচতুর প্রাশিয় চ্যান্সেলর বিসমার্ক বুঝেছিলেন সংযুক্ত জার্মানি গঠনের পথে ফ্রান্স ও জার্মানির যুদ্ধ অনিবার্য। ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধের কথাও তিনি ঘোষণা করেন।

যুদ্ধের কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে অন্তর্নিহিত কারণ ও অব্যবহিত পূর্বের তাৎক্ষণিক ঘটনাসমূহকে অনুধাবন করা বিশেষ জরুরি। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে জেনার যুদ্ধে প্রথম নেপোলিয়নের হাতে প্রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকে ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাশিয়ার সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই ভাল ছিল না। ১৮৫৭ সালে বিসমার্ক প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের সুসম্পর্ক স্থাপনের সপক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। তিনি চ্যান্সেলের হবার পর সুদক্ষ কূটনীতিকের মত তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। ফরাসি সম্রাটকে জার্মানির প্রকৃত রাজনৈতিক অবস্থা না জানিয়ে সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীয় আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন, তবে অস্ট্রিয়াকে ফ্রান্সের শত্রু বিবেচনা করে অস্ট্রিয়ার হ্যাবস্‌বার্গ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার সঙ্গে একটি জোটগঠনে সম্মত হন। প্রথম নেপোলিয়নের মত তৃতীয় নেপোলিয়নও জার্মানিতে নিজের একটি ঘাঁটি গড়তে চেয়েছিলেন। প্রথম নেপোলিয়ন রাইন-এর কনফেডারেশন গঠন করেছিলেন জার্মানির কতকগুলি রাজ্য নিয়ে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করা, সেই সঙ্গে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়াকে প্রতিহত করা, অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়া যুদ্ধে ফরাসি সম্রাট সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু সাদোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার জয় তাঁর সব হিসাব বানচাল করে দেয়। প্রাশিয়ার চমকপ্রদ শক্তিবৃদ্ধি ও ঐক্য এবং জার্মান ঐক্যজোট থেকে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করার সাফল্যে আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মানহানি ও জাতীয় ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাববোধে ফ্রান্স আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই সকল কারণে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের পর ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানির প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্কই ছিল। ফ্রান্সের সব রাজনৈতিক দল প্রাশিয়ার শক্তিবাহুল্যে হিংসাত্মক মনোভাব পোষণ করে। তৃতীয় নেপোলিয়নের সমর্থকগণ তাঁর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে রাজবংশ নিরাপদ করার জন্য একটি সফল যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। সমগ্র ফরাসি জাতি একটি সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়।

প্রাশিয়ার চ্যান্সেলের এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। জার্মান সাম্রাজ্য গঠনের সুষ্ঠু পরিপূর্ণতার জন্য ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল দুটি প্রধান কারণে। প্রথমত, বিসমার্ক জানতেন প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করার সবরকম প্রয়াসকে ফ্রান্স যে-কোনো মূল্যে প্রতিহত করবে। দ্বিতীয়ত, উত্তর জার্মান মৈত্রীজোটে অন্তর্ভুক্ত হতে দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলির অনীহাকে দূর করা সম্ভবপর হবে তা বিসমার্ক জানতেন, যদি জার্মানীর আপামর জনগণের মধ্যে জাতীয় ভাবাবেগের নতুন জোয়ার আনা যায়। এখানেও ফ্রান্সের ৩য় নেপোলিয়ন বিসমার্কের হাতের পুতুল হয়ে যান। অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়া যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা

নেবার বিনিময়ে তিনি ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। একইভাবে রাইনের বামপার্শ্বস্থ অঞ্চলগুলি থেকেও ক্ষতিপূরণ দাবি করে দক্ষিণ জার্মানদের বিরাগভাজন হন। তারা বুঝতে পারে, ফ্রান্স জার্মানদের স্বাধীনতার পরিপন্থী, প্রাশিয়ার নয়। অপরদিকে, বিসমার্ক ৩য় নেপোলিয়নের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে জার্মানির স্বার্থরক্ষার প্রকৃত কাণ্ডারী হিসাবে প্রতিপন্ন করেন। এরপর দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় প্রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে দ্বিধা করেনি।

ফ্রান্স-প্রাশিয়া যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হল স্পেনের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ। স্পেনীয় রাজনীতিতে যে অস্থিরতা দেখা দেয় তার মূলে ছিলেন এই রাজ্যের রানী ইসাবেলা। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে এক বিদ্রোহে সার্বভৌম রানী ইসাবেলা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে ১৮৬৯-এর সেপ্টেম্বরে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ১৮৭০ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়নি। এই শূন্য সিংহাসনে বসার জন্য Hohenzollern পরিবারের প্রধান প্রাশিয়ার রাজার আত্মীয় লিওপোল্ড নামক যুবরাজকে আহ্বান জানানো হয়। আশা করা হয়, স্পেনের সিংহাসনে লিওপোল্ডের আরোহণ প্রাশিয়ার পক্ষে সম্মানজনক ও লাভজনক হবে। প্রাশিয়ার জনগণ যুবরাজকে স্বাগত জানিয়েছিল। অপরপক্ষে, প্রাশিয়া ও স্পেনের আঁতাত ফ্রান্সের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। সঙ্গত কারণেই ফ্রান্স তাই প্রবল আপত্তি জানায়। ৬ই জুলাই ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী ঘোষণা করেন Hohenzollern বংশীয় যুবরাজকে যদি স্পেনের সিংহাসন থেকে সরানো না হয় তবে ফ্রান্স এই ঘটনাকে যুদ্ধের কারণ হিসেবে বিবেচনা করবে। জার্মানির পক্ষেও এই ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। জার্মানিতে কার্যরত ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে ফ্রান্স প্রাশিয়ার রাজার সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেয়। শেষোক্ত রাজাও তখন স্পেনীয় সিংহাসনে রাজপরিবারভুক্ত অন্য কোনো সদস্য যাতে বসতে না পারেন তাঁর চেষ্টা করছিলেন। ৯ই জুলাই ফরাসি রাষ্ট্রদূত Benedetti-র সঙ্গে প্রাশিয়ার রাজার এ ব্যাপারে চার দফায় আলাপ-আলোচনা হয়। ১২ই জুলাই কূটনৈতিক চাপে লিওপোল্ড স্পেনের সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই ঘটনায় ফ্রান্স পুলকিত হয়ে প্রাশিয়ার কাছে দাবি জানাল রাজসিংহাসনে ঐ বিতর্কিত প্রতিনিধিকে পুনর্বহাল করা হবে না—এমন অঙ্গীকার করতে। Benedetti-র উপর ভার দেওয়া হল প্রাশিয়ার রাজার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করার। তিনি প্রাশিয়ারাজ প্রথম উইলিয়মের কাছে এই বক্তব্য পেশ করলে রাজা ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করলেও, ফরাসি সরকার-প্রেরিত প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। লিওপোল্ডের সিংহাসন ত্যাগের সংবাদ সরকারিভাবে জানার পর প্রথম উইলিয়ম বেনেদিত্তির কাছে দূত মারফৎ জানান, স্পেনীয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অধ্যায় পরিসমাপ্ত, এ নিয়ে আর কোনো আলোচনার অবকাশ নেই।

প্রথম উইলিয়ম টেলিগ্রামের সাহায্যে বার্লিনে বিসমার্ককে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সবিস্তারে জানান। যুদ্ধপ্রিয় বিসমার্ক দেখলেন, সংগ্রামের দিন সমাগত। তিনি আরও কূটকৌশলী বুদ্ধি প্রয়োগ করে বুঝলেন, যদি প্রেরিত টেলিগ্রাফটির একটু-আধটু সম্পাদনা করা যায়, তবে সমগ্র বিশ্বে এই সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ও ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করা যেতে পারে। নর্থ জার্মান গেজেটে সেইরকম ভাবেই উক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয় যার মর্মার্থ হল, ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে প্রাশিয়ার রাজা অপমান করেছেন এবং ফরাসি সরকারের ন্যায্য চাহিদাগুলি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। ফ্রান্স ও প্রাশিয়া উভয় দেশের মধ্যেই এই ঘটনার বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, যা বিসমার্কের অভিপ্রেত ছিল। ডেভিড থমসনের মতে, আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম পূর্বে কখনই এমন নাটকীয় ভূমিকা গ্রহণ করেনি। সম্মান পুনরুদ্ধারের তাগিদে ভাগ্যবিড়ম্বিত ফ্রান্স যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। পক্ষান্তরে, জার্মানি, ফ্রান্সের অন্যায় দাবিগুলি অমান্য

করায় রাজার প্রতি দেশবাসীর আনুগত্য আরও বৃদ্ধি পায়।

১৯ জুলাই প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধ শুরু হলে বাভেরিয়া, বাডেন, উরটেমবার্গ প্রভৃতি দক্ষিণ জার্মানির রাজ্যগুলি উত্তর জার্মান মৈত্রীজোটে যোগ দেয়। তারা উভয়ের শত্রু ফ্রান্সকে প্রতিহত করতে এই যুদ্ধে প্রাশিয়ার পক্ষ নেয়। সেডানের যুদ্ধ নামে পরিচিত ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার এই এই যুদ্ধে দুর্বল ফরাসি সৈন্যদল, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, দক্ষ ও সুসংবদ্ধ জার্মান বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়ে কারাগারে বন্দি হন। ১লা সেপ্টেম্বর সেডানের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। দীর্ঘ চারমাস অবরুদ্ধ থাকার পর ১৮৭১-এর ২৮ জানুয়ারী প্যারিসের পতন হয়।

৩.৪ ❑ বিসমার্কের কৃতিত্ব

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের জার্মানির এই অভূতপূর্ব সাফল্য ইতিহাসবিদগণের লেখনীতে নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। দ্বিতীয় জার্মান সাম্রাজ্য গঠনের পিছনে যে দীর্ঘায়িত ঘটনাবলী ইউরোপের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে তাকে বিসমার্কের ১৮৬২-তে উত্থানের পর তাঁর অলৌকিক ইচ্ছাশক্তির ফসল হিসাবে ধরা উচিত কিনা, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকমহলে মতানৈক্য আছে। সাম্প্রতিককালে বিসমার্কের জীবনীকারগণ কিন্তু তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এক ঋষিতুল্য ব্যক্তিত্বরূপে চিত্রিত করতে রাজী নন। কারণ ; বিশ্ববিশ্রুত কোনো রাষ্ট্রনায়ক দীর্ঘ দশ বছর আগে প্রস্তুত একটি পরিকল্পনা সফলভাবে বিশ্বরাজনীতিতে প্রয়োগ করতে পেরেছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল। জীবনীকারদের মতে, বিসমার্ক একজন বুদ্ধিদীপ্ত সুবিধাবাদী যাঁর কার্যকলাপ পূর্বানুমান-সাপেক্ষ নয় এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রহস্যময় ছিল।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাশিয়ার জাতীয়তাবাদের প্রথম সফল পথপ্রদর্শক ছিলেন বিসমার্ক। প্রাশিয়ার স্বার্থরক্ষায় বিশ্বাসী বিসমার্ক চেয়েছিলেন সমগ্র উত্তর জার্মানিতে প্রাশিয়ার আধিপত্য এবং জার্মানিকে সকল বিষয়ে অস্ট্রিয়ার প্রভাবমুক্ত করতে। তাঁর কূটনৈতিক নীতি পরিচালিত হত প্রাশিয়ার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে। ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, এমনকি ফ্রান্সের সঙ্গেও তিনি এই নীতি গ্রহণ করেন। জার্মানির ঐক্যসাধনে বিসমার্কের অবদানকেও প্রাশিয়ার স্বার্থরক্ষার প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ হিসাবেই ধরা যেতে পারে।

৩.৫ ❑ অনুশীলনী

১. জার্মানির ঐক্য প্রচেষ্টায় ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের ভূমিকা আলোচনা করো।
২. বিসমার্ক কিভাবে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন ?
৩. জার্মানির ঐক্যপ্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে বিসমার্কের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করো।

৩.৬ ❑ গ্রন্থাবলী

১. Thomson David : Europe Since Napoleon.
২. Otto Pflanze : Bismarck and the Development of Germany-
The period of Unification 1815-1871.
৩. Eyck Erich : Bismarck and the German Empire.

একক ৪ ❑ জাতীয়তাবাদের উত্থানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের অবক্ষয়

গঠন

৪.০ প্রস্তাবনা
৪.১ গ্রীস
৪.২ রুমানিয়া
৪.৩ বুলগেরিয়া
৪.৪ সার্বিয়া
৪.৫ অনুশীলনী
৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ ❑ প্রস্তাবনা

ইউরোপের অটোমান সাম্রাজ্য হল একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ যেখানে আমরা জাতীয়তাবাদের জাগরণের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যের ভাঙনকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে এশীয় জাতিভুক্ত ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী অটোমান তুর্কিগণ ইউরোপ আক্রমণ করেছিল এবং একশত বছর পর পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্স্ট্যান্টিনোপল্ অধিকার করতে সক্ষম হয়। কন্স্ট্যান্টিনোপল্ থেকে বিজয় যাত্রা শুরু করে একে একে সার্ব, আলবেনিয়ান, রুমানিয়, গ্রীক এবং বলকান পেনিনসুলার বুলগেরিয়া রাজ্য অটোমান সাম্রাজ্যভুক্ত করতে তারা সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়া সহ মিশর, ত্রিপোলি, টিউনিস, ভূমধ্যসাগরের সাইপ্রাস ও ক্রীট দ্বীপপুঞ্জ, পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহ, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি শক্তি ভিয়েনা দখল করলেও পোল্যান্ডের কাছে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ে পশ্চিম ইউরোপে তুর্কি সাম্রাজ্যের বিস্তার অবশ্যই প্রতিহত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে তুর্কি সাম্রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয়, কারণ, সুদূর কনস্ট্যান্টিনোপল্ থেকে এই বিশাল রাজত্ব সুদক্ষভাবে পরিচালনা করা দুষ্কর ছিল। ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দেখা দেয়, যা দূর করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই ডামাডোলের সুযোগে দুর্বল তুর্কি শাসনকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ থেকে বিতাড়িত করার জন্য বলকানের জনগণ তৎপর হয়।

৪.১ ❑ গ্রীস

অটোমান সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে এসে গ্রীকরা সর্বপ্রথম একটি স্বাধীন রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তুর্কির সুলতান অবশ্য অন্যান্য সকল অধীনস্থ জাতির মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গ্রীকদের অনেক বেশী সম্মান ও গুরুত্ব দিতেন। গ্রীকদের প্রাচীন চার্চ (গীর্জা)-এর প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় বা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের আচার-আচরণে তুর্কি শাসন কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করেনি। গ্রীক সমাজ নিজস্ব শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির প্রচুর সুযোগ তাদের দেওয়া

হয়, এমনকি, তুর্কি সরকারের বিদেশ মন্ত্রকে গ্রীকদের প্রশাসনিক স্তরে উচ্চপদে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও গ্রীসে শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন সূচনা হয়। ই. লিপ্‌সনের মতে, তুর্কি শাসনে গ্রীকদের প্রতি অতিরিক্ত তোষণের মনোভাব এবং সহনশীলতার ফলস্বরূপ গ্রীসে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয় যা এ রাজ্যে তুর্কি আধিপত্য বিলুপ্ত করে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রীসে ভাষাগত ও সাহিত্যগত উৎকর্ষতার পুনরুত্থান, জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করার অনুকূল হয়ে ওঠে। ফরাসি আদর্শের প্রভাবে গ্রীকদের রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত হয়। জাতীয় আদর্শের বাণী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেবার জন্য এবং তুর্কী শক্তির কবল থেকে গ্রীক সাম্রাজ্যকে পুনরুদ্ধার করার জন্য 'Philike Hetairia' বা বান্ধব সমিতি (Socity of Friends) সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এর সদস্য সংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজারের ওপর। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর প্রথম নিকোলাস সিংহাসনে বসেন। তিনি খ্রিস্টানদের রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইংলন্ডের জনমতও গ্রীকদের পক্ষে ছিল। ইংলন্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স মিলিতভাবে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে গ্রীসের স্বাধীনতার দাবি জানানো হয়। কিন্তু তুর্কি সুলতান এই চুক্তি নাকচ করে দেন। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, ব্রিটিশ, রুশ ও ফরাসি নৌশক্তি সমুদ্রে গ্রীক ও তুর্কি নৌবহর অবরোধ করে।

তুর্কি রাজ্য Adrianople (অ্যাড্রিয়ানোপল)-এর চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তির দ্বারা মলডেভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া নামক অঞ্চল দুটি রাশিয়ার অভিভাবকত্বে তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনে করদ রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কি সম্রাটকে বাৎসরিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দেবার শর্তে গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করবার যোগ্য বিবেচিত হয়। অপরাপর বৃহৎ শক্তিগুলি অবশ্য এই করপ্রদানের ব্যবস্থায় যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে পড়ে, পাছে রাশিয়া আবার বলকান সমস্যায় হস্তক্ষেপ করে। ১৮৩২ সালে বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলিকে নিয়ে লন্ডনে যে সমাবেশ হয় তাতে গ্রীসের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার দাবি ওঠে। তুর্কি সুলতান এই দাবি মেনে নেন। বাভেরিয়ার রাজপুত্র অটোর অধীনে গ্রীস একটি স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। অটোমান সাম্রাজ্যের অখণ্ডতায় এই প্রথম ভাঙন ধরল। যাইহোক, গ্রীসের স্বাধীনতা অর্জনে বলকান-রাজ্যসমূহের উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়।

৪.২ ❑ রুমানিয়া

বলকান পেনিনসুলায় বসবাসকারী সর্ববৃহৎ জাতিগোষ্ঠী ছিল রুমানিয়ার অধিবাসীরা। অটোমান তুর্কি রাজত্বে তাদের অধিকাংশই মল্‌ডেভিয়া ও ওয়ালাচিয়া এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ হলেও রুমানিয়ারা পূর্ববৎ তাদের আপন শাসনরীতি দ্বারা পরিচালিত হত। অষ্টাদশ শতকে রাশিয়া যখন তুর্কির বিরুদ্ধে দক্ষিণে অগ্রসর হতে থাকে, ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতিকূলতা হেতু উক্ত অঞ্চল দুটি রাশিয়া ও তুর্কির মধ্যে একটি শাট্‌ল্ ককের ভূমিকা নেয়। রাশিয়া তুর্কির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে তার প্রথম পদক্ষেপই ছিল মল্‌ডেভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল করা। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'Kutchuk Kaivardzi'-র চুক্তি দ্বারা রাশিয়া এই দুই অঞ্চলে প্রবেশাধিকার লাভ করে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে মল্‌ডেভিয়ার পূর্বাংশ Bessarabia রাশিয়ার দখলে আসে। অ্যাড্রিয়ানোপল (১৮২৯

খ্রিস্টাব্দ)-এর চুক্তির ভিত্তিতে মল্‌ডেভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাশিয়ার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, এটি সংযুক্তিরই নামান্তর মাত্র। রুমানিয়ায় রুশ আধিপত্যে অস্ট্রিয়া চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে, কারণ, রাশিয়া আলোচ্য অঞ্চল দুটি অধিকার করলে অচিরেই ইউরোপের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নদী দানিয়ুব-এর নৌশক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করবে এমন আশঙ্কা অস্ট্রিয়ার ছিল। অবশ্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬ খৃ.) রাশিয়ার পরাজয়ে মিত্রশক্তি মল্‌ডেভিয়া ও ওয়ালাচিয়াকে তুর্কি সাম্রাজ্যের অধীনস্থ স্বয়ংশাসিত রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে, রাশিয়া বেসসারাবিয়া থেকেও পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

রুমানিয়ার ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায় হল দুইটি অঞ্চলের একত্র সংযুক্তিকরণ। জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সদর্পে এগিয়ে চলল ; বিশেষতঃ, ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সমর্থন পাবার পর। প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬ খৃ.) চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়। এছাড়াও, প্রতিটি অঞ্চলে একটি নির্বাচক সভা গঠন করার প্রস্তাব এই চুক্তি দ্বারা গ্রহণ করা হয়। এই সভার কর্তব্য ছিল, সংযুক্তির প্রশ্নে স্থানীয় জনগণের মতামত ইউরোপীয় কমিশনের নিকট পেশ করা, তুর্কি এবং অস্ট্রিয়া রাজ্য অবশ্য ভোটদাতাদের প্রভাবিত করার জন্য কোনো অসৎপন্থা নেয়নি। তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বাধীন মতপ্রকাশের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সাংবিধানিক সভা (Constituent Assembly) সংযুক্ত রাষ্ট্রের পক্ষে মত দিলেও ব্রিটেন ও অস্ট্রিয়ার বিরোধিতায় এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়নি। ব্রিটেন, তুর্কির শত্রু রাশিয়ার ভয়ে তুর্কিরাজ্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। অপরদিকে অস্ট্রিয়ার ভয় ছিল, ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী রুমানীয় রাজ্যকে, কারণ স্বাধীনতাকামী ট্রান্‌সিলভানিয়া-র অস্ট্রিয় শাসনাধীন রুমানীয় প্রজাগণকে এই জাতীয় ঐক্য অনুপ্রাণিত করবে, যা সাম্রাজ্যের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়, প্রতিটি অঞ্চল (Principality) তাদের নিজস্ব রাজ্যের জন্য যুবরাজ এবং আইনসভা নির্বাচিত করবে। রুমানিয়রা সুচতুরভাবে মল্‌ডেভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার জন্য একজন যুবরাজকেই মনোনীত করে। ইতালির সঙ্গে যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অস্ট্রিয়া এ ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করতে পারেনি, এ রাজ্য দুটি একজন শাসকের অধীনে সংযুক্ত হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি অবশ্য দুটি আইনসভার সংযুক্তির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে। একটি ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে যুবরাজ সমগ্র বিশ্বে রুমানিয়ার জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। রুশ-তুর্কি যুদ্ধে (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে) রুমানিয়া রাশিয়ার সপক্ষে ছিল, উর্বর বেসসারাবিয়া রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে রুমানিয়া বাধ্য হয়। রুশদেশের এই অকৃতজ্ঞ আচরণ রুমানিয়দের হতবাক্ করে দেয়। যাইহোক, রুমানিয়ার স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে বার্লিনের চুক্তির (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নতুন স্বাধীন রুমানিয়া ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে একটি রাজ্যের মর্যাদা পায়।

ই. লিপ্‌সনের মতে, বার্লিন কংগ্রেস রুমানিয়ার ধর্মীয় অক্ষমতা দূর করে সুসভ্য মানবসমাজ গড়ার ক্ষেত্রে আবশ্যিক ধর্মীয় সাম্য ও সহাবস্থান সম্ভব করতে সমর্থ হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করার অপরাধে ইহুদী জনগণকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। জমির মালিকানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত হয়।

৪.৩ ❑ বুলগেরিয়া

প্রায় পাঁচ শতক ধরে বুলগেরিয়া অটোমান সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে শাসিত হত। তুর্কিদের সঙ্গে বুলগেরিয়দের সম্পর্কও বিদ্বেষমূলক ছিল না। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে, তুর্কি সুলতানের কাছ থেকে বুলগেরিয় জনগণ একটি স্বাধীন ও জাতীয় চার্চ অনুদান হিসাবে পায়। এই চার্চ তাদের গ্রীক যাজক-ব্যবস্থার অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছিল, দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার মহান উদ্দেশ্যে বুখারেস্টে যে বৈপ্লবিক কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয় তা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। যাইহোক, ১৮৭৫ সালের একটি ঘটনা বল্‌কান পেনিনসুলার সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। হার্জেগোভিনায় একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে সমগ্র পেনিনসুলায় বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। বুলগেরিয়া উদাসীন থাকলেও এই সার্বজনীন, সর্বাত্মক আন্দোলনের প্রভাব থেকে নিজেকে পৃথক রাখতে পারেনি। তাতার-বাজারড্‌জিগ্‌ অঞ্চলেও অসন্তোষ শুরু হয়। বুলগেরিয় জনগণের অপ্রত্যাশিত উত্থানে তুর্কি শাসন বেসামাল হয়ে পড়ে। তারা সর্বশক্তি নিয়ে বুলগেরিয়া আক্রমণ করে। বাটক নামক স্থানে স্ত্রী-পুরুষ-বয়স্ক অর্থাৎ আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে মোট সাত হাজার অধিবাসীর মধ্যে হাজার পাঁচেক মানুষ নির্মমভাবে তুর্কি সেনার হাতে নিহত হন। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডকে সভ্য জগৎ বুলগেরিয় জনগণেরই চরম দুরাচারের ফল হিসাবে বর্ণনা করে। এর প্রত্যুত্তরে শুরু হয় রুশ-তুর্কি যুদ্ধ। তুর্কি শাসনাধীন স্লাভদের পরিত্রাতার ভূমিকায় রাশিয়া অবতীর্ণ হয়। অবশ্য স্যান-স্টিফানোর সন্ধি-চুক্তি দ্বারা এই যুদ্ধ মাঝপথে থেমে গিয়েছিল। এই চুক্তি বুলগেরিয়ার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হয়। সেই মুহূর্তে বুলগেরিয়া বীরত্বপূর্ণ পরম্পরার ধারক ও বাহক হিসাবে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। বুলগেরিয়া একটি করদ রাজ্যের মর্যাদা পায় যার পরিব্যাপ্তি ছিল দানিয়ুব থেকে এজিয়ান সমুদ্র এবং কৃষ্ণসাগর থেকে আলবেনিয়া পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ বুলগেরিয়া ও সেইসঙ্গে ম্যাসিডনিয়ার সিংহভাগ জুড়ে। বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলি বিভিন্ন কারণে এই ব্যবস্থায় আপত্তি জানায়।

ব্রিটেন আশঙ্কা করেছিল যে, বুলগেরিয়ার এই সুবিশাল আয়তনের প্রস্তাব রাশিয়ার দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত কনস্ট্যান্টিনোপল্‌ অধিকার করার পথ প্রশস্ত করবে। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া স্যান-স্টিফানোর চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়। বলকান পেনিনসুলার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ইউরোপের শক্তিধর দেশগুলি বার্লিন কংগ্রেসে মিলিত হয়। এই কংগ্রেসে গৃহীত চুক্তির দ্বারা বৃহত্তর বুলগেরিয়ার স্বপ্ন কঠোরভাবে অবলুপ্ত হয় এবং বুলগেরিয়া তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে—বুলগেরিয়ার মূল ভূখণ্ডটি দানিয়ুব থেকে বল্‌কান্‌ এবং কৃষ্ণসাগর থেকে সার্বিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ম্যাসিডনিয়াকে স্বয়ংশাসিত করদ রাজ্য হিসাবে তুর্কির সুলতানের অধীনে রাখা হয় ; বলকানের দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলে পূর্ব রুমানিয়া স্বায়ত্বশাসন লাভ করে, তবে রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সুলতানের অধীনস্থ থাকলেও এই রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্বভার ন্যস্ত হয় গভর্নর-জেনারেলের হাতে। এই গভর্নর-জেনারেলকে সুলতান পাঁচ বছর মেয়াদে মনোনীত করতেন। এই বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব রুমানিয়া ও ম্যাসিডনিয়ার অধিবাসী স্বজাতির জনগণের থেকে বুলগেরিয়দের পৃথক করা। এই ব্যবস্থা বুলগেরিয়ার জাতীয়তাবাদের নৈতিক দাবীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিল।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব রুমানিয়ার রাজধানী Phillippolis-এ এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের ফলস্বরূপ দুই বুলগেরিয়ার মিলন সংঘটিত হয়। তুর্কি প্রশাসক অবিলম্বে বহিষ্কৃত হন। যুবরাজ আলেকজান্ডার এই রাজ্যের শাসক নির্বাচিত হন। তুর্কি শাসন কোনো প্রতিরোধ করতে পারেনি। রাশিয়ার জার তাঁর অসম্মতি জানিয়ে রুশ রাজকর্মচারীদের বুলগেরিয়ায় ডেকে পাঠান। এই ঘটনা অবশ্য প্রজাদের মধ্যে যুবরাজ আলেকজান্ডারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছিল কিন্তু রুশপন্থীদের পীড়নমূলক ব্যবহারে মুক্তিকামীদের প্রতি দেশবাসী অচিরেই তাদের শ্রদ্ধা হারাতে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী বুলগেরিয়ার সমৃদ্ধি গ্রীস ও সার্বিয়ারও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তারা এই সংযুক্তিতে প্রবল আপত্তি জানায়। বুলগেরিয়া বিভাজনের জন্য যে শক্তিধর দেশগুলি ১৮৭৮ সালে অগ্রণী হয়, তাদের চাপে গ্রীস যুদ্ধ ঘোষণা থেকে বিরত থাকে। বৃহৎ শক্তিসমূহ বুঝতে পারে ঐক্যবদ্ধ বিশাল বুলগেরিয়ায় রাশিয়া প্রাধান্য স্থাপনে সক্ষম হবে। রাশিয়া যদি বুলগেরিয়দের স্বপক্ষে আনতে পারে তবে শেষোক্ত দেশ বলকান অঞ্চলে রুশ প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে রাশিয়ার ক্রীড়নক হয়ে কাজ করবে। ১৮৭৮-এই পরিষ্কার বোঝা যায়, তুর্কি আধিপত্যের পরিবর্তে রুশ আধিপত্য বুলগেরিয়ার অভিপ্রেত নয়। এই আচরণে বিবদমান দেশগুলি উপলব্ধি করতে পারে, বলকান অঞ্চলের রাজ্যগুলিকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে তোলাই হল রুশ শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখার একমাত্র পথ। সেক্ষেত্রে বুলগেরিয়া ও পূর্ব রুমানিয়ার একত্রীকরণ হলে বুলগেরিয়া অধিকতর ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে। এই পরিকল্পনা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ঐ দেশগুলি উক্ত দেশদুটির সংযুক্তিকে সমর্থন করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে গ্রীসের আক্রমণ প্রতিহত করার সফল প্রচেষ্টা করা হয়।

সীমানা সংক্রান্ত এবং শুল্ক বিষয়ক বিরোধে সার্বিয়ার সঙ্গে বুলগেরিয়ার সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনগণেরও সমর্থন ছিল। সার্বিয়ার রাজা তাঁর হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় নিজেকে সামিল করেছিলেন। অভিজ্ঞ রুশ রাজকর্মচারীদের প্রত্যাবর্তনে কিছুটা অসুবিধায় পড়লেও যুবরাজ আলেকজান্ডারের সামরিক দক্ষতা ও জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে বুলগেরিয়া সকল অন্তরায় পার করে সার্বিয়ার রাজধানী আক্রমণে প্রস্তুত হয়। বুখারেস্টের সন্ধি (১৮৮৬খৃ.) কোনো নতুন রাজ্যকে নিরাপত্তা দিতে না পারলেও, আলোচ্য সংযুক্তিকে সুদৃঢ় করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

8.8 ❑ সার্বিয়া

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে প্রায় সমগ্র বলকান পেনিনসুলা জুড়ে সার্বিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, তবে স্টিফেন দুসানের মৃত্যুর পর কোস্‌সোভোর যুদ্ধে তুর্কি শক্তি এই সাম্রাজ্যকে ছত্রাকার করে দেয়। এরপরও সত্তর বছর ধরে সার্বিয়া একটি পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে এই রাজ্য তুর্কি সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে স্থান পায়। ঊনবিংশ শতকের আগেও স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের উন্মাদনা সার্বিয় জনগণকে উদ্বেলিত করেছিল। কোস্‌সোভো যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে প্রচুর সংখ্যক সার্বিয় শরণার্থী দানিয়ুব পেরিয়ে এসে দক্ষিণ হাঙ্গেরীতে আশ্রয় নেয়। নতুন উপনিবেশে এসেও সার্বিয় জনগণ মাতৃভূমির প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমে অবিচল ছিল। বিশেষতঃ ফরাসি বিপ্লবের যুগে একাধিক

ঘটনায় সার্বিয়ার মুক্তির একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেয়। একসময় অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যৌথ প্রয়াসে সমগ্র বলকান পেনিনসুলা থেকে তুর্কি আধিপত্য নির্মূল হবার উপক্রম হয়। কিন্তু বলকান-ইতিহাসের এই সংকট মুহূর্তে সার্বিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের মৃত্যু হয়। ফলতঃ অস্ট্রিয় কূটনীতির ধারা প্রবাহিত হয় ভিন্ন পথে। আশাভঙ্গের বেদনায় সার্বিয়া মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

আধুনিক সার্বিয়া রাজ্যের রূপকার কারা জর্জ এক কৃষক পরিবারের সন্তান। সার্বিয়ায় বসবাসরত জেনিস্সারি (Janissaries)-দের অশুভ কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় নেন। অনতিকাল পর একটি বিশাল বাহিনীর নেতা হিসাবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। সৌভাগ্যক্রমে জেনিস্সারিরা তাদের উদ্ধত ব্যবহার এবং উইডিনের বিদ্রোহী পাশার সঙ্গে অশুভ আঁতাতের কারণে সুলতানের বিরাগভাজন ছিল। সুলতান জেনিস্সারিদের হাত থেকে বেলগ্রেড উদ্ধার করার জন্য বসনিয়ার পাশাকে সার্বদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবার আদেশ দেন। বসনিয়া ও সার্বিয়ার মিলিত শক্তি জেনিস্সারি ও উইডিনের পাশাকে পরাস্ত করে। সামরিক অত্যাচারের কবল থেকে সার্বিয়া মুক্তি পায়। এই জয়লাভ ও সামরিক সামর্থ্য সার্বিয়াকে তুর্কি শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতালাভে অনুপ্রেরণা জোগায়। তারা সার্বিয় দুর্গগুলি থেকে তুর্কী সৈন্য সরিয়ে নেবার দাবি জানায়। তুর্কি সুলতান অবশ্য তা অগ্রাহ্য করে সার্বিয়ার বিদ্রোহ দমনে তৎপর হন। সার্বদের বিরুদ্ধে বারবার সৈন্য প্রেরণ করা হলেও তা সফল হয়নি। অবশেষে ১৮০৬ সালে Mischar-এর যুদ্ধে সার্বিয়া তুর্কি সেনাবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিজয় লাভ করে। বাধ্য হয়ে সুলতান কতকগুলি উদার শর্তে রাজী হন ; যেমন—সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার, বেলগ্রেড ছাড়া অন্যান্য সব সার্বিয় দুর্গ থেকে সৈন্য অপসারণ প্রভৃতি। কোনো বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই সার্বিয়া এই মুক্তিসংগ্রাম সফল করেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, রাশিয়ার কালো ছায়া দূর হবার পর তুর্কি সাম্রাজ্য শান্তি স্থাপনে আগ্রহী হয়েছিল।

১৮১২ সালে নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযানের সুযোগ নিয়ে তুর্কিরা সার্বিয়া পুনর্দখল করে। এ ব্যাপারে রাশিয়া সার্ব জনগণকে রক্ষা করার কোনো চেষ্টা করেনি। কারা জর্জ অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ হন। অতঃপর সার্বিয়া মিলোশ অবরেনোভিচ্ নামে নতুন একজন কৃষক নেতার সন্ধান পায়, যাঁকে আধুনিক সার্বিয়ার দ্বিতীয় রূপকার বলা যেতে পারে। অবরেনোভিচের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় তুর্কি সুলতান রুশদেশকে স্ব-শাসনের অধিকার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। ১৮২৯-এর অ্যাড্রিয়ানোপলের চুক্তি প্রকৃতপক্ষে সার্বিয়াকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে, মিলোশ বংশানুক্রমিক যুবরাজের স্বীকৃতি পান।

দুর্ভাগ্যক্রমে সার্বিয়া তার স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য Karageorgevich এবং Obrenovich নামক দুটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি দায়বদ্ধ ছিল। এই দুটি পরিবারই শত্রু-শিবিরের সদস্য সংখ্যা হ্রাস করার নীতি গ্রহণ করে। আলোচ্য রাজপরিবার দুটির বংশ পরিবর্তনের রেওয়াজ এবং নিষ্ঠুর হত্যালীলার মধ্যে যুবরাজ মাইকেল-ই একমাত্র শাসক যিনি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে সার্বিয়ার সব দুর্গ থেকে তুর্কি সৈন্য প্রত্যাহার করার জন্য তুর্কি সুলতানকে বাধ্য করেছিলেন। ১৮৭৫-এ যুবরাজ মিলানের রাজত্বকালে সার্বিয় জাতির মহান অভ্যুত্থান হয়। এই আন্দোলন শুরু হয় জমিদার ও ভূস্বামীদের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক সম্প্রদায় অধ্যুষিত হার্জেগোভিনায় ; ক্রমে তা বসনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অবদমিত সার্বিয়

স্বজাতিকে সাহায্য করার সপক্ষে জনমত প্রবল হয়ে উঠলে সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রো তা মানতে বাধ্য হয়। সার্বিয়ার এই আন্দোলন সার্থক হয়। ধ্বংসের হাত থেকে সার্বিয়াকে রক্ষা করতে রাশিয়া পদক্ষেপ নেয়। স্যানস্টিফানোর সন্ধিচুক্তি অনুসারে সার্বিয়া দক্ষিণের বিশাল ভূখণ্ডের অধিকার পায়, অপরদিকে মন্টেনেগ্রো আয়তনে তিনগুণ এবং জনসংখ্যায় দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ঐক্যবদ্ধ সার্বিয়া রাজ্যের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়, সর্বোপরি, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, মন্টেনেগ্রো, স্লোভানিয়া, ডালমাশিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার সমন্বয়ে যুগোস্লোভিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

৪.৫ ❑ অনুশীলনী

১. ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উত্থান কিভাবে সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে কাজ করেছিল তা ব্যাখ্যা করো।

২. অটোমান সাম্রাজ্যর ভাঙনের মধ্য দিয়ে পূর্ব ইউরোপে কিভাবে জাতিস্বত্ত্বাগুলির বিকাশ ঘটেছিল ?

৪.৬ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১. Kedurie Elie : Nationalism.

২. Thompson David : Europe Since Nepoleon.

৩. E. Lipson : Europe in the 19th and 20th centuries.

৪. Ketelbey C.D.M. : A History of Modern Times.

– – – –

ইতিহাস—পঞ্চম পত্র

পর্যায়—৫

একক ১ ❑ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট

গঠন

১.০ বিষয়ের উপস্থাপনা
১.১ সশস্ত্র শান্তির যুগ
১.২ সাম্রাজ্যবাদের যুগ
১.৩ নয়া সাম্রাজ্যবাদের উন্মেষ : অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা
১.৪ ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের গতিপথ
১.৫ পরিণতি
১.৬ ইউরোপের অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদী সংঘাত
১.৭ চুক্তির রাজনীতি
১.৮ সামরিক প্রতিযোগিতা
১.৯ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আপাত প্রেক্ষাপট
১.১০ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতিমুখ
১.১১ বিভিন্ন ব্যাখ্যা : পর্যালোচনা
১.১২ জার্মানির দায়িত্ব
১.১৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি
১.১৪ যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়লাভের কারণ
১.১৫ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি
১.১৬ প্রশ্নাবলী
১.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ ❑ বিষয়ের উপস্থাপনা

পঞ্চম পত্রের পাঠক্রমের পঞ্চম পর্যায়-এর সময়কাল-এর ব্যাপ্তি তিন দশক (১৯১৪-১৯৪৫)। এই তিন দশকের ইউরোপের ইতিহাস ছিল বিয়োগান্তক নাটকের মত। যুদ্ধ ও শান্তি এই দুই বিপরীতধর্মী ঐতিহাসিক স্রোতধারায় ইউরোপের ইতিহাস পরিব্যাপ্ত ছিল। ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে যেমন বলা হয়ে থাকে তা ছিল হতাশা ও প্রত্যাশার যুগলবন্দী। সেই রকম ইউরোপের ইতিহাস যুদ্ধ ও শান্তির বৃত্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপে এক যুদ্ধজনিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক সঙ্কটের ঘাত প্রতিঘাতকে কেন্দ্র করে শেষ পর্যন্ত ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। স্থানীয় যুদ্ধ দিয়ে শুরু হয়ে মহাদেশীয়

যুদ্ধের পরিধি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের গতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। ইউরোপীয় সঙ্কট থেকে উদ্ভূত যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র ধারণ করে। এইভাবে ইউরোপের মহাদেশীয় রাজনীতি ও বিশ্বরাজনীতির পরিমণ্ডল একে অন্যের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ল। ইতিহাসের ভৌমিক খণ্ডীকরণ এখন থেকে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধক্লান্ত রক্তস্নাত ইউরোপের রাজনীতি শান্তি স্থাপনে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। শান্তি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হল—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শান্তি সংরক্ষণের কাঠামো নির্মাণ। ১৯১৯ সালের ভার্সাই শান্তিসম্মেলন-এর পরবর্তী দুই দশক ধরে দুটি ক্ষেত্রেই তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। যৌথ নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালনে জাতিসঙ্ঘ মনোনিবেশ করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি একদিকে যেমন শিথিল হয়ে পড়ল অন্যদিকে জাতিসঙ্ঘ যৌথ নিরাপত্তা রক্ষায় ক্রমশ বিফল হল।

ত্রিশের দশকে সঙ্কটের কালো মেঘ ইউরোপকে গ্রাস করে ফেলে। একদলীয় একনায়কতন্ত্রী আধিপত্যবাদী শাসন কায়েম হয় ইতালি ও জার্মানিতে। এর ফলে ইউরোপে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ইতালি ও জার্মানির সম্প্রসারণ নীতি যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর আঘাত হানে। শুধু ইউরোপে নয়, পূর্ব এশিয়ায় জাপানের সমরবাদী শাসকগোষ্ঠী সম্প্রসারণের চক্রব্যূহ তৈরি করে। বেপরোয়া সম্প্রসারণ নীতির দাপটে জাতিসঙ্ঘ যেমন অকেজো হয়ে উঠেছিল, পাশ্চাত্য দেশগুলি তোষণনীতির মাধ্যমে শান্তিরক্ষার ভ্রান্ত নীতির চোরাবালিতে প্রবেশ করল। যুদ্ধ বনাম শান্তি এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল যুদ্ধের স্বপক্ষে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ইউরোপ পুনরায় যুদ্ধের জালে আবদ্ধ হল।

ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোনো মহাজোট না হওয়ায় যেমন যুদ্ধের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল, অন্যদিকে জাপান ও জার্মানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উপর আক্রমণ চালিয়ে মহাজোট গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রতি আক্রমণে জার্মানি, জাপান ও ইতালির প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বসে পড়ল।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান গণতন্ত্র ও বিশ্বশান্তির ফলে বিজয় সূচনা করলেও আর এক নতুন সংঘাতের আত্মপ্রকাশ ঘটল। জার্মানি, ইতালি ও জাপানের পরাজয় এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ক্রমাবনতি এসবের ফলে যুদ্ধোত্তর বিশ্ব দুই মহাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে মতাদর্শগত সংঘাতের আবরণে ক্ষমতাকেন্দ্রিক সংঘাতের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। এভাবেই ঠান্ডা যুদ্ধের রাজনীতি যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়।

প্রথম পর্যায়ের অন্তর্গত পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর মূল প্রবাহ থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে এই সময়ের ইউরোপের ইতিহাস ছিল বৈপরীত্যের ইতিহাস। আশা-হতাশা, আলো-অন্ধকার, যুদ্ধ-শান্তি, গণতন্ত্র-একনায়কতন্ত্র এইসব বিপরীতধর্মী স্রোতের আবর্তে ইউরোপের ইতিহাস নিমজ্জিত হয়েছিল।

১.১ ❑ সশস্ত্র শান্তির যুগ

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত চার দশকের ইউরোপের ইতিহাস সশস্ত্র শান্তির যুগ নামে পরিচিত। এর কারণ হল ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত সেডানের যুদ্ধের পর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত ইউরোপে আপাত শান্তি বজায় ছিল। তবে শান্তির আড়ালে সংঘাতের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। এরই মূলে ইউরোপের ভেতরে জাতীয়তাবাদী সংঘাতের সঙ্গো ইউরোপের বাইরে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাবেশ ঘটেছিল।

১.২ ❑ সাম্রাজ্যবাদের যুগ

প্রাচীনকাল থেকে সাম্রাজ্যবাদ ইতিহাসের গতিপথের একটি প্রধান নির্ণায়ক উপাদান। প্রচলিত অর্থে সাম্রাজ্যবাদ বলতে বোঝায় পররাজ্য গ্রাসের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের ভৌমিক সম্প্রসারণ। উনিশ শতকের প্রথমে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এই চিরায়ত পদ্ধতি অনুসরণ করে ইউরোপ মহাদেশে ফ্রান্সের সার্বিক প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রে গুণগত পরিবর্তন ঘটে, শিল্প বিপ্লবের প্রসার ও ধনতন্ত্রের বিকাশ সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতায় অর্থনৈতিক মাত্রা সংযোজিত করে।

১.৩ ❑ নয়া সাম্রাজ্যবাদের উন্মেষ : অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকাল নয়া সাম্রাজ্যবাদের যুগ নামে পরিচিত। আলোচ্য সময়ে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রে গুণগত পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়া সাম্রাজ্যবাদের উন্মেষ আলোচনা প্রসঙ্গো ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জে.এ. হবসন ''Imperialism : A Study'' (১৯০২ খ্রিঃ) গ্রন্থে দেখিয়েছেন পুঁজিবাদের ব্যাপক বিকাশের ফলে অসম ধনবণ্টন দেখা দিয়েছে এবং পুঁজিবাদীদের হাতে প্রচুর মূলধন সঞ্চিত হয়েছে। এই অতিরিক্ত মূলধন লগ্নি করার জন্যই পাশ্চাত্য দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের পথ বেছে নেয়। সোভিয়েত বিপ্লবের রূপকার ভি.আই.লেনিন তাঁর ''Imperialism, the Highest Stage of Capitalism'' গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর রূপে চিহ্নিত করেছেন। লেনিনের ভাষ্য অনুসারে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাম্রাজ্যবাদের অনিবার্য পরিণতি। শিল্পোৎপাদনের চাহিদা পূরণের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের জন্য বাজারের সংস্থান আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে উপনিবেশ দখলের জন্য সংঘাত দেখা দেয়।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে অর্থনৈতিক নিমিত্তবাদের আরোপ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভৌগোলিক আবিষ্কারের সূত্র ধরেই ইউরোপের দেশগুলি বহির্বিশ্বে নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপনে উৎসাহী হয়। এছাড়া উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের সাফল্য তার অর্থনীতিকে মজবুত করে তুলেছিল।

বাস্তব পক্ষে উনিশ শতকের শেষ পর্বে ইউরোপীয় দেশগুলির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে

ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন মনে করেন অর্থনৈতিক কারণের গুরুত্ব থাকলেও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। তাঁর মতে ফ্রান্সে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি না ঘটলেও ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণে ধারাবাহিক উৎসাহ দেখিয়েছিল। ঐতিহাসিক গর্ডন. এ. ক্রেইগ-এর মতে অর্থনৈতিক উপাদানের তুলনায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের মূলে ইন্ধন জুগিয়েছিল। নৌ ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের তাগিদে ঔপনিবেশগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া লর্ড ক্লোমার, লর্ড মিলনার প্রমুখের ব্যক্তিগত প্রয়াস এবং ডেভিড লিভিংস্টোন, স্ট্যানলি প্রমুখ মিশনারিদের উদ্যোগ সাম্রাজ্যবাদের গতি ত্বরান্বিত করেছিল। বাস্তবিক পক্ষে বলা যায় যে ঔপনিবেশ স্থাপনের মূলে ছিল বহুমাত্রিক কারণের সমাবেশ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ নিজ নিজ স্বার্থে ঔপনিবেশ স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল। ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের সাফল্য বিভিন্ন দেশের জনমতকে উদ্দীপিত করেছিল। ডেভিড টমসনের মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। তাঁর ভাষায় "The sources and the nature of the urge to imperialism was multiple and varied considerably from one country to another" (Europe since Napoleon, পৃঃ ৪৯৮)

১.৪ ❑ ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের গতিপথ

১৮৭০-১৯১৪ এই কালপর্বে ইউরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের অভিমুখ ছিল আফ্রিকা ও পূর্ব এশিয়ায় কেন্দ্রীভূত। রক্ষণশীল রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে ইংলন্ড ও জার্মানি ও প্রজাতান্ত্রিক দেশ ফ্রান্স ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সমান আগ্রহী ছিল।

আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন ঃ

ফ্রান্স ইতিপূর্বেই আফ্রিকার উত্তর উপকূলে আলজিরিয়া দখল করেছিল। এখন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে টিউনিস, ১৮৮৪ খ্রিস্টোব্দে সেনেগাল, কঙ্গো ও আইভরি কোস্ট এর মধ্যবর্তী সকল স্থান দখল করে লেক চাঁদ (Lake Chand) পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে মাদাগাস্কার দ্বীপ এবং ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মরোক্কো দখল করে ফ্রান্স আফ্রিকায় এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। পর্তুগাল বেলজিয়াম-কঙ্গোর দক্ষিণে কয়েকটি ছোটো অঞ্চল পূর্বেই দখল করেছিল, এখন ঐ এলাকায় কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ করে এ্যাঙ্গোলা এবং পূর্ব উপকূলে মোজাম্বিকে উপনিবেশ গড়ে তোলে। আফ্রিকায় ইতালি একটু দেরীতে অগ্রসর হয়, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইতালি লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত ইরিট্রিয়া এবং সোমালিল্যান্ডের একটি অংশ দখল করে নেয়। এই দুটি স্থানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য ইটালি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে অ্যাবিসিনিয়া আক্রমণ করে।

সুদূর প্রাচ্য ঃ

এশিয়া এবং আফ্রিকা এই দুটি মহাদেশ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার শিকারক্ষেত্র হয়ে

উঠেছিল, ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আফ্রিকাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়া হল ; আর এশিয়াতেও ইউরোপীয় দখল কম বিস্তৃত হল না। চীনের দ্বারকে জোর করে উন্মুক্ত করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দূর প্রাচ্যে একক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে জাপানের উত্থান ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বিস্তারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১.৫ ❑ পরিণতি

ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও প্রতিযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। মূলত তিনটি ভৌগোলিক বলয়কে কেন্দ্র করে সংঘাত প্রকাশ্য রূপ নেয়। নিকট প্রাচ্যে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ দেখা দেয়। সুদূর প্রাচ্যে জার্মানি, জাপান, ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। আফ্রিকায় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি এই তিনটি দেশ ছিল মূল দাবিদার। ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক ঈর্ষা, প্রতিযোগিতা প্রশমন করার উদ্দেশ্যে জার্মানির চ্যান্সেলার বিসমার্ক ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বার্লিনে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের একটি সম্মেলন ডাকেন। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড-এর অনুরোধে সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনে স্থির হল এখন থেকে ইউরোপের দেশসমূহ আফ্রিকা মহাদেশে যে সব অঞ্চলের দখল নেবে সেই ভূখণ্ড একটি বিশেষ দেশের প্রভাবাধীন অঞ্চলরূপে নির্ধারিত হবে। এই সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশগুলির বিরোধিতার শান্তিপূর্ণ সমাধান। কিন্তু এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। বিসমার্ক যতদিন পর্যন্ত জার্মানির নিয়ন্ত্রক ছিলেন ততদিন জার্মানি ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে সংযত মনোভাব দেখিয়েছিল। কিন্তু ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বিসমার্কের পতনের পর জার্মানি সীমাবদ্ধ মহাদেশীয় রাজনীতির পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসে এক উগ্র বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ নীতির পথে ধাবিত হয়। এই নীতি 'বিশ্বনীতি' বা W elt Politik নামে পরিচিত। এই নীতির উদ্ভাবনে ও রূপায়ণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভন বুলো ও নৌ-বিভাগীয় মন্ত্রী আলফ্রেড ভন তারপিজ। এই নীতির প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম। জার্মানির ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ নীতি ও নৌ-শক্তি বিস্তার কর্মসূচীর ফলে জার্মানির চিরায়ত শত্রু ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলন্ড ও রাশিয়ার কূটনৈতিক সমঝোতা গড়ে ওঠে।

১.৬ ❑ ইউরোপের অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদী সংঘাত

একদিকে ইউরোপের বাইরে বিভিন্ন শক্তিবর্গ সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল, অন্যদিকে ইউরোপের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দেশ জাতীয়তাবাদী সংঘাতে নিমজ্জিত হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা ও অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে সংঘাতমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

(১) উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রসার :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এই সময়ে

বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত উগ্র সংগ্রামশীল রূপ ধারণ করে। প্রত্যেক দেশের উৎকট জাতীয়তাবাদ নিজ নিজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে থাকে এবং অন্যান্য জাতি সম্পর্কে বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হয়। এই উৎকট জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে বেশি প্রতিফলন ঘটে জার্মানিতে। জার্মানির অনেক ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সমাজবিদ এই ধারণা প্রচারে সক্রিয় হন। আলোচ্য সময়ে জার্মানিতে জার্মান মধ্যবিত্তশ্রেণি সমিতি, প্যান জার্মান লীগ, নেভি লীগ, জার্মান প্রতিরক্ষা লীগ প্রভৃতি সংগঠন বিস্তারধর্মী পররাষ্ট্রনীতির একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তারা সম্প্রসারণের অনুকূলে জনমত গঠন করে জার্মান সংসদে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এর থেকে যুদ্ধের মনোভাবও অনায়াসে সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু সংঙ্কীর্ণ এই উগ্র জাতীয়তাবোধের বিকাশ শুধুমাত্র জার্মানিতেই দেখা যায়নি ; কম-বেশি ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যান্ড, রাশিয়া এবং জাপানেও তার প্রকাশ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ফলে জাতিগত বৈরীতাও ক্রমে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। আর সেইসঙ্গে সুস্থভাবে কূটনৈতিক আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে সমস্যাবলীর সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়ে। এইভাবে উগ্র ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ যুদ্ধের পটভূমিকা প্রস্তুত করে। ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাক্টন এই কারণে জাতীয়তাবাদকে একটি ‘অবাস্তব ও অপরাধমূলক আদর্শ’ বলে চিহ্নিত করেন।

(২) অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদী মনোভাব :

আঘাতপ্রাপ্ত জাতীয়তাবাদ ও অতৃপ্ত জাতীয়-আকাঙ্ক্ষাও ইউরোপের নানা দেশে অসন্তোষ তৈরি করেছিল, সেডানের যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি ফ্রান্স কোনো সময়েই ভুলতে পারেনি ; আলসাস্-লোরেন পুনরায় উদ্ধারের প্রতিশোধ-স্পৃহা ফ্রান্সকে আচ্ছন্ন করেছিল। ফরাসী শিল্পপতিদের কাছে লৌহখনি সমৃদ্ধ লোরেন অঞ্চল অত্যন্ত লোভনীয় ছিল। অতএব জার্মানির বিরুদ্ধে ফরাসী জাতির মধ্যে প্রতিহিংসা-মনোবৃত্তি দিন-দিনই বেড়ে যেতে থাকলো। অন্যদিকে ইতালির জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা তখনও তৃপ্ত হতে পারেনি, ট্রেনট্রিনো ও ট্রিয়েস্ট দখল করার জন্য ইতালি উন্মুক্ত ছিল। যাইহোক, এছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বল্কান জাতীয়তাবাদ তুরস্কের পদানত জাতিগুলির মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সার্বিয়া শ্লাভ জাতীয়তাবাদের স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হয়।

১.৭ ❑ চুক্তির রাজনীতি

ইউরোপের বিভিন্ন শক্তিবর্গের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী সংঘাত মহাদেশীয় কূটনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। জার্মানির অভূতপূর্ব শক্তিবৃদ্ধি ইউরোপীয় রাজনীতির ভারসাম্যকে বিপন্ন করে তুলেছিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ইউরোপের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানি কূটনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং প্রধানতম শত্রু ফ্রান্সকে মিত্রহীন ও বিচ্ছিন্ন করার জন্য অস্ট্রিয়া ও ইতালিকে নিয়ে ত্রিশক্তি চুক্তি (Triple Alliance) গঠন করে (১৮৭৯ খ্রিঃ)। তবে বিসমার্ক স্থিতাবস্থা রক্ষায় আগ্রহী ছিলেন এবং সম্প্রসারণ নীতির

পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বিসমার্কের পতনের পর জার্মানি বিশ্বনীতির পথে ধাবিত হলে পুরাতন শত্রু ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হয় (১৯০৪ খ্রিঃ)। এরপর অপর শত্রুদেশ রাশিয়ার সঙ্গে ইংল্যান্ডের মৈত্রী সম্পাদিত হয় (১৯০৭ খ্রিঃ), এইভাবে জার্মানির ত্রিশক্তি চুক্তির বিপরীতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া ত্রিশক্তি মৈত্রী (Triple Entente) গঠিত হল। এইভাবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কূটনৈতিক শিবির একে অন্যের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হল এবং সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ঘনঘটা ইউরোপীয় কূটনীতিকে আচ্ছন্ন করল।

১.৮ ❑ সামরিক প্রতিযোগিতা

ইউরোপীয় দেশসমূহের পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ফলে প্রত্যেকেই সমর সজ্জার দিকে নজর দেয়। সমস্ত দেশই সুপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র প্রচুর পরিমাণে মজুত করতে লাগল। শিল্পপতিশ্রেণি পরিস্থিতিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে লাগল। অস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করে মুনাফা লাভে তারা আগ্রহী হল। সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিক নর্মান স্টোন অস্ত্রসজ্জার মূলে আর একটি কারণ তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে ইউরোপের প্রতিটি দেশেই সে সময়ে জনসংখ্যার গতি বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে বেশি সংখ্যক মানুষকে বাহিনীতে নিয়োগ করার প্রবণতা দেখা দিল।

বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই ইউরোপে সংঘাতের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। প্রথমে চারটি দ্বি-পাক্ষিক সংঘাতের সমাবেশ ঘটে। এগুলি হল ফ্রাঙ্কো-জার্মান, অস্ট্রো-রাশিয়ান ও অস্ট্রো-সার্বিয়ান। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বলকান অঞ্চল ও আফ্রিকার মরোক্কো সংঘাতের উৎসস্থলে পরিণত হয়। তবে ইংল্যান্ড একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছতে প্রস্তুত ছিল না। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের আগাদির সঙ্কটের পর ইংল্যান্ডের যুদ্ধ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী লর্ড হ্যালডেন জার্মানিতে যান এবং ইঙ্গ-জার্মান নৌ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হ্রাস করার জন্য ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্কে উন্নতি ঘটল না। কূটনৈতিক বোঝাপড়ার পথ রুদ্ধ হওয়ায় প্রকাশ্য সংঘর্ষ অবধারিত হয়ে উঠল।

অধ্যাপক জেমস জোল (James Joll) মনে করেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণে যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাঁর মতে রাজনৈতিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঘনীভূত সমস্যাগুলির সমাধান করতে প্রত্যেকটি দেশই যুদ্ধকে কাম্য বলে মনে করেছিল। শুধুমাত্র রাজনীতিবিদ্গণই নয়, জনগণও যুদ্ধকে স্বাগত জানায়।

১.৯ ❑ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আপাত প্রেক্ষাপট

সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ধূম্রজালের মধ্যে বারুদ স্তূপ সৃষ্টি হয়ে থাকলে তা বিস্ফোরণ হবার মত অগ্নিস্ফুলিঙ্গোরও অভাব হয় না, তবে বল্‌কান অঞ্চলের আঞ্চলিক সঙ্কট থেকেই যুদ্ধের দ্বার উন্মুক্ত হয়। অস্ট্রিয়ার শ্লাভ-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি সমেত সমস্ত শ্লাভজাতিকে এক রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবন্ধ করাই ছিল সার্বিয়ার নীতি। রাশিয়া সার্বিয়ার এই নীতিকে সমর্থন জানায়। স্বভাবতই সার্বিয়ার শক্তি খর্ব করাই তার নীতি হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য, এই সময়ে বল্‌কান অঞ্চলে

সার্বিয়াকে কেন্দ্র করে তিন ধরনের দ্বন্দ্বের সমাবেশ ঘটেছিল—তুরস্কের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গো বল্কান জাতীয়তাবাদ, প্যান জার্মান ও প্যান শ্লাভ মতবাদের সংঘাত এবং ত্রিশক্তি চুক্তি ও ত্রিশক্তি মৈত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

সেরাজেভো হত্যাকান্ড ও শক্তিবর্গের প্রতিক্রিয়া :

বোসনিয়া ও হারজেগোভিনাতে ঐক্যবন্ধ শ্লাভরাষ্ট্রের জন্য যখন জাতীয় আন্দোলন তীব্রভাবে চলছিল, তখন অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্কডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ড গেলেন বোসনিয়া ভ্রমণ করতে। সেই সময় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুন 'ব্ল্যাক হ্যান্ড' নামক একটি সন্ত্রাসবাদী দলের সভ্যদের দ্বারা তিনি বোসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভোর প্রকাশ্য রাস্তায় নিহত হলেন। অস্ট্রিয়া এই ঘটনাকে তৎক্ষণাৎ একটি সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করল।

আততায়ী ও তার সহকর্মীগণ অস্ট্রিয়ার প্রজা হলেও জাতিতে ছিল শ্লাভ ; এই অজুহাতে অস্ট্রিয়ার সরকার শ্লাভজাতিকে 'আততায়ীর জাতি' (Race of Assassins) বলে অভিহিত করে সার্বিয়াকেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করলো। এই সময়ে সার্বিয়া বল্কান অঞ্চলে শ্লাভ জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করে। অতঃপর অস্ট্রিয়া সরকার কতকগুলি শর্ত পূরণ করবার দাবি জানিয়ে সার্বিয়া সরকারকে এক চরমপত্র প্রেরণ করল। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চরমপত্রের উত্তর দাবি করা হল। সার্বিয়া প্রায় সমস্ত শর্তই মেনে নিল কিন্তু বাকী কয়েকটি মেনে নিলে সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হবে এই কারণে সার্বিয়া বিষয়টি আলোচনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক বৈঠকের প্রস্তাব করল। অস্ট্রিয়া এই প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

১.১০ ❑ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতিমুখ

অধ্যাপক ডেভিড টমসন মনে করেন সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড থেকে উদ্ভূত সঙ্কট দুই মহাজোটের সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। একদিকে অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও তুরস্কের জোট এবং এর বিপরীতে ইংল্যান্ড, ফরাসী ও রাশিয়ার জোট। মধ্যপ্রাচ্যে এই সময়ে জার্মান প্রভাব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা জোরদার হয়ে ওঠে—তাই ফ্রান্স ও ব্রিটেন মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বল্কান অঞ্চলে সার্বিয়ার শক্তি সুরক্ষিত করতে চেয়েছিল। ডেভিড টমসন লিখেছেন ''The crisis caused by Sarajevo was, therefore, a trial of strength between the two grand alliances not merely between Belgrade and Vienna''।

রাশিয়াও ঘোষণা করল যে বল্কান সমস্যা একমাত্র অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, এটি স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপের সমস্যা এবং একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক ডেকে আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে সমস্যার নিষ্পত্তি ঘটাতে চাইল। কিন্তু জার্মানির সমর্থন-পুষ্ট অস্ট্রিয়া কোনমতেই তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ মেনে নিতে চাইল না, সঙ্গো সঙ্গো রাশিয়াও সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ দিল। সৈন্য সমাবেশ বন্ধ করার জন্য জার্মানি রাশিয়ার কাছে এক চরমপত্র পাঠাল। কিন্তু এর কোনও জবাব না পাওয়ায় জার্মানি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। রাশিয়ার

সঙ্গো যুদ্ধ বাধলে ফ্রান্স নিরপেক্ষ থাকবে কিনা জানতে চেয়ে জার্মানি তাকেও একটি চরমপত্র দিল ; কিন্তু কোনও পরিষ্কার জবাব না পাওয়ায় জার্মানি ২ আগস্ট যুদ্ধ ঘোষণা করল ফ্রান্সেরও বিরুদ্ধে।

খুব তাড়াতাড়ি জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণের জন্য বেলজিয়ামের ভিতর দিয়ে সৈন্য চালনার দাবী জানায়। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের এক আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা স্বীকৃত হয়েছিল। সুতরাং বেলজিয়াম সরকার জার্মানির দাবী অগ্রাহ্য করল। কিন্তু সে আপত্তিতে কর্ণপাত না করে বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে জার্মানি সৈন্য পরিচালনা করলে ইংল্যান্ড তাতে প্রতিবাদ জানাল এবং সেই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হলে সে ৪ আগস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

এই যুদ্ধের সীমানা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে ইতালি, জাপান, চিন ও আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগদান করল। তুরস্ক, বুলগেরিয়া জার্মানির পক্ষে যোগ দিল। এইভাবে মহাদেশীয় যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হল।

১.১১ ❑ বিভিন্ন ব্যাখ্যা : পর্যালোচনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগমনে জার্মানির দায়িত্ব সম্পর্কে তিন ধরনের ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, চিরায়ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী জার্মানি ও অস্ট্রিয়া সুপরিকল্পিতভাবে আগ্রাসনের পথে ধাবিত হয় এবং যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে যুদ্ধের আগমনে শুধুমাত্র জার্মানির একক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ ব্যক্ত করা হয়। এইচ. ই. বার্নেস, এস. বি. ফে, জি. পি. গুচ্ প্রমুখ ঐতিহাসিক মনে করেন একদিকে যেমন জার্মানির আগ্রাসী নীতি যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, অন্যদিকে বিপক্ষ শক্তিবর্গ বিশেষত ব্রিটেন যুদ্ধ প্রতিহত করার বিষয়ে উদ্যোগী হয়নি। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পর যুদ্ধের আগমনে পুনরায় জার্মানিকে বেশি মাত্রায় দায়ী করা হয়। এ.জে.পি টেলর, কে. পিনসন, ফ্রিঞ্জ ফিশার, জেমস জোল প্রমুখ লেখকেরা জার্মানিকে যুদ্ধের আগমনের জন্য সমালোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক ফ্রিঞ্জ ফিশার মনে করেন, ১৯১১ থেকেই জার্মানি সচেতনভাবে যুদ্ধ চেয়েছে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এরই পরিণতি ঘটে যুদ্ধের আগমনে। তাঁদের মতে জার্মানির অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংবিধানিক কাঠামো যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল। জার্মানির শাসকগোষ্ঠীর মূল ভিত্তি রক্ষণশীল ভূস্বামী শ্রেণি ও উদীয়মান শিল্পপতি শ্রেণি নিজস্বার্থে বিস্তার নীতি সমর্থন করে। বস্তুতপক্ষে এসময় জার্মানি মানসিক স্থিরতা ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। অধ্যাপক এ.জে.পি টেলর জার্মানিকে "নিয়ন্ত্রণহীন অশ্বের" সঙ্গো তুলনা করেছিলেন, ''A run away horse, more truly an over powered engine out of control''।

১.১২ ❑ জার্মানির দায়িত্ব

ত্রিশক্তি মৈত্রী গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করার পর ভার্সাই চুক্তিতে তথাকথিত যুদ্ধাপরাধী শর্তে জার্মানিকে বিশেষত জার্মান সম্রাট-কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাইজার বিসমার্কের শান্তিপূর্ণ মিত্রজোট নীতি বর্জন করে বিশ্ব রাজনীতিতে জার্মানির প্রাধান্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রথমে রাশিয়াকে রুষ্ট করেছিলেন। ঔপনিবেশিক

বিস্তারনীতি অনুসরণের ফলে জার্মানির সঙ্গো ব্রিটেনের সংঘাত বাধে। এছাড়া কাইজার বল্‌কান রাজনীতিতে অস্ট্রিয়ার আগ্রাসী নীতিকে সমর্থন করেন। জার্মানির ধারণা হয়েছিল যে বল্‌কান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পেলে রাশিয়াকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে। এইজন্য জার্মান রাজনীতিবিদ্‌গণ অস্ট্রিয়াকে সংযত না করে প্ররোচিত করেন। সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করে অস্ট্রিয়া যখন সার্বিয়াকে চরমপত্র দেয়, তখন জার্মানি ইচ্ছাকৃতভাবে অস্ট্রিয়াকে সংযত করেনি। উপরন্তু জার্মান সেনাপতি মলট্‌কে একতরফাভাবে জার্মান সেনা রাশিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সন্নিবেশ করায় আলাপ আলোচনার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ঐতিহাসিক গর্ডন ক্রেইগ প্রমুখের মতে বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানিকে একতরফা দায়ী করা চলে না। বল্‌কান সমস্যার জন্য বা যুদ্ধ সৃষ্টির জন্য কেবল কাইজার বা জার্মানি এককভাবে দায়ী নয়। এ.জে.পি. টেলরের মতে, যুদ্ধের জন্য সব শক্তিই কম-বেশি দায়ী ছিল।

ঐতিহাসিক বিতর্ক ও ফিশার তত্ত্ব :

জার্মানি কেন যুদ্ধনীতির পথ গ্রহণ করেছিল সেই সম্পর্কে নানা ধরনের ব্যাখ্যা দেখা যায়। অনেকের ধারণা জার্মান পুঁজিপতি শ্রেণি ও সামরিক নেতারাই এই বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেন। জার্মান চ্যান্সেলর বেথহ্যাম হলওয়েগ ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না, সাম্প্রতিককালে জার্মান ঐতিহাসিক ফ্রিঞ্জ ফিশার এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জার্মানি এই সময়ে এক গভীর অভ্যন্তরীণ সংকটের আবর্তে ছিল, তাই বাইরে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করে জার্মান রাজনীতিবিদ্‌ ও পুঁজিপতি শ্রেণি নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ ও প্রাধান্য বজায় রাখতে চেয়েছিল। সামরিক নেতারা ভেবেছিলেন যে একটি দ্রুত ক্ষিপ্র যুদ্ধ শুরু করলে জার্মানি সামরিক দিক দিয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে এবং মিত্রপক্ষ জার্মানির সঙ্গো সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হবে। ফ্রিৎস ফিশার ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত "Group for World Power" নামের গ্রন্থে আলোচনা করেন যে, জার্মানি সুপরিকল্পিতভাবে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধ বাধাতে প্ররোচিত করে এবং একটি মহাদেশীয় যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে উৎসাহী হয়। জার্মান চ্যান্সেলার বেথহ্যাম হলওয়েগ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ সংক্রান্ত যে খসড়া কর্মসূচী পেশ করেন তার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক ফিশার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, জার্মানি যুদ্ধনীতির মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপে এমনকি প্রাচ্যে নিজস্ব আধিপত্য স্থাপনের রণকৌশল গ্রহণ করেছিল। হলওয়েগ জার্মান শাসকগোষ্ঠীর সম্প্রসারণবাদী মনোভাবের মুখপাত্র ছিলেন।

জার্মানির বিশেষ দায়িত্ব :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্য বিস্তারের লিপ্সা এবং বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সমগ্র বিশ্বকে একটি মহাযুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দেয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া নানা কারণে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রথম সুযোগ পেয়েছিল ; তার ফলস্বরূপ বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদেরই। পরদেশ গ্রাস করার তাগিদ জার্মানি অনুভব করে একটু দেরীতে। কিন্তু সাম্রাজ্যবিস্তারের উপযুক্ত

স্থানগুলি তখন বণ্টন হয়ে গিয়েছে। সাম্রাজ্যবিস্তারের পথ তার জন্য রুদ্ধ। সেইজন্য অন্যান্য দেশের তুলনায় জার্মানিতেই জাতীয়তাবাদ উগ্র হয়ে ওঠে বেশি এবং যুদ্ধের মনোভাব সৃষ্টি হয় বেশি। সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার নীতি যুদ্ধের প্রধান অনুঘটক হওয়ায় জার্মানির মতো অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলির দায়িত্ব মেনে নিতে হয়। তবে জার্মানির বিশেষ দায়িত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায় না। কেন না জার্মানি বল্কান অঞ্চলের একটি সীমাবদ্ধ স্থানীয় যুদ্ধকে বিশ্বযুদ্ধতে পরিণত করে তুলেছিল। জার্মানির মদত না পেলে অস্ট্রিয়া যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে পারত না। তাই তুলনামূলকভাবে জার্মানির দায়িত্ব ছিল বেশি।

১.১৩ ❑ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি

যুদ্ধের ব্যাপকতা ও রণনীতির দিক থেকে পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধবিগ্রহের তুলনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হ'ল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই যুদ্ধে তুরস্ক জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ দেয়; ইতালি, জাপান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অন্য পক্ষে (যা 'মিত্রপক্ষ' নামে পরিচিত) যোগ দেয়। একটি আঞ্চলিক যুদ্ধ (অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে সংগঠিত) শেষ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধে পরিণতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও রাষ্ট্র কোনও না কোনওভাবে এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে এই যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে যোগদানকারী সেনার সংখ্যা এত বিপুল যা পূর্বে কোনও যুদ্ধে দেখা যায়নি। তৃতীয়ত, এই যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রূপ এর আগে কখনও দেখা যায়নি। নানা ধরনের স্থলযুদ্ধে ভারী কামান, ট্যাঙ্ক বা সাঁজোয়া কামানবাহী গাড়ি, বিস্ফোরক বোমা, বিষাক্ত গ্যাস—প্রভৃতির ব্যাপক প্রয়োগ হয়। এইসব যুদ্ধাস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক চরিত্র বহুগুণে বেড়ে যায় ও সামরিক এবং বে-সামরিক জনগণের সকলেই সমানভাবে বিপদগ্রস্ত আর ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সমস্ত দেশই যুদ্ধকে সোচ্চারে বরণ করে নিয়েছিল। জার্মান রাজনীতিবিদ্‌গণ ভেবেছিলেন যুদ্ধ অচিরেই শেষ হবে এবং জার্মানি জয়যুক্ত হবে। আসলে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের রণকৌশল জার্মানি প্রস্তুত করেনি।

প্রথমদিকে সাফল্য লাভ করলেও জার্মানি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের চোরাবালিতে ডুবতে থাকে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধের পরিস্থিতি কিছুটা মিত্রপক্ষের অনুকূলে যায়। এই বছর জুটল্যান্ডের যুদ্ধে জার্মান নৌবহর ইংল্যান্ডের নৌবহর কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা হল, রাশিয়ার বলশেভিক বিদ্রোহ ও মিত্রপক্ষে আমেরিকার যোগদান। রাশিয়ার বলশেভিক দল জার্মানির সঙ্গে ব্রেস্ট-লিটোভস্ক-এর সন্ধি সম্পাদন করে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রথম থেকে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। কিন্তু জার্মানি শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সাবমেরিনের যুদ্ধ আরম্ভ করলে আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগদান করতে বাধ্য হয়। আমেরিকার মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়ার পর থেকে যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অনুকূল হয়ে উঠতে থাকে।

রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হলে জার্মানি পশ্চিম সীমান্তে জোর আক্রমণ চালায়। জার্মান

বাহিনী ইপ্রিস আক্রমণ করে প্যারিসের প্রায় ৪০ মাইলের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু মিত্রপক্ষের সেনাপতি ফচ-এর অধিনায়কত্বে মিত্রপক্ষ একের পর এক সাফল্য অর্জন করে চলে। তুরস্ক, বুলগেরিয়া, অস্ট্রিয়া একে একে পরাস্ত হয়ে মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ইতিমধ্যে জার্মানিতে অভ্যন্তরীণ বিপ্লব দেখা দেয়। জার্মান নৌবাহিনী বিদ্রোহ করে। ৯ নভেম্বর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে কাইজার হল্যান্ডে পালিয়ে গেলে জার্মানিতে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হয়। ১১ নভেম্বর জার্মানি যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়।

১.১৪ ❑ যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়লাভের কারণ

বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে সমরাস্ত্রের দিক থেকে জার্মানি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। সমরোপকরণের পরিমাণ, সেনার সংখ্যা, সমরনায়কদের দক্ষতা প্রভৃতির দিক থেকে জার্মানি ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জার্মানির ক্ষেপণাস্ত্র ও ডুবোজাহাজগুলি ছিল প্রবল বিধ্বংসীকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিত্রপক্ষের জয়লাভের একাধিক কারণ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, জার্মানির সমরোপকরণ ছিল স্বল্পমেয়াদী যুদ্ধের উপযোগী। প্রথমদিকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একাধিক যুদ্ধে জয়লাভ করলেও বেশি দিন ধরে তা রাখা জার্মানির পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয়ত, সেনা পরিচালনের ব্যাপারে জার্মানির অসুবিধা ছিল। জার্মানিকে একই সময় পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে সেনা সমাবেশ করতে হয় এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়। বহু মাইল বিস্তৃত রণ-সীমান্তে সময়মত সেনা পরিচালনা করা জার্মানির পক্ষে শেষ পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

তৃতীয়ত, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার নৌ-শক্তির তুলনায় জার্মানির নৌ-শক্তি ছিল নিতান্তই নগণ্য।

চতুর্থত, সমুদ্রের ওপর ব্রিটিশ নৌ-শক্তির প্রাধান্য জার্মানির অর্থনীতির ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর অবরোধের ফলে জার্মানির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছিল। জার্মান জেনারেল লুডেনডর্ফ স্বীকার করেছিলেন যে, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে জার্মানির বিপর্যয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাঁর ভাষায় ''If the war lasted our defeat seemed inevitable''।

পঞ্চমত, জনগণের অনাহার জনিত বিক্ষোভ জার্মানির পরাজয়ের অন্যতম কারণ। যুদ্ধ যেমন জনগণের অনুভূতি ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল, যুদ্ধের চাপে অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে জনমানসে গভীর হতাশা সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক বিরাট শক্তি ও যুদ্ধসম্ভার নিয়ে মিত্রপক্ষে যোগ দিলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়— যা প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা জার্মানির ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল প্রধানত 'জনযুদ্ধ' ('War of the people')। এই যুদ্ধে বিশ্বের জনমতের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। স্বৈরতন্ত্রী দেশ জার্মানির জনগণের তুলনায় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার মতো গণতন্ত্রী দেশগুলির জনগণ অকাতরে আপন আপন সরকারকে সাহায্য করেছিল। জার্মানির পরাজয়ের ও মিত্রপক্ষের জয়লাভের এটা এক অন্যতম কারণ।

১.১৫ ❑ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর জার্মানি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা পর্যন্ত যুদ্ধের ধারা অব্যাহত থাকে। ভৌগোলিক ব্যাপ্তির দিক থেকে এই যুদ্ধ যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিধালাভ করেছে, অন্যদিকে এত ব্যাপক, ভয়াবহ ও সর্বাত্মক যুদ্ধ আগে কখনও হয়নি। পরিণতির দিক থেকেও যুদ্ধের সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছিল। যুদ্ধের আপাত ফলাফল ছিল তিন ধরনের। চার বছর ব্যাপী সর্বনাশা যুদ্ধে দশ মিলিয়ন মানুষের জীবনহানি হয় এবং কুড়ি মিলিয়ন মানুষ যুদ্ধে আহত হয়েছিল। যুদ্ধের ব্যয়ভারও ছিল অপরিসীম।

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের সামরিক ব্যয় হয়েছিল ১৮০ বিলিয়ন ডলার আর পরোক্ষ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৫০ বিলিয়ন। বিশ্ব-অর্থনীতি কোনো না কোনোভাবে এই যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত হয়েছিল।

তৃতীয়ত, ইউরোপীয় রাজনীতির আঙ্গিকেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়, ইউরোপের দুটি বিবদমান শক্তিজোট এই যুদ্ধে অংশ নেয়— একদিকে ব্রিটেনের নেতৃত্বে ত্রিশক্তি মৈত্রী, অন্যদিকে জার্মানির নেতৃত্বে ত্রিশক্তি চুক্তি। দুই শিবিরেই রাজনৈতিক কাঠামো কম-বেশি বিধ্বস্ত হয়েছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে বলশেভিক বিপ্লবের ধাক্কায় রাশিয়ায় রোমানভ রাজবংশ ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক সরকার যুদ্ধ থেকে সরে এসে শত্রুপক্ষ জার্মানির সঙ্গে সন্ধি করে এবং এর ফলে ইউক্রেন, ক্রিমিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া প্রভৃতি অঞ্চল রাশিয়ার হস্তচ্যুত হয়। তাৎক্ষণিক দিক থেকে জার্মানি লাভবান হলেও শেষপর্যন্ত জার্মানি নিজেই পরাজিত হয় এবং মধ্য-ইউরোপ ও পূর্ব-ইউরোপের রাজনৈতিক কাঠামো বিনষ্ট হয়। জার্মানিতে হোহেনজোলার্ন রাজবংশ, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতে হ্যাপ্‌সবার্গ-রাজবংশ, তুরস্কে অটোমান রাজতন্ত্র সকলেই ক্ষমতাচ্যুত হয়। এই অবস্থায় মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক শূন্যতা ও অস্থিরতা দেখা দেয়।

১.১৬ ❑ প্রশ্নাবলী

(১) নয়া সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে? সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা কতটা গ্রহণযোগ্য?
(২) উনিশ শতকের শেষে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এর পরিণতি কি হয়েছিল?
(৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।
(৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কি অবধারিত ছিল?
(৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উন্মেষে জার্মানির দায়িত্ব নির্ণয় কর।
(৬) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি উল্লেখ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(১) সাম্রাজ্যবাদের উন্মেষ প্রসঙ্গে লেনিন ও হবসন-এর ব্যাখ্যা কি?
(২) জার্মানির বিশ্বনীতি কি?

(৩) ত্রিশক্তি মৈত্রী কিভাবে গঠিত হল?
(৪) অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার সংঘাত কিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিমুখ সৃষ্টি করেছিল?
(৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ফিশার তত্ত্ব আলোচনা কর।
(৬) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানিকে কি 'নিয়ন্ত্রণহীন অশ্ব' বলা চলে?
(৭) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ব্যাখ্যা কর।

১.১৭ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

(১) প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস
(২) ডেভিড টমসন—Europe Since Napoleon
(৩) কে. পিনসন—Modern Germany
(৪) গর্ডন ক্রেইগ—Germany 1866-1945
(৫) এ. জে. রাইডার—Twentieth Century Germany

— —

একক ২ ❑ শান্তি সংস্থাপন প্রক্রিয়া

গঠন

২.১ ভার্সাই সন্ধির পটভূমি
২.২ ভার্সাই সন্ধির কার্যাবলী
২.৩ উইলসনের চৌদ্দ দফা সূত্র
২.৪ সেভারস্-এর সন্ধি
২.৫ জাতিসঙ্ঘ—কাঠামোগত বিন্যাস
২.৬ শান্তিরক্ষায় জাতিসঙ্ঘের অবদান
২.৭ ফরাসী নিরাপত্তা সমস্যা
২.৮ লোকার্নো চুক্তি—পটভূমি—বিষয়বস্তু—গুরুত্ব
২.৯ প্যারিস শান্তি চুক্তি
২.১০ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিপর্যয়
২.১১ প্রশ্নাবলী
২.১২ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ ❑ ভার্সাই সন্ধির পটভূমি

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে জার্মানির পতন ঘটে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। এরপর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্যারিসে বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রতিনিধিরা এক বৈঠকে মিলিত হন। বিশ্বের সাতাশটি দেশের সত্তর জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এতবড় সম্মেলন বিশ্বের ইতিহাসে এর আগে অনুষ্ঠিত হয়নি। দুঃখের বিষয় জার্মানি ও অন্যান্য পরাজিত দেশগুলির প্রতিনিধিদের এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লেঁমসো, ইটালীর প্রধানমন্ত্রী অর্লান্ডো ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন এই চারজন (Big Four) প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভার্সাই-সন্ধির বন্দোবস্তের মধ্যে জার্মানির উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিশেষত জার্মানি যাতে ভবিষ্যতে শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে সেইজন্য ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল। অন্যদিকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইল্‌ন ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর ভিত্তি করে বিশ্বপুনর্গঠনের বিখ্যাত চৌদ্দ-দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ভার্সাই সম্মেলনের কার্যাবলীতে এই দুই পরস্পর বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

২.২ ❑ ভার্সাই সন্ধির কার্যাবলী

(১) ইউরোপের রাষ্ট্রিক পুনর্বিন্যাস : ভার্সাই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী (ক) জার্মানি ফ্রান্সকে আলসাস্-লোরেন ; বেলজিয়ামকে মরিসনেট ; ইউপেন ও মেলমেডি ; লিথুয়ানিয়াকে মেমেল এবং

পোল্যাণ্ডকে পোসের ও পশ্চিম-প্রাশিয়ার অংশবিশেষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। (খ) ডানজিগকে 'উন্মুক্ত বন্দর' ঘোষণা করা হল। (গ) জার্মানিকে তার উপনিবেশগুলি এবং বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় অর্জিত 'বিশেষ অধিকার' গুলি ছেড়ে দিতে হল। (ঘ) উত্তর-সাইলেশিয়া এবং পূর্ব-প্রাশিয়ার অধিবাসীগণকে গণ-ভোট দ্বারা তাদের ভাগ্য নির্ণয়ের অধিকার দেওয়া হল। (ঙ) জার্মানির শিল্প ও খনিজপ্রধান সার (Saar) অঞ্চলের উপর ১৫ বৎসরের জন্য ফ্রান্সের আধিপত্য স্বীকৃত হল।

এইভাবে প্রায় ২৫০০০ বর্গমাইল অঞ্চল জার্মানিকে পরিত্যাগ করতে হল এবং প্রায় ২,০০০,০০০ জার্মান নাগরিক স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

(২) **সামরিক শর্তাদি :** জার্মানি দ্বারা ভবিষ্যতে যাতে কোনও দেশ আক্রান্ত হতে না পারে তার জন্য তার সামরিক শক্তি খর্ব করা হল। (ক) রাইন নদীর পূর্বভাগে ত্রিশ মাইল পর্যন্ত স্থান থেকে জার্মান সৈন্য অপসারিত হল। (খ) সৈন্য-সংখ্যা এক লক্ষে কমিয়ে দেওয়া হল, সামরিক ঘাঁটিগুলি ভেঙে দেওয়া হল। (গ) বৃহদাকার যুদ্ধজাহাজগুলি ব্রিটেন হস্তগত করল, এবং সামরিক অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন সীমাবদ্ধ রাখা হল। (ঘ) জার্মানির খরচেই এক মিত্রবাহিনী জার্মানিতে মোতায়েন করা হল। সামরিক শক্তির দিক দিয়ে জার্মানি অত্যন্ত হীনবল হয়ে পড়ল।

(৩) **অর্থনৈতিক শর্তাদি :** অর্থনৈতিক দিক দিয়েও জার্মানিকে যথেষ্ট দুর্বল করবার ব্যবস্থা হল। (ক) তার অধিকাংশ বাণিজ্যপোত ফ্রান্সকে সমর্পণ করতে হল। (খ) কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ সার অঞ্চলটি ১৫ বৎসর ব্যবহারের জন্য ফ্রান্সকে দেওয়া হল। জার্মানির কয়লা ও লোহা ক্ষতিপূরণ হিসেবে অন্যান্য দেশকে সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হল। (গ) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর অর্থ জার্মানির উপর ধার্য করা হল।

দশ বৎসরের জন্য ফ্রান্স, ইতালি ও বেলজিয়ামকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা সরবরাহ করার দায়িত্ব জার্মানিকে দিতে হল। পাঁচ বৎসরের জন্য জার্মানির আমদানী ও রপ্তানির ব্যাপারে মিত্র পক্ষীয় দেশগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ করল। জার্মানির এলবা ও ওডার নদীগুলি আন্তর্জাতিক শাসনাধীনে রাখা হল। কিয়েল খালকে আন্তর্জাতিক শাসনাধীনে রেখে তা সকল দেশের বাণিজ্য-পোতগুলির কাছে উন্মুক্ত রাখা হল।

(৪) **রাজনৈতিক শর্তাদি :** (ক) এই বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির জন্য জার্মানিকে দায়ী করা হয়। (খ) জার্মান সম্রাট কাইজার উইলিয়ামকে এবং অন্যান্য জার্মান নেতৃবর্গকে যুদ্ধ সৃষ্টির অভিযোগে বিচারের দাবি জানান হল। অবশ্য তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর করা হয়নি। (গ) জার্মানিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করতে বাধ্য করা হল।

(৫) **বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ ও অছি প্রথা :** (ক) বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার শর্তাদিও ভার্সাই সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করা হল। প্রেসিডেন্ট উইলসনের 'চৌদ্দ-দফা'-র ভিত্তিতে একটি বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ (League of Nations) গঠিত হল। (খ) জার্মানি ও তার

মিত্রদের কাছ থেকে যে সমস্ত উপনিবেশ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সেগুলির শাসনভার অছি হিসাবে মিত্রপক্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হল।

২.৩ ❑ উইলসনের চৌদ্দ দফা সূত্র

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারী আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন মিত্রপক্ষ ও জার্মানীর মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে চৌদ্দটি শর্ত সম্বলিত এক ঘোষণা জারি করেন, এটাই বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা শর্ত'। শর্তগুলি হল : (১) সকল আন্তর্জাতিক শান্তিচুক্তি প্রকাশ্যে আলোচিত হবে এবং গোপন চুক্তিব্যবস্থা বর্জিত হবে। (২) সকল রাষ্ট্র সমুদ্রপথে জাহাজ চালাবার পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে। (৩) যুদ্ধোপকরণ হ্রাস করতে হবে। (৪) সকল দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বাধা নিষেধ অপসারণ করা হবে। (৫) ঔপনিবেশিক দাবি নির্ধারণে ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থ সমভাবে বিচার করতে হবে। (৬) সমস্ত রুশ অঞ্চল থেকে সৈন্য অপসারণ এবং রাশিয়া সম্পর্কে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ। (৭) বেলজিয়াম থেকে সৈন্য প্রত্যাহার। (৮) সমগ্র ফরাসী অঞ্চলের মুক্তিসাধন। (৯) জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ইতালির সীমারেখার পুনর্বিন্যাস। (১০) অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর জনসাধারণকে স্বাধীনভাবে উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা। (১১) রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো থেকে সৈন্য অপসারণ। (১২) তুরস্ক সাম্রাজ্যের তুর্কী অংশের সার্বভৌমত্ব স্বীকার। (১৩) পোল্যান্ডকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পুনর্গঠন করতে হবে। (১৪) ভবিষ্যতে যুদ্ধ নিবারণের জন্য একটি জাতিসঙ্ঘ ('a general association of nations') গঠন করতে হবে।

এই চৌদ্দ-দফা নীতির ভিত্তিতে জার্মানির সঙ্গে মিত্রপক্ষের যুদ্ধবিরতি ঘটল এবং শান্তি সম্মেলন আহূত হল।

২.৪ ❑ সেভারস্-এর সন্ধি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে মিত্রশক্তির মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়। অতঃপর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট মিত্রপক্ষ তুরস্কের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সেভারস্-এর চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তি অনুসারে তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। ফলে পুরাতন তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটল। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তুরস্কের জনগণের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং মুস্তাফা কামাল তাঁর নবগঠিত জাতীয়তাবাদী দলের সাহায্যে এই অপমানজনক চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেন। এই আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত সেভারস্ সন্ধির শর্তাদি নাকচ হয়ে যায়। মিত্রপক্ষ লুসানের সন্ধি স্বাক্ষর করে তুরস্কের অধিকাংশ দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলেন (১৯২৩ খ্রিঃ)।

২.৫ ❑ জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা—কাঠামোগত বিন্যাস

'লীগ-অফ-নেশনস্' জন্মগ্রহণ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার মধ্যে। এই প্রতিষ্ঠানটির গঠনের কারণ হল যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় এবং শান্তি স্থায়ীভাবে বজায় থাকে।

গত শতাব্দীর শেষ দিকে স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিকতার দিকে একটি ঝোঁক দেখা যায় এবং মহাযুদ্ধের আঘাতেই এই ঝোঁক বৃদ্ধি পেয়ে লীগ-অফ-নেশনস্-এর রূপ গ্রহণ করে।

জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য :

মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা বিশ্বের জনসাধারণকে শঙ্কিত করে এবং এইরূপ ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সম্ভাবনাকে চিরতরে বিলীন করবার জন্য তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। বিশ্ববাসীর এই মনের ভাবকে রূপ দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দ-দফা শর্তের মধ্যে। প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে তা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হলেও ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলীতে 'লীগ-অফ-নেশনস্' গঠনের শর্তটিও গ্রহণ করা হয়।

লীগ-অফ-নেশনস্-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের বদলে আপোস ও মীমাংসার দ্বারা সমস্ত সমস্যার সমাধান করা। এই সঙ্ঘে যেসব রাষ্ট্র যোগদান করেন তারা স্বীকার করলেন যে, (ক) যুদ্ধের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে তারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে এবং আন্তর্জাতিক আইনকে মান্য করবে। (খ) নিজেদের মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তি হবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যস্থতায়, (গ) কোন রাষ্ট্র যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোন নির্দেশ অমান্য করে, তবে অন্যান্য রাষ্ট্রবর্গ তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করবে এবং প্রয়োজনবোধে তার বিরুদ্ধে সামরিক শক্তির প্রয়োগ করতে প্রস্তুত থাকবে।

জাতিসঙ্ঘের কাঠামোগত বিন্যাস :

একটি সাধারণ সভা (Assembly), একটি কাউন্সিল (Council) এবং একটি স্থায়ী দপ্তর (Secretariat) এই নিয়ে লীগ-অফ-নেশনস্ গঠিত হয়।

(ক) সাধারণ সভায় সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের তিনজন করে প্রতিনিধি থাকবে, কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের মাত্র একটি করে ভোটের অধিকার থাকবে। এর ক্ষমতা হল রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্গত সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা এবং পরামর্শ দেওয়া। (খ) পাঁচজন স্থায়ী সদস্য, যথা—গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান এবং চারজন সাধারণ সভ্য দ্বারা নির্বাচিত অস্থায়ী সদস্য দ্বারা কাউন্সিল গঠিত হয়, কাউন্সিলের ক্ষমতা হল, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যস্থতা, সদস্য কোন রাষ্ট্রকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। (গ) স্থায়ী দপ্তরের প্রধান কাজ ছিল সাধারণ সভা ও কাউন্সিলের নির্দেশকে কার্যে রূপায়িত করা। এই দপ্তর একজন সেক্রেটারী জেনারেলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। এছাড়া লীগ-অফ-নেশনস্-এর একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ সৃষ্টি করা হয়।

২.৬ ❑ শান্তিরক্ষায় জাতিসঙ্ঘের অবদান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি বা নিরাপত্তা বিধানের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে লীগ অফ নেশনস্-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এর প্রতিষ্ঠার পর প্রায় এক দশক কাল লীগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক কার-এর মতে বিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশক

ছিল লীগের প্রাধান্য-প্রতিপত্তির যুগ, কারণ এই সময়ে লীগের কার্যকলাপ সাফল্য লাভ করে।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ :

(১) সীমানা নিয়ে তুরস্কের ও ইরাকের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে লীগ পরপর দুটি কমিশন নিযুক্ত করে যুদ্ধের সম্ভাবনা রোধে সক্ষম হয়। (২) ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে যুগোশ্লাভিয়া আলবেনিয়া আক্রমণ করতে উদ্যত হয় এবং ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ইতালি গ্রীস আক্রমণ করে। এই সময় লীগের হস্তক্ষেপের ফলে এই দুই রাষ্ট্রকে আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়। (৩) ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রীক সৈন্য বুলগেরিয়া আক্রমণ করে। লীগ হস্তক্ষেপ করে, গ্রীককে অপরাধী সাব্যস্ত করে এবং তাকে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করে। (৪) এছাড়া লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড ও অন্যান্য ছোট ছোট রাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিবাদের মীমাংসা করতে লীগ সক্ষম হয়। (৫) লীগের নেতৃত্বে জেনেভা প্রোটোকল (Geneva protocol) নামক যে চুক্তিপত্র ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত হয়েছিল, তার বিষয় ছিল সামরিক শক্তি দিয়ে আক্রমণকারীকে রোধ করা এবং অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা। ব্রিটেন ও তার ডোমিনিয়নগুলি এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে এটি পরিত্যক্ত হয়। (৬) এর পরবর্তী কালে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে লোকার্নো চুক্তি (Locarno pact) দ্বারা রাষ্ট্রসঙ্ঘ বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানির সীমানা রক্ষা করে এবং মধ্যস্থতার মাধ্যমে সকল বাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। (৭) লীগের তত্ত্বাবধানে "কোলোগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তি" বা প্যারিস শান্তি চুক্তি (আগস্ট, ১৯২৮ খ্রিঃ) স্বাক্ষর করে, স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ যুদ্ধ বিগ্রহের নীতি থেকে বিরত থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। (৮) নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রেও লীগ একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে. ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে লীগ কাউন্সিল একটি প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory Commission) গঠন করে। এরপর ১৯২৩-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহূত হয়। অবশ্য জার্মানি সম্মেলন ত্যাগ করে এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে যায়।

অন্যান্য জনহিতকর কার্যকলাপ :

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লীগ বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি এবং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে ব্যর্থ হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে অথবা ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ইতালি, ইথিওপিয়া আক্রমণ করলে লীগ কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ হয়। কিন্তু সামাজিক ও অন্যান্য জনহিতকর কার্যাদির ব্যাপারে লীগ বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। (ক) আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা রোগ নিবারণ ও তার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে লীগ একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন করেছিল। (খ) বিশ্বের যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ব্যাপারে লীগ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আহূত একটি অর্থনৈতিক সম্মেলন সকল দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য দানের সুপারিশ করে। এছাড়াও শ্রমিক সমস্যার সমাধান, ক্রীতদাস ব্যবসার অবসান, নারীসমাজের ও শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রভৃতি জনহিতকর কার্যকলাপের ক্ষেত্রে লীগ বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেয়।

২.৭ ❑ ফরাসী নিরাপত্তা সমস্যা :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে তথা সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা সমস্যা আন্তর্জাতিক রাজনীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। লীগ-অফ-নেশনস্ বা জাতিসঙ্ঘ এই সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়। আপোস মীমাংসার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা এবং আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে নিরাপত্তা রক্ষা করা লীগের প্রধানতম কর্তব্য ছিল। তবে নিরাপত্তা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা শুধুমাত্র জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়েছিল তা নয়, লীগের বাইরেও বিভিন্ন দেশ নিরাপত্তাবিধানের জন্য অগ্রসর হয়েছিল। এই সকল প্রচেষ্টার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত লোকার্নো চুক্তি।

নিরাপত্তা সমস্যা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন ছিল ফ্রান্স। কারণ সে জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে আশঙ্কিত ছিল। জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সহায়সম্পদ ও সামরিক কৃৎকৌশল সবদিক থেকেই জার্মানি ফ্রান্সের চেয়ে অগ্রবর্তী ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিজয়ী দেশ হওয়া সত্ত্বেও ফ্রান্স নিরাপত্তার অভাব অনুভব করেছিল।

ফ্রান্স তার নিরাপত্তা সমস্যা সমাধানের জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করেছিল, সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের অঙ্গীকার দেবে। কিন্তু ইংল্যান্ড অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেউই এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিল না। এই অবস্থায় ফ্রান্স লীগ-অফ-নেশনস্-এর মাধ্যমে নিরাপত্তা সমাধানের চেষ্টা চালায়। কিন্তু লীগ-অফ-নেশনস্-এর উপর ফ্রান্স বিশেষ আস্থাশীল হয়ে উঠতে পারেনি। প্রথমত, কোন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হলে সকল সদস্যরাষ্ট্রের সম্মতি প্রয়োজন ছিল। এছাড়া, লীগের নিজস্ব কোনও সেনাবাহিনী ছিল না। তাই লীগের পক্ষে সদিচ্ছা থাকলেও কোনও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া কোনও মতেই সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় ফ্রান্স নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বাধ্য হয়েই নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অগ্রসর হল। বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া এইসব দেশের সঙ্গে ফ্রান্স নিরাপত্তা সংক্রান্ত মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই সমস্ত দেশ প্রত্যেকেই জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল।

২.৮ ❑ লোকার্নো চুক্তি—পটভূমি—বিষয়বস্তু—গুরুত্ব :

পটভূমি : নিরাপত্তা সমাধানে আরও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ব্রিটেন সচেষ্ট হল এবং জার্মানির বিদেশমন্ত্রী স্ট্রেসম্যানও এই বিষয়ে সহযোগিতার হাত বাড়ালেন। ইতিমধ্যে ডয়েজ পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানে কিছুটা উন্নতি ঘটেছিল।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে সুইজারল্যান্ডের লোকার্নো শহরে ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানী ও ইতালি এই সাতটি দেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হলেন। এই সম্মেলনে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিঁয়া পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপে একই সঙ্গে সম্মিলিত নিরাপত্তার দাবি পেশ করেন, কিন্তু জার্মানি শুধুমাত্র পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা বিধানে রাজী হয়।

অন্যদিকে ফ্রান্স প্রস্তাব করে যে, জার্মানিকে লীগ-অফ-নেশনস্-এ যোগদান করতে হবে। কিন্তু

র‍্যাপোলো চুক্তি অনুসারে জার্মানির সঙ্গো রাশিয়ার বিশেষ সম্পর্ক থাকায় জার্মানি এই প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হয়। পরে ঠিক হল যে, লীগের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র নিজ নিজ সামরিক স্বার্থ ও ভৌগোলিক পরিস্থিতির সঙ্গো সামঞ্জস্য রেখে লীগের কার্যকলাপে অংশ নিতে পারে। এই প্রস্তাবে জার্মানি রাজী হয়। অবশেষে, বেলজিয়াম, ব্রিটেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, ইতালি ও পোল্যান্ডের প্রতিনিধিগণ একাধিক চুক্তিপত্র রচনা করেন, এইগুলি সম্মিলিতভাবে লোকার্নো চুক্তি (Locarno Agreements) নামে পরিচিত।

লোকার্নো চুক্তির বিষয়বস্তু :

(১) ফ্রাঙ্কো-জার্মানি ও ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়াম সালিসি চুক্তি অনুসারে জার্মানি ও ফ্রান্স এবং জার্মানি ও বেলজিয়ামের মধ্যবর্তী সীমানা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। জার্মানি রাইন অঞ্চলের সমরায়োজন থেকে বিরত থাকবার প্রতিশ্রুতি দিল।

(২) ফ্রান্স, জার্মানি ও বেলজিয়াম পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করতে সম্মত হল এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে পারস্পরিক বিবাদের মীমাংসা করতে সম্মত হল।

(৩) জার্মানি ও পোল্যান্ড এবং জার্মানি ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে আন্তর্জাতিক সালিসির মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি করা হবে।

লোকার্নো চুক্তির গুরুত্ব :

বিশ্বের ইতিহাসে লোকার্নো চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। প্যারিস শান্তি-সম্মেলনের পর এটাই ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জার্মানি লীগ-অফ-নেশনস্-এ যোগদান করার ফলে লীগ একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। লোকার্নো চুক্তির দ্বারা সর্বপ্রথম জার্মানি ও ফ্রান্সের পরস্পর বিরোধী মনোভাবের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়। এই কারণে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব চেম্বারলেন লোকার্নো সন্ধিকে যুদ্ধ ও শান্তির যুগের মধ্যে 'প্রকৃত সীমারেখা' বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তি ইউরোপে যুদ্ধের পরিবেশের অবসান ঘটিয়ে শান্তির অনুকূল আবহাওয়া তৈরীতে সাহায্য করেছিল। এইজন্য ঐতিহাসিক লিপসন লোকার্নো সন্ধিকে দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালের শ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক কীর্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

লোকার্নো চুক্তির কয়েকটি বিশেষ ত্রুটির কথা অস্বীকার করা যায় না। এই চুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হল যে, অন্যান্য চুক্তি অনুমোদন ব্যতিরেকে এবং রাষ্ট্রবর্গের স্বেচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের সমর্থন ভিন্ন ভার্সাই চুক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না। (২) লোকার্নো চুক্তির শর্তগুলি থেকে এটাই প্রমাণিত হল যে, এই চুক্তির কার্যকারিতা ব্রিটেনের দায়িত্বের উপর নির্ভরশীল, ব্রিটেন ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যবর্তী সীমানা রক্ষার দায়িত্ব না নিলে এই চুক্তি সম্পাদন হত না। (৩) লোকার্নো চুক্তি ফ্রান্সের পক্ষে লাভজনক হয়নি। তাকে রাইন অঞ্চল পরিত্যাগ করতে হল এবং জার্মানি পুনরায় শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় ফ্রান্সের নিরাপত্তা সমস্যার কোন সুস্পষ্ট সমাধান হল

না। যাই হোক, এইসব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও লোকার্নো চুক্তি তৎকালীন ইউরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়া পরিশুদ্ধ করতে কিছুটা সক্ষম হয়েছিল।

২.৯ ❑ প্যারিস শান্তি চুক্তি

লোকার্নো চুক্তির পর প্যারিস শান্তি চুক্তি বা কেলোগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তিকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রূপে চিহ্নিত করা হয়।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে জাতিসঙ্ঘ সর্বসম্মতিক্রমে আক্রমণাত্মক যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। এরপর ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্রিয়াঁ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ফ্রান্সের যুদ্ধ বিগ্রহ বর্জন করার প্রস্তাব দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব কেলোগ্-ব্রিয়াঁর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধনীতি বর্জন করার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব সকল রাষ্ট্রের সম্মতি লাভ করে এবং প্যারিসে পনেরটি দেশের প্রতিনিধিগণ মিলিত হয়ে প্যারিস-চুক্তি অথবা কেলোগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তি স্বাক্ষর করেন (আগস্ট, ১৯২৮ খ্রিঃ)। এই চুক্তি অনুসারে (১) স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের পথ অনুসরণের নিন্দা করে এবং জাতীয় নীতিরূপে যুদ্ধকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়। (২) একমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে পারস্পরিক বিবাদ ও বিরোধ মীমাংসা করতে সম্মত হয়। (৩) এই চুক্তিপত্র অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। অবশেষে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সমেত ৬৫টি দেশ এই চুক্তি গ্রহণ করতে সম্মত হয়।

প্যারিস-চুক্তির গুরত্ব :

বিশ্বের বিপুল সংখ্যক রাষ্ট্র এই চুক্তি গ্রহণ করায় এটি একটি বিশ্বজনীন ব্যাপক রাজনৈতিক চুক্তিতে পরিচিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন (জাতিসঙ্ঘ বহির্ভূত দুইটি দেশ) একটি চুক্তির আওতায় এল। ফলে এই চুক্তির ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। তবুও এই চুক্তির ত্রুটিগুলিও অস্বীকার করা যায় না। এই চুক্তিতে যুদ্ধকে জাতীয় নীতি হিসাবে বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও যুদ্ধরত রাষ্ট্রকে শাস্তিদানের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। দ্বিতীয়ত, আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ নিন্দিত হয়নি, তাই যুদ্ধ শুরু হলে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। বস্তুতপক্ষে প্যারিস চুক্তি সম্পাদনের কিছুদিনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। জাপান এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী হওয়া সত্ত্বেও মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। এরপর থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যুদ্ধের অশনিসঙ্কেত লক্ষ্য করা গেল।

২.১০ ❑ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিপর্যয় :

১৯৩০-এর দশকে কয়েক বছরের মধ্যেই যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে উঠতে লাগল এবং যৌথ নিরাপত্তার প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতিসঙ্ঘের মর্যাদা ও কার্যকারিতা হ্রাস পেতে থাকে। আসলে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পর বিশ্বরাজনীতিতে সঙ্কটের কালো মেঘ জমতে লাগল

এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও যুদ্ধ নিবারণে জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠল। জাতিসঙ্ঘের এই ব্যর্থতার পিছনে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যায়।

(১) এই ধরনের সংগঠন বিশ্বে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ; সুতরাং সুতরাং প্রতিষ্ঠানটির কাজ অনেক স্থলেই পরীক্ষামূলক হয়ে পড়েছিল, কোন অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তা অগ্রসর হবার সুযোগ মেলেনি।

(২) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রথম থেকে এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে যায়, বলশেভিক রাশিয়াকে প্রথমদিকে লীগে যোগ দিতেই দেওয়া হয়নি ; সুতরাং লীগ খানিকটা দুর্বল অবস্থাতেই যাত্রা শুরু করে।

(৩) জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক স্বার্থ পূরণের কোন সদিচ্ছাই বৃহৎ সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেখা যায়নি। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে জেনেভা প্রোটোকল ইংল্যান্ড ও তার ডোমিনিয়নগুলির প্রত্যাখ্যানের ফলেই অনুমোদিত হয়নি। এটি জাতিসঙ্ঘের কার্যকারিতার ওপর প্রথম আঘাত হিসেবে গণ্য করা হয়।

(৪) জাতিসঙ্ঘের সনদে বলা হয়েছিল যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সর্ববাদীসম্মত হতে হবে। স্বভাবতই কোন একটি দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন সম্ভাবনা থাকলে কোনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব ছিল। তাছাড়া জাতিসঙ্ঘের কোন সামরিক শক্তি ছিল না। তাই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া গেলেও তার রূপায়ণ অন্যান্য দেশের সামরিক সাহায্য ও সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। কেলোগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তি উপেক্ষা করে জাপান ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে জাতিসঙ্ঘ শুধুমাত্র প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। বরং জাপান জাতিসঙ্ঘর সদস্যপদ ত্যাগ করে জাতিসঙ্ঘকে দুর্বল করে তোলে। জাতিসঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইতালি যখন আফ্রিকায় ইথিওপিয়া আক্রমণ করে তখন সেখানকার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কোনও প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি। উপরন্তু ইতালি জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রয়োজনে তারা জাতিসঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণ নীতি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেনি। সেইজন্যই নিরস্ত্রীকরণের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতার মূল কারণ হল সদস্যরাষ্ট্রগুলির বিশেষত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ভ্রান্ত নীতি ও সুবিধাবাদ। একদিকে ইতালি, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্র যৌথ নিরাপত্তার আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে সম্প্রসারণের দিকে অগ্রসর হয় অন্যদিকে আগ্রাসন প্রতিরোধ করার জন্য জাতিসঙ্ঘকে শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সদিচ্ছার অভাব ছিল। দুঃখের কথা হল জার্মানি, জাপান, ইতালির আগ্রাসী নীতি যখন জাতিসঙ্ঘের দুর্বলতা ও অন্তসারশূন্যতা তুলে ধরেছিল ঠিক একই সময়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রত্যক্ষভাবে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ না করে আত্মঘাতী তোষণনীতির জালে জড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থায় জাতিসঙ্ঘ শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। ঠিক কখন জাতিসঙ্ঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিক এ.জে.পি. টেলর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখটি ধার্য করেছেন। ঐদিন জার্মান একনায়ক হিটলার ভার্সাই চুক্তি ও লোকার্নো চুক্তির শর্তাবলী প্রকাশ্যে লঙ্ঘন করে রাইন

অঞ্চলে সেনা সমাবেশ করেন। এই ঘটনায় সবাই নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অধ্যাপক টেলর ৭ই মার্চকে ‘দিক পরিবর্তনকারী ঘটনা’ (turning point) বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটায় ইউরোপীয় রাজনীতি শান্তি থেকে সংঘাতের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হল।

২.১১ ❑ প্রশ্নাবলী

(১) ভার্সাই সন্ধির উদ্দেশ্য ও সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ কর।
(২) ভার্সাই সন্ধি কি উইলসনের আদর্শবাদের সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ ছিল?
(৩) ফরাসী নিরাপত্তা সমস্যা কাকে বলে? ফ্রান্স নিজস্ব উদ্যোগে কিভাবে এর সমাধানে সচেষ্ট হয়েছিল?
(৪) লোকার্নো চুক্তিকে কি যুদ্ধ ও শান্তির বিভাজনরেখা বলে চলে?
(৫) লোকার্নো চুক্তি ও প্যারিস শান্তি চুক্তি কতদূর সফল হয়েছিল?
(৬) জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে কিভাবে শান্তি সংরক্ষণের চেষ্টা হয়?
(৭) যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিপর্যয় ব্যাখ্যা কর।

২.১২ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

(১) David Thompson : Europe Since Napoleon.
(২) C.A. Fyffe : A History of Modern Europe.
(৩) Carlton J.H. Hayer : A Political and Social History of Modern Europe.
(৪) Oxford History of Modern Europe.

একক ৩ ❑ ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

গঠন

৩.০ সূচনা

৩.১ রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়, সোভিয়েত রাষ্ট্র স্থাপন

৩.১.১ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

৩.১.২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিপ্লবের আপাত প্রেক্ষাপট

৩.১.৩ বিপ্লবের পথ ও পদ্ধতি—লেনিনের রণকৌশল

৩.১.৪ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের গতিধারা

৩.১.৫ লেনিন ও বলশেভিক দলের ভূমিকা

৩.১.৬ সোভিয়েত বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

৩.১.৭ লেনিনোত্তর কালে সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা

৩.২ জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

৩.২.১ যুদ্ধোত্তর অভ্যুত্থান

৩.২.২ নাৎসী আধিপত্যবাদ ও জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

৩.৩ ইতালিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

৩.৪ গণফ্রন্টের বিকাশ

৩.৪.১ ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট শাসন

৩.৪.২ স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও গণফ্রন্টের বিপর্যয়

৩.৫ প্রশ্নাবলী

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ ❑ সূচনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ইউরোপের রাজনীতিতে তিন ধরনের রাজনৈতিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপিত হয়। এছাড়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল ছিল। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধোত্তর ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সফল হওয়ায় ও কমিনটার্ন নামক আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে ওঠায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের গতি তীব্রতর হয়। তৃতীয়ত, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই দুইয়ের বিকল্প বিরুদ্ধ শক্তিরূপে একনায়কতন্ত্রী আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে। ইতালি ও জার্মানি ছিল এই একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার পীঠস্থান।

আলোচ্য এককে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা হল। সাফল্য ও ব্যর্থতা দুইয়েরই সমাবেশ ঘটেছিল আন্দোলনের গতিধারায়।

৩.১ ❑ সোভিয়েত বিপ্লব : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় ও সোভিয়েত রাষ্ট্র স্থাপন

যুদ্ধ ও বিপ্লব বিশ শতকের ইউরোপ তথ্য বিশ্বের ইতিহাসে মূল দুই নির্ণায়ক শক্তি। আবার এ দুটি একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার জারতন্ত্রের সৌধ বিধ্বস্ত হয় এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা হয়।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের সোভিয়েত বিপ্লব, বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী বলশেভিক দল এই বিপ্লবের নিয়ন্ত্রক ছিল। কিন্তু এই বিপ্লব কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পরিণতি ছিল এই বিপ্লব। ঐতিহাসিক ই.এইচ্.কার মন্তব্য করেছেন "The Revolution of 1917 was in one sense a sharp break in Russian history and in another a long awaited fulfilment of it"।

৩.১.১ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট :

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ভূমিদাস প্রথার অবসান রাশিয়ার ইতিহাসে বিভাজন রেখা নামে পরিচিত। মুক্তির ঘোষণার মাধ্যমে ভূমিদাসগণ আইনি অধীনতার নিগড় থেকে মুক্তি পেলেও তাদের অবস্থার কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি। রাশিয়ার অর্থনীতির আঙ্গিকে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। রাশিয়ার অর্থনীতি আগের মতই মূলত কৃষিপ্রধান হয়ে রইল। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকৃত অগ্রগতি ঘটেনি। রাশিয়ার জনসংখ্যার বেশিরভাগ ছিল কৃষক। প্রতি হাজার জনসংখ্যার ৮৫০ জন ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাও ছিল সাবেকি ধরনের। ভূমিদাসগণ মুক্তি পেলেও জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। বেশিরভাগ কৃষিযোগ্য জমি গ্রামীণ অভিজাত সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এদিকে প্রভাবশালী অভিজাত সম্প্রদায় রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিল। তাই শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। উনিশ শতকের শেষ দিকে রাশিয়ায় শিল্পায়নের প্রচেষ্টা শুরু হলেও শিল্পায়নের চরিত্র ছিল কৃত্রিম, অসম ও সীমিত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তেমন বিকাশ না ঘটায় শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি এসেছিল বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছ থেকে। রাশিয়ার শিল্পায়নে ফরাসী পুঁজির বিনিয়োগের মাত্রা ছিল বেশি। বিদেশী পুঁজির প্রাধান্য থাকায় শিল্পের বিকাশ ঘটলেও রাশিয়া তার সুফল থেকে বঞ্চিত ছিল। তবে কলকারখানা গড়ে ওঠায় শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ মিলিয়ন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ মিলিয়ন। শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাদের আর্থিক মানের উন্নতি ঘটেনি। এই অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিত হয়ে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়।

৩.১.২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিপ্লবের আপাত প্রেক্ষাপট :

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে যেমন ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজতন্ত্র পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে সংস্কার প্রচেষ্টায় আগ্রহী হয়েছিলেন। কিন্তু সংস্কার প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা বিপ্লবের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। সেই রকম রাশিয়ায় জারতন্ত্র পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে জারতন্ত্রের দমননীতির বিরুদ্ধে রাশিয়ায় প্রথম বিপ্লবের দাবানল জ্বলে ওঠে। একথা সত্য, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু রাশিয়ার শাসক জার দ্বিতীয় নিকোলাস প্রতিনিধি সভা বা ডুমা আহ্বান করলেন। এছাড়া স্টোলিপিন রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক কাঠামো সংস্কারের জন্য একগুচ্ছ কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। কিন্তু সংস্কার প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি। ইতিমধ্যে রাশিয়া ইউরোপের রাজনৈতিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধলে রাশিয়া, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। রণাঙ্গানে পর্যাক্রমে পরাজয়ের ফলে জার সরকারের অযোগ্যতা জনসাধারণের কাছে প্রকট হয়ে উঠল। এছাড়া যুদ্ধের চাপে রাশিয়া অর্থনৈতিক সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়। পণ্যসামগ্রীর অভাবে জনজীবনে হতাশা নেমে আসে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বিপ্লবের সূচনা পর্যন্ত যুদ্ধখাতে ব্যয় হয়েছিল তিন হাজার কোটি রুবল। এই অর্থের এক-তৃতীয়াংশ বৈদেশিক ঋণ মারফৎ সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া যুদ্ধে প্রায় আট লক্ষ সেনার জীবননাশ হয়। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়।

৩.১.৩ বিপ্লবের পথ ও পদ্ধতি—লেনিনের রণকৌশল :

উনিশ শতকে কার্ল মার্কস ও তাঁর সহযোগী এঙ্গোলস শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। অন্যদিকে রাশিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে বিপ্লবের প্রকরণ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। প্রকাশ্য আন্দোলনের পাশাপাশি গোপন বিপ্লববাদী আন্দোলনের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ডস্টয়ভস্কি, টুর্গেনিভ প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায় বিপ্লববাদী আন্দোলনের মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়। লেনিন মার্কসবাদী মতাদর্শ ও বিপ্লববাদী ঐতিহ্য এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রসঙ্গাত মনে রাখা প্রয়োজন, মার্কস উপলব্ধি করেছিলেন পশ্চিম ইউরোপের একটি শিল্পোন্নত দেশে প্রথম সর্বহারা বিপ্লব সম্পন্ন হবে, কিন্তু রাশিয়ার মত আপেক্ষিকভাবে কম শিল্পোন্নত দেশে প্রথম এই ধরনের বিপ্লব সফল হয়েছিল। এছাড়া রাশিয়ার বিপ্লব কোন পথে সম্পন্ন হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী বিপরীতধর্মী ধারণা পোষণ করত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বলশেভিক দল জয়যুক্ত হয়। রাশিয়া বিশ্বের সর্বহারা বিপ্লবের পুরোধা হয়েছিল এবং বলশেভিক দল এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছিল—এই দুইয়ের মূলে লেনিনের নীতি ও নেতৃত্ব-এর অবদান ছিল সর্বাধিক।

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ ওরফে লেনিন (এপ্রিল ১৮৭০-জানুয়ারী ১৯২৪) ছিলেন একাধারে বলশেভিক বিপ্লবের তাত্ত্বিক ও সংগঠক। লেনিন ছাত্রাবস্থায় মার্কসবাদী আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হন এবং রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে লেনিন রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলের সঙ্গো যুক্ত হন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় বিভিন্ন সাম্যবাদী দল

একত্রে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি গঠন করে। লেনিন বিপ্লবের উপযোগী একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল দল গঠনের জন্য উদ্যোগী হন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে 'What is to be done' গ্রন্থে এই ধরনের দলের রূপরেখা তুলে ধরেন। তাঁর মতে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল দুটি পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা বলশেভিক ও মেনশেভিক। লেনিনের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলশেভিক দল লেনিনের নির্দেশিত পথে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে লেনিন ও তাঁর বলশেভিক দল এই সিদ্ধান্তে এলেন যে শ্রমিক সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিক ঐক্য গড়ে তুলে বিপ্লবের কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করতে হবে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মেনশেভিক দলের সঙ্গে বলশেভিকদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ঐ বৎসরেই বৈপ্লবিক প্রচারকার্য পরিচালনার জন্য বলশেভিক দলের মুখপত্র 'প্রাভদা' প্রকাশিত হয়।

লেনিনের মতাদর্শ অন্যান্য বামপন্থী সাম্যবাদী দল ও গোষ্ঠীর মনঃপূত ছিল না। দুটি বিষয়ে মতবিরোধ প্রকাশ্য রূপ গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত বলা যায়, লেনিন ও জার্মানির কমিউনিস্ট নেত্রী রোজা লুক্সেমবুর্গ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ও বৈপ্লবিক দল সম্পর্কে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। লেনিন-এর অভিমত হল বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এক সঙ্কটজনক অবস্থায় পতিত হয়েছে, এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাত হানতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের শিকলের দুর্বল গ্রন্থিতে আঘাত হানতে পারলে সেই অংশটি ভেঙে পড়বে। লেনিনের মতে রাশিয়া হল দুর্বলতম গ্রন্থি, তাই এখানেই বিপ্লবের জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু রোজা লুক্সেমবুর্গের ধারণা হল যে রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাল্পতার জন্য সেখানে সর্বহারা বিপ্লব না হয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, লেনিন-এর দৃঢ় ধারণা ছিল যে সর্বহারা বিপ্লবের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী হিসাবে একটি সুসংহত সুশৃঙ্খল দলকে বিপ্লবের দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু রোজা লুক্সেমবুর্গ লেনিনের পার্টি তত্ত্ব-এর বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে কেন্দ্রীভূত দলীয় সংগঠনের মাধ্যমে বিপ্লবের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে তার চরিত্র হবে কৃত্রিম ও যান্ত্রিক। ফরাসী বিপ্লবী লুই অগাস্ত ব্লাঙ্কির বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের ধারণা লেনিন রাশিয়ার পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করেছেন। লেনিন ও লুক্সেমবুর্গের মতবিরোধ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মার্কসীয় চিন্তাবিদ রুথ ফিশার লিখেছেন যে লেনিন রাশিয়ার আপাত পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন, পক্ষান্তরে রোজা লুক্সেমবুর্গ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দীর্ঘসূত্রী ক্রমবিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। (Ruth Ficher, The Origins of German Communism, পৃঃ ২৬-২৭)

৩.১.৪ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের গতিধারা :

প্রথম পর্যায় :

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ-বিপ্লব রাজনৈতিক ও সামাজিক এই দুই পর্যায়ে সংঘটিত হয়েছিল। জার সম্রাটের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাশিয়ার পেট্রোগ্রাড শহরে শ্রমিকগণ ধর্মঘট শুরু করে। এরপর খাদ্যের দাবিতে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সর্বত্র দাঙ্গা-

হাঙ্গামা দেখা দেয়। জারের সেনাবাহিনীও জনগণের পক্ষ গ্রহণ করে। বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য শ্রমিক ও সেনাবাহিনী মিলিতভাবে সোভিয়েত গড়ে তোলে। বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হওয়ায় জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন (১৪ই মার্চ)। রাশিয়ায় রাজতন্ত্র অবলুপ্ত হল এবং এর জায়গায় 'ডুমা' বা জাতীয় পরিষদে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হল। এইভাবে রাশিয়ায় রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব লুপ্ত হল এবং একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো শুরু হল। জারতন্ত্রের অবসানের মধ্য দিয়ে রুশ-বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হল।

দ্বিতীয় পর্যায় : নভেম্বর-বিপ্লব :

অস্থায়ী সরকারে মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রাধান্য থাকলেও, দেশে প্রকৃত ক্ষমতা ছিল শ্রমিক, কৃষক ও সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সোভিয়েতগুলির হাতে। মার্চ-বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই শ্রমিক, সেনা প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠিত হয় এবং সমস্ত দেশে এই ধরনের সংগঠন প্রসারিত হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুন সমস্ত রাশিয়ার সোভিয়েতগুলির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে লেনিন বলেন, একমাত্র বলশেভিকদের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের মাধ্যমে দেশের তিনটি মূল সমস্যার সমাধান সম্ভব। এগুলি হল যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি স্থাপন, শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ এবং কৃষকদের মধ্যে জমির বন্দোবস্ত করা। এইভাবে লেনিন সেনা, শ্রমিক ও কৃষক এই তিন শ্রেণীর মানুষের প্রকৃত কল্যাণসাধন করেন। এদিকে অস্থায়ী সরকার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করবার কোনও যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় জনগণের মনে অসন্তোষ বেড়ে গেল। এছাড়া যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নীতি অব্যাহত থাকায় অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতিতে মেনশেভিক দলের নেতা কেরেনস্কি শাসনক্ষমতা লাভ করলেন, কিন্তু তিনি অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে জনগণকে রক্ষা করতে পারলেন না। ফলে দেশবাসীর মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেল। এদিকে কেরেনস্কি জার্মানদের বিরুদ্ধে পুনরায় আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় (জুলাই, ১৯১৭ খ্রিঃ) সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ বৃদ্ধি পেল এবং জনগণ সোভিয়েতগুলির দ্বারা সংগঠিত হতে থাকলো।

৩.১.৫ লেনিন ও বলশেভিক দলের ভূমিকা

জনগণের বিক্ষোভকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে পরিচালিত করাই ছিল বলশেভিক দলের উদ্দেশ্য। এপ্রিল মাসে বলশেভিক দলের নেতা লেনিন সুইজারল্যান্ড থেকে রাশিয়ায় ফিরে এলেন এবং রাশিয়ার রাজনীতিতে এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি হল। বিখ্যাত এপ্রিল সন্দর্ভ (থিসিস)-এ লেনিন গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের কথা প্রচার করেন এবং লেনিনের সুযোগ্য নেতৃত্বে বলশেভিক দল সক্রিয় হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের প্রতি আনুগত্য জানায় এবং রুশ সেনাবাহিনী সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নেয়। যুদ্ধনীতির প্রতিবাদে বলশেভিক দলের নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাডে বিক্ষোভ মিছিল দেখা দিল (জুলাই ১৯১৭ খ্রিঃ)। শ্রমিক মিছিলের উপর আক্রমণ শুরু হল এবং লেনিনসহ বহু নেতৃস্থানীয় কর্মী আত্মগোপন করলেন, এইসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শহরে, গ্রামাঞ্চলে ও সেনাবাহিনীর মধ্যে বলশেভিক দলের প্রভাব ও

জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল। আলোচ্য সময়ে বলশেভিক দলের সদস্যসংখ্যা ৫০,০০০ থেকে ২,৪০,০০০-এ পরিণত হয়। এছাড়া পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতে বলশেভিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। লেনিন সংসদীয় প্রজাতন্ত্র ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক, সেনা ও কৃষকদের প্রতিনিধি নিয়ে সঙ্ঘ (সোভিয়েত) স্থাপনের নীতি ঘোষণা করেন। তাঁর নেতৃত্বে বলশেভিক দল 'শান্তি, খাদ্য ও জমি' এই তিনটি বিষয়ের ওপর জনমত গঠন করতে লাগল। মেনশেভিক সরকারের অর্থনৈতিক ব্যর্থতার সুযোগে তারা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শ্রমিক সেনা প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের হাতে হস্তান্তর করবার জন্য বলশেভিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করল। এরপর অক্টোবর মাসে, বলশেভিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ঐতিহাসিক অধিবেশনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য লেনিনের প্রস্তাব ১০-২ ভোটে গৃহীত হয়। অবশেষে লেনিনের যোগ্য শিষ্য ট্রটস্কি সশস্ত্র শ্রমিকদের সংগঠিত করে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর বলশেভিক দলের নেতৃত্বে বিপ্লব সম্পন্ন করলেন। শীত প্রাসাদ দখল হল এবং অস্থায়ী সরকারের পতন হল। এইভাবে রাশিয়ায় বিশ্বের প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রের ভিত্তি গঠিত হল।

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য প্রসঙ্গো মনে রাখা প্রয়োজন যে লেনিনের নেতৃত্ব ও বলশেভিক দলের সাংগঠনিক ক্ষমতা এই সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু লেনিনের পক্ষে সহজে সাফল্য লাভ সম্ভব হত না, যদি না পরিবেশ অনুকূল থাকত। অ্যালান বুলক লিখেছেন, লেনিন ও বলশেভিক দল অথবা অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দলগুলির কেউই বিপ্লবের কারিগর ছিলেন না। শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষ, কৃষক সম্প্রদায়ের দুর্দশা অথবা সেনাবাহিনীর হতাশা এ সমস্তই যুদ্ধজনিত পরিস্থিতি থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু অন্য দলগুলি জনগণের ক্ষোভ ও অসন্তোষকে ঠিকমত পরিচালনা করতে পারেনি। লেনিন-এর কৃতিত্ব হল তিনি সঠিক পথ নির্দেশিত করেছিলেন। লেনিনের ভাষায় ক্ষোভকে তিনি বৈপ্লবিক খাতে প্রবাহিত করেছিলেন। এপ্রিল থিসিসে লেনিন দুটি বিষয় স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। প্রথমত, কোনমতেই যুদ্ধে সমর্থন জানানো হবে না এবং দ্বিতীয়ত সংসদীয় দলীয় রাজনীতি নয়, শ্রমিক, কৃষক, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক সমিতি বা সোভিয়েতগুলি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন গড়ে তোলা হবে। একথা সত্য অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দলগুলি, এমনকি বলশেভিক দলের অগ্রণী নেতারা যেমন জিনোভিয়েভ ও কামেনভ লেনিনের রণকৌশল সমর্থন করেননি। কিন্তু অনমনীয় চিত্তে লেনিন যুদ্ধ নয়, বিপ্লব এই লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পথ বেছে নেন। বলশেভিক দলের ষষ্ঠ পার্টি সম্মেলনে (জুলাই-আগস্ট) সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বলশেভিক বিপ্লব সম্পন্ন হল।

৩.১.৬ সোভিয়েত বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের বলশেভিক বিপ্লব শুধুমাত্র রাশিয়ার ইতিহাসেই নয়, বিশ্ব-ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এক যুগান্তকারী ঘটনা। ফলত এই বিপ্লব রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এবং বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।

অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া :

নতুন প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক সরকার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনের ব্যবস্থা করেন। বিনা ক্ষতিপূরণে কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অধিগ্রহণ করে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে শ্রমিকদের তত্ত্বাবধানেই সেগুলির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ন্যায্য বন্টন ব্যবস্থা চালু করে জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের জমি-বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল তা নয়, রাশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের ফলে রাশিয়ার জনসাধারণ বলশেভিক সরকারের স্বপক্ষে এল। কিন্তু জমিদার, যাজক, বিত্তশালী প্রভৃতি শ্রেণীগুলি প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিল। ফলে তারা বলশেভিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এইভাবে রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবের ওরফে শ্বেত সন্ত্রাসের জন্ম হয়। এদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে নবগঠিত রাষ্ট্রটি ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে নানা পশ্চিমী দেশ বলশেভিক শাসনকে উচ্ছেদ করবার জন্য সেনাবাহিনী পাঠায় এবং রাশিয়ায় হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু বলশেভিক সরকার বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এই দুই বিপদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে সমর্থ হল।

১৯১৭ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ এই তিন বছর যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ (war-communism)-এর পর্ব নামে পরিচিত। সদ্য প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রকে এর জন্য প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয়েছিল। প্রায় পনের মিলিয়ন মানুষ গৃহযুদ্ধ জনিত পরিস্থিতিতে প্রাণ হারায়। অর্থনৈতিক দিক থেকে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ প্রাক্-যুদ্ধ স্তর থেকে এক-সপ্তমাংশ স্তরে নেমে আসে এবং মুদ্রাব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের সূচনাকালে দুই ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রথমত, গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। জমিতে ভূস্বামীদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়ায় কৃষকেরা জমির উপর মালিকানাস্বত্ব লাভ করল। শহরাঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণীর তুলনায় গ্রামাঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায় বিপ্লবের ফলে লাভবান হল। এদিকে ঘরে বাইরে সঙ্কটের মোকাবিলা করতে গিয়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ ও আমলাতান্ত্রিক ঝোঁক বৃদ্ধি পায়। আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত সোভিয়েতগুলির উপর ভিত্তি করে নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ক্রমশ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ও মন্ত্রী পরিষদের উপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হয়। দমনমূলক বিধি ব্যবস্থা আরোপিত হল। লেনিন ও তাঁর সহযোগী ট্রটস্কি উভয়েই প্রথম দিকের আপৎকালীন কঠোর কর্মপদ্ধতির যৌক্তিকতা তুলে ধরেছিলেন। 'Left-wing Communism an Infantile Diorder' পুস্তিকায় লেনিন দলীয় নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। ট্রটস্কি 'The Defence of Terror গ্রন্থে (১৯২০ খ্রিঃ) লিখেছিলেন "To reject terror is to reject socialism" । ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত দশম পার্টি সম্মেলনে লেনিন স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন যে দল হল সর্বহারার অগ্রণী বাহিনী। তাই দলের সংহতি ও সাংগঠনিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজন 'চেকা' নামে রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনী গঠিত হল এবং এর মাধ্যমে দলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীগুলিকে দমন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

বৈদেশিক প্রতিক্রিয়া :

বলশেভিক বিপ্লবের পর লেনিন যুদ্ধ থেকে সরে আনতে মনস্থ করেন। সোভিয়েত রাশিয়ার নিরাপত্তার স্বার্থে লেনিন জার্মানির সঙ্গে আপোস মীমাংসায় উপনীত হলেন। সে সময় এক বিশাল জার্মান সেনাবাহিনী রাশিয়ার সীমান্তে মোতায়েন ছিল। এছাড়া লেনিন ও বলশেভিক পার্টি যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে মনে করতেন। তাই, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জড়িত থাকা সাম্যবাদী মতাদর্শের সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ ছিল না। ১৯১৭ থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির আঙ্গিকে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, জার্মানির সঙ্গে শান্তি স্থাপনের এবং দ্বিতীয়ত, বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের তৎপরতা। সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ট্রটস্কি জার্মানির সঙ্গে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব দেন। এর ভিত্তিতে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মার্চ বলশেভিক সরকার জার্মানির সঙ্গে ব্রেস্টলিটভস্ক সন্ধি সম্পাদন করে। এই সন্ধি অনুসারে রাশিয়া তার অধিকৃত পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়ার দায়িত্ব জার্মানির হাতে ন্যস্ত করে। এমনকি প্রতিশ্রুত হয় যে, ইউরোপের কোথাও সাম্যবাদী আদর্শের প্রচারে উদ্যোগী হবে না।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যুদয় পুঁজিবাদী জগতের কাছে বিপজ্জনক মনে হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই ইউরোপের সর্বত্র অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিপ্লবের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত রাশিয়া প্রচারে উদ্যত হয়। বলশেভিক দল রাশিয়াকে বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে। বলশেভিক নেতাদের ধারণা হয়েছিল যে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হওয়ায় সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে এবং যুদ্ধ ও বিপ্লবের অভিঘাতে বিশ্বের আমূল পরিবর্তন ঘটবে। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশরূপে সোভিয়েত রাশিয়াকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিধি প্রসারে ঐতিহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। লেনিন প্রমুখ নেতারা উপলব্ধি করলেন বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একক সমাজতান্ত্রিক শক্তিরূপে রাশিয়ার অস্তিত্ব বজায় রাখা এক কথায় অসম্ভব। লেনিনের উদ্যোগে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চে কমিনটার্ন বা তৃতীয় আন্তর্জাতিক নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্যবাদের প্রচার পরিচালনা এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল। লেনিনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী জি. ওয়াই. জিনোভিয়েভ কমিনটার্নে সভাপতি নিযুক্ত হন।

৩.১.৭ লেনিনোত্তর কালে সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা

১৯২১ সাল থেকে লেনিন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন ঘটে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে লেনিন নতুন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy) ঘোষণা করেন। পরিবহন ব্যবস্থা, বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রইল। কিন্তু কৃষকদের হাতে জমির মালিকানাস্বত্ব দেওয়া হল। কৃষকেরা নিজেদের ইচ্ছেমত শস্য বিক্রয় করার অধিকার পেল। ছোট ছোট শিল্প সংস্থার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হয়। রাশিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের মত বিদেশনীতিতেও নমনীয় মনোভাব দেখা যায়। বৈদেশিক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করতে সক্ষম সোভিয়েত

রাশিয়ার নিরাপত্তাহীনতা হ্রাস পায়। পাশ্চাত্য দেশগুলিও সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়। এরপর রাশিয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গো স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রথমে জার্মানির সঙ্গো র‍্যাপোলো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। পরে ইংল্যান্ডের সঙ্গো বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করে।

লেনিন ছিলেন সোভিয়েত বিপ্লবের রূপকার। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে জোসেফ স্টালিন (১৮৭৯-১৯৫৩) সোভিয়েত রাশিয়ার শীর্ষ নেতার পদে আসীন হন। প্রথম থেকেই স্টালিন ছিলেন লেনিনের বিশ্বস্ত অনুগামী। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বলশেভিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালকগোষ্ঠীর সদস্য হন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। লেনিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ, স্টালিন, কামেনেভ প্রমুখ। ট্রটস্কি ছিলেন লাল ফৌজের স্রষ্টা। চিন্তাভাবনা ও কর্মদক্ষতায় তাঁর স্থান ছিল লেনিনের পরেই। মূলত তাঁর সঙ্গো স্টালিনের মতবিরোধ চরমে ওঠে। স্টালিন ছিলেন 'একদেশে সমাজতন্ত্র' মতবাদের সমর্থক, পক্ষান্তরে ট্রটস্কি ছিলেন বিশ্ববিপ্লবের প্রবক্তা। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে ট্রটস্কি ক্ষমতা দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে দেশত্যাগ করেন। শুধুমাত্র ট্রটস্কি গোষ্ঠীকেই প্রতিহত করা হয়নি, এরপর স্টালিনের রোষানলে পড়লেন নিকোলাই বুখারিন প্রমুখ নেতারা। তাঁদের দক্ষিণপন্থী প্রবণতার সমর্থক বলে অভিযুক্ত করা হল। বুখারিনকে কমিনটার্নের নেতৃত্ব থেকে বহিষ্কার করা হল এবং স্টালিনের নির্দেশে কমিনটার্নের ষষ্ঠ সম্মেলনে (১৯২৮ খ্রিঃ) প্রতিটি দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে প্রতিহত করার নির্দেশ দেওয়া হল। শীঘ্রই বুখারিন প্রমুখদের দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসৃত করা হল।

পরিকল্পিত অর্থনীতি :

লেনিনের পরবর্তীকালে সোভিয়েত অর্থনীতির চরিত্র কি হবে সে বিষয়ে বলশেভিক দলে মতপার্থক্য দেখা যায়। বুখারিন প্রমুখ নেতারা নতুন অর্থনৈতিক নীতির (NEO) ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাইলেন। কিন্তু স্টালিন ও তাঁর সমর্থকগণ এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে কৃষিক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানা বহাল থাকলে নতুন বিত্তবান শ্রেণীর উন্মেষ ঘটবে এবং সাম্যবাদী অর্থনীতির গতি ব্যাহত হবে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে স্টালিনের অর্থনৈতিক নীতি অনুমোদিত হয়। ঐতিহাসিক অ্যালান বুলক লিখেছেন "The new economic course was now married to the nationalist theme of socialism in one country"। দ্রুত শিল্পায়নের ভিত্তিতেই সোভিয়েত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের শক্তি সুদৃঢ় করার প্রয়াস শুরু হল। কৃষিতে যৌথ খামার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি দ্রুত শিল্পায়নের কর্মসূচী গৃহীত হল। ইস্পাত ও কয়লা উৎপাদনের মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে যৌথ খামার ব্যবস্থার পরিণাম সুখকর ছিল না। কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং কৃষক অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আসলে স্টালিনের নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সোভিয়েত অর্থনীতিতে ভারসাম্য আনতে পারেনি।

নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবথা :

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে স্টালিন সোভিয়েত রাশিয়ায় বলশেভিক দল ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেন। স্টালিনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অ্যালান বুলক মনে করেন যে স্টালিন রাশিয়ায় আরোপিত বিপ্লব (revolution from above)–এর প্রতিভূ ছিলেন। সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় দলের আধিপত্য এবং দলের উপর স্টালিনের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল। মূল প্রতিদ্বন্দ্বীদের উৎখাত করে বেরিয়া, মলোটোভ প্রমুখ অনুগত নেতাদের সমর্থনে স্টালিনের ব্যক্তিগত আধিপত্য কার্যকর হয়। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে সের্গেই কিরভ (১৮৮৬-১৯৩৪)-এর রহস্যজনক হত্যার পর স্টালিন দমননীতির মাত্রা বৃদ্ধি করেন। দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার নামে অসংখ্য দলীয় নেতা ও কর্মীদের বিতাড়িত করা হয়। এই ঘটনা মহানিষ্কাশন (The Great Purge) নামে কথিত। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য একটি পৃথক দপ্তর খোলা হল, এর নাম NKVD। সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল সেগুলি হল—

চেকা ১৯১৭-১৯২২
জি.পি.ইউ ১৯২২-১৯২৪
ও.জি.পি.ইউ ১৯২৪-১৯৩৪
এন.কে.ভি.ডি ১৯৩৪-১৯৪১
এন.কে.জি.বি ১৯৪১-১৯৪৬
এম.জি.বি ১৯৪৬-১৯৫৪
কে.জি.বি ১৯৫৪-১৯৯১

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রায় পনের মিলিয়ন ব্যক্তিকে বন্দীশালায় চালান দেওয়া হয়। বন্দীশালার প্রচলিত রুশ প্রতিশব্দ হল গুলাগ (Gulag)। অ্যালান বুলক "Hitler and Stalin-Parallel Lives" গ্রন্থে স্টালিনের দমননীতিকে হিটলারের সন্ত্রাসবাদের সমগোত্রীয় বলে অভিহিত করেছেন। প্রখ্যাত সোভিয়েত লেখক আলেক্সিস টলস্টয় "পিটার দি গ্রেট" নামক উপন্যাসে স্টালিনের কর্তৃত্ববাদকে তারিফ করেছেন। পরবর্তীকালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিশতম পার্টি সম্মেলনে স্টালিনের ব্যক্তিগত কর্তৃত্ববাদকে কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, স্টালিনের নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে কিছুটা প্রয়োজন হলেও তা সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় ও গতিশীল করে তুলতে পারেনি। ১৯৮০-র দশকে মিখাইল গর্বাচভ সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দলতন্ত্রের স্থবিরতার বিকল্প হিসাবে সাম্যবাদের মানবিক অভিমুখে উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন।

৩.২ ❑ জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই জার্মান রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দল জার্মান সংসদে প্রধানতম রাজনৈতিক দলরূপে প্রতিষ্ঠিত

হয়। এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জার্মান রাষ্ট্রকে সমর্থনের প্রশ্নে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের মধ্যে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলের অধিকাংশ নেতাই জার্মান সংসদে সরকার পক্ষকে সমর্থন জানায়। রোজা লুক্সেমবার্গ, লিইবনেক্ট প্রমুখ নেতারা অবশ্য যুদ্ধনীতির বিরোধিতা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল তিনটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে—বামপন্থী, মধ্যপন্থী ও দক্ষিণপন্থী। জার্মান সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার জন্য রোজা লুক্সেমবার্গ "The Crisis in German Social Democracy' নামে পুস্তিকা লেখেন। এছাড়া তিনি ও তাঁর সহযোগী লিইবনেক্ট ও ক্লারা জেটকিন স্পার্টাকাস লিগ নামে একটি বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোলেন।

৩.২.১ যুদ্ধোত্তর অভ্যুত্থান

লেনিন প্রথম থেকেই জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, রাশিয়ার বলশেভিক দল অর্থনৈতিক দুর্দশা ও রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে দ্রুততালে বিপ্লবের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। জার্মানিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তি অনেক সুদৃঢ় এবং সেখানে শাসকগোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট বেশি। এদিকে জার্মান সমাজতন্ত্রীরা বিশেষত রোজা লুক্সেমবার্গ জার্মানির সঙ্গে রাশিয়ার সন্ধি স্থাপনে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে এর ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লুক্সেবার্গ ও লিইবনেক্ট বামপন্থীদের নিয়ে আবার নতুন করে গণসংগ্রাম গড়ে তোলার উদ্যোগে ব্রতী হন। জনগণের মধ্যে তাঁদের প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং জার্মানির বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে বার্লিনে ধর্মঘট সশস্ত্র সংঘর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বলশেভিকদের মতোই রোজা ও লিইবনেক্ট শ্রমিকদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার ও সোভিয়েত সেনা তৈরি করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কিন্তু জার্মান কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক বিশিষ্ট নেতাই তখন আপোসের পথে পা বাড়িয়েছেন, যার ফলে অনেকেই এঁদের সংগ্রামের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার পথে বাধা দান করেন।

জার্মান শাসকদলও এঁদের প্রভাব ও প্রচারে ভীত হয়ে পড়ে এবং পুনরায় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী রোজা ও লিইবনেক্টকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারাগারে নিয়ে যাবার পথে এঁদের হত্যা করা হয়। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এই হত্যার কোনও দায় স্বীকার করে না। একইসাথে ঘাতকবাহিনীর হাতে প্রাণ দেন জুগিচ।

অক্টোবর অভ্যুত্থান জার্মানিতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব প্রসঙ্গো ঐতিহাসিক এ.জে.পি. টেলর লিখেছেন যে ঐ বিপ্লব ছিল দিক পরিবর্তনকারী। কিন্তু দিক পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়েছিল। অনুরূপভাবে জার্মানির যুদ্ধোত্তর শ্রমিক আন্দোলন দিক পরিবর্তনকারী (turning point) হয়ে উঠতে পারেনি। সশস্ত্র বিপ্লবের সম্ভাবনা বিনষ্ট হওয়ার জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি (UPD) সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবিষ্ট হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ৪৫টি আসন লাভ করে এবং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ৭৭টি আসনে জয়লাভ করে।

৩.২.২ নাৎসী আধিপত্যবাদ ও জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

কিন্তু সংসদীয় পথে ক্ষমতা দখলের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে ও পুঁজিপতি শ্রেণী পরোক্ষভাবে সমর্থন করায় হিটলারের নাৎসী দল ক্ষমতা দখলে সমর্থ হয় (জানুয়ারী ১৯৩৩)। হিটলারের অভ্যুত্থানে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি, কমিনটার্ন ও সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান স্টালিনের দায়দায়িত্ব নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। জার্মান সমাজতন্ত্রী নেতা অটো ব্রাউন তাঁর স্মৃতিকথায় ও অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট নেত্রী রুথ ফিশার তাঁর গ্রন্থে ("Stalin and German Communism– A study in the origins of the state party") দেখিয়েছেন কিভাবে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করে মস্কোর নির্দেশে পরিচালিত হত এবং এর ফলে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি সঙ্কীর্ণ অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে।

স্টালিনের নির্দেশে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে যৌথভাবে হিটলারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি। এর ফলে জার্মানিতে বাম বিকল্পের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয় এবং রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগ নিয়ে হিটলার ও নাৎসীদল ক্ষমতা করায়ত্ত করে। অধ্যাপক আইজাক ডয়েশার (Issac Deutscher) তাঁর রচিত ("The Unifinished Revolution") পুস্তিকায় ত্রিশের দশকের শুরুতে স্টালিন এবং কমিনটার্নের অবাস্তব ও নিষ্ক্রিয় মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন। স্টালিনের ভ্রান্তনীতির ফলেই জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি সঙ্কীর্ণ ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। স্টালিন হিটলারের নাৎসীবাদের বিপদ সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন না এবং সোভিয়েত রাশিয়ার নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাইরে কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাননি। এমনকি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি হিটলারের অভ্যুত্থানকে একটি 'সাময়িক পদক্ষেপ' রূপে গণ্য করেছিল এবং সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে সহযোগিতা না করে তাদের 'সামাজিক ফ্যাসিস্ত' (Social Facist) রূপে চিহ্নিত করে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ডয়েশার সখেদে মন্তব্য করেছেন, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের জার্মান নির্বাচনে হিটলারের সহজ জয় আদৌ অনিবার্য ছিলনা। ডয়েশারের বক্তব্য হল জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এইরকম সঙ্কীর্ণ ও অবিবেচক অবস্থান গ্রহণ না করলে জার্মানিতে নাৎসী একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না।

৩.৩ ❑ ইতালিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩,০০,০০০ এবং সংসদে এই দলের ১৫৬ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। ২০০০ গ্রাম ও পৌর পরিষদে সমাজতন্ত্রীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। ট্রেড ইউনিয়নে তাদের সদস্য ছিল দুই মিলিয়ন।

ইতালিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব। পো নদীর উপত্যকায় কৃষকেরা কৃষি বিদ্রোহে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়। বিভিন্ন এলাকায় কমিউন গঠনে সমাজতন্ত্রীদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তাদের চাপে ভূস্বামীরা গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করে শহরে আশ্রয় নেয়।

ইতালির সমাজতন্ত্রী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আন্টোনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭)-র ভূমিকা উল্লেখ করা প্রয়োজন। গ্রামসি টুরিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সমাজতন্ত্রী দলে যোগদান করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইতালিতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে পার্টির শীর্ষ পদে আসীন হন এবং ইতালির সংসদে নির্বাচিত হন, পার্টির মুখপত্র অবন্তীর সম্পাদনা করেন। তুরিনে তাঁর নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন জঙ্গী চরিত্র ধারণ করে। মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ত দলের একনায়কতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে কমিউনিস্ট পার্টির উপর দমন নিপীড়ন চাপানো হয়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে গ্রামসি কারারুদ্ধ হন এবং দীর্ঘ এগারো বছর কারাবাসের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৩.৩ ❑ নাৎসী জার্মানির উত্থানের প্রতিক্রিয়া : গণফ্রন্টের বিকাশ :

৩.৪.১ ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্ট শাসন

ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থানের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে 'পপুলার ফ্রন্ট' বা গণ-মোর্চার বিকাশ ঘটে। এই জোটের লক্ষ্য ছিল ফ্যাসিবাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ এবং সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তি রক্ষা করা। সাধারণত বামপন্থী (Leftwing) ও উদারনৈতিকদের নিয়ে এই জোট গঠন করা হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের সময় ফ্রান্সে এই ধরনের পপুলার ফ্রন্ট নির্বাচনী জোট হিসাবে গঠিত হয় এবং নির্বাচনে সাফল্য লাভ করে। লিও ব্লুম-এর নেতৃত্বে সেখানে পপুলার ফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের র‍্যাডিকালস বা চরমপন্থী, সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টরা পপুলার ফ্রন্টকে সমর্থন করে। এছাড়া এর প্রতি ট্রেড ইউনিয়ন ও 'মানব অধিকার সংস্থা' (League of the rights of man) প্রভৃতিরও সমর্থন ছিল। নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্ট বিরাট সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্টরা এই সরকারে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মাঝে মধ্যেই শিল্পক্ষেত্রে ধর্মঘটের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে সরকারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। পপুলার ফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল— (১) ফ্যাসিবাদী সংস্থাগুলিকে দমন করা ; (২) সংবাদপত্রের সংস্কার প্রবর্তন এবং (৩) ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ও গণশিক্ষার প্রসার ; (৪) সমরাস্ত্র নির্মাণের শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা ; আর্থিক সংস্কার সাধন করা এবং (৫) বেকার সমস্যার সমাধান করা। প্রধানমন্ত্রী ব্লুম সমরাস্ত্র শিল্প ও ব্যাঙ্ক-অফ-ফ্রান্সের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে এবং ফ্যাসিবাদী সংস্থাগুলিকে ভেঙে দিতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁর মূল সংস্কারগুলি ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত পপুলার ফ্রন্ট ব্যর্থ হয়। মাত্র দুই বৎসরের শাসনকালে ফ্রন্ট সরকারের পক্ষে ঘোষিত ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়ণ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে পপুলার ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে এবং এডওয়ার্ড দালাদিয়ার (Daladier) -এর নেতৃত্বে চরমপন্থী সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। দালাদিয়ার জার্মান-বিরোধী নীতি থেকে সরে এসে ব্রিটেনের সঙ্গে যৌথভাবে জার্মানির প্রতি আপোস নীতি গ্রহণ করেন।

৩.৪.২ স্পেনের গৃহযুদ্ধ : গণফ্রন্টের বিপর্যয়

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে স্পেনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাম ও গণতান্ত্রিক গণফ্রন্ট ক্যাথলিক ও রাজতন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত জাতীয় ফ্রন্টকে পরাজিত করে। কিন্তু এর পরেই স্পেন এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়। বাম গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতালাভে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজতন্ত্রের সমর্থক কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর একাংশ প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথে ধাবিত হয়। এই বিদ্রোহের সংগঠক ছিলেন জেনারেল ফ্রাঙ্কো। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুলাই মরক্কোতে স্পেনীয় সৈন্যবাহিনী ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে বিদ্রোহে সামিল হয়। শীঘ্রই সমগ্র স্পেন গৃহযুদ্ধের কবলে পতিত হল। প্রজাতন্ত্রী ও রাজতন্ত্রী শিবিরের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে।

গৃহযুদ্ধের শুরু থেকেই ইতালি ও জার্মানি বিরোধীদের পক্ষ গ্রহণ করে। ইতালি ১৫০০০০ সেনা পাঠায় এবং জার্মানি রণসম্ভার দিয়ে বিদ্রোহীদের সমর্থন জানায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্পেনের ক্ষমতাসীন গণফ্রন্টের সরকার বিদেশী শক্তিগুলির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহায় সম্পদ সংগ্রহ করতে পারেনি। স্পেনের বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পরেই স্পেনের প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী লিও ব্লুমের সাহায্যপ্রার্থী হন। যদিও সমমতাবলম্বী স্পেনীয় সরকারের পক্ষ গ্রহণে ফ্রান্স আদর্শগত দিক থেকে আগ্রহী ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলডুইন কোন মতেই স্পেনের গৃহযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হতে চাননি। ব্রিটেনের আশঙ্কা ছিল স্পেনের গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে এক জটিল আন্তর্জাতিক সংঘাতের সূচনা হবে। তাই হস্তক্ষেপ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করে ব্রিটেন নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখতে চাইল।

বিদেশী সহযোগিতা না পেয়ে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকার এক অসম সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল। সোভিয়েত ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। কিন্তু রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সাহায্যের পরিমাণ ছিল নগণ্য। শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কো জয়যুক্ত হলেন এবং স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাচ্যুত হল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ থেকে প্রমাণিত হল ফ্যাসিবাদী সম্প্রসারণের প্রতিরোধ করতে বাম ও গণতান্ত্রিক দেশগুলি ব্যর্থ হয়েছিল। যদি ব্রিটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গো যৌথভাবে স্পেনের ফ্যাসিবাদী বিদ্রোহ প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হত, তাহলে জার্মানি ও ইতালি আগ্রাসী তৎপরতার ঝুঁকি নিতে সাহস পেত না। কূটনৈতিক দিক থেকে সোভিয়েত রাশিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। এরই সুযোগে জার্মানি আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের দিকে অগ্রসর হল।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি : একটি নির্ণায়ক পদক্ষেপ

ঐতিহাসিক অ্যালান বুলক, লেখক আইজাক ডয়েশার প্রমুখ মনে করেন জার্মানির নাৎসী আধিপত্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার পর স্টালিন রাশিয়ার জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেন। ভাগ্যের পরিহাস এই যে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি প্রধানতম শত্রু জার্মানির সঙ্গো অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৯ খ্রিঃ) সম্পাদন করতে বাধ্য হন।

বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানি সম্পর্কে দুই ধরনের আপাত-

বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। ব্রেস্টলিটভস্কের চুক্তি (১৯১৮), র‍্যাপোলো চুক্তি (১৯২২ খ্রিঃ) সোভিয়েত-জার্মান সহযোগিতার নিদর্শন ছিল। পক্ষান্তরে জার্মানির তীব্র সোভিয়েত বিরোধী মনোভাব রাশিয়াকে জার্মান বিরোধিতার পথ গ্রহণে বাধ্য করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়া সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণের হাত থেকে নিষ্কৃতি অর্জন করে।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির মূলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তোষণ নীতিকে দায়ী করা যায়। রাশিয়াকে উপেক্ষা করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসে এবং মিউনিক চুক্তির মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূখণ্ড জার্মানির হাতে ছেড়ে দেয়। এরপর হিটলার সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করলেন (মার্চ ১৯৩৯)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক মিত্রতা গড়ে তুলতে দোদুল্যমানতা দেখায়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উদসীনতায় ক্ষুব্ধ হয়ে রাশিয়া গোপনে জার্মানির সঙ্গে শলাপরামর্শ করে এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে আগস্ট রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হল। এরপর ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করলে রাশিয়া নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করে এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

৩.৫ ❑ প্রশ্নাবলী

(১) ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বলশেভিক বিপ্লবের পটভূমি আলোচনা কর।

(২) বলশেভিক বিপ্লবের আগমনে লেনিনের নীতি ও রণকৌশল ব্যাখ্যা কর।

(৩) বলশেভিক বিপ্লব-এর সাফল্য কি অনিবার্য ছিল।

(৪) 'আপৎকালীন সাম্যবাদ' (War Communism) কতটা যুক্তিগ্রাহ্য ?

(৫) 'একদেশে সমাজতন্ত্রবাদ' কি ? কিভাবে এই মতাদর্শ কার্যকর হয়েছিল ?

(৬) বলশেভিক রাষ্ট্র গঠনে লেনিনের ভূমিকা আলোচনা কর।

(৭) স্টালিনের সময় সোভিয়েত রাশিয়ার পুনর্গঠনের দিকগুলি উল্লেখ কর।

(৮) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ।

(৯) ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে বৈপ্লবিক মোড় ঘোরার সম্ভাবনা কিভাবে ব্যর্থ হয় ?

(১০) ফ্রান্সে গণফ্রন্ট সরকারের উন্মেষ ও পরিণতি উল্লেখ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(১) নতুন অর্থনৈতিক নীতি

(২) আপৎকালীন সাম্যবাদ

(৩) লিও ট্রটস্কি

(৪) একদেশে সমাজতন্ত্রবাদ

(৫) গুলাগ

৩.৬ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

ই.এইচ.কার—The Bolshevik Revolution.

অ্যালান বুলক—Hitler and Stalin-Parallel Lives.

আইজাক ডয়েশার—The Unfinished Revolution.

রুথ ফিশার—Stalin and German Communism.

ডেভিড টমসন—Europe Since Napoleon.

প্রণব চট্টোপাধ্যায়—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস

একক ৪ ❑ ইউরোপে উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান

গঠন

৪ (ক) ০ প্রস্তাবনা
৪ (ক) ১ গণতন্ত্রের শিথিল চরিত্র
৪ (ক) ২ ইতালিতে মুসোলিনির একনায়কতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠা
৪ (ক) ৩ মুসোলিনি কর্তৃক ফ্যাসিস্ত দল গঠন
৪ (ক) ৪ মুসোলিনির নীতি
৪ (ক) ৫ মুসোলিনির সংস্কার
৪ (ক) ৬ ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার ত্রুটি
৪ (ক) ৭ ফ্যাসিবাদের প্রকৃতি
৪ (ক) ৮ ইতালির বৈদেশিক নীতি
৪ (খ) ০ নাৎসী বিপ্লব : পটভূমি ও প্রকৃতি
৪ (খ) ১ পটভূমিকা
৪ (খ) ২ হিটলারের প্রথম জীবন
৪ (খ) ৩ নাৎসী দলের উত্থান
৪ (খ) ৪ নাৎসী সংগঠন ও প্রচার
৪ (খ) ৫ হিটলারের উত্থান : কিভাবে ও কেন ?
৪ (খ) ৬ হিটলারের ব্যক্তিগত ভূমিকা
৪ (খ) ৭ নাৎসী শাসনের প্রকৃতি
৪ (খ) ৮ প্রশ্নাবলী
৪ (খ) ৯ সহায়ক গ্রন্থসূচী

৪.ক.০ ❑ প্রস্তাবনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইউরোপে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি মজবুত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ধারণা হয়েছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলি জনমত উপেক্ষা করে নিজেদের আত্মম্ভরিতা জাহির করার জন্য যুদ্ধের পথে নিজ নিজ দেশকে ঠেলে দিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্ব কূটনীতির কাঠামো নির্মাণের স্বপক্ষে অভিমত দেন। তাঁর মতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পৃথিবীতে সংঘাত, অস্থিরতা উপশমে সহায়ক হবে। গোপন কূটনীতির পরিবর্তে মুক্ত পরিবেশে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিকশিত হবে।

৪.ক.১ ❑ গণতন্ত্রের শিথিল চরিত্র

দুঃখের কথা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের পরাজিত ও সদ্য প্রতিষ্ঠিত দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও, প্রথম থেকেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিথিল চরিত্র প্রকট হয়ে ওঠে। ইতালি ও জার্মানী এই দুই দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্ষয়িষ্ণু ও ভারসাম্যহীন হয়ে ওঠে। একথা সত্য, ইতালিতে ব্রিটেনের মত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলবৎ ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর আর্থ-সামাজিক সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইতালিকে গ্রাস করেছিল। জার্মানীতেও নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইউরোপের ইতিহাসে দুই ধরনের দ্বন্দ্ব দেখা যায়—একদিকে ছিল শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রচেষ্টা এবং এর বিপরীতে ছিল সংশোধনবাদী ও সম্প্রসারণশীল প্রবণতা। অন্যদিকে নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামো রচিত হয়, কিন্তু গণতন্ত্রের শিথিল চরিত্রের জন্য তা সুদৃঢ় হয়ে উঠতে পারেনি। বিভিন্ন দেশে নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যর্থ ও অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং একনায়কতন্ত্রী শক্তি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করে। ইতালি এবং জার্মানী এই দুটি দেশে একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুদয় হয়—তারা কালক্রমে শান্তি ও গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানে। ইতালিতে প্রথম গণতন্ত্র বিপর্যস্ত হয় এবং মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ত দলের একনায়কতন্ত্রী সরকার ক্ষমতা লাভ করে। জার্মানীতে অবশ্য ১৯২০-র দশকে ভাইমার প্রজাতন্ত্র ক্রমিক অবক্ষয়ের পথে ধাবিত হয় এবং তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। আলোচ্য সময়ে ইতালি ও জার্মানীতে গণতন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের ওপর একনায়কতন্ত্রী শাসনের কাঠামো রচিত হয়েছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলেও তা সংযত ও রক্ষণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করে।

৪.ক.২ ❑ ইতালিতে মুসোলিনির একনায়কতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠা

পটভূমিকা : মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালিতে একদলীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ও গণতন্ত্রের অবসান কোনও আকস্মিক ঘটনা ছিল না। নানা কারণে ইতালিতে এক সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল এবং সমাজজীবনে হতাশা ও রাজনৈতিক জীবনে শূন্যতা সৃষ্টি হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই সম্মেলনে ইতালির আশাভঙ্গ হয়। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় ইতালি জার্মানির পক্ষ ত্যাগ করে মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়। ইউরোপীয় রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি ও ইউরোপের বাইরে উপনিবেশ লাভের আশায় ইতালি মিত্রপক্ষে যোগদান করে এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন চুক্তিতে মিত্রপক্ষ ইতালিকে যে সকল স্থানের ওপর আধিপত্য বিস্তারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভার্সাই চুক্তিতে বাস্তবায়িত হয়নি। ডালমেশিয়া উপকূলে ইতালির প্রাধান্য স্বীকৃতি পায়নি। উপনিবেশ সম্পর্কেও ইতালির আশা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয়ত, পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পাশাপাশি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ইতালির আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে এবং কলকারখানা বন্ধ হতে লাগল। দেশবাসী অভাব-অনটনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হল এবং শ্রমিক শ্রেণির কর্মচ্যুতি শুরু হল। এই অবস্থায় শ্রমিক অসন্তোষ ও আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯১৮

খ্রিস্টাব্দে ২৯২টি শ্রমিক ধর্মঘট হয়, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২০০০। গ্রামাঞ্চলেও কৃষকেরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে এবং জমি দখল করতে থাকে।

তৃতীয়ত, ইতালির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। রুশ বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইতালির সমাজতন্ত্রীরা রাশিয়ার মত এখানেও বিপ্লব সংগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯১৯-২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইতালির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনগণ সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কারখানা, ডাকবিভাগ ও রেলবিভাগে শ্রমিক ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই সঙ্কটের সম্মুখে নিট্টি ও গিওলিট্টি প্রমুখ ক্ষমতাশীল নেতারা সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলেন। ইতালিতে ১৯১৯ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ছয়টি মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটে। অন্যদিকে দেশের জমিদার, শিল্পপতি ও মধ্যবিত্তের একটি শিক্ষিত অংশ একটি সুদক্ষ, স্থায়ী শাসনব্যবস্থার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। কারণ তারা সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল। দেশের এই শোচনীয় অভ্যন্তরীণ অবস্থার সুযোগ নিয়ে ইতালিতে মুসোলিনী ক্ষমতা দখল করলেন এবং ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন।

৪.ক.৩ ❑ মুসোলিনি কর্তৃক ফ্যাসিস্ত দল গঠন

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে রোমাগ্না নামক স্থানে মুসোলিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। পরে তিনি সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সুইজারল্যান্ডে 'অভান্তি' নামে একটি সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার সম্পাদনা করতে শুরু করলেন। পরে দেশে ফিরে এলে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে তিনি ইতালির যুদ্ধে যোগদান সমর্থন করতে থাকেন এবং এই বিষয়ে সমাজতান্ত্রিকদের সঙ্গে মতভেদ দেখা দিলে তিনি ঐ দল থেকে বিতাড়িত হন। যুদ্ধের অবসানে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনি, কর্মচ্যুত সৈনিকদের এবং জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিকদের মিলিত সম্মেলন আহ্বান করেন। সেখানে জাতির পুনরুজ্জীবনের জন্য এক দীর্ঘ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই সম্মেলন থেকেই 'ফ্যাসিস্ত' দলের উৎপত্তি (মার্চ, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে)। ফ্যাসিস্ত আন্দোলন শীঘ্র ইতালির নানা শহরে ও গ্রামে প্রসার লাভ করে। ফ্যাসিস্তগণ কালো পোশাক পরত ও কয়েকটি দণ্ডের একটি আঁটি ঐক্য ও কর্তৃত্বের প্রতীকচিহ্ন রূপে গ্রহণ করে। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে ফ্যাসিস্তদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে এই দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭,০০০। ১৯২১ খিস্টাব্দে এটি বেড়ে গিয়ে হয় ৩০,০০,০০০। ১৯১২ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে ফ্যাসিবাদী বাহিনী মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালির রাজধানী রোম অভিমুখে যাত্রা করল এবং সরকার নিয়ন্ত্রণের দাবি জানাল। গৃহযুদ্ধ পরিহারের উদ্দেশ্যে ইতালির রাজা মুসোলিনির হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণ করলেন। এইভাবে মুসোলিনি ইতালিতে ক্ষমতা দখল করেন।

৪.ক.৪ ❑ মুসোলিনির নীতি

মুসোলিনিকে বলা হত ইল ডুচে। ক্ষমতা দখল করে মুসোলিনি ইতালিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিধ্বস্ত করে ফ্যাসিস্ত দলের নেতৃত্ব একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। একমাত্র ফ্যাসিস্ত দল ছাড়া অন্য সকল রাজনৈতিক দলকে বে-আইনী ঘোষণা করা হল। এর আগে ইতালির প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''The war is here and it is a war of the people. The war of today will be the revolution of tomorrow." ১৯২৬ খ্রিঃ থেকে তিনি ডিক্রি বা আদেশ-এর মাধ্যমে দেশশাসন করতে লাগলেন এবং এর ফলে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ইতালি থেকে বিলুপ্ত হল। রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে ফ্যাসিবাদের মূল বক্তব্য ছিল রাষ্ট্রই সকল শক্তির উৎস—এই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রে ব্যক্তিসত্ত্বার কোন স্থান নেই এবং রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করাই রাষ্ট্রিক জীবনের মূল উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদিও তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্র বিরোধী, তবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তিনি অগ্রসর হন। মুসোলিনি ফ্যাসিস্টগণকে 'Solvers of problems' বলেছেন। তিনি ফ্যাসিবাদী আন্দোলনকে পার্টি-বিহীন 'এক জাতীয় আন্দোলন' (Non-party movement) বলেছেন। সমস্ত জাতি যখন নৈরাজ্যের দিকে ধাবিত হয়েছিল, তখন মুসোলিনি দেশের মানুষকে মুক্তির দিশা দেখান। তাঁর দলের মূলমন্ত্র ছিল—'রাষ্ট্র সকল শক্তির আধার' (Everything in the State, nothing outside the State and nothing against the State)। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বশান্তির নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। এইভাবে ইতালিতে মুসোলিনির একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি হয়ে ওঠেন দেশের একমাত্র নেতা বা 'ডুচে' (Duce)।

৪.ক.৫ ❑ মুসোলিনির সংস্কার

জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বহু ক্ষেত্রে মুসোলিনি কতকগুলি সংস্কার সাধন করলেন। ১) অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধনের জন্য তিনি সরকারী বাজেটে আয় ও ব্যয়ের সমতা বিধান করলেন ; অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা টেকনিক্যাল বোর্ড গঠন করলেন, এবং এই বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী নতুন নতুন কারখানা স্থাপন ও পুরাতন কারখানাগুলির পুনর্বিন্যাস করলেন ; খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহ দিয়ে তিনি দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুললেন। ২) শ্রমিকদের কাজের সময় কিছু হ্রাস করলেন, তাদের ন্যূনতম মজুরি স্থির এবং জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিয়ে তিনি জনসাধারণের জীবনযাত্রা সহজ করবার চেষ্টা করলেন ; ৩) ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের জন্য সরকারী উদ্যোগে জাহাজ কোম্পানী খোলা হল। একটি বিশালাকার জাহাজ প্রস্তুতের কারখানাও স্থাপিত হল ; ৪) মোটর, ইলেক্ট্রিক ও বেতার শিল্পের উন্নতি হল, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্রুত অগ্রসর হল, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা করা হল। মুসোলিনি প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল কথা ছিল অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ভিন্ন মুসোলিনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সংস্কারসাধনে সচেষ্ট হলেন ; ১) শিক্ষিতের

হারবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাখাতে যথেষ্ট অর্থ মঞ্জুর করা হল ; ২) পোপের সঙ্গে দীর্ঘকালের বিবাদ মিটিয়ে চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যসাধন করা হল ; ৩) এরপর মুসোলিনি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এক নতুন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন (Fascist Syndicalism)। এই সমস্ত সংস্কার সাধন করে মুসোলিনি ইতালির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু কিছু উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হলেন এবং ইতালি ইউরোপের একটি বিশিষ্ট শক্তিতে পরিণত হল।

৪.ক.৬ ❑ ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার ত্রুটি

রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে মুসোলিনি চমকপ্রদ উন্নতি সাধনে সক্ষম হলেও, তাঁর নীতি ত্রুটিহীন ছিল না। প্রথমত, মুসোলিনির পরিচালনায় ইতালিতে গণতন্ত্রের বিনাশ ঘটে। একমাত্র ফ্যাসিস্ত দল ছাড়া অন্যান্য সব দলকে নিশ্চিহ্ন করা হয় ; মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ খর্ব করা হয়। মুসোলিনি নিজেই বলেছিলেন, 'Fascism tolerates no dif ference of opinion.' দ্বিতীয়ত, শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল সত্য, কিন্তু সেই শিক্ষার মাধ্যমে ফ্যাসিস্ত সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়েছিল ; ফলে ব্যক্তিগত চিন্তাশক্তির বিনাশ ঘটে। এই সর্বাত্মক স্বৈরাচারের অধীনে থাকতে অস্বীকার করে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ইতালি ত্যাগ করে চলে যান। তৃতীয়ত, প্যারিস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত ট্রেনটিনোতে দুই লক্ষাধিক জার্মান ভাষাভাষী অস্ট্রিয়ান বাস করত ; সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে মুসোলিনি অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাধ্যমে তাদের ইতালির সঙ্গে অঙ্গীভূত করতে চাইলেন।

৪.ক.৭ ❑ ফ্যাসিবাদের প্রকৃতি

মুক্তপন্থী ঐতিহাসিকেরা ফ্যাসিবাদকে একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদের প্রতিফলন বলে মনে করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুসোলিনি ইতালির বিভিন্ন রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সমর্থনে এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করেছিলেন। তাই প্রকৃত অর্থে মুসোলিনি অবাধ ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। অন্যদিকে ক্রোচে প্রমুখ ফ্যাসিবাদ অনুরাগী ইতিহাসবেত্তারা মনে করেন যে, ফ্যাসিবাদ ছিল একটি অতিপ্রয়োজনীয় ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা। ফ্যাসিবাদের আগমনের ফলেই ইতালি যুদ্ধোত্তর অস্থির হতাশাব্যঞ্জক ব্যবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। ষাটের দশকের প্রথম থেকে ইতালির ঐতিহাসিক রেনজো দে ফেলিস (Renzo de Felice) ফ্যাসিবাদ ও তার চরিত্র নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল ফ্যাসিবাদ একটি 'বৈপ্লবিক ব্যবস্থা' (a revolutionary phenomenon)। এর মূলে ছিল একটি উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষমতা লাভের অদম্য প্রচেষ্টা। তাঁরা একদিকে যেমন প্রচলিত দুর্বল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন, অন্যদিকে তাঁরা সমাজতন্ত্রের প্রতিও আস্থাশীল ছিলেন না। তবে ফেলিস্-এর বক্তব্য অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও, এই যুক্তি সর্বগ্রাহ্য নয়। কেননা তিনি ফ্যাসিবাদের নেতিবাচক জনবিরোধী দিকগুলি চিহ্নিত করেননি।

৪.ক.৮ ❑ ইতালির বৈদেশিক নীতি : বিশের দশক

মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালিতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় শুধুমাত্র ইতালির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেই পরিবর্তন ঘটায়নি, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও ইতালির সম্প্রসারণবাদী কার্যকলাপ শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে এনেছিল।

ইতালির পররাষ্ট্রনীতির চরিত্র সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য হল যে, মুসোলিনি ছিলেন একজন সংশোধনবাদী, অর্থাৎ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্থিতাবস্থা রক্ষায় বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিলেন না। অবশ্য, যুদ্ধোত্তরকালে ইতালির জনমানসে ১৯১৯-এর শান্তি চুক্তি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল এবং মুসোলিনি এইভাবে ইতালিবাসীর মন জয় করতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের গণসমর্থনের ভিত্তি মজবুত করতে চেয়েছিলেন। মুসোলিনি ইতালির পূর্বতন গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কথা সদর্পে ঘোষণা করেন।

কিন্তু বিশের দশকে মুসোলিনি যুদ্ধ বা সংঘর্ষের পথ গ্রহণ করেননি। আসল কথা, বিশের দশকে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও বৈদেশিক কূটনৈতিক পরিবেশ ইটালির সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণের পক্ষে অনুকূল ছিল না। অভ্যন্তরীণ দিক থেকে মুসোলিনিকে দুটি বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হয়। প্রথমত, ইতালিতে ফ্যাসিস্ত দলের নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপনে মুসোলিনি য-বান হন। আবার অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানেও মুসোলিনিকে নজর দিতে হয়েছিল। এছাড়া বিস্তারনীতির পথে এগোতে হ'লে সামরিক প্রস্তুতিও প্রয়োজন। কিন্তু ইতালির দুর্বল অর্থনীতি বিশেষত বিশের দশকের শেষ দিকে মহামন্দার প্রকোপে ইতালি ইচ্ছাসত্ত্বেও সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক সাফল্য লাভ করতে পারেনি। বিশের দশকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইতালির পক্ষে অনুকূল ছিল না। ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই সময়ে ইউরোপীয় রাজনীতিতে পরিচালিকা শক্তিতে পরিণত হয়। জার্মানী দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সোভিয়েট রাশিয়া ছিল নিঃসঙ্গ। এমত অবস্থায় ইতালির পক্ষে কোন সংশোধনবাদী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, তাহলে তাকে যৌথ ব্রিটিশ-ফরাসী বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হত।

বিশের দশকে ইতালির পররাষ্ট্রনীতির কর্মতৎপরতার প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র ছিল ভূমধ্যসাগর ও বল্কান অঞ্চল। দুটি অঞ্চলেই ফ্রান্স ছিল ইতালির প্রধান প্রতিপক্ষ।

প্যারি সম্মেলনের পর থেকেই ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠতে থাকে। উত্তর আফ্রিকার টিউনিসিয়ায় ফরাসী প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় ইতালি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনির একনায়কতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে গণতান্ত্রিক ফ্রান্সের সঙ্গো ইতালির মতাদর্শগত ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এছাড়া বিশের দশকে ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে নৌ-শক্তি সংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে দু'টি দেশই প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়। এরপর বল্কান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের জন্য ইতালি ও ফ্রান্স উভয়েই সচেষ্ট হয়। ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার সঙ্গো পারস্পরিক চুক্তিতে আবন্ধ হয়। অন্যদিকে ইতালি আড্রিয়াটিক উপকূলে শক্তি বৃদ্ধির জন্য যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গো সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। যুগোশ্লাভিয়ার শক্তি হ্রাস

করার জন্য ইতালি অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গোরী এই দুটি দেশের সঙ্গোও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মিত্রতা স্থাপন করে।

এই সময়ে একদল উগ্র জাতীয়তাবাদী ফিউম শহরটি দখল করে নেয়। যুগোশ্লাভিয়া ইতালির পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির নিস্পৃহ মনোভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে যুগোশ্লাভিয়া ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ইতালির সঙ্গো একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনি আলবেনিয়ার সঙ্গো টিরানা সন্ধি (Treaty of Tirana) সম্পাদন করেন। এই চুক্তিতে আলবেনিয়ার ওপর কোন বৈদেশিক আক্রমণ ঘটলে ইতালি ও আলবেনিয়া যৌথভাবে তা প্রতিরোধ করবে।

৪.খ ০ ❑ নাৎসী বিপ্লব : পটভূমি ও প্রকৃতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জার্মান রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলবৎ হয়, কিন্তু এক দশকের মধ্যেই সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভাইমার প্রজাতন্ত্র বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী দলের একনায়কতন্ত্রী শাসন কায়েম হয়। নাৎসী দলের ক্ষমতালাভকে অনেকে নাৎসী বিপ্লব বলেছেন, কারণ এই গণ-সমাবেশ ও গণ-রাজনীতির পথ অনুসরণ করেই নাৎসীরা ক্ষমতায় এসেছিল। হতাশাগ্রস্ত একজন যুবক হিটলার কয়েক বছরের মধ্যেই নাৎসী দলকে জার্মান রাজনীতির পরিচালিকা শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হন। তাঁর এই অভূতপূর্ব উত্তরণকে এ.জে.রাইডার "বাজনাবাদক থেকে একনায়ক" (''From Drummer to Dictator'')-এ উত্তরণ বলে অভিহিত করেছেন।

৪.খ.১ ❑ পটভূমিকা

নাৎসী দলের একনায়কতন্ত্রী শাসনের প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক দিক থেকে অস্বাভাবিক ছিল না। উনিশ শতকে প্রাশিয়ার সামরিক শক্তির মাধ্যমে জার্মান রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জার্মানীর জনমানসে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এছাড়া ভাইমার প্রজাতন্ত্র রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে পারেনি। একের পর এক বহুদলীয় মোর্চা সরকার ক্ষমতাসীন হয়। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে শোচনীয় হয়ে ওঠে। আকাশছোঁয়া মুদ্রাস্ফীতি ও বেকার সমস্যার ভয়াবহতা জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে প্রধান সীমাবদ্ধতা ছিল বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, এর ফলে জার্মানীর রাজনীতিক স্থিতিশীলতা ছিল না। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে ব্যর্থতার জন্য জার্মানীর সাধারণ জনগণের মনে প্রজাতন্ত্রের প্রতি আস্থাভাব গড়ে ওঠেনি।

এইভাবে দেখা যায় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই জার্মান রাজনীতিতে অস্থিরতা ও অচলাবস্থা তৈরি হয়। ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে জেনরিখ ব্রুনিং প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। জার্মান সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় প্রেসিডেন্টের বিশেষ অনুশাসনবলে (৪০নং ধারা) জার্মান রাষ্ট্রব্যবস্থা চলতে লাগল। আসলে ব্রুনিং-এর সময় থেকেই সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্রের মুখোশধারী ব্যবস্থা শুরু হয়।

একইরকম সংকটজনক অচলাবস্থার প্রেক্ষাপটে হিটলার ও তাঁর নাৎসী দল শাসকদলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়।

৪.খ.২ ❑ হিটলারের প্রথম জীবন

১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত ব্রাউন্ড গ্রামের এক দরিদ্র চর্মকারের ঘরে অ্যাডলফ হিটলার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন শুল্ক বিভাগের কর্মচারী, মাতা ক্লারা সাধারণ কৃষক রমণী। বাল্যকালে পিতাকে হারিয়ে চরম দুঃখ কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটে। ভিয়েনার ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, যুদ্ধে আহত হয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। যুদ্ধ অবসানে তিনি মিউনিকে চলে আসেন এবং সেখানে জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টিতে যোগ দেন। ১৯২১ সালে দলের নাম রাখা হয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (National Socialist Party অথবা NAZI PARTY), দলীয় কর্মসূচীতে ভার্সাই-সন্ধির নিন্দা করা হয় এবং সমস্ত জার্মানদের নিয়ে একটি বৃহত্তর জার্মানী গঠনের নীতি গ্রহণ করা হয়। একই সঙ্গে ইহুদিদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হয়। এছাড়া সংসদীয় শাসনব্যবস্থাকেও আক্রমণ করা হয়। এই প্রোগ্রামে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। নাৎসীবাদে এক সর্বাত্মক বর্ণভিত্তিক ও আগ্রাসনমুখী মতাদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়।

১৯২৩ সালের নভেম্বরে হিটলার মিউনিকে জেনারেল লুডেনডর্ফের সঙ্গে যৌথভাবে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেন এবং হিটলার পাঁচ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই বিচারের সূত্র ধরে হিটলার জাতীয় রাজনীতিতে পরিচিতি লাভ করলেন। কারারুদ্ধ অবস্থাতেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মেইন ক্যামফ্ (Mein Kampf) রচনা করেন। এই গ্রন্থটিতে নাৎসী দলের আদর্শ ঘোষিত হয়। ভার্সাই চুক্তি অপেক্ষা রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব, জার্মান জাতির মহত্ত্ব এবং বিশ্ব শাসন করবার জন্মগত অধিকার—এইসব ছিল নাৎসীদলের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর গ্রন্থে ঐ আদর্শগুলি চয়ন করেন এবং ঐগুলিই নাৎসীদলের মূলমন্ত্র স্বরূপ হয়ে দেখা দেয়।

৪.খ.৩ ❑ নাৎসী দলের উত্থান

জার্মানীর সংকটজনক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নাৎসীদল জনসাধারণকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করতে লাগল। ১৯৩০ সালে সাধারণ নির্বাচনে নাৎসীদল ১০৭টি আসন লাভ করে। বিশ্ব সংকট তীব্রতর হবার সঙ্গে সঙ্গে নাৎসী দলের সমর্থকও দ্রুত বেড়ে যায় এবং ১৯৩২ সালের নির্বাচনে তারা রাইখস্ট্যাগে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। ১৯৩০ সালে তারা ৬৫ লক্ষ ভোট অর্জন করে, ১৯৩২ সালে তাদের স্বপক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে যায় (১৩৭০০,০০০)। কিন্তু ক্ষমতা লাভের আগে হিটলার জার্মানীর সংসদীয় রাজনীতিতে কখনও এক-তৃতীয়াংশের বেশি ভোট পাননি, যা হোক, ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন হিনডেনবার্গ হিটলারকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানালেন। (ক) হিটলার প্রথমে এক বহুদলীয় সরকারের প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত হন। তিনি

ছাড়া আর দু'জন নাৎসী দলভুক্ত মন্ত্রী ছিলেন। এরপর ১৯৩৩ সালের ২৮ ফ্রেব্রুয়ারী জার্মান সংসদে অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর একটি নির্দেশ জারী করে কমিউনিস্টদের দমন করেন। (খ) ৫ মার্চ (১৯৩৩ সালে) অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নাৎসী দল জার্মান সংসদে ২৮৮টি আসন লাভ করে। সংসদে শীঘ্রই Enabling Act অনুমোদিত হয় এবং হিটলার সর্বময় ক্ষমতা অর্জন করলেন। পরিশেষে ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্ট হিনডেনবার্গের মৃত্যু হ'লে হিটলার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট দুটি পদ নিজে গ্রহণ করেন এবং নিজেকে 'ফুহেরার' অর্থাৎ প্রধান নেতা বলে ঘোষণা করেন।

ঐতিহাসিক অ্যালান বুলক হিটলার ও সোভিয়েত রাশিয়ার কর্ণধার স্তালিনের নেতৃত্ব কর্মপন্থায় সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। দুজনেই একদলীয় নিয়ন্ত্রণবাদী শাসন কায়েম করেছিলেন। এ ছাড়া দুজনেই জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। হিটলার জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছিলেন আর স্তালিন একদেশে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারূপে রাশিয়ার স্বার্থকে সংরক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। তবে দুজনের মধ্যে পার্থক্যের দিকটিও তুলে ধরা প্রয়োজন। হিটলার নাৎসী দলের প্রতিষ্ঠাতা ও নাৎসী বিপ্লবের স্থপতি ছিলেন। পক্ষান্তরে লেনিন ছিলেন বলশেভিক দলের স্রষ্টা ও বলশেভিক বিপ্লবের স্থপতি তিনি আর স্তালিন ছিলেন লেনিনের অনুগামী, লেনিন স্থাপিত শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সোভিয়েত রাষ্ট্রের ইমারতকে তিনি সঞ্জীবিত করেন।

অতঃপর নিজ ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করবার জন্য হিটলার ইহুদী ও কমিউনিস্টদের ওপর অত্যাচার করে তাদেরকে দমন করতে লাগলেন ; নির্বাসন, গ্রেপ্তার, গোপন হত্যা—কোন পন্থাই তিনি বাদ দিলেন না। তিনি রাইখস্ট্যাগের সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। এইরূপ ভাবে প্রজাতন্ত্রেরও প্রকৃতপক্ষে বিনাশ ঘটল। জার্মানীতে একমাত্র ক্ষমতাবান পার্টি থাকল নাৎসী পার্টি এবং হিটলার হলেন তার একচ্ছত্র ডিরেক্টর। সমকালীন নাৎসী দলের তাত্ত্বিক লেখক আরনেস্ট হুবার (Ernest Huber) হিটলারের সর্বসময় কর্তৃত্ব সমর্থন করে মন্তব্য করেন—''The Fuhrer unites himself the whole sovereign power of the Reich, all public power in the state as in the movement stems from the Fuhrer's power!

হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী দলের অভ্যুদয়ের ঘটনাপ্রবাহে দুই ধরনের পদ্ধতির সমাবেশ দেখা যায়। প্রথমে তিনি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় হিটলার প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। আসলে হিটলার সংসদীয় পথে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সংসদীয় কাঠামো ভেঙে ফেলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। হিটলারের অনুগামী গোয়েবলস্ (Goebbles) ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বলেছিলেন নাৎসী দল গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে তাকে গ্রাস করতে চায় (''Like the wolf falling upon a herd of sheep, that is how we come'') । এরপর নাৎসী দল দু'ভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনায় মনোনিবেশ করে—সংসদীয় রাজনীতি ও গণ-আন্দোলন। দু'টি ক্ষেত্রেই নাৎসী দল উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে অগ্রসর হয়। এর জন্য মজবুত সংগঠন ও জোরদার প্রচারের ওপর নজর দেওয়া হয়।

৪.খ.৪ ❑ নাৎসী সংগঠন ও প্রচার

নাৎসী দলের সংগঠন ও প্রচার দু'টি দিকেই হিটলারের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ছিল। গোয়েরিং, হেস, রোজেনবুর্গ, রোয়েম, গোয়েবলস্ প্রমুখ নেতাদের সাহায্যে তিনি দলকে শক্তিশালী করে তোলেন। রক্তবর্ণ দলীয় পতাকা গ্রহণ করা হল। এর মধ্যিখানে সাদা রং-এর মধ্যে কালো স্বস্তিকা চিহ্ন শোভিত। লাল রং পুঁজিবাদ বিরোধিতার প্রতীক, সাদা রং জাতীয়তাবাদের ও স্বস্তিকা আর্য জাতির প্রতিবিম্ব। প্রচারের জন্য দলীয় মুখপত্র 'পিপলস্ অবজার্ভার' প্রকাশিত হল। দলীয় কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য এক ঝটিকা বাহিনী গঠিত হল—এর নাম ছিল 'স্টর্ম ট্রপার', সংক্ষেপে এস. এ. (S.A) । এই বাহিনী অন্যান্য দলগুলির ওপর হামলা চালাত। স্বেচ্ছাসেবকগণ বাদামি রং-এর পোষাকে সজ্জিত হওয়ায় তাদের 'ব্রাউন শার্ট'-ও বলা হত। এছাড়া ছিল রক্ষীবাহিনী যার নাম এস. এস. (Schutzstaf fela সংক্ষেপে S.S.) । হেনরিক হিমলারের নেতৃত্বে এই রক্ষীবাহিনী সবচেয়ে শক্তিমান হয়ে ওঠে। নাৎসী দলের মূল স্লোগান ছিল জয়তু জার্মানী আর ফুয়েরার (মহান নেতা) জিন্দাবাদ।

৪.খ.৫ ❑ হিটলারের উত্থান—কিভাবে ও কেন ?

ভাবতে আশ্চর্য লাগে ১৯২৮ সালের সংসদীয় নির্বাচনে নাৎসী দল মাত্র ২৬ শতাংশ ভোট পায়। ১৯৩০ সাল থেকে প্রাপ্ত ভোট ও আসন সংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩২- এর নির্বাচনে ৩৭.২ শতাংশ ভোট ও ২৩০টি আসন পেয়ে বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। ১৯৩২- এর নভেম্বরে ৩৩ শতাংশ ভোট ও ১৯৬টি আসন পায়। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হিটলারকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। মাত্র তিন-চার বছরের মধ্যে এতটা সাফল্যের কারণ কি সে বিষয়ে তর্কবিতর্কের শেষ নেই। আসলে জার্মানীর সংসদীয় রাজনীতির পালাবদল ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। প্রথমত, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে মহামন্দার প্রকোপ জার্মানীকে বেসামাল করে তুলেছিল, তাই মধ্যপন্থী উদারনৈতিক ও দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী দলগুলির জনপ্রিয়তা প্রচণ্ড হ্রাস পায়। এর সুবাদে হিটলারের নাৎসী দলের অগ্রগতি অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। প্রজাতন্ত্রের প্রতি জনগণের আস্থা বিপন্ন হয়—হিটলার পরিত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। দ্বিতীয়ত, জার্মান প্রজাতন্ত্রে ১৯৩০ সাল থেকে ক্রমশ দক্ষিণপন্থী প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়। দক্ষিণপন্থী দলগুলির পক্ষে ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। পাপেন, শিলার প্রমুখ দক্ষিণপন্থী নেতারা সাময়িকভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন। তাঁরা নাৎসী দলের সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখতে চাইলেন। জার্মানীর দক্ষিণপন্থী শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে প্রতিবিপ্লবী গণতন্ত্র বিরোধী আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন হিটলারকে তাঁরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। অধ্যাপক অ্যালান বুলক মনে করেন, হিটলারকে যাঁরা ক্ষমতায় নিয়ে এলেন তাঁরা হিটলারের পরিচালিত নাৎসী আন্দোলনের উগ্র প্রবল চরিত্র বুঝতে পারেননি।

৪.খ.৬ ❑ হিটলারের ব্যক্তিগত ভূমিকা

হিটলারের পরিচালনায় জার্মানীতে নাৎসী দলের ক্ষমতা লাভ শুধুমাত্র হিটলারের নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তার পরিণতি ছিল একথা বলা যায় না। একথা সত্যি, তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা ও বাগ্মিতা নাৎসী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক এ. জে. পি টেলর মনে করেন যে, হিটলারের নেতৃত্ব ও বাগ্মিতাকে নাৎসী দলের ক্ষমতা লাভের প্রধান কারণ বলা যায় না। তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী যদি নাৎসী দলের ক্ষমতা দখলের মূল কারণ হতো তাহলে এত দেরীতে নাৎসী দল ক্ষমতায় এল কেন? বস্তুতপক্ষে, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জার্মানীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল ও সংকটজনক হয়ে ওঠায় হিটলারের পক্ষে ক্ষমতায় আসীন হওয়া সম্ভব হয়েছিল। হিটলারের ক্ষমতা লাভের মূলে আপাত কারণ ছিল জার্মানীর রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক সংঘাত। বামপন্থী দলগুলি যথা—সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি সহমতে পৌঁছোতে পারেনি। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী দলগুলি বামপন্থী রাজনীতিকে কোণঠাসা করবার জন্য হিটলারকে পূর্ণমাত্রায় মদত দিয়েছিল। অভিজাত সম্প্রদায়, শিল্পপতিগণ ও সামরিক বাহিনী হিটলারের পক্ষ অবলম্বন করে।

হিটলার বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করেননি, বৈধ সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেই তিনি নাৎসী বিপ্লবের কর্মকাণ্ড শুরু করেন। এর দু'টি দিক ছিল। একদিকে জার্মান রাজনীতিতে হিটলার নাৎসী দলের একনায়কতন্ত্রী আধিপত্যবাদী শাসন কায়েম করেছিলেন, অন্যদিকে সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে নাৎসী দলের ও তার সর্বময় নেতা হিটলারের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হয়। এই প্রচেষ্টা 'সমন্বয় সাধন' (Gleichchaltang) নামে পরিচিত। রাষ্ট্র ও সমাজের ওপর নেতা ও দলের পরিপূর্ণ আধিপত্য কায়েম হয়েছিল। ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না, সবাই দলের ক্রীড়নকে পরিণত হয়।

৪.খ.৭ ❑ নাৎসী শাসনের প্রকৃতি

হিটলার বৈধ নিয়মতান্ত্রিক পথে ছয় মাসের মধ্যে বাম ও দক্ষিণপন্থী উভয় ধরনের দলগুলির কার্যকলাপে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেন। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে এক আইন জারি করে নাৎসী দলকে একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। এইভাবে বৈধ সংবিধানিক পথে ক্ষমতায় আসার পর নাৎসী দল 'ছদ্ম আইনী' ও 'প্রচ্ছন্ন সাংবিধানিক' আবরণ ধারণ করল। কিন্তু প্রশ্ন হল, ফরাসী বিপ্লব ও সোভিয়েত বিপ্লবের পর ঐ দুই দেশে যেরকম হিংসাশ্রয়ী গৃহযুদ্ধ জনিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, জার্মানীতে সে রকম কোন পরিস্থিতি দেখা যায়নি কেন? ঐতিহাসিক অ্যালান বুলক মনে করেন, জার্মান জনগণের অধিকাংশের মনে এই ধারণা হয় যে ১৯১৮ সালের পর জার্মান জাতি যে রকম অপমানজনক ও হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল তার থেকে নিষ্কৃতি মিলেছে এবং বিসমার্কের পর হিটলারই একমাত্র নেতা যিনি জাতীয় উজ্জীবন আনতে পারবেন।

প্রচলিত ধারণা হল হিটলার একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক একদলীয় আধিপত্যবাদী শাসন কায়েম করেছিলেন এবং সরকার, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন জার্মানীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তাঁদের মতে নাৎসী আন্দোলন বৈপ্লবিক ছিল না, তা ছিল প্রতিবিপ্লবী। এছাড়া নাৎসী সংগঠনে বিভিন্ন নেতার বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার বৃত্ত ছিল, হিটলার এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখতেন। তবে নাৎসী মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে হিটলার জার্মান জাতির মনে উদ্দীপনা ও উগ্র দেশপ্রেম সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামরিক শক্তির প্রসার এসবের মাধ্যমে জাতি, দল ও সরকার সবাইকে একবন্ধনে গেঁথে জার্মান জাতির মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা ছিল নাৎসী বিপ্লবের মূল আধার।

জার্মানীতে দল ও রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত চরিত্র সম্পর্কে একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। একথা সত্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের মত পার্টি ও রাষ্ট্র একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জার্মানীর পার্টি ও রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় দলই শেষ কথা, সমস্ত নীতি নির্ধারণের আধার হল দল। কিন্তু জার্মানীর বিষয়টি অন্যরকম দাঁড়াল। ১৯৩৪ সাল নাগাদ পার্টি, রাষ্ট্র ও ফুয়েরার এই ত্রিভুজের উপর জার্মান রাজনীতি প্রবিষ্ট হয়। দল বা রাষ্ট্র নয়, ‘ফুয়েরার’ হলেন সকল শক্তির আধার। নাৎসী দলের তাত্ত্বিক নেতা আরনেস্ট হুবার স্পষ্টই লিখেছেন ''The Fuhrer unites in himself the whole sovereign power of the Reich, all public power in the state as in the movement stems from the Fuhrer's power''.

আসলে জার্মানিতে নাৎসী বিপ্লব ‘নিচুতলার বিপ্লব’ (revolution from below) হয়নি, যা হয়েছিল ‘আরোপিত বিপ্লব’ (''revolution from above'') । জার্মান ঐতিহাসিক কে. ডি. ব্রেচার মনে করেন নেতার সর্বময় প্রভুত্ব এই জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যাতে দলীয় হস্তক্ষেপ ক্ষমতা বহাল রাখার পথে কাঁটা না হয়ে ওঠে।

৪.খ.৮ ❑ নাৎসী শাসনে জার্মানীর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতি

নাৎসী শাসনের দুটি দিকের কথা জার্মান ঐতিহাসিক ফ্রাঞ্জ নিউম্যান উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল আধিপত্যবাদ ও অর্থনৈতিক বিকাশ। আধিপত্যবাদ কায়েম করার জন্য ও তা সুদৃঢ় করার জন্য প্রচার ও দমন এই দুই পদ্ধতি সমান্তরালভাবে অনুসৃত হয়। প্রচারের ক্ষেত্রে হিটলারের প্রধান সহযোগী ছিলেন যোসেফ গোয়েবলস্ (১৮৯৭-১৯৪৫)। প্রেস, রেডিও ও গণমাধ্যমের সহায়তায় নাৎসী শাসনের ও মহান নেতার গুণকীর্তন শুরু হয়। এর পাশাপাশি দমন নীতির বাঁধন সুদৃঢ় করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী (S.A.) ও গোপন পুলিশ বাহিনী (S.S.) এই দুটি সংস্থাকে নিয়োজিত করা হল। প্রসঙ্গত বলা যায় নাৎসী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কর্ণধার ছিলেন আরনেস্ট রম। জার্মানীর নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়।

নাৎসী দলের প্রচার এবং সমাবেশে এরা মুখ্য ভূমিকা নেয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যরা ধূসর রঙের পোশাক পরত। তাই তারা 'Brown Shirt' নামে পরিচিত ছিল। অর্থনৈতিক দুর্দশা ও মানসিক হতাশার কবলে পতিত হয়ে তরুণ সম্প্রদায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দেয়।

হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নাৎসী স্বেচ্ছাসেবকদের মনে প্রত্যাশার মাত্রা বাড়তে থাকে। জাতীয় বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে। তাই এবার দ্বিতীয় বিপ্লব অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার বাসনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু হিটলার দ্বিতীয় বিপ্লবের পথে হাঁটতে রাজী ছিলেন না। সুশৃঙ্খল রক্ষীবাহিনী (S.S.) ও গোপন রাষ্ট্রীয় আরক্ষা বাহিনী (Gestapo) গঠন করে হিটলার নাৎসী দলের শৃঙ্খলা ও দলের উপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। হিটলার তাঁর দুই সহযোগী হিমলার ও গোয়েরিং-এর মাধ্যমে S.S. ও গেস্টাপো এই দুই সংস্থাকে মজবুত করে তুললেন। গেস্টাপোর মাধ্যমে হিটলার দলের মধ্যের ও বাইরের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করেন। এদিকে এস. এ. বাহিনী ও তার নেতা রম-এর কার্যকলাপে হিটলার ক্ষুব্ধ হলেন। ১৯৩৪ সালের ৩০শে জুন রমকে হত্যা করা হল এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্ষমতা খর্ব করা হল।

আধিপত্যবাদের সৌধ গড়ে তোলার পাশাপাশি হিটলার জার্মানীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। একদিকে যুদ্ধোত্তর জার্মানীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজন ছিল। এছাড়া মহামন্দার কবলে জার্মান অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই সড়ক নির্মাণ, শিল্প বিনিয়োগ প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু হিটলার জার্মানীর সমরসজ্জার স্বার্থেই অর্থনীতিকে নিয়োজিত করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন লিখেছেন ''Hitler had chosen the alternative path of militarism and foreign aggresion and opted for guns not butter'.

অর্থনীতির ক্ষেত্রে হিটলারের প্রধানতম পরামর্শদাতা ছিলেন হালমার শাকট। ১৯৩৪ সালে অর্থমন্ত্রীর পদে আসীন হয়ে তিনি জার্মানীর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করেন এবং পঁচিশটি দেশের সঙ্গে জার্মানী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এর ফলে জার্মানীর রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা উনিশ ভাগ বৃদ্ধি পেল। এই সময়ে জার্মানী দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে জার্মানীর অর্থনীতির স্বার্থে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়।

১৯৩৬ সালের পর জার্মানীর অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে নীতিগত পরিবর্তন ঘটে। শাকট্-এর বিকাশধর্মী নীতি হিটলারের মনঃপূত হল না। বিস্তারধর্মী পররাষ্ট্র নীতির অনুষঙ্গরূপে জার্মান অর্থনীতিকে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৩৬ সালে হিটলার নির্দেশ দিলেন চার বছরের মধ্যে জার্মান সৈন্যবাহিনীকে সমরাভিযানের উপযুক্ত করতে হবে। শীঘ্রই চার বৎসর মেয়াদী সমরসজ্জার পরিকল্পনা কার্যকর হল।

একথা সত্য, স্বল্পমেয়াদী সাফল্য লাভে জার্মান অর্থনীতি সক্ষম হয়েছিল। বেকারের সংখ্যা ছয় মিলিয়ন থেকে ৪ লক্ষে নেমে আসে। শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় আয়-এর পরিমাণ শতকরা আশি ভাগ উন্নীত হয়। তবে জার্মান অর্থনীতিতে নাৎসী শাসনে আধিপত্যবাদী ঝোঁক দেখা যায় এবং নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি গড়ে ওঠে। কিন্তু ক্রমশই সমরবাদী নীতির

স্বার্থে অর্থনীতিকে ব্যবহার করা হয়। ১৯৩৫ সালে জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের নির্দেশ জারি করা হল। ১৯৩৩ সালে জার্মান সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল ১০০,০০০, ১৯৩৫ সালে ৩৬ ডিভিসন সৈন্যবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানীর সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ১০৩ ডিভিসনে পৌঁছয়। স্থলবাহিনীর পাশাপাশি বিমানবাহিনী এবং নৌসেনার সংখ্যা দ্রুততালে বৃদ্ধি পায়। বিপুল সমরসজ্জার মাশুল দিতে হল জার্মান অর্থনীতিকে। সমরসজ্জার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ জোগাড় করা এক কথায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় বিস্তারের নীতির পথ অনুসরণ করা ভিন্ন আর কোন পথ রইল না। ঐতিহাসিক টিম ম্যাসন তাই মন্তব্য করেছেন। ''A war for the plunder of manpower and materials lay square in the dreadful logic of German economic development under National Societies.

৪.৮ ❑ প্রশ্নাবলী

(১) কিভাবে ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান হয়?
(২) ফ্যাসিবাদী শাসনের প্রকৃতি ও ভিত্তি আলোচনা করুন।
(৩) জার্মানিতে হিটলার কিভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন?
(৪) জার্মানিতে নাৎসীবাদের উত্থানের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাগুলি উল্লেখ করুন।
(৫) জার্মানিতে নাৎসী আধিপত্যবাদের প্রকৃতি ও কাঠামো আলোচনা করুন।
(৬) হিটলারের উত্থান জার্মান অর্থনীতির উপর কিভাবে প্রভাব ফেলেছিল?

৪.৯ ❑ সহায়ক গ্রন্থসূচী

(1) Bulock, Alan — Hitler—A study in Tyranny.
Bulock, Alan — Hitler and Stalin Parallel Lives.
(2) Blinorghan, Martin — Musoloni and Fascist Italy.
(3) W iskman, Elizabeth — Europe of the Dictators
(4) Thompson, David — Europe since Napolion.
(5) চট্টোপাধ্যায়, প্রণব — আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।

একক ৫ ❑ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : প্রেক্ষাপট ও পরিণতি—ঠাণ্ডা যুদ্ধের আগমন

গঠন

৫.১ প্রস্তাবনা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি : ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা
৫.২ হিটলারের বিস্তারধর্মী পররাষ্ট্র নীতি—প্রকৃতি ও প্রয়োগ
৫.৩ তোষণ নীতি ও তার পরিণাম
৫.৪ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আপাত প্রেক্ষাপট
৫.৫ ঠাণ্ডা যুদ্ধের সংজ্ঞা
৫.৬ ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট
৫.৭ ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা
৫.৮ ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রকৃতি
৫.৯ ট্রুম্যান তত্ত্ব : ঠাণ্ডা যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা
৫.১০ বেষ্টনী নীতি
৫.১১ সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া
৫.১২ অনুশীলনী
৫.১৩ গ্রন্থাবলী

৫.১ ❑ প্রস্তাবনা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি : ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর। জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করলে এই যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার জন্য পোল্যান্ড আক্রমণ ছিল আপাত বা তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎস অনুসন্ধান করতে হলে দুটি বিষয় স্মরণে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, যুদ্ধের ক্ষেত্র নির্ধারণ ও আক্রমণের মূলে ছিল জার্মানীর বিস্তারধর্মী তৎপরতা যার ফলে ইউরোপীয় রাজনীতির স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। অন্যদিকে নিছক হিটলারের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির উপর একতরফা দোষ আরোপ করা যুক্তি- গ্রাহ্য নয়। ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেলর মনে করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূলে কেউ নায়ক অথবা খলনায়ক ছিলেন না। সামাজিক ভুলভ্রান্তি ও দূরদৃষ্টির অভাব পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রমুখ পাশ্চাত্য দেশসমূহের ভ্রান্ত তোষণ নীতি যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে মূল্যহীন করে তুলেছিল আর কোনরকম প্রতিরোধ নীতি না থাকায় জার্মানী ক্রমশ বিস্তারমূলক কর্মকাণ্ডের পথে ধাবিত হওয়ার সুযোগ পায়। আসলে সদিচ্ছা থাকলে যুদ্ধকে প্রতিহত করা কষ্টসাধ্য ছিল না। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ চার্চিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে **'অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ'** (Unnecessary War) বলে উল্লেখ করেছেন। 'The Gathering Storm' গ্রন্থে চার্চিল স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন ''How did the English-speaking peoples, through their un wisdom, careless and good nature allowed the wicked to rearm?''

ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগমনের ঘটনাপ্রবাহকে দুভাবে বিভক্ত করেছেন—যথা, যুদ্ধের পথে যাত্রা (Drive to the war) and যুদ্ধের অভিমুখ (Drift to the war) অন্যভাবে বলা যায় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে দুভাবে আলোচনা করা যায়—বৃহত্তর প্রেক্ষাপট আর আপাত প্রেক্ষাপট।

বস্তুতপক্ষে ১৯৩৬ সালের মার্চে যুদ্ধের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট-এর দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। ঐ সময়ে জার্মান রাষ্ট্রনায়ক হিটলার ভার্সাই সন্ধি ও লোকার্ণো চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করে রাইন অঞ্চলে সেনা পাঠালেন। এরপর জার্মানী দুভাবে বিস্তার নীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। সর্ব জার্মানবাদ (Pan Germanism)-এর দাবি তুলে প্রথমে অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্তিকরণ করা হল (মার্চ ১৯৩৮)। এরপর চেকোশ্লোভাকিয়ায় জার্মান ভাষাভাষী সুদেতান অঞ্চল গ্রাস করার জন্য হিটলার সচেষ্ট হলেন। সেখানে জার্মান বাসিন্দাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে আন্দোলন শুরু করার প্রোরোচনা দেওয়া হয়। হিটলার ক্রমশ উগ্র সংহার মূর্তি ধারণ করলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন শান্তি সংরক্ষণের যুক্তি দেখিয়ে হিটলারের সঙ্গে আপোসরফায় এলেন। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানী, ইতালি, ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুগ্মভাবে মিউনিক চুক্তি সম্পাদন করলেন। চেম্বারলেন মিউনিক চুক্তিকে 'সম্মানজনক শান্তি' (Peace with honour) বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। ছয় মাসের মধ্যে হিটলার সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়াকে গ্রাস করে নিলেন।

৫.২ ❑ হিটলারের বিস্তারধর্মী পররাষ্ট্র নীতি : প্রকৃতি ও প্রয়োগ

হিটলারের বিস্তারধর্মী পররাষ্ট্র নীতি ইউরোপীয় রাজনীতির ভারসাম্য বিনষ্ট করে এবং যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তবে হিটলারের পররাষ্ট্র নীতির প্রকৃতি কি ছিল সে বিষয়ে তর্ক বিতর্কের অন্ত নেই। ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেলর মনে করেন হিটলারের পররাষ্ট্র নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, জার্মান পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য ছিল অযৌক্তিক ভার্সাই চুক্তির সংশোধন, টেলর-এর মতে হিটলার এই সংশোধনবাদী ধারণার সমর্থক ছিলেন। দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক টেলর মনে করেন হিটলার সুপরিকল্পিতভাবে পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করেননি। অধ্যাপক টেলর-এর ধারণা হিটলার অপরের ভুলভ্রান্তিকে ব্যবহার করে লক্ষ্যপূরণ করতে চেয়েছিলেন, কখনই নিজ উদ্যোগে এগোতে চাননি। অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ অবশ্য দেখাতে চেয়েছেন হিটলারের বিস্তারধর্মী পররাষ্ট্র নীতির পরিকল্পিত ছক তাঁর রচিত আত্মজীবনী গ্রন্থ (১৯২৫ খ্রিঃ) Mein Kampf-এ বিধৃত হয়েছে। অধ্যাপক টেলর এই বক্তব্যকে নস্যাৎ করে বলেছেন যে হিটলারের বিস্তারধর্মী নীতির ক্ষেত্রে স্থির পরিকল্পনা 'দিবা স্বপ্ন' (Day Dream) ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু অ্যালান বুলক প্রমুখের মতে হিটলার নিছক শুধুমাত্র একজন সুযোগসন্ধানী রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি সুপরিকল্পিতভাবে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তবে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তিনি পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।

বিস্তার নীতির রূপায়ণ :

হিটলারের পররাষ্ট্র নীতির বিবর্তনে দুটি সুস্পষ্ট পর্যায় পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি সম্প্রসারণ নীতির পথে এগোননি, জার্মানীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি সুসংহত করা তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল। ১৯৩৬ সালের পর থেকে বিস্তারধর্মী কর্মসূচী রূপায়নে উদ্যত হন। পাশ্চাত্য দেশগুলির দোদুল্যমানতা ও জাতিসঙ্ঘের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি আক্রমণাত্মক রণকৌশল গ্রহণ করেন। অধ্যাপক অ্যালান বুলক লিখেছেন, "His foreign policy combined consistency of aim with complete opportunism in method and tactics." হিটলারের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে জাতিতত্ত্ব (race) ও ভূখণ্ড অধিকার (space) এই দুইয়ের সমাবেশ দেখা যায়। জার্মান জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের দাবিতে ইউরোপের জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি জার্মানীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে বৃহত্তর জার্মান রাষ্ট্র গঠন তাঁর আপাত উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এর পাশাপাশি ইউরোপ মহাদেশে অ-জার্মান অঞ্চলগুলি গ্রাস করে জার্মান রাষ্ট্রকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত করা হিটলারের মূল লক্ষ্য ছিল। তবে হিটলার ছিলেন একজন চতুর, সুযোগসন্ধানী রাজনীতিবিদ। তাই পরিকল্পনা মাফিক না এগিয়ে পররাষ্ট্র নীতির রূপায়ণে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এগিয়েছিলেন।

৫.৩ ❑ তোষণ নীতি ও তার পরিণাম

১৯৩০-এর দশক বিশ্বরাজনীতিতে সংকটের যুগ নামে পরিচিত। কেননা এই সময়ে একনায়কতন্ত্রী দেশগুলির জঙ্গি বিস্তারধর্মী নীতি শক্তিসাম্য বিনষ্ট করে। এর বিপরীতে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে। পাশ্চাত্য দেশগুলি শান্তি সংরক্ষণের জন্য সম্প্রাসারণবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধমূলক (deterrent) নীতি গ্রহণ করলেন না। পক্ষান্তরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স আত্মঘাতী আপোসমুখী নীতি অনুসরণে সচেষ্ট হয়। এই নিরাসক্ত আপোসমুখী নীতি তোষণ নীতি নামে পরিচিত।

তোষণ নীতি সম্পর্কে দুধরনের পরস্পর বিপরীত ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। হুইলার বেনেট, মার্টিন গিলবার্ট, হিউ ট্রেভার রোপার প্রমুখ ইতিহাসবিদগণ তোষণ নীতিকে ভ্রান্ত, অনৈতিক, অদূর-দর্শী বলে চিহ্নিত করেছেন। এই নীতির ফলে জার্মানীর বিস্তারধর্মী তৎপরতা বিনা প্রতিরোধে জয়যুক্ত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছিল। এই প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছেন ঐতিহাসিক এ.জে.পি. টেলর। অধ্যাপক টেলর The Origins of the Second World War গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে ব্রিটেন, ফ্রান্স সুপরিকল্পিতভাবে তোষণ নীতি গ্রহণ করেনি। ঐতিহাসিক এফ. এফ. নথেজ অবশ্য মনে করেন যে ব্রিটেন ইচ্ছাকৃতভাবে তোষণ নীতি গ্রহণ করেনি, শান্তিপূর্ণভাবে বাণিজ্যিক কার্যকলাপের স্বার্থে কোন সক্রিয় হস্তক্ষেপমূলক নীতি গ্রহণ করতে চায়নি। তাই পোল্যান্ড ও রোমানিয়ার অখণ্ডতা রক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়।

তোষণ নীতির রূপায়ণ :

তোষণ নীতির গতিধারায় তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায় দেখা যায়। ১৯৩৬ সালের মার্চ থেকে ১৯৩৮ সালের মার্চ পর্যন্ত সময় তোষণ নীতির প্রথম পর্ব। এ সময়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রচ্ছন্ন তোষণ নীতি গ্রহণ করে। স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করার জন্য জেনারেল ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহে অবতীর্ণ হলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রজাতান্ত্রিক সরকারের স্বপক্ষে হস্তক্ষেপ করতে রাজী হয়নি। ব্রিটেন, ফ্রান্সের নিরপেক্ষতার সুযোগ নিয়ে ইতালি, জার্মানী গৃহযুদ্ধে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে। এর ফলে ফ্রাঙ্কো জয়যুক্ত হন। অধ্যাপক এ.জে.পি. টেলর মন্তব্য করেছেন স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহের সাফল্যের মূলে ছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিষ্ক্রিয়তা।

স্পেনের গৃহযুদ্ধকে সচরাচর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া হলা হয়ে থাকে। কারণ এরপর একনায়কতন্ত্রী দেশগুলি বিনা প্রতিরোধে শান্তি সংহার করতে থাকে। অন্যদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিষ্ক্রিয় তোষণ নীতির আত্মঘাতী পথে এগোতে থাকে। কিন্তু তোষণ নীতি বাস্তবসম্মত ছিল না। শান্তি রক্ষার যুক্তি দেখিয়ে এই নীতি অনুসৃত হলেও আসলে তোষণ নীতি হিটলারের সম্প্রসারণ নীতিকে পরিপুষ্ট করেছিল।

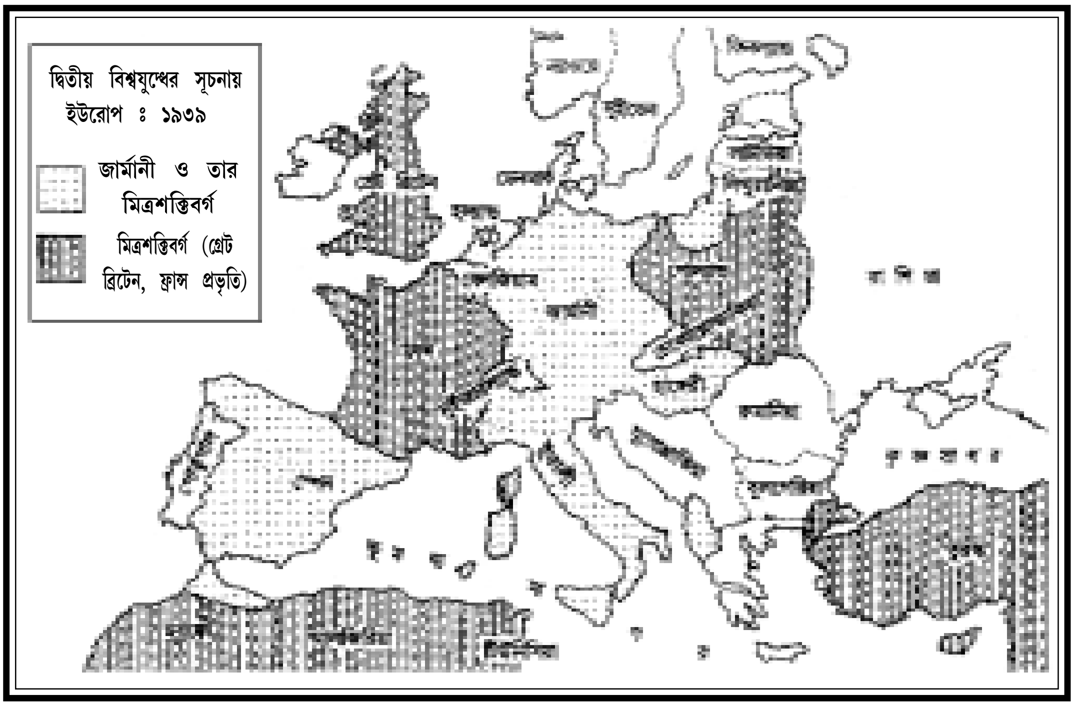

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল আকস্মিক। অধ্যাপক টেলর এই যুদ্ধকে পথ দুর্ঘটনার সমতুল বলেছেন। কিন্তু যুদ্ধের আগমন ছিল অবধারিত। পোল্যান্ড নিয়ে যুদ্ধের সূচনা এড়ানো সম্ভব হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা যুদ্ধের আগমনকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

৫.৪ ❑ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আপাত প্রেক্ষাপট

জার্মান একনায়ক হিটলার কর্তৃক পোল্যান্ডের উপর চাপ সৃষ্টির ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার পরিণতি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করার পর হিটলার পোল্যান্ডের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে সংঘাতে না গিয়ে আপোসরফায় আসবে। তাই যুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়ে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে কাজ হাসিল হবে। হিটলার পোল্যান্ডের কাছে বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী ডানজিগ বন্দর প্রত্যর্পণ-এর দাবি জানালেন এবং একই সঙ্গে জার্মানীর সঙ্গে ডানজিগের সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রবেশ পথ চাইলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন হিটলারের দুরভিসন্ধির উপর আস্থা রাখতে পারলেন না। তাই জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করলে ব্রিটেন পোল্যান্ডের নিরাপত্তা রক্ষার অঙ্গীকার করে ছিল। এই পরিস্থিতিতে হিটলার জার্মানীর কূটনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। পূর্ব সীমান্তে সোভিয়েত রাশিয়া আর পশ্চিমে ব্রিটেন ও ফ্রান্স থাকায় দুই সীমান্তে সমান্তরাল যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়ার সম্ভাবনা হিটলারকে উদ্বিগ্ন করল। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানীর সঙ্গে আপোসরফায় না আসায় হিটলার প্রধানতম শত্রু দেশরূপে চিহ্নিত সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক বোঝাপড়ায় উন্নীত হলেন। ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগস্ট জার্মান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিকে কূটনৈতিক বিপ্লব বলা যায় কেননা মূল শত্রু এখন কূটনৈতিক সমঝোতায় আবদ্ধ আর ব্রিটেন ও ফ্রান্স এখন জার্মানীর প্রধান শত্রুদেশ হয়ে উঠল।

তাই যখন ও যেভাবে হিটলার যুদ্ধের পথে এগোতে চেয়েছিলেন তা সম্ভব হল না। ১৯৪২ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলার যুদ্ধের পথে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিন বছর আগে রাশিয়াকে স্বপক্ষে এনে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হল। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের সূত্র ধরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

হিটলারের বিস্তারধর্মী পররাষ্ট্র নীতির পাশাপাশি সুদূর প্রাচ্যে জাপান, আফ্রিকায় ইতালি সম্প্রসারণবাদী তৎপরতা শুরু করে। প্রথমে জাপান মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করে এবং তারপর চীনের মূল ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায়। ইতালি আফ্রিকার অন্তর্গত ইথিওপিয়া রাজ্যটি গ্রাস করে। ইতালি, জার্মানী ও জাপান পৃথক পৃথক ভাবে বিস্তার নীতির পথে ধাবিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু এই তিনটি দেশই ছিল সমরবাদী ও গণতন্ত্র বিরোধী। শীঘ্রই তারা পারস্পরিক কূটনৈতিক সমঝোতায় আবদ্ধ হল। ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধের পর ইতালি, জার্মানী উভয়েই স্পেনের একনায়কতন্ত্রী সমরনায়ক ফ্রাঙ্কোর পক্ষ গ্রহণ করে। অন্যদিকে জার্মানী, জাপান উভয়েই ছিল সাম্যবাদী রাশিয়ার মূল

প্রতিপক্ষ। ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে জার্মানী, জাপান 'কমিনটার্ন বিরোধী চুক্তি' (Anti comintern pact)-তে আবদ্ধ হয়। পরের বছর ইতালি জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে একত্রে অক্ষ জোট গঠন করে। এই জোটকে রোম-বার্লিন—টোকিও মৈত্রী বলা হয়ে থাকে।

সামরিক ও কূটনৈতিক উভয় দিক থেকেই যখন ফ্যাসিবাদী ও সমরবাদী শক্তিবর্গ নিজেদের শক্তি সংহত করছিল, সেই সময় যৌথ নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালনে জাতিসঙ্ঘ সার্বিক ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। জাপান, ইতালি, জার্মানী পররাজ্য গ্রাস করলেও জাতিসঙ্ঘের পক্ষে কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। জাতিসঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষায় বেশি আগ্রহী ছিল, তাই সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে যৌথ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য মিলিত প্রচেষ্টা সংগঠিত করা যায়নি। এছাড়া জাপান, ইতালি, জার্মানী জাতিসঙ্ঘকে সদর্পে অগ্রাহ্য করতে লাগল। এমনকি তারা জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয়নি।

৫.৫ ❑ ঠাণ্ডা যুদ্ধের সংজ্ঞা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী চার দশক আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগ নামে কথিত। ঠাণ্ডা যুদ্ধের চরিত্রে বিশেষ দিক লক্ষণীয়। প্রথমত, ঠাণ্ডা যুদ্ধ বলতে যুদ্ধ বোঝায় না আবার শান্তিও বোঝায় না। যুদ্ধও নয়, আবার শান্তিও নয়—এই রকম ত্রিশঙ্কু অবস্থার দোলাচল দেখা যায় ঠাণ্ডা যুদ্ধের আঙ্গিকে। দ্বিতীয়ত, ঠাণ্ডা যুদ্ধে দুই মহাশক্তিধর দেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মহাশক্তিরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং এই দুটি দেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমাবেশ ঘটে ঠাণ্ডা যুদ্ধে। প্রখ্যাত লেখক লুই হ্যালে দুটি মহাশক্তির সংঘাতকে 'বৃশ্চিক' (scorpion) ও মাকড়সা (tarantula)-র সংঘাত বলে অভিহিত করেছেন। তৃতীয়ত, ঠাণ্ডা যুদ্ধ বিশ্বের ইতিহাসে এক অভিনব সংঘাতের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের পাশাপাশি সমগ্র বিশ্ব দুটি পরস্পর বিপরীত মতাদর্শ জনিত সংঘাতে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। চতুর্থত, ঠাণ্ডা লড়াইকে অনেকে দীর্ঘতম শান্তি (The Longest Peace) বলে মন্তব্য করেছেন। কেননা দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির একে অন্যকে প্রতিহত করার জন্য সদা সচেষ্ট ছিল। এর ফলে বিশ্বরাজনীতিতে ভারসাম্য বজায় ছিল এবং কোন বড়মাপের সরাসরি সংঘাতের সূচনা হয়নি।

১৯৪৭ সালে প্রখ্যাত মার্কিন লেখক ও সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান প্রথম ঠাণ্ডা যুদ্ধ বা cold war কথাটি চয়ন করেছেন। অন্যদিকে মার্কিন কূটনীতিবিদ জর্জ কেন্নান এটিকে বেষ্টনী নীতি বলে চিহ্নিত করেছেন।

৫.৬ ❑ ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের দুটি প্রধানতম শক্তিমান রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলির মত তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। খনিজ সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের

ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। একথা সত্য যুদ্ধের পর মার্কিন সেনাবাহিনীর সংখ্যা বারো মিলিয়ন থেকে দুই মিলিয়নে নামিয়ে আনা হয়েছিল। নৌশক্তি ও বিমান বহরের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য কায়েম হয়েছিল। বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক শক্তিরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা প্রতিপন্ন হল।

কিন্তু ঠাণ্ডা যুদ্ধকে শুধুমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিণতি বলা সঙ্গত নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ও সময়ে পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতবিরোধ ছিল। মার্কসবাদে বিশ্ব বিপ্লবের ধারণা পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়েছিল। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদের সংহার কমিউনিস্ট পার্টির অভীষ্ট লক্ষ্য। তাই ত্রিশের দশকে হিটলার বিস্তার নীতির পথে এগোলে পাশ্চাত্য দেশগুলি নিরাসক্ত মনোভাব গ্রহণ করে। এমনকি ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্ভাব্য সংঘর্ষের সম্ভাবনা তাদের কাছে বেশি আর্কষণীয় মনে হয়েছিল। কারণ ফ্যাসিবাদ, রাশিয়া উভয়ের শক্তিহানি ঘটলে পাশ্চাত্য দেশগুলি বিশ্ব রাজনীতিতে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখতে পারবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ রাশিয়ার সঙ্গে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মহাজোটে আবদ্ধ হলেও মিত্রপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ অবিশ্বাস অব্যাহত ছিল। স্টালিন ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পরামর্শ দেন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন মহলে নিরাসক্ত মনোভাব দেখে স্টালিন ক্ষুব্ধ হন।

একথা সত্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেউই প্রথম থেকে অনমনীয় সংঘাতমূলক অবস্থান গ্রহণ করেনি। যদিও সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান স্টালিন পুঁজিবাদী জগতের সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়ার পক্ষে কোন সংঘাতমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার ঝুঁকি নিতে চাননি। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এফ. ডি. রুজভেল্ট সহমর্মিতা ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে একটি যৌথ বিশ্ববিধান গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। চার ধরনের স্বাধীনতার প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিল—এগুলি হল বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অভাব ও দারিদ্র থেকে মুক্তি আর ভয় ভীতি থেকে পরিত্রাণ। ১৯৪৫ সালের ইয়ল্টা সম্মেলনে ইংলন্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোঝাপড়ার মনোভাব দেখায়।

কিন্তু যুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিতে শক্তিসাম্যের আঙ্গিকে রূপান্তর ঘটে, জার্মানী ও জাপানের পতন এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আর্থিক শক্তিহানির ফলে ইউরোপের মহাদেশীয় রাজনীতিতে রাশিয়া একক শক্তিধর দেশে পরিণত হল। এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনী পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে জার্মান আধিপত্য থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। এরপর সোভিয়েত রাশিয়া যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া সমেত সমগ্র পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট দলের প্রভাবাধীন অনুগত সরকার গঠনে সমর্থ হয়। পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়ন কি সুপরিকল্পিতভাবে প্রাধান্য স্থাপন করেছিল? এ সম্পর্কে হিউ-সেটন-ওয়াটসন মনে করেন যে যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বিনা প্রতিরোধে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ইউরোপে একটি প্রভাবাধীন বলয় স্থাপন করে। কিন্তু ঐতিহাসিক ডেভিড হরোউইজ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম দিকে নমনীয় মনোভাব পোষণ করত, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলির বৈরিতা তাকে পূর্ব ইউরোপে নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থা কায়েম করতে বাধ্য করে।

৫.৭ ❑ ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা

যদিও ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যানের মার্কিন কংগ্রেসে ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল, তার আগেই দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরের উন্মেষ ঘটেছিল। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ স্যার উইনস্টন চার্চিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরী প্রদেশের ফালটনে ওয়েস্টমিনিস্টার কলেজে সম্মানমূলক ডিগ্রি গ্রহণকালে প্রদত্ত ভাষণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসী দুরভিসন্ধিমূলক তৎপরতা সম্পর্কে সাবধান করে দেন। তাঁর মতে পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন কালো লৌহ যবনিকার অন্তরালে আচ্ছাদিত। ঠিক একই সময়ে ১৯৪৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী রাশিয়ার কর্ণধার স্টালিন এক ভাষণে সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের কথা তুলে ধরেন। দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ সংগ্রামের কথা ব্যক্ত করেন। এরপর মার্কিন সরকারি মহল সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি নমনীয় মনোভাব ত্যাগ করে।

৫.৮ ❑ ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রকৃতি

ঠাণ্ডা যুদ্ধ কি আদর্শগত দ্বন্দ্ব না ক্ষমতার সংঘাত সে বিষয়ে ঐতিহাসিক ও ভাষ্যকারদের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নেই। আপাতদৃষ্টিতে দুই মহাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী মতাদর্শের মধ্যে সংঘাতের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। মতাদর্শগত সংঘাতের বিষয়টি মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডিন অ্যাকেসন স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন।

"The threat to western Europe seemed to me singularly like that which Islam had posed centuries before, with its combination of ideological zeal and fighting power." মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনে এই ধারণা জন্মায় যে সাম্যবাদের পীঠস্থান সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনমতেই পুঁজিবাদী জগতের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে রাজী হবে না।

১৯৬০ সালের পর ঠাণ্ডা লড়াই নিয়ে ইতিহাস চর্চায় সংশোধনবাদী ব্যাখ্যার অবতারণা হয়। ডি. এফ. ফ্লেমিং, গ্যাব্রিয়েল কলকো, উইলিয়াম এ. উইলিয়ামস প্রমুখ মনে করেন যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের আগমনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনমনীয় আধিপত্যবাদী মনোভাব সর্বতোভাবে দায়ী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রধানতম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র বিশ্বে নিজের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করার বাসনা দ্বারা তাড়িত হয়ে সক্রিয় হস্তক্ষেপমূলক নীতি গ্রহণ করে। একই সুরে গার অ্যালপারোভিজ তাঁর Atomic Diplomacy গ্রন্থে লিখেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসাবে সংযত নীতি পরিহার করে সংঘাতপূর্ণ নীতি গ্রহণ করে। পারমাণবিক বোমার সুবাদে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান রুজভেল্ট-এর সহাবস্থানমূলক নীতিতে ছেদ টানেন এবং সংঘাতমূলক নীতি গ্রহণে উদ্যত হন। অন্যদিকে রাশিয়ার কর্ণধার স্টালিন নমনীয় মনোভাব অব্যাহত রাখেন। হরোউইজ লিখেছেন স্টালিন চীন, ইতালি, ফ্রান্স ও অন্যত্র কমিউনিস্ট দলগুলিকে সংযত আচরণ করার নির্দেশ দেন।

শেষ বিচারে আদর্শগত দ্বন্দ্ব না ক্ষমতার সংঘাত সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা

কষ্টকর। আসলে ঠাণ্ডা যুদ্ধের মধ্যে আদর্শগত ও শক্তির সংঘাত দুইয়েরই সমাবেশ ঘটেছিল। লেখক মার্টিন ওয়াকার মনে করেন শক্তির সংঘাত ও আদর্শগত বিরোধ এ দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছিল ঠাণ্ডা যুদ্ধ। তাঁর ভাষায় ''It was about the balance of power, a war of German succesion and at the same time it was an ideological confrontation.

৫.৯ ❑ ঠাণ্ডা যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা

প্রথম সমস্যা শুরু হয় গ্রীসে। এই সময় গ্রীসে এক গৃহযুদ্ধ জনিত পরিস্থিতির সূচনা হয়। ক্ষমতাসীন রাজতন্ত্রী সরকার কমিউনিস্ট দলের সশস্ত্র আক্রমণে নাজেহাল হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠায় এবার ১৯৪৭ সালের ২১শে ফ্রেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিল তার পক্ষে গ্রীসে কোন রকম আর্থিক ও সামরিক সাহায্যদান সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে নতুন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন মার্শাল মানবিকতাবাদের যুক্তি দেখিয়ে গ্রীসে মার্কিন হস্তক্ষেপ নীতির সুপারিশ করেন।

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১২ই মার্চ মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান মার্কিন কংগ্রেসকে প্রদত্ত ভাষণে ঘোষণা করলেন বিশ্বের মুক্ত জাতিসমূহের রাষ্ট্রিক অখণ্ডতা রক্ষা করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করে। ট্রুম্যানের ঘোষণা 'ট্রুম্যান তত্ত্ব' (Truman Doctrine) নামে পরিচিত। ট্রুম্যান গ্রীক ও তুরস্কের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব দেন। এই অর্থ মঞ্জুর হওয়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রীক ও তুরস্কে গৃহযুদ্ধ নিরসনে সমর্থ হয় এবং সাম্যবাদী আগ্রাসনের আশঙ্কা দূর হয়।

ট্রুম্যান তত্ত্বের ঘোষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ব রাজনীতিতে জল বিভাজিকা নামে পরিচিত। চিরায়ত নিরাসক্ত ও নির্লিপ্ত পররাষ্ট্র নীতির অবসান ঘটিয়ে বিশ্বজনীন সক্রিয় হস্তক্ষেপ নীতির পথে ধাবিত হল। এর পর থেকে পাঁচ দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নীতির ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের বিবর্তন

চারটি পর্ব :

(১) প্রারম্ভিক পর্ব (১৯৪৭-১৯৫০)

(২) প্রতিযোগিতা ও প্রতিরোধ পর্ব (১৯৫০-১৯৬২)

(৩) ঠাণ্ডা যুদ্ধ (১৯৬৩-১৯৭৯)

(৪) ঠাণ্ডা যুদ্ধের শেষ পর্যায় ও অবসান। (১৯৮০-১৯৯১)

আলোচ্য এককে ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রারম্ভরিক পর্বের আলোচনা পরিবেশিত হয়েছে। এই সময়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধ মূলত ইউরোপীয় মহাদেশের পরিসরে সীমিত ছিল এবং সংঘাতের মূল বিষয় ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত বিরোধী বেষ্টিনী নীতি ও তার বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া।

৫.১০ ❑ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় প্রতিরোধ নীতি (বেষ্টনী নীতি)

ট্রুম্যান নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। এখন থেকে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির মূল সূত্র হল সাম্যবাদ বিরোধী বেষ্টনী নীতি। মার্কিন বেষ্টনী নীতির সঙ্গে বিশিষ্ট মার্কিন কূটনীতিবিদ জর্জ কেন্নানের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতার নিরিখে কেন্নান স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে সাম্যবাদের পীঠস্থান সোভিয়েত রাশিয়া কোনমতেই পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইবে না। তাই রাশিয়া দীর্ঘসূত্রী সংঘাতের পথে এগোবে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে Foreign Affairs পত্রিকায় 'X' ছদ্মনামে 'বেষ্টনী নীতি' শব্দটি চয়ন করেন। তাঁর মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক ও সুদৃঢ় চিত্তে প্রতিরোধ নীতি অনুসরণ করতে হবে। কেন্নানের অভিমত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত বিরোধী শক্তির প্রতিরোধ নীতি গ্রহণের জন্য মানসিক ও বৈষয়িক দিক থেকে এখন প্রস্তুত।

বেষ্টনী নীতির প্রয়োগ

অর্থনৈতিক দিক : মার্শাল পরিকল্পনা—বেষ্টনী নীতির প্রধান দুটি দিক হল অর্থনৈতিক ও সামরিক। প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিধস্ত পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে দৃষ্টি দেয়। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য মার্কিন সহায়তা দানের নীতি ঘোষণা করেন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ সি মার্শাল। ১৯৪৭ সালের ৫ই জুন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক ভাষণে মার্শাল এই নীতি অনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করেন। তাঁর বক্তব্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে ক্ষুধা, হতাশা, দারিদ্র ও বিশৃঙ্খলা উপশমে বদ্ধপরিকর।

মার্শাল পরিকল্পনা ছিল ট্রুম্যান নীতির অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ। ট্রুম্যান মার্শাল পরিকল্পনাকে তাঁর পরিকল্পনার অঙ্গীভূত বিষয় বলে মন্তব্য করেছিলেন। মার্শাল পরিকল্পনার দুটি বিশেষ দিক ছিল—ইউরোপ মহাদেশের দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সংহতি সাধন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সহায়তা। ষোলটি ইউরোপের দেশ যৌথভাবে ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিপুল পরিমাণ ১১ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করেন। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন কর্মসূচী রূপায়িত হয়। এর ফলে ইউরোপের অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা ফিরে আসে। রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চিম ইউরোপে সাম্যবাদী প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা দূর করা সম্ভব হয়।

উত্তর আতলান্তিক সামরিক জোট (ন্যাটো) :

মার্শাল পরিকল্পনার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটাতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক দুর্দশা ও অস্থিরতা সাম্যবাদ প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে মার্শাল পরিকল্পনাকে প্রতিষেধক কৌশল বলা চলে। কিন্তু এর পাশাপাশি সম্ভাব্য সোভিয়েত আক্রমণের হাত থেকে পশ্চিম ইউরোপের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। যৌথ সামরিক জোট গঠন করে নিরাপত্তা রক্ষার প্রচেষ্টা উত্তর আতলান্তিক সামরিক চুক্তি নামে পরিচিত।

যৌথ সামরিক চুক্তি গঠনের আপাত কারণ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক বার্লিন অবরোধ (জুন ১৯৪৮)-এর সিদ্ধান্ত। সোভিয়েত ইউনিয়ন বার্লিন অবরোধ করলে পশ্চিম জার্মানীর উপর পাশ্চাত্য দেশুগলির নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়বে। সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত পূর্ব জার্মানীর ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত বার্লিনে অবরোধের ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং বার্লিন-এর উপর পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রণ ছিন্ন হবে।

পাশ্চাত্য দেশগুলি বার্লিন অবরোধের আঘাত সামলে নিয়েছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে মার্কিন সেনেটে রিপাবলিকান দলের নেতা আর্থার ভ্যান্ডেনবার্গ সামরিক জোট গঠন সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পেশ করেন (জুন ১৯৪৮)। এই প্রস্তাবের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের অন্যত্র রাষ্ট্রবর্গের সঙ্গো যৌথ সামরিক চুক্তি সম্পাদন করার অনুমোদন দেওয়া হল। এতদিন পর্যন্ত মার্কিন বিদেশ নীতির মূল বক্তব্য ছিল হস্তক্ষেপ বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী অবস্থান গ্রহণ। যা হোক সামরিক চুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হল উত্তর আতলান্তিক চুক্তি সংস্থা (NATO) গঠন (এপ্রিল ১৯৪৯)। প্রথমে বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, গ্রীস, আইসল্যান্ড, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৫.১১ ❑ সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ইউরোপে বিশেষ প্রভাবাধীন বলয় গঠনে উদ্যত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত বিরোধী বেষ্টনী নীতির প্রক্রিয়া শুরু করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপে নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার সিদ্ধান্ত নেয়। পূর্ব ইউরোপের নটি রাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা একটি সম্মেলনে যোগদান করেন (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)। এই সম্মেলনে কমিনফর্ম (Comunist Information Bureau) গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। কমিনফর্ম গঠনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সংহতি সাধনের প্রচেষ্টা শুরু হয়।

যুগোশ্লভিয়ার বহিষ্কার :

কিন্তু পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থা সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না। যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান টিটো সোভিয়েত রাশিয়ার একতরফা কর্তৃত্ব মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। টিটো সাম্যবাদী আন্দোলনে বহুকেন্দ্রিকতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। টিটোকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে কোণঠাসা করার জন্য কমিনফর্ম থেকে যুগোশ্লাভিয়াকে বহিষ্কার করা হল (জুন ১৯৪৮), তবে টিটো সবরকমের চাপ অগ্রাহ্য করে যুগোশ্লভিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হলেন।

এরপর সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপে নিজ প্রভাব অটুট রাখার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ও সামরিক কাঠামো গড়ে তোলে। প্রথমে ১৯৪৯ সালে কমেকন নামে সংস্থা গঠন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গো পূর্ব ইউরোপের অর্থনৈতিক যোগসূত্র গঠন করা হয়। এর পাশাপাশি পূর্ব ইউরোপের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে যৌথ প্রতিরোধ বাহিনী গঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি ওয়ারশ সামরিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়।

আইসলান্ড
সুইডেন
ফিনল্যান্ড
সোভিয়েত
রাশিয়া
আয়ারল্যান্ড
অস্ট্রিয়া
সুইজারল্যান্ড
ইউরোপে ঠান্ডা লড়াই
রাজনীতির
ভৌগোলিক বিভাজন
নিরপেক্ষ রাষ্ট্র
ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্র
কমিউনিস্ট রাষ্ট্র (ওয়ারশ চুক্তির বাইরে)
উত্তর আতলান্তিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত

৫.১১ ❑ অনুশীলনী

(১) হিটলারের পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য ও রূপায়ণ আলোচনা করুন।

(২) তোষণ নীতির ব্যর্থতা ও তার পরিণাম কি ছিল?

(৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আপাত প্রেক্ষাপট উল্লেখ করুন।

(৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবর্তন আলোচনা করুন।

(৫) ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

(৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেষ্টনী নীতি ব্যাখ্যা করুন।

(৭) ১৯৪৭-১৯৫০ সময়কালে ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্ব আলোচনা করুন।

৫.১২ ❑ গ্রন্থাবলী

১. Bulock, Alan : Hitler—A study in Tyranny.

২. Wiskman, Elizabeth : Europe of the Dictators.

৩. Walker, Martin : The Cold War.

৪. Keller, William : The 20th century World.

৫. Fleming, D.F.: The Cold War and its Origin. (1917–1960).

— — —

ইতিহাস—ষষ্ঠ পত্র

পর্যায়—১

একক 1 ❑ ঠাণ্ডা লড়াই-এর পটভূমি বা সূচনা (Background of cold war)

গঠন

1.0 **সূচনা**
1.1 **মিত্রশক্তি জোটের স্ববিরোধিতা**
1.2 **জার্মানিকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ**
1.3 **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব**

1.0 ❑ সূচনা

বিগত অর্ধশতক ধরে 'ঠাণ্ডা লড়াই' শব্দটি বিশ্বরাজনীতির পরিভাষায় এক বিরাট জায়গা অধিকার করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরাভূত শক্তিগুলি নতুন বিশ্বব্যবস্থার বশীভূত হলেও, বিজয়ী শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সুপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমেই তীব্র হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধকালীন ঐক্য বিনষ্ট হয়। পরিবর্তে দেখা দেয় রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে বিপরীত মেরুতে অবস্থিত ক্ষমতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ দুই শিবির—একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র, অন্যদিকে সোভিয়েত নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রী দুনিয়া।

মনে রাখতে হবে, যে দুই পক্ষের মধ্যে এই লড়াই চলেছিল, তাদের মধ্যে যতই উত্তেজনা থাকুক অথবা সম্পর্কের অবনতি হোক, পরস্পরের বিরুদ্ধে সরাসরি বলপ্রয়োগ থেকে তারা বিরত থেকেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যাতে জড়িয়ে পড়তে না হয়, সেজন্য তারা সতর্কতা অবলম্বন করেছে। বলপ্রয়োগ যেখানে যা ঘটেছে তার অধিকাংশেই বলা যায় ব-কলমের যুদ্ধ (Proxy war) যা পরস্পরের স্থানিক দূরত্ব বজায় রেখে, বিপজ্জনক নৈকট্যে না এনে করা হয়েছিল। এই বৈরিতার সম্পর্কই চলেছে একটানা পাঁচদশক ধরে (১৯৪৫-১৯৯২)। সেদিক থেকে বিচার করলে এই লড়াই শান্তিপূর্ণ না হলেও পরস্পরের প্রতি আঘাত ঘটায়নি। যুদ্ধ অথচ যুদ্ধ নয়, এমন অবস্থা বোঝাতেই এর নাম 'ঠাণ্ডা লড়াই'।

1.1 ❑ গণতন্ত্রের শিথিল চরিত্র

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি জোটের প্রধান শরিক রাষ্ট্রগুলির দুটি বড়ো রকমের স্ববিরোধ থেকে। এর মধ্যে প্রথম স্ববিরোধ এই যে রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা রক্ষার্থে ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করা হলেও মিত্রশক্তির মধ্যে পশ্চিমি গণতন্ত্রগুলির অনেকেই সাম্রাজ্যবাদের স্রষ্টা ও সুবিধাভোগী ছিল। সুতরাং যুদ্ধের অবসানে তাদের বিশ্বব্যাপী উপনিবেশের কর্তৃত্ব থেকে যাওয়ারই সম্ভাবনা। একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই কোনো উপনিবেশের দখলদার ছিল না এবং

ঔপনিবেশিক মানুষের জাতীয় আন্দোলনে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পরোক্ষভাবে উৎসাহদান তার কর্মসূচির অঙ্গা ছিল।

দ্বিতীয় স্ববিরোধ, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সহাবস্থান সেকালের প্রেক্ষিতে কৃত্রিম বলে গণ্য হয়েছে। ভিন্নধর্মী দুই মতাদর্শের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা থেকেই গিয়েছিল। যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের সামান্যতম প্রতিবিম্বও পশ্চিমি শক্তিগুলির চক্ষুশূল ছিল। যুদ্ধের পর যখন দেখা গেল, পূর্ব ইউরোপে লাল ফৌজের একক প্রচেষ্টায় নাৎসী শত্রুর শুধু উৎখাত হয়নি, স্থানীয় বেসরকারি প্রতিরোধের সঙ্গো তাদের সুসম্পর্কের ফলে পূর্ব ইউরোপ ও বলকান অঞ্চল জুড়ে সোভিয়েত কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হচ্ছে, সোভিয়েত মনোভাবাপন্ন সরকারও গঠিত হচ্ছে, পশ্চিমি দুনিয়া তখন থেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এবং সোভিয়েত প্রভাব যাতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে আর না এগোতে পারে সেজন্য সচেতন কূটনীতি শুরু হয়ে যায়। বিশেষত যুদ্ধোত্তর ব্রিটেন ও ফ্রান্স সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ায়, একমাত্র অক্ষত শক্তি এবং যুদ্ধের সুবাদে অস্ত্রশস্ত্রের কারবার ও দেদার ঋণদান-জনিত সমৃদ্ধির প্রাপক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত বিরোধী জোটের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এই ভূমিকায় আসার মতাদর্শগত কারণ হিসেবে সাম্যবাদ বিদ্বেষকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল, যুদ্ধশেষে মার্কিন জনসাধারণের গৃহমুখী অন্তরণকে প্রশমিত করার জন্য। আসলে যা শুরু হয়, তা ক্ষমতার জন্য অদম্য লড়াই।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ নিয়ে মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে কূটনৈতিক আলাপ আলোচনায়। পশ্চিমি তরফে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মস্কোয় আসেন (অক্টোবর, ১৯৪৪) তাঁর প্রভাব মণ্ডল বিষয়ক প্রস্তাব নিয়ে। উদ্দিষ্ট ভূখন্ড অবশ্যই পূর্ব ইউরোপ। সেখানে প্রভাবের অনুপাতটি দেখানো হয় এইভাবে যাতে গ্রিসের ক্ষেত্রে পশ্চিমি প্রভাব প্রায় ষোল আনা, যুগোশ্লাভিয়ার আধা-আধি এবং বাকি পোল্যান্ড ছাড়া অন্যান্য জায়গায় সোভিয়েতের প্রায় সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। এ প্রস্তাবে স্তালিনের না ছিল সায়, না ছিল আপত্তি। কারণ এক অর্থে পূর্ব ইউরোপের আসন্ন রাজনৈতিক বাস্তবের অনেকটাই এতে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পোল্যান্ডের ক্ষেত্রে লন্ডনে অস্থায়ীভাবে নির্বাসিত সরকারের পুনর্বহাল নিয়ে চার্চিলের জেদ তিনি বরদাস্ত করেননি ; কেননা সেখানে ইতিমধ্যেই মুক্তিফৌজের সঙ্গো সহযোদ্ধার নেতৃত্ব দিয়েছিল যে লাবলিন (Lublin) কমিটি তার ওপরেই পোল্যান্ডের শাসনভার ন্যস্ত হয়েছে।

বস্তুত বলশেভিক সরকার প্রতিষ্ঠার পরপরই প্রতিবিপ্লব ঘটানোর অপচেষ্টা থেকে শুরু করে হিটলারের জার্মানি সম্বন্ধে ইউরোপীয় শক্তিগুলির দুমুখো নীতির অনুসরণ পর্যন্ত ঘটনা থেকে রুশ নেতৃত্বের বদ্ধমূল ধারণা হয় যে পুঁজিবাদী শত্রুবেষ্টিত এই বিপন্ন অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হওয়া ছাড়া গতি নেই। সুতরাং পরবর্তীকালের যুদ্ধঘটিত সহযোগিতা সত্ত্বেও সদ্য অতীতের অবিশ্বাস মুছে যায়নি।

এই অবিশ্বাসের বাতাবরণ অনেকটাই দূর হতে পারত যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের কল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধোত্তর বিশ্বের মানচিত্রটি পুনর্নির্মিত হত। পূর্ব ইউরোপে রুশ স্বার্থ মেনে নিতে তাঁর আপত্তি ছিল না, যদি রুশের তরফে পশ্চিমে আর অগ্রসর না হওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যেত।

ইয়াল্টা ত্রিশক্তি সম্মেলনের শর্ত কার্যত মানা হয়নি। বরং জার্মানি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত হয় যে এল্‌ব নদীর পূর্বদিক বরাবর একটি অংশ থাকবে রুশ তত্ত্বাবধানে এবং পশ্চিম অংশে অন্য তিন মিত্র শক্তির কর্তৃত্ব চলবে স্থায়ী বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত।

1.2 ❑ জার্মানিকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরোধ

জার্মানির ব্যাপারে এই স্থায়ী বন্দোবস্ত করা নিয়েই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সবচেয়ে বিস্ফোরক দিকটি সঞ্জাত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানি থেকে কীভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় হবে সে প্রশ্ন ছাড়াও ঐ দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ অত্যন্ত কণ্টকিত, জটিল এক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। একটি দুর্বল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সপক্ষে ছিলেন ফরাসিরা, ব্রিটিশরা চেয়েছিল একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র আর রুশের তরফে প্রথমদিকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি ও পরে দ্বিধাবিভক্ত জার্মানিই সুবিধাজনক মনে হয়। দ্বিধাবিভক্ত জার্মানির পুনর্মিলন ছাড়া এসব প্রশ্নের স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় ব্রিটেন ও আমেরিকা দখলীকৃত অংশে জোরদার প্রয়াস শুরু হয় একটি সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। সেইসঙ্গে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংসদের আয়তন বৃদ্ধি, রূর্‌ শিল্পাঞ্চলের আন্তর্জাতিকীকরণ, জার্মান মুদ্রা মার্কের নতুন মূল্য নির্ধারণ, আলাদা শান্তিচুক্তি এবং ত্রিশক্তির মোতায়েন করা সেনাবাহিনীর স্থায়ী অবস্থান পশ্চিম জার্মানিতে Federal Republic of Germany নামক আলাদা এক স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় জ্ঞাপন করে। অন্যদিকে রুশের তরফেও তোড়জোড় শুরু হয় পূর্ব জার্মানিকে সোভিয়েত ধাঁচে গড়ে তোলার।

1.3 ❑ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বন্দ্ব

এরপর যুদ্ধে পরাভূত শত্রুপক্ষীয় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শান্তিচুক্তি প্রস্তুত করার ব্যাপারে পটসডাম সম্মেলনে (১৯৪৫) পঞ্চ মিত্রশক্তির (আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন) পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত পর্ষদে প্রায় প্রতিটি বিষয় নিয়ে সোভিয়েত প্রতিনিধির বিতণ্ডা চলতে থাকে। ইতালির দখলে আসা ট্রিয়েস্ট (Trieste)-কে যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা এবং আফ্রিকায় ইতালীয় উপনিবেশ ত্রিপলি-কে সোভিয়েত অছি শাসনে আনার প্রস্তাব পশিমি পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের তীব্র বিরোধিতায় নাকচ হয়ে যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও শান্তিচুক্তি সম্পাদনে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে গ্রিসে বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের ওপর হানাদারির জন্য ব্রিটিশ সেনাপ্রেরণেরও তীব্র সমালোচনা করেন সোভিয়েত প্রতিনিধি মলোটভ। একটি মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদ (Allied Control Council) গঠন সত্ত্বেও জাপানের পুনর্গঠন এবং নতুন সংবিধান রচনার ব্যাপারে একচেটিয়া মার্কিন কর্তৃত্ব সোভিয়েত সরকারকে অসন্তুষ্ট করে তোলে। অন্যদিকে চিনের গৃহযুদ্ধ শেষে মূল ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত জাতীয়তাবাদী চিয়াং কাইশেক সরকারকে সমর্থন জানাতে থাকে পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলি এবং গণবিপ্লবী চিন সরকারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। এইভাবে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানের অভাব, দুই শিবিরের বৈরী সম্পর্ককে বিদ্বিষ্ট করে তোলে।

এই সন্ধিক্ষণে দুটি ঘটনা গুরুতরভাবে মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্কের ওপর আঘাত হানে। প্রথমটি হল, যুদ্ধের শেষাশেষি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা গবেষণার উৎপাদন এক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র যার নাম পরমাণু বোমা। এই বোমার আবিষ্কার গোপন রাখা এবং আত্মসমর্পণের পর জাপানের দুই শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে (আগস্ট, ১৯৪৫) এর ধ্বংসলীলা স্তালিনকে রুজভেল্ট পরবর্তী মার্কিন সরকার সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক করে তোলে। দ্বিতীয় ঘটনাটি আমেরিকায় ভ্রমণরত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের একটি উত্তেজক বক্তৃতা, যা এক অর্থে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সরকারি ঘোষণা বলে ধরা যেতে পারে। বলা হয়, ইউরোপকে দ্বিখণ্ড করে এক 'লৌহ যবনিকা' নেমে এসেছে এবং রুশ শক্তিকে প্রতিহত করতে ইঙ্গ-মার্কিন উভয়পক্ষে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া আশু প্রয়োজন। এরপর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্কই ঘনীভূত হতে থাকে। এর প্রাথমিক কয়েকটি লক্ষণ ঃ ইউরোপ থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণের কাজ হঠাৎ থেমে যাওয়া, বার্লিনের ওপর রাশিয়ার অবরোধ, ইরানে সেনাবাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণদানে মার্কিন চুক্তি, গ্রিসে রাজতন্ত্র সমর্থক বাহিনীর সঙ্গে গ্রিক কমিউনিস্ট গেরিলাদের সংঘর্ষ ইত্যাদি। আসলে সেই সময় যুদ্ধের পর মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে একটা সম্মানজনক রফার অপেক্ষায় ছিলেন ট্রুমান। কিন্তু রুশ বিদেশমন্ত্রী মলোটভের সঙ্গে কথাবার্তার পর তিনি হতাশ ও রুষ্ট বোধ করেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা গেল ঃ Unless Russia is faced with an iron first and strong language, another war is in the making.

এই হল যুদ্ধের অশনি সংকেত। প্রেসিডেন্ট ট্রুমান ঘোষণা করলেন ঠাণ্ডা লড়াই সম্বন্ধে তাঁর নীতি ঃ যেসব স্বাধীন দেশ বহির্দেশীয় চাপ ও অভ্যন্তরীণ সংখ্যালঘুদের সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনে প্রস্তুত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাহায্যদানে কৃতসঙ্কল্প।

ট্রুমানের এই ঘোষিত নীতির প্রয়োগস্থল প্রথমদিকে ছিল ইউরোপের পশ্চিম ভূখণ্ড। অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে ইউরোপে একটি সোভিয়েত বিরোধী মণ্ডল সৃষ্টি করা ছিল এর লক্ষ্য। অনেকে এই প্রচেষ্টাকে সোভিয়েত শক্তি সীমাবদ্ধকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে মনে করলেও এর বিশ্বজোড়া প্রয়োগ এবং সামরিকীকরণ শুরু হয়েছে অনেক পরে। এই পর্যায়ে প্রধানত পশ্চিম ইউরোপের পূর্ণ নিরাপত্তা এবং কিয়দংশে মধ্য ইউরোপের ওপর নজরদারি ছিল মার্কিন নীতির মূল লক্ষ্য।

বিদেশসচিব মার্শালের দুটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক সাহায্যদানের মাধ্যমে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠন ত্বরান্বিত করা এবং এইভাবে বিপ্লব-বিদ্রোহের প্রতিষেধক প্রয়োগ করে রাজনৈতিক সুস্থিতি বজায় রাখা। যথারীতি সোভিয়েত প্রতিনিধি মলোটভ এই পরিকল্পনার সমালোচনা করে বলেন এর দ্বারা ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের ওপর বাইরের হস্তক্ষেপ আসার সম্ভাবনা রয়েছে, অথচ সেখানে উন্নয়নের প্রধান উৎস হওয়ার কথা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দ্বারা সৃষ্ট সাহায্য ভাণ্ডার। পশ্চিম ইউরোপের ১৬টি সাহায্যপ্রাপ্ত দেশ নিয়ে OEEC (Organisation for European Economic Cooperation) গঠিত হয় এপ্রিল ১৯৪৮-এ। অপরপক্ষে সোভিয়েত তরফে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলির অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে গঠিত হয় COMECON (জানুয়ারি ১৯৪৯)। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পশ্চাৎপটে এইভাবে ইউরোপের অর্থনৈতিক দ্বিখণ্ডীকরণ সম্পূর্ণ হল।

এরপর সামরিক সংস্থা NATO (North Atlantic Treaty Organisation, 4 April, 1949)-র

প্রতিষ্ঠা। সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত পূর্ব ইউরোপের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয় অতলান্তিক মহাসাগরের দুই তীর জুড়ে ছোটো বড়ো ১২টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত বড়ো মাপের এই সামরিক জোট। অঞ্চলভিত্তিক এই যৌথ প্রতিরক্ষা, যার তত্ত্বগত অবলম্বন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে বিবৃত যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা—তার আসল স্বরূপ হল, পূর্ব ইউরোপের মুখোমুখি এক আগাম সামরিক সংগঠন। যুদ্ধ না বাধলেও এত বড়ো সামরিক নিরাপত্তার আয়োজন সত্যিই অভূতপূর্ব। ঠান্ডা লড়াইয়ের কারণে যদি এর সৃষ্টি হয়ে থাকে, পরবর্তীকালে ঠান্ডা লড়াইকে তীব্র করে তোলাতেও এর দায়িত্ব কম নয়।

ওদিকে সোভিয়েত পক্ষও নীরব দর্শকের ভূমিকায় নিশ্চেষ্ট থাকেনি। NATO-র প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষত পশ্চিম জার্মানির তাতে অন্তর্ভুক্তি, সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে বিপজ্জনক মনে হওয়ায় পোল্যান্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, এবং ফ্রান্স ও ইটালির কমিউনিস্ট দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয় (জানুয়ারি, ১৯৪৯) নাম দেওয়া হয় COMINFORM (Communist Information Bureau)-এর মাধ্যমে মার্শাল পরিকল্পনাধীন পশ্চিমি দেশগুলিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোড়ন, ধর্মঘট ইত্যাদির চেষ্টা চলতে থাকে।

সামরিক প্রতিরোধের প্রয়োজনে NATO-র বিপরীতে কমিউনিস্ট দেশগুলিও জোটবদ্ধ হয় 'ওয়ারশ' চুক্তি মোতাবেক। পূর্ব জার্মানিও পরে এর সদস্য হয়। এটিও কাগজে কলমে আত্মরক্ষামূলক আঞ্চলিক ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষিত হলেও এর উদ্দেশ্য ছিল NATO-র বিরুদ্ধে পাল্টা ভারসাম্য সৃষ্টি করা। এই চুক্তির বলে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলিতে সঙ্কটকালে রুশ সৈন্যবাহিনীর অবাধ প্রবেশ স্বীকৃত হয়। এইভাবে যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দুই মহাজোট ইউরোপে ঠান্ডা লড়াইকে সামরিক দিক থেকে এক বিপজ্জনক স্তরে নিয়ে যায়। এর ফলে অবশ্য যে ভারসাম্য রচিত হয় তাকে বিঘ্নিত করার সক্রিয় কোনো ঝুঁকি কোনো পক্ষেই কখনোই নেওয়ার চেষ্টা হয়নি, যদিও মাঝে মাঝে হুমকি দেওয়া বন্ধ থাকেনি। যখনই উত্তেজনার কারণ ঘটেছে—যেমন বার্লিন অবরোধ (১৯৪৭-৪৯), হাঙ্গেরীতে অভ্যুত্থান (১৯৫৬) কিংবা চিনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯৪৯), এর পর ইন্দোচীন এলাকায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম (১৯৪৬-র পর থেকেই) তখনই রণহুঙ্কার শোনা গেছে ঠিকই। এমনকি মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস একদা সমগ্র পূর্ব ইউরোপ থেকে সাম্যবাদকে গুটিয়ে দেওয়ারও আস্ফালন করেন। শুধুই সীমাবদ্ধকরণের চেয়ে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে 'বিপুল প্রতিশোধ গ্রহণ' (massive retaliation)-এর পথ অবলম্বনের পক্ষেও যুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রত্যক্ষ সংঘাত সর্বদাই এড়িয়ে চলা হয়েছে।

এর কারণ, চল্লিশের দশকে পারমাণবিক অস্ত্রের যে একচেটিয়া অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছিল, কালক্রমে সোভিয়েত দেশেও একের পর এক atom, hydrogen এবং nitrogen বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে সাফল্যের পর তা অন্তর্হিত হয়। অস্ত্র প্রতিযোগিতার দৌড়ে উভয়েই উভয়ের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। তখন প্রয়োজন হয় পারস্পরিক নিবারণ (mutual deterrence)। মোটের ওপর স্তালিন আমলের সন্দিগ্ধ ও বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে সহজ হয়ে ওঠে, নিকিতা ক্রুশ্চেভের সময় বিংশ পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের রীতি (১৯৫৬) ঘোষণার পর থেকে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা পরিহার করা না হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কৌশল অনেকাংশে বদলে যায়।

একক 2 ❑ ইউরোপে পট পরিবর্তন

গঠন

2.0 সূচনা

2.1 সংহতির আদিপর্ব ঃ সংগঠন (১৯৪৭-১৯৭৪)

2.2 দ্বিতীয় পর্ব ঃ সম্প্রসারণ (১৯৬৬-১৯৮৬)

2.3 সোভিয়েত দেশের ভাঙন

2.3.1 ভাঙনের পটভূমি

2.3.2 স্বাধীন রাষ্ট্র সমবায় প্রতিষ্ঠা

2.3.3 সোভিয়েত দেশে জাতীয়তাবাদী বিচ্ছিন্নতা উদ্রেকের কারণ

2.3.4 সোভিয়েত দেশে জাতীয়তাবাদী বিচ্ছিন্নতার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

2.3.5 রাশিয়ার চেচেন জাতি বিদ্রোহ

2.1 ইউরোপীয় সংঘ

2.4.1 মন্ত্রী পরিষদ

2.4.2 কমিশন

2.4.3 ইউরোপীয় সংসদ

2.4.4 ইউরোপীয় আদালত

2.4.5 অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত সমিতি

2.4.6 হিসাব পরীক্ষকমণ্ডল

2.4.7 মূল্যায়ন

2.4.8 ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন সংবিধান

2.5 উপসংহার

2.0 ❑ সূচনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও যেমন পরেও তেমনই আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির কেন্দ্রস্থল হিসেবে ইউরোপের গুরুত্ব অপরিবর্তিত রয়েছে। দুই পর্বের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, আতলান্তিকের অপর তীরবর্তী প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ পরবর্তীকালে অতি ঘনিষ্ঠভাবে ইউরোপের ঘটনাবলির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। অন্য একটি পার্থক্য এই যে ঠাণ্ডা লড়াই পর্বে দ্বৈরথ সমরে ইউরোপ ভূখণ্ড ফলত পূর্ব পশ্চিম বরাবর দ্বিধা বিভক্ত হয়ে থেকেছে। এই উত্তেজনাপূর্ণ বাতাবরণের মধ্যে থেকেও

পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি যেভাবে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সংহতির পথে অগ্রসর হয়েছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিকেও তা প্রভাবিত করেছে নানা দিক থেকে।

সংহতির এই প্রয়াসকে যদি কোনও একটিমাত্র তাগিদ বা প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে অবশ্যই উল্লেখ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইউরোপের সার্বিক ও ব্যাপক বিপর্যয়। চূড়ান্ত দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনীতি, রাজনৈতিক মর্যাদাহীনতা, দারিদ্রজনিত অস্থিরতা, ও অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপে সাম্যবাদের অশনিসংকেত—সবমিলিয়ে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির তখন করুণ চেহারা। আত্মবিশ্বাসের পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা জনমানসে ক্রমশই জাগ্রত হতে থাকে—যদিও কীভাবে তা হাসিল করা সম্ভব, সে বিষয়ে যথার্থ পথনির্দেশ রাজনীতির উচ্চস্তরে স্থির হতে যথেষ্ট সময় লেগে যায়।

পশ্চিম ইউরোপে সংহতি প্রয়াসের অন্যান্য তাগিদগুলিকে Karl Deutsch চিহ্নিত করেছেন চার প্রকারে। প্রথমত, এবং অতি অবশ্যই নিরাপত্তা বিধান। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক নিম্নগামিতাকে রোধ করা এবং সমৃদ্ধি ফিরে পাওয়া। তৃতীয়ত, যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ থেকে জনসাধারণের মুক্তি ও মহাদেশীয় চলাচল অবাধ করে তোলা। চতুর্থত, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বিনষ্ট ক্ষমতার পুনরুদ্ধার।

ইউরোপের দুর্দশা মোচনের এই 'Sovereign remedy' অবশ্য সংশ্লিষ্ট সকলের কল্পনাকে উজ্জীবিত করতে পারেনি। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী অকারণে ইউরোপীয় মহাদেশের জটিলতায় প্রবেশ করতে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। অন্যদিকে আবার মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ডে গোড়া থেকেই সংঘবদ্ধতার প্রতি ঝোঁক স্পষ্ট হতে থাকে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে ক্ষমতাসীন এবং সরকার বিরোধী উভয়পক্ষেই কখনো সংযোগপন্থী কখনো বা স্বাতন্ত্র্যবাদী—এই দুই মনোভাবের একটি প্রবল হয়ে উঠেছে। এইরকম উত্থানপতনের মধ্য দিয়েই শেষপর্যন্ত আজকের ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিমাংশে একটি সুসংবদ্ধ ঐক্যমুখী আঞ্চলিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে পেয়েছে।

ইউরোপীয় ঐক্য নির্মাণের এই দীর্ঘ প্রক্রিয়াকে দুটি প্রধান পর্বে ভাগ করা যায়। আদিপর্বটি মার্শাল পরিকল্পনায় পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন থেকে ইউরোপীয় অভিন্ন বাজার তথা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী গঠন (১৯৪৭-১৯৬৫ পর্যন্ত)। দ্বিতীয় পর্বটি এই গোষ্ঠীর কাঠামোগত সম্প্রসারণের সঙ্গে জড়িত (১৯৬৬-১৯৮৫)। অবশেষে রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে এর আত্মপ্রতিষ্ঠা (১৯৮৫ থেকে অদ্যবিধি) এই প্রক্রিয়ার সর্বাধুনিক পর্ব।

2.1 ❑ সংহতির আদিপর্ব ঃ সংগঠন (১৯৪৭-১৯৭৪)

মার্শাল সাহায্য প্রকল্পের প্রেক্ষিতে ১৯৪৪ সালে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ (Organization for European Economic Cooperation) গঠন সর্বপ্রথম পদক্ষেপ যার থেকে সংহতির যাত্রা শুরু হয়। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন সরকারের প্রদত্ত সাহায্যের সদ্ব্যবহারের দ্বারা যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের আর্থিক পুনর্গঠনকে সম্ভব করে তোলা। ১৯৪৯ সালে এজন্য ইউরোপীয় পরিষদ (Council of Europe) গঠনের জন্য একটি চুক্তি হয়—যাতে পশ্চিম

ইউরোপের অধিকাংশ দেশসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা স্বাক্ষর দান করে। এই পরিষদে সকল সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব ছিল এবং দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের জন্য একটি কার্যনির্বাহী কমিটি ও একটি প্রশাসনিক দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় প্যারিসে। সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে কতকগুলি সুপারিশ করা ছাড়া পরিষদের বিশেষ কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা ছিল না। এককথায়, ''European opinion thus may at most propose, but each nationalist disposes." (Karl Deutsch, 'The Analysis of International Relations.')

OEEC-র কাঠামোর মধ্যে ১৯৫০ সালে ইউরোপীয় লেনদেন সংস্থা European Payments Union স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য পশ্চিম ইউরোপের বহুপাক্ষিক বাণিজ্যের সুবিধার্থে অর্থের আদানপ্রদান সুগম করে তোলা।

এর পরবর্তী পদক্ষেপ European Coal and Steel Company-র প্রতিষ্ঠা (১৯৫১)। এই প্রথম ফ্রান্স ও জার্মানির দুটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপকরণকে একটি সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় নিয়ে আসার চেষ্টা ফলবতী হতে দেখা গেল। এই উদ্যোগের প্রধান রূপকার ফরাসি বিদেশমন্ত্রী রোবের্ত্ শ্যুমাঁ এবং সমর্থকমণ্ডলী দেশ ও বিদেশের অধি-জাতীয়তাবাদী (Supernationalist) বিভিন্ন গোষ্ঠী। ব্রিটেন স্বভাবতই এই গোষ্ঠীতে যোগ দিতে নারাজ তার রাজনৈতিক কারণ অধি-জাতীয়তার সঙ্গো জাতীয়তার বিরোধ আর অর্থনৈতিক কারণ, ইউরোপের বাজারে ব্রিটেনে প্রস্তুত ইস্পাতের দাম পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। পঞ্চাশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত এই সংস্থাটি সক্রিয় রয়েছে এবং সাফল্যের সঙ্গো আন্তঃরাষ্ট্র সহযোগিতার প্রমাণ রেখে চলেছে। এর স্রষ্টা শ্যুমাঁ যথার্থই স্বপ্ন দেখেছিলেন ঃ "a first step in the direction of European federation." এবং "it will rapidly lead us on towards the complete economic and political unification of Europe." (Walter Hallstein, United Europe : Challenges and Opportunity').

প্রকৃতপক্ষে ECSC-র কার্যকারিতায় উৎসাহিত হয়ে দু'বছরের মধ্যেই (১৯৫৩) একটি বৃহত্তর সংঘবদ্ধতার প্রস্তাব আসে বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গের তরফে। একটি অভিন্ন বাজার সৃষ্টির এই প্রস্তাব নিয়ে ECSC-র ছয় বিদেশমন্ত্রী স্তরে বিবেচনার পর European Economic Community (EEC) গঠনের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় ইটালির রোমে (মার্চ, ১৯৫৭)। এই সংস্থার লক্ষ্য হল একটি অভিন্ন বাজারের মাধ্যমে সদস্য দেশগুলিতে পণ্য, পরিষেবা, পর্যটক এবং পুঁজির অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা।

ঐ সঙ্গো আরও একটি চুক্তির বলে EEC-র সদস্য ছয় রাষ্ট্রের মধ্যে পরমাণু শক্তির গবেষণা ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটি তদারকি সংস্থা European Atomic Energy Community (EURATOM) গড়ে ওঠে (১৯৫৮)।

EEC-র অভিন্ন বাজার সৃষ্টির লক্ষমাত্রা দ্রুত পূর্ণ হতে থাকে। ১৯৬৭ সালের মধ্যে সদস্যদেশগুলির শিল্পজাত পণ্যের ওপর চার-পঞ্চমাংশ শুল্ক রহিত হয় এবং অনেকগুলি কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন ও বিপণনকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনার ব্যাপারে সহমত সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক, রোম চুক্তির প্রথম দুই ধারাতেই EEC-র ব্যাপকতর ভূমিকায় ইউরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্যবন্ধন রচনার

ইঙ্গিত ছিল। শুধু অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন নয়, ক্রমান্বয়ে ভারসাম্যযুক্ত সম্প্রসারণ, স্থিতিশীলতা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন—এইসব অভীষ্টও পূরণের অঙ্গীকার ছিল। ১৯৬৯ সালে ইউরোপীয় বাজারটিকে সংহত করার জন্য একটি শুল্ক সংঘ (Customs Union) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর বিদ্যমান শুল্ক ও শুল্ক বহির্ভূত বাধানিষেধ (tariff and non-tariff barriers) দূর করার প্রয়াস শুরু হয়। অভিন্ন ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সঙ্গো তৃতীয় সব দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই শুল্ক ও আমদানি-রপ্তানি নীতি অনুসৃত হতে থাকল। ইউরোপের বাইরে অবস্থিত প্রাক্তন উপনিবেশগুলির সঙ্গো EEC-র সদস্যরাষ্ট্রগুলির একটি বিশেষ সম্পর্ক এভাবে বিধিবন্ধ হয়ে রইল।

EEC-র অভ্যুদয় ইউরোপের আঞ্চলিক রাজনীতিতে একটি বিশেষ মাত্রার সংযোজন ঘটায়। ইউরোপীয় সংসদে ব্রিটেনের চেষ্টা আসলে নিবন্ধ ছিল রাজনৈতিক দিক নির্দেশ করা। তার অধিক মনোযোগ ছিল নিজস্ব পারমাণবিক শক্তি অর্জনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গো ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহের একটি চুক্তি সম্পাদন। ব্রিটেনের কমনওয়েলথমুখী বাণিজ্যিক স্বার্থ তাকে ইউরোপীয় সাধারণ বাজার থেকে দূরে টেনে রেখেছিল। ব্রিটেনের তরফে ম্যাকমিলান সরকারের প্রস্তাব ছিল একটি মুক্তবাণিজ্য এলাকা সৃষ্টির যার একদিকে থাকবে মূল ভূখন্ডের ছয় রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে ব্রিটেন সহ কয়েকটি রাষ্ট্র। এই দ্বিতীয় গোষ্ঠী শিল্পসামগ্রীর ওপর শুল্কগত বাধা অপসারণে রাজি হলেও কৃষিজ পণ্যের ওপর এই নীতি অনুসরণে সম্মত ছিল না। বহিঃশুল্ক আরোপের ব্যাপারেও তৃতীয় দেশগুলি সম্বন্ধে কোনো অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রস্তাব সমর্থিত হয়নি। ফলে, সুইজারল্যান্ড, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার তিন রাষ্ট্রকে নিয়ে ব্রিটিশ উদ্যোগে গঠিত হয় EFTA (European Free Trade Association, 1959)।

অগত্যা ব্রিটেনকে বাইরে রেখেই ইউরোপীয় সংহতির কাজ এগোতে থাকে। এ সময় ফ্রান্সে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং দ্য গ্যলের নেতৃত্ব গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দ্য গ্যল চেয়েছিলেন ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাবমুক্ত এক স্বাধীন ইউরোপ এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য প্রয়োজন EEC-র রাজনৈতিক সত্তায় পরিণতি। জার্মান চ্যান্সেলর আদেন্যরের সঙ্গো Rambonillet বৈঠকে (জুলাই, ১৯৫৯) তাঁর প্রস্তাব ছিল একটি রাষ্ট্রসম্মেলনের যার সচিবালয় স্থাপিত হবে প্যারিসে। ফ্রান্সের এই অতি অগ্রসর-ভূমিকা জার্মানি ও বেনেলুক্স দেশগুলিকে অস্বস্তিতে ফেলে।

ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মধ্যে এই সময় অন্য একটি বিরোধ দেখা দেয়। একদিকে ফ্রান্সের তরফে চাপ ছিল যত শীঘ্র সম্ভব অভিন্ন বাজারের উপযোগী একটি অভিন্ন কৃষিনীতি (Common Agricultural Policy) প্রণয়ন, যে বিষয়ে অন্য সকলের আপত্তি ছিল। অন্যদিকে জার্মানির পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসে ইউরোপীয় কমিশনে সাধারণ সভার ক্ষমতা বৃদ্ধির এবং পরিষদের সব সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গ্রহণ করার। কমিশনের তৎকালীন জার্মান প্রেসিডেন্ট ড. হলস্টাইনের এই প্রস্তাব ফ্রান্সের রাজনৈতিক উচ্চাশার পথে বিঘ্ন মনে হওয়ায় দ্য গ্যল তার প্রবল বিরোধিতা করেন এবং জার্মানির মনোভাব শেষপর্যন্ত নরম হয়। ইতিমধ্যে ব্রিটেন ও আমেরিকায় Polaris ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন এবং মার্কিন প্রশাসনের মস্কোর সঙ্গো মিতালি (detente)-র প্রবণতা জার্মান রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আশঙ্কার সঞ্চার করে। পাছে কমিশনটি এভাবে ভেঙে পড়ে তাই একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা হয় ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে।

2.2 ❑ দ্বিতীয় পর্ব ঃ সম্প্রসারণ (১৯৬৬-১৯৮৬)

ঠিক এই সময়েই ব্রিটেনে নবনির্মিত শ্রমিকদলের সরকার প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের নেতৃত্বে ইউরোপে পুনঃপ্রবেশে আগ্রহ প্রকাশ করে। অন্যদিকে ইউরোপীয় কমিশনে ফ্রান্সকে নিয়ে জটিলতা চলতে থাকায় ব্রিটেনের পক্ষে ইউরোপ প্রবেশের এই ছিল উপযুক্ত সময়। তাছাড়া কয়লা ও ইস্পাত সংস্থা এবং EURATOM-এর সঙ্গো EEC-র সংযুক্তি এবং অভিন্ন বাজারে শিল্পসামগ্রীর অবাধ প্রবেশ সুরক্ষিত হওয়ার ব্রিটেন অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করে। ফ্রান্স ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধতা না করলেও ইউরোপীয় কমিশনের গঠনগত পরিবর্তনে দ্য গ্যল প্রস্তাবে ব্রিটেনকে রাজি করাতে পারেনি। ফলে আরও কিছুদিন স্থগিত থাকার পর এডোয়ার্ড হিথের রক্ষণশীল সরকারের আমলে ইউরোপীয় গোষ্ঠীতে ব্রিটেনের সদস্যপদ লাভ সম্ভব হয়। সেইসঙ্গো যোগ দেয় ডেনমার্ক, আয়ার্ল্যান্ড ও নরওয়ে (জানু, ১৯৬২)।

ইউরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার যে অভীষ্ট রোম চুক্তিতে (১৯৫৭) প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল, তার পূর্ণতা লাভের একটি দিক হল আরও অধিক সংখ্যক সদস্য রাষ্ট্রকে এর অন্তর্ভুক্ত করা। ছয় সদস্যের এই সংগঠনে প্রথমে তিন (ব্রিটেন, ডেনমার্ক, আয়ার্ল্যান্ড, ১৯৭৩), তারপর অন্য এক (গ্রিস, ১৯৮১), তারপর আরও দুই (স্পেন ও পর্তুগাল, ১৯৮৬) এবং সর্বশেষে তিন রাষ্ট্র (সুইডেন, অস্ট্রিয়া, ও ফিনল্যান্ড, ১৯৯৫) এতে যোগ দেওয়ায় মোট সদস্য দাঁড়ায় পনেরো।

এই সম্প্রসারণ সুসাধ্য হতে পেরেছিল রাজনৈতিক নমনীয়তার দরুন। অধি-জাতীয়তাবাদ (Supranationalism) এবং সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের একটি মধ্যপন্থা অনুসরণ করায় উভয় মতাদর্শের সমন্বয়ে এক ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে ওঠে। EEC-তে যোগ দেয় সুইজারল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও লিখটেনস্টাইন।

১৯৮০-র দশকের শেষদিকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের ফলে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গো রাশিয়ার বন্ধন আলগা হয়ে যায়। অচিরেই পোল্যান্ড, হাঙ্গোরী, চেক ও শ্লোভাক প্রজাতন্ত্র, রোমানিয়া এবং বুলগেরিয়া পশ্চিম ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সঙ্গো সম্পর্ক স্থাপনে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। এ নিয়ে মূল সদস্যদের মধ্যে মতান্তর ঘটে, তবে অধিকাংশ সদস্যই সংগঠনের প্রসারণে বাধার সৃষ্টি না করে ভাবীকালের সদস্যদের জন্য যোগ্যতার দুটি মাপকাঠি স্থির করে দেয়—একটি হল গণতন্ত্রীকরণ, অন্যটি হল মুক্তবাজারি অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা। অবশ্যই আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক আধুনিকতার দিক থেকে পূর্ব ইউরোপ পশ্চিমের তুলনায় যথেষ্ট পশ্চাৎপদ। সুতরাং ঐসব দেশের অন্তর্ভুক্তি পশ্চিমের অগ্রগতির পক্ষে বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আবার অতি বৃহৎ একটি সংগঠনের প্রশাসনিক জটিলতাও কম নয়। তবে শিল্পে অগ্রসর চেক প্রজাতন্ত্র বা হাঙ্গোরী কিংবা কৃষি ও খামারজাত পণ্যের দিক থেকে সমৃদ্ধ পোল্যান্ডের আগমন EEC-তে তুলনামূলকভাবে উৎসাহজনক বলা যায়।

সম্প্রসারণের এই পর্বে EEC-র কার্যধারার অনেকগুলি লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। যেমন, GATT চুক্তির মধ্যে যেসব বাণিজ্যিক বৈঠক আহূত হয়েছে তাতে আলাদাভাবে সদস্যরাষ্ট্রগুলির মতামতের চেয়ে গোষ্ঠীর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক জোরালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আবার ১৯৭৮ সালের জুলাই

মাসে সদস্যরাষ্ট্রগুলির জাতীয় মুদ্রার সহজ বিনিময়যোগ্যতা সুনিশ্চিত করতে একটি সাধারণ মুদ্রাব্যবস্থা (European Currency Unit-ECU) চালু করা হয়। তার মধ্যে নয় দেশের নয়রকম মুদ্রার (ব্রিটিশ পাউন্ড স্টার্লিং বাদে) একটি পেটিকার মাধ্যমে গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীবহির্ভূত দেশসমূহের মধ্যে মুদ্রাবিনিময়ের হার স্থির হতে থাকে। অভিন্ন বাজারের জন্য একটি অভিন্ন Customs Union থাকায় শুধু বাণিজ্যিক সমতাই নয়, সদস্য দেশগুলির পরিবহন ব্যবস্থা, পরিবেশ রক্ষণ, শক্তির বণ্টন ও অনুন্নত অঞ্চলের জন্য প্রকল্প রূপায়ণ সহজ হয়ে ওঠে।

অবশ্যই বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের রাজস্ব ও আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা (Fiscal Systems) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হওয়ায়, একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্যে সব রাষ্ট্রকে নিয়ে আসা অতীব দুরূহ বলে প্রমাণিত হয়। তা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সহযোগিতায় EEC যে একটি ব্যতিক্রমী পরীক্ষাগার মাত্র ছয় সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে যে আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অর্ধশতাব্দী আগে, সেই ইউরোপীয় গোষ্ঠীর চাপটি এখন এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এটা এখন শুধুই আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগ গোষ্ঠী নয় ; এর নতুন নাম ইউরোপীয় সংঘই (European Union) এর বর্তমান স্বরূপের ইঙ্গিত বহন করছে।

গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে অবশ্যই দ্বিমতের অবকাশ আছে। অধিজাতীয়তা (Supranationalism) ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের মধ্যে মেলবন্ধন সহজ কাজ নয়। এর অভীষ্ট হল যৌথ শক্তির উদ্বোধন—যার দ্বারা প্রত্যেক সদস্য অধিকতর সমৃদ্ধি, অধিকতর নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে।

এ পর্যন্ত কোনো আঞ্চলিক সংগঠনই ইউরোপের মতো নিজস্ব সাধারণ মুদ্রা, প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সংসদ এবং সাধারণ সামাজিক-অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনে উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন পেশাদারি উদ্যোগ চালু করার কথা ভাবতেই শুরু করেনি। সবচেয়ে বড়োকথা, উপরিকাঠামোর সংহতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের মানসিকতাও বদলে দিতে পেরেছে এই সংঘ। ব্যক্তিচেতনার পাশাপাশি গোষ্ঠীমননও তাই ইউরোপে বিকশিত হচ্ছে।

2.3 ❑ **সোভিয়েত দেশের ভাঙন** (Collapse of the Soviet Union)

আকারে বৃহৎ একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রে তার রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং অঙ্গরাজ্যের, অথবা বলা যায় গরিষ্ঠ জাতির সঙ্গে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের বিরোধ এবং উত্তেজনা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্বন্দ্ব গত শতকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছিল। ঘটনার আকস্মিকতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল একই সঙ্গে মূল রুশ ভূখণ্ডে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হওয়ায়। প্রায় সাত দশক ধরে বিভিন্ন জাতিসত্তাকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বাঁধনে আবদ্ধ রাখার যে মডেল বা প্রতিরূপ গড়ে উঠেছিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে বাঁধন ছিন্ন হয়ে যায়।

কমিউনিস্ট-পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক প্রতিরূপকে একটি বিকল্প মনে করে, রাষ্ট্র ও সমাজের ভাঙনের আলাদা কোনো ব্যাখ্যা এখনও গ্রহণযোগ্য হয়নি।

বহুজাতিক সমাজে ভাঙনের প্রবণতার একটি কারণ কাঠামোগত (Structure) ত্রুটি। দুর্বল ভিত্তির

ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র, অক্ষম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, শাসনকর্তৃত্বে বৈধতার অভাব, সীমান্ত সুরক্ষায় ফাঁক ও বিচ্যুতি, রাষ্ট্রের মধ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলির আলাদা আলাদা ভৌগোলিক অবস্থান—এইসব কাঠামোগত ত্রুটির লক্ষণ।

রাজনৈতিক কারণের মধ্যে অন্তর্গত রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বে অপূর্ণতা, ভিন্ন মত অসহিষ্ণু মতাদর্শ, এক গোষ্ঠীর অন্য গোষ্ঠীর ওপর প্রভুত্বপরায়ণতা, নেতিবাচক গোষ্ঠী রাজনীতি, সমাজের মাতব্বরদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক কারণসমূহের মধ্যে বৈষম্যমূলক সুবিধা বণ্টন, প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদের ওপর অধিকারের তারতম্য, শ্রেণি-শোষণ ছাড়াও রয়েছে এক ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায় উত্তরণকালীন অস্থিরতা। তাছাড়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতি থেকে জাতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পদার্পণ কিংবা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন অর্থনীতি থেকে হঠাৎ মুক্ত বাজারি অর্থনীতিতে রূপান্তরের সময় কোনো জাতিগোষ্ঠী অবহেলিত বোধ করলে বিচ্ছিন্নতাবাদ জন্ম নেয়। সামাজিক কারণের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তারতম্যও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বিচ্ছিন্নতাবাদের উসকানিতে সাংস্কৃতিক ভেদ-বিভেদও কম দায়ী নয়। ভাষাগত বিরোধ, শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার সঙ্গে যুগসঞ্চিত ঘৃণা ও বিদ্বেষ যুক্ত হয়ে স্বকীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের তাগিদে বিপন্ন জাতিগোষ্ঠী আলাদা হয়ে যেতে চায়।

সোভিয়েত দেশে ভাঙনের প্রক্রিয়া আগে শুরু হয়ে থাকলেও তার পরিণতি দেখা দিয়েছে আকস্মিকভাবেই।

2.3.1 **ভাঙনের পটভূমি**

বলাবাহুল্য এত অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষকে একটি সমাজব্যবস্থার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা অসম্ভব কাজ। সোভিয়েত নেতৃত্ব তাই জোর দিয়েছিলেন রাজনৈতিক সংহতি (Political integration)-এর ওপর। তার ফলে বাইরের জগতের কাছে সমগ্র ব্যবস্থাটি এক ধরনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হিসেবে প্রতীয়মান থাকে। এজন্যই বলা হয়েছে, "—the Soviet Union looked an empire in the classical sense that it covers a territory of considerable extent, embracing a vast diversity of ethnically dissimilar peoples—ruled by a single sovereign authority. The imperial rule is channeled through a unique political control mechanism, the CPSU."

সুতরাং চমৎকার জাতিসমন্বয়ের যে মতাদর্শ (Sobornost) সোভিয়েত তাত্ত্বিকেরা প্রচার করে এসেছেন, তা কোনোকালেই বাস্তবায়িত হয়নি। এই প্রেক্ষিতে সোভিয়েত শাসনকালের শেষ পর্বে রাষ্ট্রনেতা গোর্বাচেভের আমলে (১৯৮৫-১৯৯০) দুটি বাস্তবসত্য মেনে নেওয়া হল। এক, যদি দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তন করতে হয়, তার সঙ্গে সাম্রাজ্যপ্রতিম প্রভুত্ব একইসঙ্গে বজায় রাখা চলে না, দুই, ওপর থেকে বিপ্লব শুরু হলে নীচের দিকে বিচ্ছিন্নতাবোধ জাগ্রত হবেই। গোর্বাচেভ যে সংস্কারপন্থী চেতনার সঞ্চার করতে উদ্যত হয়েছিলেন তার তিনটি উপাদান glasnost (স্বচ্ছতা), perestroika (পুনর্গঠন) ও uskorenie (বিকাশের গতিবৃদ্ধি)।

সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘের অঙ্গারাজ্যগুলিতে একই সময়ে পুনর্গঠনের রাজনৈতিক তাৎপর্য প্রকাশ পেতে থাকে সার্বভৌমত্বের দাবিতে। সার্বভৌমত্ব অবশ্য সোভিয়েত পরিভাষায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার দ্যোতক ছিল না। সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘের মধ্যেই জাতীয়তাবোধ সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। আর আশ্চর্যের বিষয় এই ব্যাপারে অন্য অঙ্গারাজ্যের তুলনায় মূল রুশ ভূখণ্ডে RSFR অঙ্গারাজ্যে জাতীয় স্বাধীনতার সরব উচ্চারণ শোনা যায়। ভ্লাদিমির ঝিরিনোভ্স্কির প্রতিষ্ঠিত Liberal Democratic উগ্র রুশ জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দিতে থাকে।

অন্যান্য অঙ্গারাজ্যও যে এই দৃষ্টান্তই অনুসরণ করতে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। প্রথম সুযোগেই স্বাধীনতা ঘোষণা করল ইউক্রেন, যদিও রুশ যুক্তরাষ্ট্র নিজস্ব সেনাবাহিনী ও মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তন না করা পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া স্থগিত রাখল। বাল্টিক এলাকার তিনটি রাজ্য এস্তোনিয়া, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তিকে অবৈধ বলে মনে করে এসেছে। এই বিষয়ে নিযুক্ত কমিশন যখন ঐ চুক্তির ন্যায্যতা ও বৈধতা অসিদ্ধ বলে স্থির করে, তখনই সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির আইনসভা (CPD) পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে (মার্চ-মে, ১৯৯০)। অন্য প্রতিবেশী রাজ্য — বেলারুশ, মোলজাভিয়া, জর্জিয়াও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

অন্যত্র মধ্য এশিয়া ও ককেশাস অঞ্চলে ১৯৮৮ থেকেই জাতিগোষ্ঠীগত সংঘর্ষ চলছিল। মধ্য এশিয়ায় গণরাজ্যগুলি মোটের ওপর এক একটি প্রধান জাতিসত্তার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের উৎপত্তিস্থল তুর্কিস্থান। এদের রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তন বলতে এক সম্রাজ্য থেকে অন্য সাম্রাজ্যে হস্তান্তর ছাড়া কিছু ঘটেনি। এজন্যই মন্তব্য করা হয়েছে—"Central Asia unlike some other parts of the Soviet Union has no period of national independence to look back to. The people there passed directly from the hands of the sumi-feudal Khans to the hands of Czarist colonial administration who, in turn, were replaced by Soviet officials."

ফলে দীর্ঘকাল ধরে পরাধীন থাকায় এসব দেশে খুব স্পষ্ট কোনো রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়নি। তা সত্ত্বেও অন্তত তাসখন্দে একটি সুসংগঠিত গণআন্দোলন গড়ে ওঠে।

এইভাবে দেশব্যাপী এক ব্যাপক ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে সোভিয়েত সংঘভুক্ত বিভিন্ন অঙ্গারাজ্যের মানুষের জাতীয়তাবোধ প্রকাশ পেতে থাকে। এই বিক্ষুব্ধ জাতীয়তার পিছনে যে সঙ্গত কারণ রয়েছে গোর্বাচেভও তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তিনি আশা করেছিলেন অঙ্গারাজ্যগুলিকে আরও স্বাতন্ত্র্য, আরও ক্ষমতা দিলে সংশোধিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সোভিয়েত দেশকে রক্ষা করা যেতে পারে। এজন্য তিনি নতুন একটি চুক্তির খসড়া তৈরি করেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত মূল রুশ ভূখণ্ডেই স্বাধীন সত্তার দাবি ওঠায় এবং নবনির্বাচিত সোভিয়েত প্রতিনিধিসভা ইউনিয়ন চুক্তির বিরোধিতা করায় গোর্বাচেভ রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মেলান। এই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সময় (আগস্ট, ১৯৯১) Soyuz নামে একটি গোষ্ঠী, KGB ও লালফৌজের একাংশ অভ্যুত্থান ঘটায়। অন্যদিকে উদারপন্থীদের সমর্থনের জোরে ইয়েলেৎসিন ঐ অভ্যুত্থান চূর্ণ করে সম্পূর্ণ ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। এরপর রুশ গণরাজ্যসহ অন্যান্য অঙ্গারাজ্যগুলির একে একে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘের অবলুপ্তি অচিরেই সম্পূর্ণ হয়। একই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি, আমলাতন্ত্র, KGB-রও অবনমন ঘটে।

2.3.2 **স্বাধীন রাষ্ট্রসমবায়** (Commonwealth of Independent States) **প্রতিষ্ঠা**

১৯৯১ সালের আগস্ট অভ্যুত্থান ও অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে অঙ্গরাজ্যগুলির সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘের প্রতি আনুগত্য প্রকৃত প্রস্তাবে লয়প্রাপ্ত হয়। রাষ্ট্রসংঘের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তির দখল নিয়ে নেয় স্থানীয় শক্তিগুলি। এরই মধ্যে স্থানীয় অর্থনীতিও প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। সব কটি অঙ্গারাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধি সভাই সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে পরিত্যাগকারী রাষ্ট্রগুলি সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরস্পর একটি Protocol স্বাক্ষর করে। বেলারুশের রাজধানী মিন্‌স্ক শহরে স্বাক্ষরিত ঐ প্রোটোকলের সঙ্গে ঘোষিত হয় সংঘ পরিত্যাগকারী রাষ্ট্রগুলির এক সমবায় প্রতিষ্ঠা (৮ ডিসেম্বর, ১৯৯১)। এর নাম হয় Commonwealth of Independent States বা স্বাধীন রাষ্ট্রসমবায়। এই সঙ্গে আক্ষরিক অর্থে প্রাক্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘের অবলুপ্তি ঘটে (১ জানুয়ারী, ১৯৯২)।

কাজাকস্তানের রাজধানী আলমাআটায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় CIS-এর। এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানে ১২টি প্রাক্তন সোভিয়েত অঙ্গরাজ্য সমমর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন সদস্যপদ লাভ করে। বলাবাহুল্য CIS কোনো অতিরাষ্ট্রীয় মর্যাদার অধিকারী নয়। এই রাষ্ট্রসমবায়ের অভ্যন্তরস্থ অধিবাসীদের অভিন্ন কোনো নাগরিকতা সৃষ্টি হয়নি। একটি রাষ্ট্রনায়কমন্ডলী (Council of Hearts of States)-র মাধ্যমে সদস্যরাষ্ট্রগুলির সাধারণ স্বার্থ নির্ণয় করা হয় এবং সেই অনুযায়ী সেই বিষয়গুলি যৌথভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

2.3.3 **সোভিয়েত দেশে জাতীয়তাবাদী বিচ্ছিন্নতা উদ্রেকের কারণ**

বহুজাতিক একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বৃহত্তর এবং/অথবা সবচেয়ে প্রতাপশালী জনগোষ্ঠীর প্রভাব যদি অন্য সব জনগোষ্ঠীর পক্ষে ক্ষতিকর ও অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এই বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম প্রভাবশালী রুশ জাতির প্রতি সেরকম কিছু বিদ্বেষ থেকে ঘটেনি, যতটা ঘটেছে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় অনমনীয়তা, অদক্ষতা এবং অবদমনশীলতার জন্য।

এই সাধারণ প্রেক্ষিতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একাধিক বিভেদমূলক অন্যায্য বন্দোবস্ত। স্থানীয় ভাষাগুলিকে উচ্চশিক্ষা ও সরকারি প্রশাসনের ক্ষেত্রে একেবারেই আমল না দিয়ে সর্বত্র রুশভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফল হয়েছিল মারাত্মক। অ-রুশ ভাষাগুলিকে দেখা হত, "as secondary, provincial and in the long run unnecessary."

দ্বিতীয়ত, ভাষাগত বৈষম্য তীব্র ক্ষোভের কারণ হলেও বিক্ষুব্ধবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে ইন্ধন জোগাতে আরও বেশি সাহায্য করেছে অর্থনৈতিক বঞ্চনা, সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত শাসনে জনকল্যাণ ব্যবস্থার প্রসার এবং শিল্পায়িত অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ ঘটলেও, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহের সরবরাহ থেকে শুরু করে স্থানীয় উৎপাদন পরিকল্পনা, বিপণন, মূলধন বিনিয়োগ এমনকি কারখানার অভ্যন্তরস্থ পরিচালনা একটি কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা যন্ত্র এবং একচ্ছত্রধর দলীয় আমলাতন্ত্রের নির্দেশের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে না হয়েছে সাধারণের প্রয়োজন মেটানো, না হয়েছে উৎপাদনদক্ষতা আনয়ন।

কৃষি উৎপাদনেও বিপর্যয় ঘটেছে একই কারণে। এককথায়, উৎপাদনে ও বন্টনের ক্ষেত্রে স্থানীয় বাস্তবতা উপেক্ষিত হয়েছে এবং প্রাধান্য পেয়েছে কেন্দ্রীয় নির্দেশ।

তৃতীয়ত, পরিবেশগত দুর্ভাবনা কতকগুলি অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় নির্দেশ সম্বন্ধে প্রথমে সন্দিহান ও পরে বিপন্ন করে তোলে। ইউক্রেন প্রদেশের চের্নোবিলে পরমাণু শক্তিজাত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণের (এপ্রিল, ১৯৮৬) পর পরমাণু দূষণ ছড়িয়ে পড়ে সোভিয়েত দেশের পশ্চিমাংশে। নানাস্থানে শিশুমৃত্যু ও বিকলাঙ্গতা ঘটতে থাকে। এই শঙ্কাজনক সংবাদ জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর নানাস্থানে নাগরিক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।

চতুর্থত, সামরিক তৎপরতার দিক থেকে পশ্চিমদিকের অগ্রবর্তী রাজ্যগুলি—যার মধ্যে বেলারুশ প্রধান—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এবং ঠান্ডা লড়াই পর্বে প্রভূত পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করেছে ধন-প্রাণ ও নিরাপত্তার মূল্যে। অথচ সামরিক কর্তৃত্ব থেকেছে রুশ সেনানায়কদের হাতে। সেনাবাহিনীতে আদেশদান ও পালনে রুশ ভাষাই ছিল স্বীকৃত মাধ্যম। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এই ধরনের রুশীকরণ প্রবল আপত্তির কারণ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েনও এমনভাবে করা হত যাতে এক রাজ্যের সৈনিক দূরবর্তী দেশে অবস্থান করতে বাধ্য হয়।

পঞ্চমত, জাতিগত দিক থেকে রুশদের আধিপত্য সর্বত্রই বজায় ছিল। অঙ্গরাজ্যগুলিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিল্পায়ন, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি নানা সূত্রে যাবতীয় নতুন উদ্যোগের ওপর পার্টির নজরদারিতে প্রধান ভূমিকা ছিল রুশ আধিকারিকদের। অনেক সময়েই তারা স্থানীয় জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়ে পড়ে।

ষষ্ঠত, মানবাধিকার সংক্রান্ত চেতনার প্রসার রুশ ও অ-রুশ উভয় জনসমষ্টির মধ্যে জাতিগত বৈষম্য সম্বন্ধে সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে তোলে।

সপ্তমত, দেশের অর্থনীতি, সামরিক আয়োজন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অ-রুশ জনগোষ্ঠীর যেমন রুশীকরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে, তেমনই আবার রুশ জনগণের মধ্যে একাংশ তাদের প্রাপ্য সুবিধা ও প্রাধান্য ন্যায্য বলেই মনে করে এসেছে। রুশদের নিজস্ব জাতীয় আবেগ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Paul. B. Henz-এর মতে এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য, "As a people the Russians have made the greatest exertion and sacrifice to maintain the Soviet.....Structure.......They provide the driving force and practically all the most senior and sensitive personal for government and the armed services......lip service to the multinational character of their system not withstanding, these are seen by them as essentially Russians accomplished" এই জাতিগরিমার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল অ-রুশ জাতিগোষ্ঠীকে অনুন্নত অবস্থা থেকে উন্নত করার দায়ভার, যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

সবশেষে উল্লেখ করতে হয় জাতিগত বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রসারে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা। ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রদান করেও সোভিয়েত শাসকমহল নিজ কর্তৃত্ব কায়েম রাখার জন্য Orthodox Church-এর ধর্মযাজকদের সঙ্গে একটি বিশেষ যোগসূত্র স্থাপন করে।

আবার মধ্য এশিয়ার মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মাচরণে স্বাধীনতা থাকলেও অনেক মসজিদই আনুকূল্যের অভাবে জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়। কেবলমাত্র যেখানে ধর্মগুরু বা মুফ্‌তিরা স্থানীয় কমিউনিস্ট দলের অনুগ্রহভাজন, সেখানে অবস্থার তারতম্য দেখা যায়। এককথায়, বিবিধ ধর্মের সাহবস্থানের অনুকূল হতে পারে এমন রাজনৈতিক পরিবেশের অভাব সোভিয়েত দেশে জাতীয়তাবাদী আলোড়নকে উজ্জীবিত করতে সাহায্য করেছে।

১৯৯০-এর দশকে সমগ্র সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘের প্রতিটি অঞ্চলে যে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত বা পুনর্জাগ্রত হয় তারও ইন্ধন জুগিয়েছে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, জাতিগত এবং ধর্মীয় অব্যবস্থা ও অবিচার।

2.3.4 সোভিয়েত দেশে জাতীয়তাবাদী বিচ্ছিন্নতার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

জাতীয়তাবাদী বিচ্ছিন্নতার পরিণামে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ঐক্যবন্ধন শিথিল হয়ে পড়া এবং একটির জায়গায় পনেরোটি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অপ্রত্যাশিত আলোড়ন।

প্রথমত, ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসান ও সোভিয়েত দেশের ভাঙন প্রায় একই কালপর্বের ঘটনা। সুতরাং দুই শিবিরের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কথা ওঠে এখানে তার অন্য এক মাত্রার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, পুরানো সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘের দুই অঙ্গোর একটি পশ্চিম ইউরোপ সংলগ্ন, এই এলাকার নবজাত রাষ্ট্রগুলির সবকটির রাশিয়ার প্রতি আগের মতো আনুগত্য বজায় থাকার কথা নয়। বরং দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যেই ইউরোপীয় সংঘে যোগদানের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছে। এই পশ্চিমমুখিতা দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে রাশিয়ার দিক থেকে জাতীয় স্বার্থের কতদূর অনুকূল হবে তাতে সন্দেহ আছে।

তৃতীয়ত, প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র হিসেবে রুশ প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রকে CIS–এর পক্ষ থেকে মেনে নেওয়ার পর, তার অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রকে (যারা এক সময় সোভিয়েত দেশের অঙ্গারাজ্য ছিল) রাশিয়ায় সঙ্গো নতুন করে সম্পর্ক স্থির করতে হয়েছে। রাশিয়ার পক্ষ থেকেও প্রয়াস অব্যাহত রাখা হয়েছে CIS–এর মাধ্যমে কিছুটা কর্তৃত্ব বজায় রাখার। তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মত প্রকাশের সময় সবকটি দেশ যে রাশিয়ার পরামর্শে চলবে এমন নয়।

পরিশেষে, বিশ্ব রাজনীতির ক্ষমতা সমীকরণে প্রাক্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘ যে বিশিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রতিপত্তির যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল, ভেঙে যাওয়া ভূতপূর্ব রাষ্ট্রের অধিকারী আজকের রাশিয়ার সে তুলনায় নিতান্তই গড়পড়তা ভূমিকা। অর্থনৈতিক দুর্বলতায় রাজনৈতিক উদ্যোগ এখন অনেক সীমাবদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের ওপর নির্ভরতা এখন প্রায় মজ্জাগত হয়ে উঠেছে। কোনো বড়ো রকম বিতর্কেই রাশিয়ার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার আভাস পাওয়া যায় না। NATO-র পূর্বমুখী সম্প্রসারণ কিংবা ইঙ্গ-মার্কিন বলদর্পিতার বিপক্ষে রুশ নেতৃত্ব কঠোর মনোভাব নিতে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে।

2.3.5 **রাশিয়ার চেচেন জাতি বিদ্রোহ ঃ**

সোভিয়েত দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতীয়তার আলোড়ন শুধুমাত্র অঙ্গারাজ্যগুলির স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই প্রক্রিয়ার অন্যতম পথপ্রদর্শক রুশ প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই এক দীর্ঘস্থায়ী বিচ্ছিন্নতার সংগ্রাম আজও অব্যাহত রয়েছে। রুশ প্রজাতন্ত্রের ৩১টি স্বায়ত্তশাসন এলাকার মধ্যে দুটি চেচনিয়া ও তাতারস্তান জাতিগত রাজনীতিতে গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে এবং বেশ কিছুকাল ধরে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়ে আসছে।

চেচনিয়ায় রুশ আধিপত্য কায়েম হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে সেখানকার সম্পন্ন প্রভাবশালী শ্রেণি। একটি বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, 'the local elite are still embedded in Soviet style, administration and political ideology. Even elected leadership cannot completely cut-off roots from the former Russia.' অন্যদিকে চেচনিয়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে এই রুশ নির্ভরতায় প্রবল আপত্তি। MARSHA অর্থাৎ যে স্বাধীনতায় জন্য তারা আজ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত তার লক্ষ্য আত্মপরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তাদের মনোভাব এই বিষয়ে কঠোর হয়ে উঠছে। পূর্বোক্ত বিশ্লেষণেই দেখা যাচ্ছে, "The meaning of 'freedom' form the Chechen person is not simply to philosophy of existence, rather, for them, the political domination of one nation by the other is equivalent to physical death."

এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা বেশির ভাগই হানিফি সম্প্রদায়যুক্ত সুন্নি মুসলমান। পার্শ্ববর্তী ইঙ্গাশ জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গো কিছুটা মিশ্রণ হলেও ১৯৯২ সালের পর থেকে চেচেনরা নিজেদের স্বতন্ত্র বলে গণ্য করছে। চেচনিয়ার বিদ্রোহের সূত্রপাত বলা যায় ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ যখন চেচেন জেনারেল ধোকার দুদায়েভ রাজধানী গ্রোজনির দখল নেন এবং পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে কৌশলে President পদে জয়ী হন। স্বাধীনচেতা এই সেনানায়কের উত্থানে আতঙ্কিত হয়ে রুশ নেতৃত্ব ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সেখানে সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করেন।

এরপর রাশিয়ায় রাজনীতিতে অস্থিরতা, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে চেচ্‌নিয়ার দুর্বৃত্তায়ণ শুরু হয়ে যায়। সেখানকার প্রতিবাদী আন্দোলন বিদ্রোহের চেহারা নিতে থাকে। এই অবস্থাতেও রুশ নেতৃত্ব চেচনিয়ার ব্যাপারে মিটমাটের চেষ্টায় ছিলেন। কারণ বিদ্রোহী জাতীয়তার প্রশ্নে তখনও সরকারি কোনো নীতি নির্ধারিত হয়নি।

ইতিমধ্যে মস্কো থেকে যাবতীয় আর্থিক অনুদান ও সরকারি কর্মীদের বেতন ও পেনশন প্রদান বন্ধ করে দেওয়ায় চেচেন মানুষ দুর্দশা বাড়ে। তাদের একাংশ ১৯৯৩ সালের এক সমাবেশ থেকে দাবি জানায় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের এবং রাশিয়ার সঙ্গো সম্পর্ক স্থির করার জন্য গণভোটের। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত রুশ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে একধরনের জাতিদাঙ্গা শুরু হয়, দুদায়েভের পরিচালিত জঙ্গিসেনা প্রচারের কৌশলে স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদা আদায় করে নেয়। অন্যদিকে ১৯৯৬ সালে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষিতে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়।

চেচনিয়াতেও অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফল অনুসারে আসলাম মাসকাদোভের নেতৃত্বে একটি নতুন সরকার গঠিত হয়, চেচনিয়াকে স্বাধীন সত্তায় উন্নীত করা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার প্রতিশ্রুতি দিলেও এই সরকার সাধারণ চেচেন মানুষকে আনুগত্যের বন্ধনে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়।

এরপর জঙ্গিপনার সঙ্গে অন্য একটি মাত্রা ইসলামি মৌলবাদ, সহজেই যুক্ত হয়ে যায়। দুদায়েভের মৃত্যুর পর নতুন জঙ্গিনেতা ইয়ান্দার বাইয়েভ-এর উদ্যোগে একটি Islamic Youth Centre গঠন করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী দাখেস্তান থেকে আরব মৌলবাদীদের আগমন হতে থাকে। শুদু চেচনিয়া নয়, সন্নিহিত রাজ্য দাঘেস্তান ও অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত ককেশাস এলাকাকে একই ইসলামিক ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসার তোড়জোড় শুরু হয়। জঙ্গি আন্দোলনের পক্ষে এই পরিবর্তনের আশু সুফল হল আন্তর্জাতিক মৌলবাদী ইসলামি সংগঠনগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং সেখান থেকে প্রভূত অর্থসাহায্য লাভ। এই প্রসঙ্গে Irina Koudryashova-র মত একজন দক্ষ বিশ্লেষকের অভিমত উদ্ধৃতির যোগ্য ঃ "It is certainly rather difficult to draw the line between radical and fundamentalists....dreaming of purification of Islam....nationalists who were using Islam for their own purposes and criminal elements who use religious rhetoric as a cover." মোটামুটি এই সময়েই চেচেন বিদ্রোহীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় চেচনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত রুশ সরকারের সঙ্গে কোনো আলোচনা, কোনো চুক্তি নয়। বেশকিছু অসামরিক জীবন ও সম্পত্তি নাশের প্রতিক্রিয়ায় নব-নির্বাচিত রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুটিন আতঙ্কবাদ দমনের এক সর্বাত্মক উদ্যোগ শুরু করেন। রুশ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদের বিবৃতিতে বলা হল ঃ "The character and scale of the anti-terrorist operation (must be) adequate to the threat generated by the bandits entrenched in the Republic of Chechnya who are financed by the international terrorist centres. We must not tolerate the criminal regime.....we can only overcome it by military force."

চেচেন বিদ্রোহ প্রলম্বিত হওয়ার অন্যতম কারণ বহির্দেশীয় সমর্থন ও সাহায্য। এ বিষয়ে অতি প্রাসঙ্গিক এই অভিমত ঃ "A number of countries are fighting for influence in the Caucasus and would like to see the region split into foreign Trans-Caucasus and Russian Northern Caucasus. One of the ideas floated is to create a unified Caucasan State where Russia would play no role."

চেচেন গৃহযুদ্ধ নিবারণ করা না গেলেও, তার প্রশমনের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে। দেশের মধ্যে গণসমর্থনের অভাব এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী দমনের চাপে কোণঠাসা বিদ্রোহীরা এখন বেপরোয়া আক্রমণ চালাচ্ছে যত্রতত্র, এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে চেচনিয়ায় যে আন্দোলন মুক্তি সংগ্রাম হিসেবে শুরু হয়েছিল এখন তা সহিংস সন্ত্রাসবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। জাতিগত বিচ্ছিন্নতা সময়ে দমন অথবা সমাধান না করা হলে পরিণতি এইরকমই হয়ে থাকে।

2.4 ❑ **ইউরোপীয় সংঘ** (European Union)

মুখ্যত আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংহতির লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও, ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী ক্রমেই একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করতে থাকে। Consultative Assembly বা পরামর্শদাতা সভাকে একটি ইউরোপীয় সংসদের মর্যাদা প্রদান ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সংসদে পাশ করা বিধি-বিধান প্রকৃত অর্থে জাতীয় সংসদগুলির মতো বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয় আইনে পরিণত হয়নি। ইউরোপীয় সংসদের বিশেষ ক্ষমতা হল EEC–র মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করা, সংখ্যাধিক্যের ভোটে মন্ত্রীপরিষদ ও বিশেষ কমিশনের সদস্যদের পদচ্যুত করা এবং সর্বোপরি EEC–র বাজেট প্রস্তাব অনুমোদন বা বাতিল করা।

এছাড়া ১৯৭০-এর দশক থেকেই EEC–র বৈদেশিক নীতি দপ্তর বিশ্ব রাজনীতির ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। লাতিন আমেরিকায় নিকারাগুয়ার গৃহযুদ্ধে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য আলাপ আলোচনায় EEC উৎসাহ দান করে, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ দূর করার ব্যাপারে একটি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্যও EEC তৎপর হয়ে ওঠে।

প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও EEC যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তারও রাজনৈতিক তাৎপর্য কম নয়। এক অর্থে সামরিক ও অসামরিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনে স্ব-নির্ভরতা অর্জনের ফলে ইউরোপীয় ব্যাপারে মার্কিন কর্তৃত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

EEC–র অগ্রগতি শুধু ইউরোপেই নয়, পার্শ্ববর্তী এবং দূরবর্তী অঞ্চলেও এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনেক দেশকে আকৃষ্ট করেছে। অলজিরিয়া, অস্ট্রিয়া, মিশর, ইরান, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, মেক্সিকো ইত্যাদি মধ্যক্ষমতা সম্পন্ন বহু দেশ ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সঙ্গো বিশেষ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

ইউরোপীয় গোষ্ঠীর কার্যধারা যেভাবে স্থিরীকৃত হয়েছিল রোম চুক্তিতে (১৯৫৭) তারপর সংগঠনটির চরিত্র ধীরে ধীরে বদলে যাওয়ায় ঐ চুক্তির সংশোধন ঘটিয়ে প্রণীত হয়েছিল ইউরোপীয় আইন (Single European Act, 1968)। গোষ্ঠীর কার্যকলাপের মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংক্রান্ত দায়িত্ব অর্ন্তভুক্ত হয়। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ক্ষমতাও এই আইনে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ১৯৯২ সালের মধ্যে একটিমাত্র ইউরোপীয় বাজার গঠনের সংকল্প গ্রহণ করা হয়।

এর পরের মাইলফলক মাসট্রিচ্ চুক্তি (১৯৯১)। এর দ্বারা সদস্যরাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক মিলনের উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হয়। মাসট্রিচ্ চুক্তি অনুযায়ী নানা ধরনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যকলাপে যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা দেখা দেয়, যেমন একটি সাধারণ পুলিশবাহিনী (Europol); কিংবা সামাজিক অধিকার সমূহের সংরক্ষণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল একটি সাধারণ বিদেশনীতি ও প্রতিরক্ষা নীতি গ্রহণের সংকল্প। এছাড়া প্রতিরক্ষা জোরদার করতে Western European Union নামে একটি নিরাপত্তা সংস্থার কথাও ঐ চুক্তিতে বলা হয়।

আঞ্চলিক সংহতির প্রয়াসে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সাফল্য ও ব্যর্থতার যেমন একটি অঞ্চলগত রাজনৈতিক পটভূমি আছে, তেমনই এর অভ্যন্তরীণ সংগঠনেরও রয়েছে যথেষ্ট গুরুত্ব।

গোষ্ঠীর প্রধান পাঁচটি অঙ্গা হল—মন্ত্রীপরিষদ (Council of Ministers), কমিশন, ইউরোপীয়

পরিষদ (European Council), ইউরোপীয় সংসদ (European Parliament), এবং ইউরোপীয় আদালত (European Court of Justice), এবং হিসাব পরীক্ষকমণ্ডল Court of Auditors.

2.4.1 **মন্ত্রীপরিষদ ঃ**

সব সদস্যরাষ্ট্রের একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই পরিষদ EEC–র কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং সর্বপ্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান মঞ্চ। EEC–র গণতান্ত্রিক ভিত্তির এটি একটি বিশেষ পরিচায়ক। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত একটি স্থায়ী কমিটি (COREPER) মন্ত্রীপরিষদকে টেকনিক্যাল বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

2.4.2 **কমিশন ঃ**

সদস্যরাষ্ট্রগুলির দ্বারা নিযুক্ত ২০জন কমিশনার নিয়ে এই সংস্থাটি গঠিত। এর মধ্যে পাঁচ বৃহৎ রাষ্ট্রের (ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, ইটালি ও স্পেন) দু'জন করে এবং অন্য দশ রাষ্ট্রের একজন করে প্রতিনিধি থাকে।

কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য চার প্রকারের ঃ

(ক) মূল সাংগঠনিক চুক্তির রূপায়ণ যথাযথ হচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিত করা, (খ) চুক্তির আওতাভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও মতামতকে বিন্যস্ত করা, (গ) চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী মন্ত্রীপরিষদ ও সংসদকে নীতি নির্ধারণে পথপ্রদর্শন করা, (ঘ) গৃহীত নীতিগুলির বাস্তব রূপায়ণের জন্য মন্ত্রীপরিষদ থেকে যেসব ক্ষমতা অর্পিত হবে, সেগুলির প্রয়োগ করা।

2.4.3 **ইউরোপীয় সংসদ ঃ**

বিশ্বের আঞ্চলিক সংগঠনগুলির মধ্যে এমন একটি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সংসদ এখনও বিরল। ইউরোপীয় সংসদ ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গে অবস্থিত। এর ভূমিকা মূলত সদস্যদেশগুলিকে কাম্য আইন প্রণয়নে নির্দেশ প্রদান।

2.4.4 **ইউরোপীয় আদালত ঃ**

ইউরোপীয় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমস্ত আইনের ব্যাখ্যা ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এই ন্যায়ালয়ে সম্পন্ন হয়। এই আদালত পশ্চিম ইউরোপে অধি-জাতীয়তার একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ রূপে পরিগণিত। এই আদালতের প্রধান এক্তিয়ার মূল সংস্থা ও তার গঠনকারী সদস্যদের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্ব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি করা।

2.4.5 **অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত সমিতি ঃ**

ইউরোপীয় গোষ্ঠী যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লেনদেনেই আবদ্ধতা নয়, মহাদেশে প্রচলিত নানাধরনের

সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়গুলিও এই সংগঠনের আলোচ্য বিষয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সক্রিয়—যেমন শিল্পপতিদের সংঘ, শ্রমিক সংঘ, গণমাধ্যম সংস্থা ইত্যাদি থেকে এই সদস্যদের মনোনীত করা হয়।

2.4.6 **হিসাব পরীক্ষকমণ্ডল ঃ**

গোষ্ঠীর আর্থিক আয়ব্যয়ের ওপর নজরদারির জন্য ১৫ সদস্যের এই মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালে। ইউরোপীয় সংসদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে মন্ত্রীপরিষদ এদের ছয় বছরের জন্য নিয়োগ করেন। হিসাবশাস্ত্রে পেশাদারি সুনাম এদের নিয়োগের ভিত্তি।

2.4.7 **মূল্যায়ন ঃ**

অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এক কার্যক্রম নিয়ে মাত্র ছয় সদস্যরাষ্ট্রের যে আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অর্ধশতাব্দী আগে, সেই ইউরোপীয় গোষ্ঠীর চারাটি এখন এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এখন আর এটি কেবলমাত্র আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগ গোষ্ঠী নয়; এর নতুন নাম ইউরোপীয় সংঘই (European Union) এর বর্তমান স্বরূপের ইঙ্গিত বহন করেছে।

গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে অবশ্যই দ্বিমতের অবকাশ আছে। ইউরোপীয় সংঘ যে কারণে অন্য সব আঞ্চলিক সরকারি সংগঠনের থেকে স্বতন্ত্র, তা হল একটি প্রায় সার্বভৌম যৌথ সত্তার কল্পনাকে বাস্তবে রূপদান। পরিপূর্ণ একটি অতিরাষ্ট্র না হয়েও একটি অধিজাতীয় রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে এই সংঘ অন্যান্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের সমকক্ষ হয়ে উঠছে।

সব মিলিয়ে ইউরোপীয় সংঘকে আঞ্চলিক সংহতির বৃহত্তম সার্থক রূপায়ণ বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে এর মধ্যে যে সব সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং কর্মপ্রণালীর অসংগতি আছে সেগুলিও উপেক্ষণীয় নয়।

প্রথমত, এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির সময়সাপেক্ষতা।

দ্বিতীয়ত, জাতিগত স্বাভিমান এখনও বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে অন্যতম অবলম্বন। সেজন্য দেখা যায়, যদি বা সরকার পক্ষ যৌথ কল্যাণে কিছুটা স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত, তখন আবার বিরোধী পক্ষ সার্বভৌমত্বের জিগির তুলে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে থাকে।

তৃতীয়ত, এই গোষ্ঠীর মধ্যে পরমাণু অস্ত্রশস্ত্রের মালিকানা রয়েছে দুই রাষ্ট্রের—ব্রিটেন ও ফ্রান্সের। এর মধ্যে ব্রিটেন মার্কিন অনুগামী এবং ফ্রান্স নিজস্ব শক্তি অর্জনে বিশ্বাসী।

চতুর্থত, ইউরোপীয় সংঘে যোগদানেচ্ছু নতুন দশটি দেশের সদস্যপদ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সংঘের সংবিধান সংশোধনের উপলক্ষ্য দেখা দিয়েছে।

পঞ্চমত, সংঘের পক্ষ থেকে একটি ইউরো মুদ্রা চালু করা হয়েছে। সঙ্গে যুক্ত রয়েছে European Monitory Union এবং Frankfurt-এ নব নিযুক্ত ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।

2.4.8 **ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন সংবিধান (২০০৪)**

এই New Fundamental Reforms বা মৌলিক সংস্কারের ধারক হিসেবে যে নতুন সংবিধান রচনা করা হয়েছে ১৯ শে জুন ২০০৪ সালে ব্রাসেল্‌স সম্মেলনে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ফরাসি রাষ্ট্রপতি জাক্ শিরাকের প্রতিক্রিয়া ঃ—"Thanks to this new treaty, we will have a more efficient Europe, Europe that responds to the needs of our citizens and Europe that holds a greater weight in the World."

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Tony Bleyer-ও অভিনন্দন জানিয়েছেন একে "Tony historic" বলে, যদিও কর আদায় ও বিদেশনীতির ক্ষেত্রে ভিটো দানের অধিকার বজায় রাখার জন্য তাঁর সরকারের জেদি মনোভাব ফ্রান্স ও জার্মানির বিরোধিতায় প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে।

নতুন সংবিধান গৃহীত হওয়ার ফলে ইউরোপীয় সংঘের কর্মপরিধিও বিস্তৃত হল।

এবার সদস্য দেশগুলি সার্বভৌম এশিয়ায় ভুক্ত অনেকগুলি বিষয় সংঘের আওতায় চলে আসছে, বিশেষত কর-আরোপের নীতি, সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি, ফৌজদারী, আইন এবং সংঘের রাজত্ব ব্যবস্থা।

তবে এই নবযুগ প্রবর্তনে পরবর্তী অধ্যায় খুব মসৃণভাবে অতিক্রান্ত হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় সংঘকে একটি "জায়মান অতিরাষ্ট্র" (Nations Superstate) রূপে চিত্রিত করে জাতীয়তাবাদী মহলে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ব্রিটেনে অনুষ্ঠিত কম হারে কর আদায় ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গো জার্মানি বা ফ্রান্সের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় প্রয়াসগুলির পার্থক্য এখন ইউরোপীয় সংঘে ভিন্নমুখী চিন্তাধারার সৃষ্টি করতে পারে।

মনে রাখতে হবে ইউরোপীয় সংঘ এখন বিশ্বে বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য এলাকা।

2.5 ❑ **উপসংহার ঃ**

আসলে ইউরোপীয় সংঘে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখে আঞ্চলিক সংঘটির মৌল প্রশ্নটি সামনে এসে পড়ছে। একদিকে নব কর্মসমন্বয়বাদী (New functionalist) দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ধরে নেওয়া যেতে পারে আঞ্চলিক সংহতির প্রয়াস একবার শুরু হয়ে গেলে তাতে আপনার থেকেই গতি সঞ্চার হতে থাকবে। (integration would create its own momentum) অন্যদিকে বাস্তববাদীরা মনে করেন, কোনো অঞ্চলের জাতিসমূহ অর্থনৈতিক সহযোগিতায় আবন্ধ হতে পারে এবং উৎসাহবশে ক্রমেই সেই সহযোগিতাকে দৃঢ়তর বন্ধনে পরিণত করতে পারে।

একক 3 ❑ তৃতীয় বিশ্বে ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War in the 3rd World)

গঠন

3.1 কোরিয়া সমস্যা

3.2 সুয়েজ সঙ্কট

3.3 ভিয়েতনাম যুদ্ধ

3.4 আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষ

3.1 ❑ কোরিয়া সমস্যা

প্রায় তিনদশক পরে দ্বীপরাষ্ট্র কোরিয়া জাপানি সাম্রাজ্যের কবল থেকে মুক্ত হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জাপানি অধ্যায়-এর পরিসমাপ্তি ঘটলেও মুক্তিবাদী মিত্রশক্তিপুঞ্জের 'প্রভাব-এলাকার' তত্ত্ব পৌঁছোল সুদূর কোরিয়ায়। যুদ্ধের শর্ত অনুযায়ী উত্তর কোরিয়া রাশিয়ার এবং দক্ষিণ প্রান্ত আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে থাকল। দেশটি দুটি দখলি এলাকায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে দুটি আলাদা ধরনের সরকার ও ভিন্ন দুই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবানুসারে ৩৮° অক্ষরেখার সীমানা ধরে কোরিয়াকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোয় কোরিয়া সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এক আলোচনা বৈঠক বসে। এই আলোচনায় স্থির হয় যে সোভিয়েত-মার্কিন যুক্ত কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশন কোরিয়ার সব গণতান্ত্রিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করবে। কোরিয়া পাঁচ বছরের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিন, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে থাকবে। এই আলোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিষয়টি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপন করলে জাতিপুঞ্জ কোরিয়া সম্পর্কিত এক অস্থায়ী কমিশন নিযুক্ত করে। এই কমিশনকে সমগ্র কোরিয়ার নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া জাতীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করে সমগ্র কোরিয়ার শাসনক্ষমতা দখল সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ করবার অধিকার প্রদত্ত হয়। কমিশনকে আরও দায়িত্ব দেওয়া হয় বিদেশি সৈন্য অপসারণের জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই কমিশন গঠনের প্রস্তাবে বিরোধিতা করে। কমিশন শুধু দক্ষিণ কোরিয়াতে নির্বাচন-পর্ব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। সমগ্র কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবার পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই ও মতপার্থক্যের ফলে উক্ত প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করেনি।

১৯৪৮ সালে সীংম্যান রী'র নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ায় এক দক্ষিণপন্থী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। রী'র একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থায় কোরিয়ার কমিউনিস্ট

পার্টি ও শ্রমিক সংগঠনগুলোকে দমন করা হতে লাগল এবং এই কমিউনিস্ট সংগঠনকে সরাসরি দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা হল। তিনি কমিউনিস্টদের সতর্ক করে দিলেন যে তারা যদি তাঁর মত সমর্থন না করে তাহলে সৈন্য দ্বারা দ্বীপরাষ্ট্রটির উত্তর সীমান্ত বন্ধ করে দেবেন। আমেরিকা রী'র এই হুমকিকে যুদ্ধের প্রাক্-ঘোষণা হিসেবে গুরুত্ব দিল এবং তাঁর এই উগ্র জাতীয়তাবোধকে ঠেকানোর জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যবাহিনীকে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র পাঠাল। উত্তর কোরিয়াতে এক নির্বাচন হয়। কিম ইল সুং-এর নেতৃত্বে এক কমিউনিস্ট সরকার উত্তর কোরিয়াতে কার্যভার গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। উত্তর কোরিয়া প্রধানত শিল্পপ্রধান এবং দক্ষিণ কোরিয়া কৃষিপ্রধান। আমেরিকা সীংম্যান সরকারকেই একমাত্র আইনসঙ্গত কোরিয়া সরকার বলে ঘোষণা করে। নতুন এক কমিশন গঠন করে উভয় কোরিয়ায় সংযুক্তির প্রচেষ্টা চালাতে বলা হয়। উভয় কোরিয়াই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার আবেদনপত্র জাতিপুঞ্জ গ্রহণ করেনি। দক্ষিণ কোরিয়ায় আবেদন সোভিয়েত 'ভেটো' প্রয়োগের ফলে বাতিল হয়ে যায়।

১৯৫০-এর জুন মাসে অভিযোগ ওঠে উত্তর কোরিয়া থেকে নাকি কমিউনিস্ট ফৌজ সীমানা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়া ভূখণ্ড আক্রমণে উদ্যত। প্রসঙ্গটি অচিরেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে তোলা হয় এবং আগ্রাসনের ঘটনা হিসেবে একে চিহ্নিত করে যৌথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা, অর্থাৎ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সোভিয়েতের প্রবল আপত্তি, ঘন ঘন ভিটো প্রদান ও শেষে সভাকক্ষ ত্যাগের পর অচল নিরাপত্তা পরিষদ থেকে বিষয়টি সাধারণ সভায় তোলা হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে কোরিয়ায় UN সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই অভিযানে ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বহু দেশের সহযোগিতা থাকলেও, সদ্য-দখল জাপানের ভূখণ্ড থেকে যুদ্ধ পরিচালনার সিংহভাগ দায় বহন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু দীর্ঘ তিন বছরের চেষ্টাতেও এই যৌথ অভিযান শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। বরং ৩৮তম অক্ষরেখা অতিক্রম করে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশোদ্যত জাতিপুঞ্জ বাহিনী, চিন-সোভিয়েত সাহায্যপুষ্ট উত্তর কোরিয়ার আক্রমণের মুখে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে বাধ্য হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং জেনিভা শান্তি সম্মেলনের (১৯৫৪) শর্তসাপেক্ষে উভয়পক্ষের বন্দিবিনিময় সম্পন্ন হয়।

3.1 ❑ **সুয়েজ সঙ্কট**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় শেষের দিকে মিশর অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধ শেষে মিশর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করে। যুদ্ধোত্তরকালে মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অভ্যন্তরীণ সমাজবিপ্লবের ফলে মিশরে যে গঠনমূলক জাতীয়তাবোধ জন্মায়, পশ্চিমি ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি তাকে উপেক্ষা করতে থাকে। ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে কর্নেল গামাল আব্দেল নাসের সর্বসম্মতিক্রমে মিশরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রপতি নাসেরের বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র আরব জগতকে ঐক্যবদ্ধ করা, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দুর্নীতি দূর করা, সামন্তবাদের উচ্ছেদ সাধন করে আমূল ভূমি সংস্কার প্রবর্তন করা।

অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য নাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ পরিকল্পনা অবলম্বন করেন। পশ্চিমি বৃহৎ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রমুখ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন নাসের। কিন্তু তাঁর এই আবেদন গৃহীত হয়নি। তাদের এই অসম্মতি নাসেরকে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে।

নাসের ১৯৫৬ সালের ২৬ জুলাই সুয়েজ খাল জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে জাতীয়করণের পরে সুয়েজ খাল থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হবে তাই আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং এইভাবে মিশরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা হবে। সুয়েজ জাতীয়করণে ইঙ্গাফরাসি শক্তি মিশরের ওপর বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এরপর মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসের সুয়েজ খাল থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ এবং পুরনো চুক্তি বাতিল করে সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব মিশরের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করায় ইঙ্গা-ফরাসি তরফে সশস্ত্র যুগ্ম আক্রমণ (১৯৫৬) চালানো হয়। নির্জোট নীতির পক্ষপাতী নাসেরের সঙ্গো সোভিয়েত দেশের সুসম্পর্ক লক্ষ করে নীলনদের ওপর নির্মীয়মাণ আসোয়ান বাঁধ প্রকল্প থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিশ্রুত সাহায্য প্রত্যাহার করে নেয়। সর্বোপরি মধ্যপ্রাচ্যের পশ্চিম অনুগামী কয়েকটি দেশ (ইরান, ইরাক, তুরস্ক ও পাকিস্তান)-কে নিয়ে একটি সামরিক জোট গঠন করা মধ্যপ্রাচ্যে এ পর্যন্ত অনাগত ঠান্ডা লড়াইয়ের পথ উন্মুক্ত করে দিল।

3.3 ❑ **ভিয়েতনাম যুদ্ধ**

আনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওস এই তিনটি রাজ্যকে নিয়ে ছিল ইন্দোচীন। উনিশ শতকে এই তিনটি রাজ্যের ওপর ফ্রান্স তার আধিপত্য স্থাপন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যখন ইন্দোচীনে প্রবেশ করে তখন এখানে ফরাসি শাসনের অবসান ঘটে। এই সময় ভিয়েৎমিন্ নামে একটি বিপ্লবী দল স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে। জাপানের পরাজয়ের সঙ্গো সঙ্গো এই দলটি আনামে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং এর নাম দেয় ভিয়েতনাম। এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হলেন হো চি মিন।

যুদ্ধ শেষ হলে ফরাসি সরকার এই অঞ্চলে তার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার সঙ্কল্প করে। শুরু হল সাম্রাজ্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এইভাবে জাপান থেকে কোরিয়া এবং তারপরেই দক্ষিণ-পূর্বমুখী আক্রমণাত্মক প্রস্তুতির সমর্থনে Domino Theory নামের একটি তত্ত্বের আমদানি করা হয়। মূল প্রবক্তা রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের ভাষায় ঃ

"You have a row of dominoes set up. You knock over the first one, and what will happen to the last one is a certainty that it will go over very quickly."

অর্থাৎ সাম্যবাদীরা একবার কোথাও বিপ্লবে সাফল্য অর্জন করলে পর পর কাছাকাছি যত দেশ আছে সর্বত্রই বিপ্লবের আঘাতে বিদ্যমান ব্যবস্থা লোপ পাবে। তদনুসারে বিপন্ন হতে পারে এমন সব দেশে আগে থেকে প্রতিরোধ শুরু করে দিতে হবে, উদাহরণস্বরূপ ইন্দোচীনের দিকে নজর পড়ে। ঐ দেশটি দীর্ঘকাল ফরাসি উপনিবেশ হিসেবে থাকার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হস্তগত হয়

এবং সেখানকার কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি যুগপৎ জাপানি সাম্রাজ্যবাদের উৎখাত ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যাবর্তন রুখতে তৎপর হয়ে ওঠে। এই সময়ই প্রত্যাবৃত্ত ফরাসি ঔপনিবেশিক সরকারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রভূত সামরিক সাহায্য আসতে থাকে আমেরিকা থেকে। কিন্তু প্রবল কমিউনিস্ট প্রতিরোধের মুখে ফরাসি বাহিনী পরাস্ত হয় এবং দিয়েন বিয়েন ফু নামক স্থানে দীর্ঘ ছয়মাস আটক থাকার পর শান্তিচুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হয়। এজন্য জেনিভায় আহূত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মার্কিন, ব্রিটিশ, সোভিয়েত ও চিনা প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ও সম্মতিতে স্থির হয়, ফরাসি সৈন্যবাহিনীর অপসারণকালে সাময়িকভাবে ভিয়েতনাম উত্তর ও দক্ষিণ দুই অংশে বিভক্ত থাকবে এবং তার অব্যবহিত পরে দুই এলাকাতেই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠিত হবে। ভারত, পোল্যান্ড ও কানাডার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ওপর সমগ্র প্রক্রিয়াটি তদারক করার ভার ন্যস্ত রইল।

কিন্তু ঠান্ডা লড়াইয়ের রাহু অনিবার্যভাবে গ্রাস করল ভিয়েতনামের শান্তি প্রক্রিয়াকে। পতনোন্মুখ ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ না করাটা মার্কিন প্রশাসনের কৌশলগত পশ্চাদপসরণ (tactical retreat) মাত্র এবং জেনিভা সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনামের অভ্যুদয় যে আদৌ তাদের মনঃপূত নয় তার প্রমাণ অচিরেই পাওয়া গেল। ভিয়েতনামের দক্ষিণ অংশকে এবার 'testing ground for containment on the mainland of Asia' হিসেবে ব্যবহার করা হতে থাকল। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মার্কিন মনোনীত রাষ্ট্রপ্রধান নো দিন দিয়েমকে আশ্বাস দেওয়া হল তাঁর দেশটিকে রাজনৈতিক অন্তর্ঘাত ও বাইরের সামরিক আগ্রাসন প্রতিহত করবার মতো শক্তিশালী করে তোলা হবে। এইভাবে শুরু হল দক্ষিণ ভিয়েতনামে জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির উপর দমনপীড়ন, প্রতিক্রিয়ায় উত্তরোত্তর গণবিক্ষোভ, স্বেচ্ছাবাহিনী ভিয়েতকঙের উদ্ভব, ক্রমাগত মার্কিন সৈন্যবাহিনীর প্রবেশ এবং অবশ্যই উত্তর ভিয়েতনামে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট সরকারের ওপর বোমারু হামলা যার প্রত্যুত্তরে সমগ্র ভিয়েতনাম জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সাহায্য আসতে থাকে সোভিয়েত ও চিন থেকে। শত্রু বিনাশের নামে শহরতলি, গ্রাম, শস্যক্ষেত্র, বনাঞ্চলে মার্কিন রাসায়নিক অস্ত্রের ধ্বংসলীলা আর নিরীহ মানুষ নিধন সারা বিশ্বে নিন্দা এবং নিজ দেশে ছাত্র যুব বিক্ষোভের আলোড়ন জাগায়। অবশেষে উত্তর ও দক্ষিণের দীর্ঘ (১৯৬৪-৭৫) মৃত্যুপণ সংগ্রাম সমগ্র ভিয়েতনাম ও সন্নিহিত লাওস ও কাম্বোডিয়া থেকে মার্কিন সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ অপসারণে বাধ্য করে এবং স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনামের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

দেখা গেল কোরিয়ার সংগ্রামের পর আবার এশিয়ারই অন্য একটি দেশে মার্কিন আগ্রাসনের তাণ্ডব। একে উপলক্ষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অংশত চিনের সঙ্গে তাদের শুধু ছায়াযুদ্ধ নয়, ভালো মতো শক্তির পরীক্ষা হয়ে গেল। সেইসঙ্গে তৃতীয় দুনিয়ার কোন্ দেশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই সংগ্রামে কী ভূমিকা গ্রহণ করে তারও পরীক্ষা হয়ে গেল। বলাবাহুল্য, ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুধু সামরিক দিক থেকেই নয়, কূটনৈতিক দিক থেকেও অভাবনীয় পরাজয় ঘটল। ভিয়েতনামের এই সাফল্যে সমগ্র এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিতে সোভিয়েত দেশের প্রভাব শতগুণ বর্ধিত হল।

3.4 ❑ আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষ প্রথম পর্যায় (১৯৪৮)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতি যতগুলি আঞ্চলিক সংঘর্ষে উদ্বেল হয়েছে তার মধ্যে আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পক্ষে এপর্যন্ত প্রায় অসম্ভব প্রমাণিত হয়েছে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময় এই সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ অবশ্যই বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ। দুই বিবদমান শিবিরের দিক থেকে পরোক্ষ শক্তিপরীক্ষা অঙ্গান হয়ে ওঠে মধ্যপ্রাচ্য। আরব জাতীয়তাবাদ যেমন সোভিয়েত দেশের সমর্থন ও সাহায্য লাভ করে, তেমনই ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েলের পক্ষে মার্কিন ও ইউরোপীয় মদত সর্বদাই সহজলভ্য ছিল।

ঠাণ্ডা লড়াই পর্বে মোট তিনবার বড়োমাপের যুদ্ধ ও একাধিক সংঘর্ষ বাধে আরবদেশগুলি ও ইজরায়েলের মধ্যে এবং প্রতিক্ষেত্রেই প্যালেস্তানীয় সমস্যাকে উপলক্ষ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই সংঘর্ষগুলিতে একদিকে আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গো ইহুদি জাতীয়তাবাদের সংঘাত ও অন্যদিকে ইজরায়েল ও প্রতিবেশী আরবরাষ্ট্রগুলির ভূখণ্ডের দখল নিয়ে বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথম সংঘর্ষের (১৯৪৮) কারণ নিহিত ছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে দীর্ঘকাল প্রবাসী ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্যালেস্তাইনে একটি স্বতন্ত্র ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অবসানে প্যালোস্তাইন ভূখন্ডে স্থানীয় আরব ও বহিরাগত ইহুদিদের পরস্পরবিরোধী দাবির নিষ্পত্তির জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বিষয়টি উত্থাপিত হয়। ভারপ্রাপ্ত ১১ সদস্যের কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত ছিল প্যালেস্তাইনের বিভাজন এবং এক অংশে ইহুদি ও অন্য অংশে আরবদের অধিষ্ঠান বিধিবদ্ধ করার। তিন দেশের প্রতিনিধি—ভারত, ইরান ও সাবেক যুগোশ্লাভিয়া এর বিরোধিতা করে। কমিটির সুপারিশমতো প্যালেস্তাইন বিভাজনের সিদ্ধান্ত নেয় জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা (UNGA Resolution, 29 November, 1947)। বিক্ষুব্ধ প্যালেস্তানীয় আরবদের সঙ্গো এর ফলে ইহুদিদের দাঙ্গা বেধে যায় এবং তদারকি ব্রিটিশ সরকার ঐ এলাকা থেকে সরে যাওয়ার সুযোগে ইহুদিরা স্বাধীন ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে (মে, ১৯৪৮)। এই নতুন সরকার প্রায় সঙ্গো সঙ্গোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেকগুলি পশ্চিমি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে।

স্বাধীন ইজরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণার প্রতিক্রিয়ার মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্স জোর্ডান ও ইরাকের সৈন্যবাহিনী একজোট হয়ে ইজরায়েল আক্রমণ করে। আরব-ইজরায়েলের প্রথম যুদ্ধ অবশ্য আরবদের পক্ষে সাফল্যজনক হয়নি। জাতিপুঞ্জের মধ্যস্থতায় সাময়িক যুদ্ধবিরতি হলেও আরবদেশগুলি ইজরায়েলের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী সংগ্রামের সঙ্কল্প গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় আরব-ইজরেয়ল যুদ্ধ (১৯৫৬)

আরবদের সঙ্গো প্রথম সামরিক সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা থেকে ইজরায়েলি প্রশাসন কতকগুলি স্থায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। এক, আরবদের থেকে জবরদখল করে নেওয়া এলাকাগুলি প্রত্যর্পণে অসম্মতি, দুই, ভবিষ্যৎ আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও বিদেশ থেকে আনীত আধুনিক যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহ করা, তিন, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে পশ্চিমি শিবিরের

কূটনৈতিক সমর্থন আদায়, এবং চার, প্যালেস্তানীয় ছাউনিগুলির ওপর সশস্ত্র নজরদারি।

প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের অসম্মান ও প্যালেস্তানীয় আরবদের দুর্দশায় অন্যান্য আরবদেশের মনোভাব কঠিন হয়ে উঠলেও সুসংহত কোনো উদ্যোগ নিতে তখনই কেউ প্রস্তুত ছিল না। আর একটি যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে ইন্ধন জুগিয়েছিল বাইরের বৃহৎ শক্তিগুলি।

মিশরের নবীন জাতীয়তাবাদী এবং নির্জোট আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা হিসেবে গামাল আব্দেল নাসের ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আলজিরিয়ার মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করেন, ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে সৃষ্ট বাগদাদ প্যাক্ট-এর বিরোধিতা করেন, মিশরের সিনাই মরুভূমির গাজা অঞ্চলে প্যালেস্তানীয় শিবিরগুলির ওপর ইজরায়েলী সৈন্যের হামলায় বাধাদানের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলি থেকে না পেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মার্কিন প্রশাসন নীলনদের ওপর আসোয়ান বাঁধ নির্মাণে প্রতিশ্রুত সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হলে সোভিয়েত সহায়তায় বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে নাসের একটি সুদূরপ্রসারী ও চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নিলেন সুয়েজ খাল কোম্পানির জাতীয়করণের (২৬ জুলাই, ১৯৫৬) দ্বারা। সুয়েজ খাল কোম্পানির ব্রিটিশ ও ফরাসি অংশীদারেরা ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি পেলেও ঐ দুই দেশের সরকার ইজরায়েলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে খাল পুনর্দখলের যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ব্রিটেন ফ্রান্স ও ইজরায়েলের যৌথ আক্রমণে পর্যুদস্ত মিশর সুয়েজ খালেরও দখল হারাতে বসেছিল। এই সন্ধিক্ষণে বিশ্বব্যাপী আগ্রাসনবিরোধী জনমতের চাপে, সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভের ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের হুমকিতে এবং সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শূন্যস্থান দখলের প্রত্যাশায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও যুদ্ধ বন্ধ করতে জাতিপুঞ্জের নির্দেশ সমর্থন করে।

এই যুদ্ধে কিছু ভূখণ্ড হারালেও আরব দুনিয়ায় নাসেরের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাবও ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। পক্ষান্তরে ইজরায়েলের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়। সুয়েজ যুদ্ধে অবশ্য বৃহত্তর আরব-ইজরায়েলি সমস্যার কোনো হেরফের হয়নি। বরং এ অঞ্চলের রাজনৈতিক পটভূমিতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আর একটি সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল।

তৃতীয় আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ (১৯৬৭)

গোলযোগের শুরু হয় ১৯৬৩-তে জোর্ডান নদীর জল একটি কৃত্রিম খালে প্রবাহিত করার ইজরায়েলি প্রচেষ্টা থেকে। এর ফলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং সিনাই এলাকা থেকে প্যালেস্তানীয় বিদ্রোহী গোষ্ঠী ফিদায়েঁ নিয়মিত ইজরায়েল দখলীকৃত এলাকায় হানা দিতে থাকে। চাপে পড়ে নাসের ঘোষণাই করে দিলেন যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুত। সিরিয়ার অধীন গোলান পর্বতশীর্ষ থেকে গোলাবর্ষণের প্রত্যুত্তরে ইজরায়েলি বিমানবাহিনী সিরীয় বিমানক্ষেত্রগুলির ওপর বোমাবর্ষণ করে ও ছয়টি মিগ বিমান চূর্ণ হয়। এরপর নাসের কর্তৃক তিরান প্রণালীর মধ্য দিয়ে ইজরায়েলি জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা কার্যকর হওয়ার আগেই অতর্কিত আক্রমণে (৫ জুন) ইজরায়েলি বিমানবাহিনী মিশরের বিমানঘাঁটিগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের সৈন্যবাহিনী গাজা ভূখণ্ডসহ সমগ্র সিনাই উপত্যকা

দখল করে নেয়। বলাবাহুল্য প্রতিপক্ষের সামরিক দুর্বলতা ও সমন্বয়ের অভাবে ইজরায়েলি বাহিনী অবলীলাক্রমে জোর্ডান নদীর পশ্চিম তীর (West Bank), জেরুজালেম শহরের পূর্বাংশ, সিরিয়ার গোলান পার্বত্যভূমির দখল নিয়ে নেয় এবং ইরাকের যুদ্ধবিমানগুলি ধ্বংস করে।

মাত্র ছয়দিনের এই সংগ্রামে এতগুলি আরব রাষ্ট্রের যৌথশক্তির শোচনীয় পরাজয়ে সমগ্র আরব দুনিয়াতে হতাশার সঞ্চার হয়। মূলত সোভিয়েত ও মার্কিন উভয় পক্ষের চাপেই যুদ্ধ থেমে যায়। সুতরাং এই যুদ্ধেও মূল আরব-ইজরায়েল সমস্যার কোনো সমাধান তো হলই না, বরং মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ভূগোলই পরিবর্তিত হয়ে গেল অবিশ্বাস্যভাবে। পরাভূত আরবদেশগুলি খার্টুমে মিলিত হয়ে শপথ গ্রহণ করল "no negotiation, no recognition, no peace."

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ উভয় পক্ষের স্বার্থকে সমান গুরুত্ব দিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল যার মর্মার্থ ইজরায়েলকে সমস্ত দখলীকৃত ভূমি ছেড়ে যেতে হবে, আরবদেশগুলি ইজরায়েলের অস্তিত্ব মেনে নেবে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সচেষ্ট থাকবে। বলাবাহুল্য কোনোপক্ষই এই পন্থা অনুসরণে রাজি ছিল না। এই প্রস্তাব না মানায় আর একটি যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে রইল।

চতুর্থ আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ (অক্টোবর ১৯৭৩)

সম্মুখযুদ্ধে ইজরায়েলকে পর্যুদস্ত করে প্যালেস্তানীয় সমস্যার সমাধান যে অসম্ভব সেটা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরবরাষ্ট্রগুলির মতো প্যালেস্তানীয়রাও বুঝে গিয়েছিল।

মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসেরের মৃত্যুর পর নতুন রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত দুমুখো নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। একদিকে ইজরায়েলিদের কাছ থেকে হৃত ভূখণ্ড ফিরে পাওয়ার জন্য উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রে মিশরীয় সৈন্যবাহিনীকে সজ্জিত করে তোলা এবং অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে মিটমাটের জন্য ইজরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। ১৯৭৩ সালের ৬ অক্টোবর মিশরীয় সৈন্যরা আকস্মিক আক্রমণে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে সিনাই উপত্যকার ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু অতর্কিত আক্রমণের বিহ্বলভাব অচিরেই কাটিয়ে উঠে ইজরায়েলি সাঁজোয়াবাহিনী গোলান দখল করে নেয় এবং সিনাই থেকে মিশরীয় সৈন্যদেরও হটিয়ে দেয়।

এই যুদ্ধে আবার মিশর ও সিরিয়ার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও আরব দুনিয়ায় নতুন করে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়। তেল উৎপাদনকারী আরবদেশগুলি ইজরায়েলকে সাহায্যদানকারী সমস্ত পশ্চিমি রাষ্ট্রে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। তেল উৎপাদনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে এভাবে একটি অত্যাবশ্যক পণ্যকে আমদানিকারকদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করায় সমগ্র ইউরোপীয় গোষ্ঠী বিচলিত হয়ে পড়ে। মস্কো থেকেও এই সময় আরবদের পক্ষে সামরিক হস্তক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

সোভিয়েত হস্তক্ষেপ নিবারণের জন্য উদ্‌গ্রীব আমেরিকায় যুদ্ধবিরতি ও শান্তি সম্মেলনের দৌত্যে নেমে পড়ে। যুদ্ধে আরবরা অত্যুন্নত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের ফলে ইজরায়েলি পক্ষে প্রভূত সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় তারাও আর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চায়নি। সুতরাং ১৯৭৭ সালে ইজরায়েল সরকারের প্রেরিত মৈত্রী প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে মিশর রাষ্ট্রপ্রধান আনওয়ার সাদাত ইহুদি প্রধানমন্ত্রী মেনাচিম বেগিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ বৈঠকে মিলিত হন জেরুজালেমে। মধ্যপ্রাচ্যে এরপর বড়োমাপের সম্মুখ সমর না হলেও সংঘর্ষ প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

একক 4 ❑ নির্জোট আন্দোলন ও বিশ্ব রাজনীতিতে তার প্রভাব
(NAM & its impact on World Politics)

গঠন

4.0 **সূচনা**

4.1 **জোট নিরপেক্ষতার তাত্ত্বিক কাঠামো**

4.2 **জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়**

4.3 **নির্জোট আন্দোলনের কৃতিত্ব**

4.4 **নির্জোট আন্দোলনের সম্ভাবনা**

4.0 ❑ সূচনা

বৃহৎ শক্তি-শাসিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় তৃতীয় দুনিয়ার উন্নতিকামী অথচ দুর্বল দেশগুলির আত্মরক্ষার্থে এমন একটি বৈদেশিক নীতির প্রয়োজন ছিল, যা তাদের বিশ্বজোড়া ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফাঁদ থেকে দূরে রাখবে অথচ স্বাভাবিক আন্তঃরাষ্ট্র লেনদেনের ব্যপারে জাতীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করতে সাহায্য করবে। এমনই একটি মৌলিকতাসম্পন্ন বিদেশনীতি গত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে কল্পিত এবং রূপায়িত হয়ে আসছে, যার নাম জোট নিরপেক্ষতা (Non-alignment)। স্বাধীন ভারতের বিদেশনীতির রূপকার জওহরলাল নেহরু ও তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী ভি. কে. কৃষ্ণমেননের চিন্তাধারায় এই মৌলিক ধারণার উৎপত্তি। পরে এই নীতি অবলম্বন করে বিশ্বব্যাপী যে সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে ওঠে নির্জোট আন্দোলন নামে তা আজও বহাল রয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসন মুক্তি ও আফ্রো-এশিয়া সংহতির প্রয়াস জোট নিরপেক্ষতার পটভূমি রচনা করে। এ বিষয়ে আফ্রিকা-এশিয়ার লক্ষ লক্ষ শন্তিকামী সাধারণ মানুষের অবস্থান কি হবে সে বিষয়ে নেহরুর স্পষ্ট ঘোষণা (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ বেতার ভাষণ) ঃ

"We propose, as far as possible, to keep away from the power politics of groups, aligned against one another."

জোট নিরপেক্ষতা কোনো সুবিধাবাদী অবস্থান নয়। এর অর্থ আত্মনির্ভর, স্বাধীন ও অবিচল একটি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হওয়া।

4.1 জোট নিরপেক্ষতার তাত্ত্বিক কাঠামো

ভারতীয় চিন্তন থেকে সাধারণ বিশ্বচেতনার প্রাবিষ্ট হওয়ার জন্য জোটনিরপেক্ষতার মর্মার্থ সম্বন্ধে সহমত গঠন ছিল অত্যন্ত জরুরি। এর মূল ধারণাগুলির মোটামুটি তিনটি দিক সর্বজনস্বীকৃত ঃ

১। জোট নিরপেক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক আইনে উল্লিখিত নিরপেক্ষতার মধ্যে পার্থক্য : যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে যুযুধান কোনো পক্ষের সঙ্গেই কোনো সংস্রব না রাখাই হল নিরপেক্ষতা। উত্তপ্ত যুদ্ধ না হলেও যুদ্ধেরই তুল্য ঠাণ্ডা লড়াইয়ে জোট নিরপেক্ষ দেশ যেমন অংশ নেবে না, তেমনই পক্ষপাতিত্বও করবে না — এই ছিল মূল দৃষ্টিভঙ্গি। নিজেদের জাতীয় স্বার্থই এক্ষেত্রে বিচারের মূল নিরিখ। আবার স্থায়ী নিরপেক্ষতায় শান্তির সময়েও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে নীরব থাকাই প্রথা।

২। জোট নিরপেক্ষ দেশের কাছে তার সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাই বড়ো কথা।

৩। শান্তি ও সহযোগিতার বাতাবরণ গড়ে তুলতে নির্জোট নীতি যে কোনো প্রকারের আধিপত্যের বিরোধী।

৪। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি বিশেষভাবে প্রয়াসী হবে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ন্যায্য ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে।

৫। জোট নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের কোনো জোট তৈরি করবে না, তবে ক্ষেত্রবিশেষ নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রগুলি প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রেখে চলবে ও বৈদেশিক নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে প্রয়াসী হবে।

৬। রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করার প্রশ্ন ওঠে না জোট নিরপেক্ষতায়। তবে সামাজিক ন্যায় ও স্বনির্ভর উন্নয়নের স্বার্থে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, অবাধ স্বাধীনতা ও পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যবর্তী কোনো পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয় বলে অনেকেই মনে করেন।

4.2 ❑ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়

প্রথমে আফ্রিকার ও এশিয়ার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিকে নিয়ে বিশ্বরাজনীতিতে এর আত্মপ্রকাশ ঘটলেও লাতিন আমেরিকা এবং ইউরোপের কোনো কোনো দেশ অচিরেই এই নির্জোট আন্দোলনে শামিল হতে চায়। ১৯৫৬ সালে ব্রাইয়োনিতে প্রধান ত্রয়ী—নেহরু, নাসের ও টিটো—তিন মহাদেশের প্রতিভূ হিসেবে যে বৈঠক করেন, সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় জোট নিরপেক্ষতাকে দেশভিত্তিক বিদেশনীতির উর্ধ্বে একটি বিশ্বজোড়া আন্দোলনে পরিণত করার।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালে যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে নিরপেক্ষ ২৫টি দেশের শীর্ষ সম্মেলন বসে এবং সেখানেই নির্জোট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা।

বেলগ্রেড শীর্ষ সম্মেলনের আগেই কায়রোয় ২২ দেশের বিদেশমন্ত্রীদের প্রস্তুতি বৈঠকে জোট নিরপেক্ষতার স্বরূপ ও নির্জোট আন্দোলনের সদস্য হওয়ায় যোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনায় স্থির হয় ঃ

১) সদস্য পদপ্রার্থী দেশকে স্বাধীন নীতি অনুসরণে আগ্রহী হতে হবে।

২) রাজনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহাবস্থানে বিশ্বাসী হতে হবে।

৩) ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তির আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সমর্থন করতে হবে।

৪) ঠাণ্ডা লড়াই প্রভাবিত কোনো জোটের শরিক হবে না।

৫) আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থে কোনো বৃহৎ শক্তির সঙ্গো চুক্তিতে আবদ্ধ থাকলেও সেই চুক্তির সঙ্গো ঠান্ডা লড়াইয়ের কোনো সংস্রব থাকবে না।

১৯৬৪ সালে কায়রোয় নির্জোট আন্দোলনের দ্বিতীয় সম্মেলনে দেখা গেল ৪৭টি জাতিরাষ্ট্র এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং আরও দশটি দেশ পর্যবেক্ষকের মর্যাদা পেয়েছে। কায়রো ঘোষণায় বিশেষ জোর দেওয়া হয় নিরাপত্তা, সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসা এবং নিরস্ত্রীকরণের ওপরে।

১৯৬৪ থেকে ১৯৭০ নির্জোট আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১৯৭০ সালে জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকাতে তৃতীয় নির্জোট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রিত ৭০টি দেশের মধ্যে ৫৪টি দেশ প্রতিনিধি পাঠায়। লুসাকায় মূল আলোচ্য বিষয় ছিল তিনটি—নয়া সাম্রাজ্যবাদ, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের গণতন্ত্রীকরণ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে যে স্বার্থের সংঘাত অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেই প্রেক্ষিতে উত্তর-দক্ষিণের আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে জরুরি কাঠামোগত পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হয়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম এখন থেকে সমান্তরাল খাতে বইতে থাকে।

১৯৭৩ সালে চতুর্থ নির্জোট শীর্ষ সম্মেলন আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সদস্যদের উপস্থিতি ছিল বিশাল আকারে। ৭৫টি সদস্যরাষ্ট্র, ৯টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র ও ৩টি অতিথি রাষ্ট্র ছাড়াও UN, OAS, Arab League এবং অনেকগুলি শ্রমিক সংগঠন এবং তিন মহাদেশের মুক্তি আন্দোলনকারীরা এই সম্মেলনে যোগ দেয়।

সবরকম আধিপত্যকেই পরিহার করে তৃতীয় দুনিয়ার স্বার্থে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দাবি উত্থিত হল আলজিয়ার্সে।

১৯৭৬ সালে পঞ্চম নির্জোট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল এর পর কলম্বোয়। এবার উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে হল ৮৬, যার মধ্যে ৭টি নতুন সদস্য। এই সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং ইহুদি প্রভুত্ববাদকে এক শ্রেণিভুক্ত করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয়।

১৯৭৯-এ হাভানায় নির্জোট আন্দোলনের ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলন নানাকারণে চাঞ্চল্যকর হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তানও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল।

১৯৮২-তে নতুন দিল্লিতে নির্জোট আন্দোলনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব নেওয়া হয় যাতে আন্দোলনের ঝোঁক নিয়ে কোনো ভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়। প্রতিকূল আবস্থায় টিকে থাকার প্রয়োজনে উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষ সহযোগিতার ওপর জোর দেওয়া হয়।

১৯৮৬ সালে হারারে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঃ ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মহাকাশ যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শনের প্রেক্ষিতে শান্তির প্রয়াসকে সংহত করা, খ) অর্থনৈতিক সমস্যাবলী গ) দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী জোট।

১৯৮৯ সালে নবম সম্মেলনের জন্য নির্বাচিত বেলগ্রেডে দ্বিতীয়বারের জন্য নির্জোট শীর্ষসম্মেলনের আয়োজন হল। হারারে সম্মেলনের সূত্র ধরে বেলগ্রেডে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্র সহযোগ বৃদ্ধির আবেদন জানানো হয়। স্পষ্টতই বেলগ্রেড সম্মেলনের মূল সুরটি খুব নীচু পর্দায় বাঁধা ছিল।

১৯৯২ সালের নির্জোট আন্দোলনের নিস্তেজ হয়ে আসা দীপশিখা কিছুকালের জন্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জাকার্তায় দশম সম্মেলনে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র সাহায্য দিয়ে নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বনির্ভরতা সৃষ্টি করার দ্বারাই নিশ্চিত হতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা হয়। একটি বার্তায় পৃথিবীব্যাপী অশান্তি, আধিপত্য ও জাতিগত সংঘর্ষ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ সহযোগিতাকে জোরদার করার কথা বলা হয়েছে।

কলম্বিয়ার রাজধানী কার্টাজেনীতে N A M-এর একাদশ শীর্ষ সম্মেলন বসে। শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে যে বিষয়গুলি প্রাধান্য পায় সেগুলি হল — ক) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের আসনে উন্নয়নশীল দেশের বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব ; খ) ব্যয়বহুল শান্তিরক্ষাবাহিনীর ব্যয়সঙ্কোচ করে দারিদ্র দূরীকরণে অর্থ বরাদ্দ ; গ) জাতিধর্ম নির্বিশেষে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ; ঘ) জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ঙ) উন্নয়নকে বহনযোগ্য করে তোলা।

এই সম্মেলনে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বেনজির ভুট্টো কাশ্মীরের প্রশ্ন তুলে নির্জোট আন্দোলনের মধ্যেই সংঘাত নিবারণ ও বিবাদ নিরসনের একটি বন্দোবস্ত সৃষ্টির আবেদন জানান। দক্ষিণ এশিয়াকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল বলে ঘোষণারও তিনি দাবি করেন।

এরপর দ্বাদশ সম্মেলন বসে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরে। উদ্বোধক নেলসন ম্যান্ডেলা পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ, জাতিপুঞ্জের পুনর্গঠন, নারীদের অধিকার ও মর্যাদারক্ষা এবং সুশাসন — এই কয়টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে চান। এই সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ, পরমাণু অস্ত্র ছাড়াও বিশ্বায়নের চাপে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রান্তিকীকরণ, HIV-AIDS জাতীয় মারণ ব্যাধির প্রসার, আন্তর্জাতিক মাদক চালান নিয়েও উদ্বিগ্ন আলোচনা হয়। সর্বাত্মক পরমাণু অস্ত্রপরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের (Comprehensive Test Ban Treaty) চুক্তির সপক্ষে এবং আফগানিস্তান, সুদান প্রভৃতি দেশে বহিরাগত সামরিক হস্তক্ষেপের বিপক্ষে মত প্রকাশ করা হয়।

ডারবানের পর ২০০৩ সালে N A M-এর ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে। ১১৬ সদস্যের এই বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণের হুমকি, আতঙ্কবাদের প্রসার ও বিশ্ববাণিজ্যে বৈষম্য প্রাধান্য পায়। শুধু পরিতাপের বিষয় এই যে, ইরাকে আগ্রাসন অবাঞ্ছিত হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রকাশ্যে কোনো সদস্য নিন্দা করেনি—মুসলিম দেশগুলিও না।

4.3 ❑ নির্জোট আন্দোলনের কৃতিত্ব

বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠান্ডা লড়াইয়ের পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পদ্ধতি হিসেবে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির কাছে জোট নিরপেক্ষতার আবেদন ছিল অসমান্য। প্রথম দিকে দুই মহাশক্তি সমানভাবে এর ঘোরতর বিরোধিতা করে এসে, ক্রমশ নির্জোট আন্দোলনের শক্তি সঞ্চয় এবং নিজ নিজ শিবিরের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করে বিশ্বরাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে N A M-কে তারা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী — তিনস্তরের পরিস্থিতিই এখানে একটি যৌথ কূটনীতির জন্ম

দেয়, যা যথাকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তার ছাপ রেখে যেতে সমর্থ হয়েছে। সামরিক জোটের অপছন্দ হলেও নিরপেক্ষতার মূল্য উপেক্ষিত হয়নি। এমনকি ঠাণ্ডা লড়াই চলাকালীন নির্জোট রাষ্ট্রগুলিকে উভয় শিবিরের মধ্যস্থতাও করতে হয়েছে—যেমন কোরিয়া, ইন্দোচীন।

নির্জোট আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল দুই শিবিরের সংঘর্ষের তত্ত্ব অবাঞ্ছিত প্রতিপন্ন হওয়া। দ্বিতীয়ত, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় কুফল এবং পরমাণু অস্ত্রের বিপদ সম্বন্ধে বিশ্বচেতনা জাগ্রত করা ও নিরস্ত্রীকরণের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবত আরও কঠিন হতে পারত যদি না N A M-ভুক্ত এতগুলি সদস্যরাষ্ট্র যুদ্ধবিরোধী মনোভাবে একত্র হত। তৃতীয়ত, প্রায় দু'শতাব্দী ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের যে গুরুভার তৃতীয় দুনিয়াকে বহন করতে হয়েছে, N A M-এর যৌথ সহায়তা সেই গুরুভার অপসারণে যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে। চতুর্থত, মানবাধিকার নিয়ে অধুনা যে আলোড়ন চলছে, তার সূত্রপাত বলা যায় নির্জোট আন্দোলনের পক্ষ থেকে বর্ণবিদ্বেষী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরব ও সক্রিয় জেহাদে। পঞ্চমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলির আধিপত্য ও তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ হয়তো আজও অন্তর্হিত হয়নি, তবু বৃহৎ শক্তির দাপট এবং একতরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ ও যৌথ আন্দেলন সৃষ্টিতে NAM–এর সদস্যগণ আন্তর্জাতিক যাবতীয় মঞ্চে একযোগে অংশ নিয়েছেন। নির্জোট হয়েও এই আন্দোলনের অংশীদার রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে অধিকাংশ সময়ই একটি চাপসৃষ্টিকারী একক গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করেছে।

অবশ্যই নির্জোট আন্দোলনভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ঐক্য জাগ্রত হয়েছে একথা বলা যাবে না। কিন্তু কূটনৈতিক স্তরে সহযোগিতা ও সংগ্রামের সমন্বয় একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, সন্দেহ নেই।

গত শতাব্দীর শেষ কয়েক দশকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উপশম এবং ক্রমে দুই বিরোধী শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সমঝোতার লক্ষণ দেখা দেওয়ার সময় থেকেই প্রশ্ন উঠেছিল নির্জোট আন্দোলন তার প্রয়োজনীয়তা রক্ষা করতে পারবে কিনা। কিন্তু এর প্রাসঙ্গিকতার অনেক দিক আছে।

প্রথমত, জোট এবং নির্জোট পরস্পর বিশ্লিষ্ট ধারণা নয়। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জোটবদ্ধ হওয়া বা না হওয়া পরিস্থিতি নির্ভর, বাধ্যতামূলক নয়। দ্বিতীয়ত, দুটি মুখোমুখি সামরিক জোট থাকা বিশ্বশান্তির পক্ষে অবশ্যই বিপজ্জনক। কিন্তু এর মধ্যে যদি একটি জোট ভেঙে যায় এবং অপরটি বহাল থাকে, তাহলেও সমস্ত জাতিরাষ্ট্রের নিরাপদ মনে করার কোনো কারণ ঘটেছে বলে মনে হয় না। বরং যত বেশি সংখ্যক দেশ ঐ একটি জোটের বাইরে থাকে আনুপাতিকভাবে তাদের সমষ্টিগত গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

তৃতীয়ত, ঠান্ডা লড়াই শেষ হওয়ার পর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির থেকে মুক্ত হয়েই অনেকগুলি ইউরোপীয় রাষ্ট্র সরাসরি NATO–র অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। অ-পশ্চিমি ইউরোপ বহির্ভূত স্বাধীন দেশগুলির কাছে এই ঘটনা উপেক্ষা করার নয়। সুতরাং ঠাণ্ডা লড়াই শেষ হলেও নির্জোট আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অন্যভাবে দেখা দিতে পারে।

চতুর্থত, ঠান্ডা লড়াই মূলত রাজনৈতিক-সামরিক সংঘর্ষের এক বাতাবরণ। নির্জোট আন্দোলন সেই

বাতাবরণকে বর্জনীয় মনে করেছে, বিপজ্জনক মনে করেছে। নির্জোট দেশগুলি আসলে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত, ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত, উন্নয়নকামী মানুষের আবাসভূমি। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদই এই সমস্ত মানুষের সাধারণ ঐতিহাসিক শত্রু। বাজারি অর্থনীতির ধ্বজাবাহী বিশ্বায়ন তৃতীয় দুনিয়ার সমস্ত দেশেই নতুন এক সঙ্কটের জন্ম দিচ্ছে। জাতীয় উন্নয়ন থেকে জাতীয় নিরাপত্তা, এমনকি জাতীয় সংস্কৃতিও বিশ্বায়নের চাপে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। সুতরাং তিলে তিলে গড়ে তোলা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি বিশ্বজোড়া মঞ্চকে এখন আরও বেশি প্রয়োজন তৃতীয় দুনিয়ার।

পঞ্চমত, ঠাণ্ডা লড়াই পর্বের অভিশপ্ত উত্তরাধিকার পরমাণু অস্ত্রের স্তূপ, যা নাকি ব্যবহারের জন্য নয়, সন্ত্রস্ত করে রাখার জন্য। আর সেই সন্ত্রাসের একচেটিয়া অধিকার থাকছে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী কয়েকটি রাষ্ট্রের হাতে। এই ধরনের পরমাণু অস্ত্রঘটিত বর্ণবৈষম্য (nuclear apartheid) মেনে নেওয়া অনৈতিক ও অন্যায্য। সুতরাং অস্ত্র নির্মাণ হোক বা না হোক, প্রতিরোধের শেষ উপায় হিসেবে অস্ত্র নির্মাণের অধিকার বিসর্জন দেওয়ার নয়। তাই নির্জোট আন্দোললকেই ভাবতে হবে এক্ষেত্রে কী করা উচিত।

4.4 ❑ নির্জোট আন্দোলনের সম্ভাবনা

নির্জোট আন্দোলনের উদ্বর্তন অবশ্যই নির্ভর করবে তিনটি বিষয়ের ওপর—বিশ্বরাজনীতির বাস্তব অবস্থা, সদস্যরাষ্ট্রগুলির ঐক্য এবং আন্তরিক প্রয়াসের ওপর। এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বহু প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম এসেছে এবং এখনও এর শক্তি নিঃশেষ হয়নি। কিন্তু বৃহদায়তন এই আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য যে স্তরের নেতৃত্ব থাকা দরকার, অধুনা জাতিরাষ্ট্রগুলির মধ্যে সেই মাপের নেতৃত্বের উপস্থিতি ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে N A M আদৌ কোনো জোর খাটানোর অবস্থায় পৌঁছেছে কিনা। নচেৎ যে আন্দোলনের চাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকারকে UN ও Commonwealth থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্য মার্কিন প্রশাসনকে নিন্দিত হতে হয়েছে, যাদের দাবি মেনে নয়া আন্তর্জাতিক আর্থব্যবস্থা জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত হয়েছে, নিরস্ত্রীকরণের জন্য বৃহৎ শক্তিগুলিকে চাপের মধ্যে রাখা হয়েছিল, অধুনা সেই মঞ্চেই ঠাণ্ডা লড়াই মুক্ত দুনিয়ায় মার্কিন বলদর্পিতার বীভৎস নিদর্শন সত্ত্বেও অত্যন্ত নরম সুরের প্রস্তাব গৃহীত হতে দেখা যাচ্ছে।

সেজন্য N A M-এর কতকগুলি অন্তর্নিহিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। সেগুলি হল বিভিন্ন পটভূমি থেকে আসা সদস্যবৃন্দের মধ্যে সমমনোভাবাপন্ন হওয়ার জন্য সচেতন প্রয়াসের অভাব, কার্যকারিতার চেয়ে প্রচারমূলক বাগ্মিতায় কালক্ষেপ, NIEO -এর সার্থক রূপায়ণে শত অন্তরায় থাকলেও দক্ষিণ বাণিজ্যিক ও কারিগরি সহযোগিতার স্বার্থে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়ায় ব্যর্থতা এবং একমেরু বিশ্বের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কূটনৈতিক কৌশল গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ততা।

ইতিহাস—ষষ্ঠ পত্র

পর্যায়—২

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্বরাজনীতি

একক ১ ❑ গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উত্থান এবং চীন-সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্ক

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ সূচনা

১.২ প্রাক্কথন

১.৩ চীনে সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট দলের উদ্ভবের পটভূমিকা

১.৪ কুয়ো-মিন-তাং এবং কমিউনিস্ট সম্পর্ক (১৯২১-'৩৭ খ্রিঃ)

১.৫ দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ এবং কুয়ো-মিন-তাং-কমিউনিস্ট সম্পর্ক (১৯৩৭-'৪৫ খ্রিঃ)

১.৬ চূড়ান্ত সংগ্রাম (১৯৪৫-'৪৯ খ্রিঃ) ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা

১.৭ বিশ্বরাজনীতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বা সাম্যবাদী চীনের প্রভাব

১.৮ চীন-সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্ক

ক. প্রথম পর্যায় (১৯৪৯-'৫৪ খ্রিঃ)

খ. দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫৪-'৭৬ খ্রিঃ)

গ. তৃতীয় পর্যায় (১৯৭৬-'৯১ খ্রিঃ)

১.৯ অনুশীলনী

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ ❑ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককের উদ্দেশ্য হ'ল ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে মাও-জে-দং এর নেতৃত্বে চীনে সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পর্যায় ব্যাখ্যা করা এবং বিশ্বরাজনীতিতে নবোদিত গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রভাব আলোচনা করা। চীনের এই মহান্ বিপ্লবের প্রেক্ষাপট অনুধাবনের জন্য চীনের পূর্ব ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। এই সঙ্গো বিশ্বের প্রথম সাম্যবাদী রাষ্ট্র চীনের সম্পর্কের বিভিন্ন ধারা আলোচিত হবে।

১.১ ❑ সূচনা

পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্র চীন এক প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান। সুপ্রাচীন এই দেশটির ইতিহাসও কম আকর্ষণীয় নয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে চীনে সাম্যবাদী শাসনের প্রতিষ্ঠা এই ধারাবাহিক ইতিহাসেরই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। রাজতন্ত্র, বৈদেশিক শক্তির চীনে আধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্ঠা, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ,

প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব, সাংস্কৃতিক জাগরণ ইত্যাদি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চীনে সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল ঘটনা চীনা জনগণের মানসিকতা পরিবর্তনেও সহায়তা করে। চীনে সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভবের পূর্বের ইতিহাসের মূল বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করে নিলে সেখানে সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট অনুধাবন করা সহজ হবে।

১.২ ❑ প্রাক্‌কথন

সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সুপ্রাচীন চীন পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম রাষ্ট্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিশালতম সাম্রাজ্য হিসেবে চীনের পরিচিতি ছিল। চীন ছিল একটি বহুজাতিক দেশ এবং এখানে বিভিন্ন ধর্মমত প্রচলিত ছিল। এগুলির মধ্যে কনফুসীয় ধর্মাবলম্বীরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত চীনের অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চীনে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে চীনে মাঞ্চু বা চিং রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না। চীনের প্রাচীনপন্থী ঐতিহাসিকদের মতে এ সময় থেকেই চীনে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। কারণ, এই সময় থেকেই চীনে পাশ্চাত্য পর্যটক, বণিক, ধর্মপ্রচারকগণ আসতে শুরু করেন। পশ্চিমী জগতের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ শুরু হয়। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যেমন, ভিনাক, ফেয়ারব্যাঙ্ক প্রমুখ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ বা প্রথম অহিফেন যুদ্ধকে (১৮৩৯ খ্রিঃ-১৮৪২ খ্রিঃ) চীনের আধুনিক যুগের সূত্রপাত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

পাশ্চাত্য বণিকদের মধ্যে পর্তুগীজরাই চীনের ক্যান্টন বন্দরে প্রথম বাণিজ্যের জন্য আসে এবং ম্যাকাও অঞ্চলে একটি উপনিবেশ স্থাপন করে। ক্রমশ ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও স্পেনীয় বণিকরা ক্যান্টনে বাণিজ্যের জন্য উপস্থিত হয়। ক্যান্টন বন্দরের বাইরে অন্য কোনো অঞ্চলে ইউরোপীয়দের বাণিজ্য নিষিদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ইউরোপীয়গণ চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণে আগ্রহী হয়ে ওঠে কারণ ক্যান্টন বাণিজ্য তাদের কাছে অত্যন্ত লাভজনক ছিল। বিশেষত ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ইংলন্ড চীনে বাণিজ্যের প্রসারে আগ্রহী হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বাণিজ্যিক স্বার্থে বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলে চীনের সঙ্গেও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই পরিস্থিতি চীনের চিরাচরিত জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করে।

পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে চীনের সংঘাতের প্রথম উদাহরণ ১৮৪০-৪২ খ্রিস্টাব্দের 'প্রথম অহিফেন যুদ্ধ'। অহিফেন বা আফিমের ব্যবসা চীনে নৈতিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। এই ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ইংলন্ডের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। যার পরিণতি ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ বা প্রথম অহিফেন যুদ্ধ। যুদ্ধে মাঞ্চু সম্রাট ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ইংরেজদের সঙ্গে 'নানকিং-এর সন্ধি' স্বাক্ষরে বাধ্য হন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর 'বোগ-এর সন্ধি'র মাধ্যমে ইংরেজরা চীনে 'বিশেষ অনুগৃহীত জাতি' (Most Favoured Nation) হিসেবে স্বীকৃতি ও কিছু অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করে, যা চীনের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে। এরপর আমেরিকা ও ফ্রান্সকেও চীন

অনুরূপ সুবিধাদানে বাধ্য হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য বণিকরা অধিকতর সুবিধা দাবী করতে থাকে। এর ফলশ্রুতি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, যা 'দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ' নামে পরিচিত। পরাজিত চীন ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'তিয়েনসিনের সন্ধি' স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। এর মাধ্যমে চীনের আরও বৃহত্তর এলাকায় বাণিজ্যের অধিকার, ধর্মপ্রচারের অধিকার এবং আরও সম্প্রসারিত অতিরাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি। চীন একটি আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় চীনের অর্থনীতি এবং বিদেশীদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য ভাবধারা চীনের অভ্যন্তরে বিস্তৃত হতে থাকে। মাঞ্চু রাজবংশের দুর্বলতার সুযোগে চীনে বিভিন্ন বিদেশী শক্তি আধিপত্য স্থাপনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অতিরাষ্ট্রিক অধিকারের সুযোগ নিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলি বন্দরের কাছাকাছি অঞ্চলে নিজেদের প্রভাবাধীন এলাকা গড়ে তোলে এবং সেইসব এলাকার শাসনব্যবস্থাও তাদের প্রভাবাধীন হয়। চীনের ভূখণ্ড অধিকারের প্রতিযোগিতায় পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে এশীয় দেশ জাপানও যোগ দেয়।

উপরি-উক্ত ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ার চীনের অভ্যন্তরে সৃষ্ট অসন্তোষ মাঞ্চু শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের জন্ম দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দুটি বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে চীনের গণ অসন্তোষ প্রকাশিত হয়। প্রথমটি হ'ল 'তাইপিং বিদ্রোহ' (১৮৫০-৬৪ খ্রিস্টাব্দ)। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের চীনে অনুপ্রবেশের পটভূমিকায় এই অভ্যুত্থান হলেও এর পিছনে প্রকৃত কারণ ছিল চীনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক অবক্ষয়। এই গণ অভ্যুত্থান দক্ষিণ চীন থেকে সাময়িকভাবে মাঞ্চু শাসন উচ্ছেদ করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। তবে তা মাঞ্চু শাসনের দুর্বলতা প্রকট ক'রে দেয়। দ্বিতীয়টি হ'ল 'বক্সার বিদ্রোহ' (১৮৯৯-১৯০১ খ্রিস্টাব্দ)। তবে এই দুই বিদ্রোহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ১৮৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দের চীন-জাপান যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পরাজিত চীন জাপানের সঙ্গে 'শিমনোসেকির সন্ধি' (১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ) স্থাপনে বাধ্য হয়। এর ফলে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মত জাপানও চীনে অতিরাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করে।

চীনে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের আধিপত্য বিস্তার এবং অর্থনৈতিক শোষণ, জাপানের কাছে চীনের পরাজয় প্রসূত বিক্ষোভ থেকে ক্রমশ জাগ্রত হয় জাতীয় চেতনার। চীনকে শক্তিশালী করার জন্য পাশ্চাত্যের অনুরূপ আধুনিক সংস্কার প্রবর্তনের দাবীতে চীনে 'তরুণ চীন' (Young China) আন্দোলন দেখা দেয় কাং-য়ু-ওয়েই-এর নেতৃত্বে। তিনি রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই সংস্কার প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আদর্শে প্রভাবিত হন তরুণ মাঞ্চু সম্রাট কোয়ার সু। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি যে সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেন তার উদ্দেশ্য ছিল চীনের শিক্ষাব্যবস্থা, প্রশাসন, সামরিক সংগঠন প্রভৃতি পাশ্চাত্য ধাঁচে গড়ে তোলা। কিন্তু রক্ষণশীল গোষ্ঠীর বিরোধিতায় এই সংস্কার উদ্যোগ মাত্র একশত দিন স্থায়ী হওয়ায় এই প্রচেষ্টা 'শত দিবসের সংস্কার' নামে পরিচিত। রক্ষণশীল গোষ্ঠীর পাশ্চাত্য বিরোধী মনোভাবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে চীনে 'বক্সার বিদ্রোহ' (১৮৯৯-১৯০১ খ্রিস্টাব্দ) দেখা দেয়। এছাড়াও পাশ্চাত্য দেশগুলির অর্থনৈতিক শোষণ, মাঞ্চু শাসনের দুর্বলতা, ধর্মান্তরকরণ ইত্যাদিও এই বিদ্রোহের কারণ ছিল। বক্সার বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এইসব ঘটনা চীনে আসন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী ছিল। বক্সার বিদ্রোহকে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন বলা না গেলেও এর মূল লক্ষ্য ছিল প্রথমে বিদেশী বিরোধী ও মাঞ্চু শাসন বিরোধী। পড়ে এই আন্দোলন মাঞ্চু বংশের অনুকূল আন্দোলনে পরিণত হয়। আরও

পরে তা দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চরিত্র ছিল লক্ষণীয়।

চীনে মাঞ্চু অপশাসনের বিরুদ্ধে অনেক বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। খাদ্যাভাব, ক্রমবর্ধমান করভার, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দুর্বলতা, সংস্কার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা, বেকারত্ব প্রভৃতি চীনে এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে চীনে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, উচ্চশিক্ষার্থে চীনা ছাত্রদের বিদেশ যাত্রা ইত্যাদির ফলে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শন, গণতান্ত্রিক চেতনা ও বৈপ্লবিক মতাদর্শের সঙ্গে চীনাদের পরিচয় ঘটে। এই পরিস্থিতিতে এক উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসক ডঃ সান-ইয়াৎ সেন জাতীয়তাবাদী নীতির দ্বারা চীনে মাঞ্চু বংশের উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ তুলে ধরেন। তাঁর প্রচেষ্টার ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে গঠিত হয় 'তুং-মেং-হুই' বা মৈত্রী সমিতি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোন ইঙ্গিত অবশ্য সান-ইয়াৎ-সেনের নীতির মধ্যে ছিল না। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে 'তুং-মেং-হুই' দল দক্ষিণ চীনের ক্যান্টনকে কেন্দ্র করে মাঞ্চু বংশ বিরোধী প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করে। নাংকিং সহ সমগ্র দক্ষিণ চীন বিপ্লবীদের দ্বারা অধিকৃত হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সান ইয়াৎ সেন। উত্তর চীনে পিকিং-এ সেনাপতি য়ুয়ান-শি-কাই মাঞ্চু শাসনের দুর্বলতার সুযোগে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। চীনের ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সান-ইয়াৎ-সেন ও য়ুয়ান-শি-কাই এক বোঝাপড়ায় আসেন। চীনে ঐক্যবদ্ধ প্রজাতান্ত্রিক সংস্কার স্থাপনের শর্তে সান-ইয়াৎ-সেন য়ুয়ান-শি-কাইকে প্রজাতান্ত্রিক চীনের রাষ্ট্রপতি হিসেবে মেনে নেন। ১৯১২ খ্রিঃ ফ্রেব্রুয়ারী মাসে মাঞ্চু সম্রাট পদত্যাগ করেন। ঐক্যবদ্ধ চীনের নতুন রাষ্ট্রপতি হন য়ুয়ান-শি-কাই। চীনে রাজতন্ত্রের অবসানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও তা চীনা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়, যা আরও একটি বিপ্লবকে অনিবার্য করে তোলে, যার পরিণতি চীনে সাম্যবাদী আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট দলের ক্ষমতা লাভ।

১.৩ ❑ চীনে সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট দলের উদ্ভবের পটভূমিকা

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তীকালে চীনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। য়ুয়ান-শি-কাই প্রজাতান্ত্রিক চীনের রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করার পর গণতান্ত্রিক আদর্শ পরিত্যাগ করে চীনে পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও নিজেকে সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা শুরু করেন। পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে তিনি দশ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করেন। নাংকিং থেকে পিকিং-এ তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। প্রশাসনিক দুর্নীতি, উৎকোচ, নির্বিচারে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ, স্বজন পোষণ ইত্যাদি শাসনব্যবস্থাকে সঙ্কটাপন্ন করে তোলে।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ড. সান-ইয়াৎ-সেনের 'তুং-মেং-হুই' দলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'কুয়ো-মিন-তাং' বা প্রজাতন্ত্রী দল। য়ুয়ান-শি-কাই-এর স্বৈরাচারী শাসন উচ্ছেদ করার জন্য সান-ইয়াৎ-সেন এক ব্যর্থ চেষ্টা করেন। পরিণামে চীনে কুয়ো-মিন-তাং দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। সান-ইয়াৎ-সেন ও অন্যান্য বিপ্লবীরা জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে য়ুয়ান-শি-কাই-এর মৃত্যু হলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সান-ইয়াৎ-সেন জাপান থেকে চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। তবে চীনে তখন

নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। য়ুয়ান-শি-কাই-এর সময়ে চীনে যে সব সেনানায়ককে প্রাদেশিক শাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলে প্রায় স্বাধীন শাসক রূপে কাজ করতে থাকেন। ১৯১৬ থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে চীনে 'সমরশাসনের যুগ' (Age of warlords) বলা হয়। এই সময় সমরশাসকদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব চীনে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়। উত্তর ও দক্ষিণ চীন বিভিন্ন সামরিক চক্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। শেষপর্যন্ত বিপ্লবী কুয়ো-মিন-তাং দল কুয়ো-মিন-তাং সেনাবাহিনীর সাহায্যে এক নতুন শাসনব্যবস্থা স্থাপন করে দ্বিধা-বিভক্ত চীনকে ঐক্যবন্ধ করে। সমরশাসনের যুগের অবসানে জাতীয় সরকার এবং কুয়ো-মিন-তাং দল প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সমরশাসনের যুগ থেকেই চীনে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ধীরগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরূপ অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য চীনের বুদ্ধিজীবীদের মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছিল। বিশেষত পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অনেকেই মার্কসবাদচর্চায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে মার্কসবাদচর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এইসব আলোচনাচক্রকে কেন্দ্র করে উদ্ভব হয়েছিল বিভিন্ন সাম্যবাদী গোষ্ঠীর। মার্কসবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯১৮-২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাশিয়া চীনের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। রাশিয়া চীনে তার বিশেষ অধিকার পরিত্যাগ করে। এইসব ঘটনা চীনের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। রুশ বলশেভিক বিপ্লব এবং মার্কসবাদ চীনের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করার ফলে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মের ছাত্র আন্দোলন শক্তিশালী হয়। চীনের বিপ্লবীরা পশ্চিমী গণতন্ত্র, উদারনীতি এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিবর্তে রুশ বিপ্লবী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। এই সময় চীনে মার্কসবাদের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক লি-তা-চাও ব্যতীত চু-চিউ-পাই, চ্যাং-কুয়ো-তাও, মাও-জে-দং, চেন-তু-সিউ প্রমুখ। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সাংহাইতে একটি গোপন সভায় চীনের কমিউনিস্ট দল গঠিত হয়। এই সভায় সাম্যবাদী অর্থনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি তিনটি প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচি গৃহীত হয়। এগুলি হল চীন থেকে বিদেশী শক্তির বিতাড়ন, সমরশাসনের উচ্ছেদ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

চীনে সাম্যবাদী ধ্যানধারণার উদ্ভব সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। চীনে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল তার কিছু প্রাথমিক দুর্বলতা ছিল যা দেশে এক প্রকার শ্রেণি সংগ্রামকে অনিবার্য করে তুলেছিল। চীনা সমাজে ভদ্রলোক বা gentry সম্প্রদায় অর্থাৎ ঐতিহ্যাশ্রিত কনফুসীয় পণ্ডিত প্রশাসক শ্রেণি ছিলেন রক্ষণশীল কনফুসীয় সমাজব্যবস্থার প্রতিভূ। চীনে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশের পাশাপাশি যে আধুনিকতার সূত্রপাত হচ্ছিল তার প্রতি এঁদের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কারণ তাঁরা পাশ্চাত্যকরণের পরিবর্তে কনফুসীয়বাদকে সংরক্ষণ করার প্রতিই বেশি আগ্রহী ছিলেন। এছাড়া চীনে ভূস্বামী সম্প্রদায় ও রাজতন্ত্রের মধ্যে এক ধরনের আঁতাত ছিল। কিন্তু ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে রাজতন্ত্রের পতনের পর ভূস্বামী শ্রেণির দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। অবশ্য ১৯১১-র বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পরেও তারা কৃষকদের শোষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে চলছিল। এই পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ চীনে সক্রিয় বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পাশ্চাত্য

পুঁজিবাদ চীনে প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন এনেছিল। কার্ল মার্ক্সের মতে চীনে এই পরিবর্তন প্রধানত বন্দর-শহরগুলিতে দেখা গিয়েছিল। এর ফলে এক ক্ষুদ্র চীনা বুর্জোয়া গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁরা শিল্পের পরিবর্তে বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহী ছিলেন। শহরের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের ক্ষুদ্র 'প্রলেতারিয়েত' গোষ্ঠীরও আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা ক্ষুদ্র কলকারখানায় কাজ করতেন। কিন্তু বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণি উভয়েই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহ্যানুসারী ছিল এবং সেখানেই পশ্চিমের শিল্পায়িত সমাজের বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ছিল বলে মনে করেন এম. ডি. ডেভিড।

ইউরোপে পুঁজিবাদের উত্থানের সঙ্গে অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায় তাদের ক্ষমতা হারিয়েছিল এবং উৎপাদন ও বিনিময়ের নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ভোগ করছিল। চীনেও একই ধরনের পরিবর্তন আসছিল, তবে তা খুব ধীর গতিতে। ফলে চীনে বুর্জোয়া অথবা প্রলেতারিয়েত গোষ্ঠীর আবির্ভাব খুব একটা শক্তিশালী ছিল না। সমরশাসনের যুগে অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায় তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়েছিল এবং তা চলে গিয়েছিল সামরিক শ্রেণির হাতে। এইভাবে চীনের আধুনিক সামাজিক পরিকাঠামো ছিল দুর্বল, যাতে এক দুর্বল বুর্জোয়া এবং আরো দুর্বল প্রলেতারিয়েত শ্রেণির অবস্থান ছিল।

চীনের বিশাল কৃষকসমাজ অভিজাত ভূস্বামী এবং সামরিকশ্রেণির দ্বারা শোষিত ছিল। কৃষকসমাজ ব্যাপক অর্থনৈতিক চাপের শিকার ছিল কারণ সমরশাসনের যুগে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ফলে তাদের প্রভূত করভার বহন করতে হত। এরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল প্রাচীনপন্থী কিন্তু একটি শক্তিশালী বৈপ্লবিক শক্তি হয়ে ওঠার ক্ষমতা এদের ছিল। কিন্তু যেটির অভাব ছিল যেটি হল যোগ্য নেতৃত্ব, আদর্শবাদ এবং উপযুক্ত সংগঠন। কুয়ো-মিন-তাং এবং কমিউনিস্ট দল উভয়ই ভূমিবন্টন এবং পুঁজির নিয়ন্ত্রণের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল। এদের মধ্যে কমিউনিস্ট দলই চীনের দুর্বল সামাজিক অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে জনমানসে সাম্যবাদী ধ্যানধারণা বপন করার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছিল। মাও-জে-দং এই শোষিত কৃষকসমাজকে হাতিয়ার করেই ১৯৪৯-এ চীনে সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইভাবে চীনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা এক পরিবর্তনের পটভূমি রচনা করেছিল। চীনের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় তাঁদের প্রেরণা হিসেবে রাশিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্যবাদী ধ্যানধারণার বিকাশ দেখা যাচ্ছিল। চেন-তু-সিউ, লি-তা-চাও, হু-শি, মাও-জে-দং প্রমুখ মার্কসবাদী সামাজিক বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়েছিল চীনের কমিউনিস্ট দল।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সাংহাইতে চীনা কমিউনিস্ট দলের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ১২ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। তবে এঁদের মধ্যে দুই গুরুত্বপূর্ণ মার্কসবাদী চেন-তু-সিউ এবং লি-তা-চাও ছিলেন না। উল্লেখযোগ্য হিসেবে ছিলেন পিকিং-এর প্রতিনিধি চ্যাং-কুয়ো-তাও, হ্যানকাও-এর প্রতিনিধি টং-বি-উ এবং হুনানের প্রতিনিধি মাও-জে-দং। এই সম্মেলনে কমিনটার্ন-এর পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক হিসেবে এসেছিলেন এইচ. স্লিভ. লিয়েট। এই অধিবেশনে চীনা কমিউনিস্ট দল কুয়ো-মিন-তাং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করবে কিনা এবং সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চীনে বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালনা করা হবে কিনা এ নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে চীনের কমিউনিস্ট দলের দ্বিতীয় কংগ্রেসে বলা হয় যে চীনে সমরশাসন এবং সাম্রাজ্যবাদের

উচ্ছেদ ঘটিয়ে ঐক্যবন্ধ চীনে এক গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করাই হবে কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী সমরনায়ক উ-পেই-ফু-র সৈন্যবাহিনী পিকিং-এর কাছে চ্যাং-সিন-তিয়েন অঞ্চলে নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপরে গুলিবর্ষণ করলে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। কমিউনিস্ট দল এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে সাম্রাজ্যবাদ ও সমরশাসকদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী মৈত্রী গড়ে তোলার কথা বলা হয়। ৭ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনা কমিউনিস্ট দল ও শ্রমিকশ্রেণিকে কুয়ো-মিন-তাং দলের কাছাকাছি নিয়ে আসতে সাহায্য করে। চীনের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবিগণ প্রথমদিকে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন কারণ মার্কসবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বেই বিপ্লব আসবে। চেন-তু-সিউ শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী ভূমিকার উপরে বেশি জোর দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ এবং তারা শহরের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় রক্ষণশীল কৃষক সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেকটাই প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন। কিন্তু চীনাসমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কৃষক সম্প্রদায়। লি-তা-চাও বিপ্লবে কৃষকদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ৭ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনার ফলে শ্রমিকশ্রেণিও বুঝতে পারে যে চীনে কৃষকদের সাহায্য ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রাম সম্ভবপর নয়। সমরশাসকদের অত্যাচার ও কৃষিপণ্যের মূল্যহ্রাসের প্রতিবাদে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর চীনের বিভিন্ন অংশে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এই সময় থেকেই চীনা কমিউনিস্ট দল কৃষকদের সমর্থন লাভ করার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে। লি-তা-চাও-এর আদর্শ মাও-জে-দংকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট দলের চতুর্থ কংগ্রেসে সংগঠনকে শক্তিশালী করে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল।

১.৪ ❑ কুয়ো-মিন-তাং এবং কমিউনিস্ট সম্পর্ক (১৯২১-১৯৩৭ খ্রিঃ)

চীনা বিপ্লবের ক্ষেত্রে দুটি সমান্তরাল বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা দেখা গিয়েছিল যাদের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। একটি হল কুয়ো-মিন-তাং যাদের প্রধান সমর্থন এবং ভিত্তি ছিল শহরাঞ্চলে এবং অপরটি চীনা কমিউনিস্ট দল যারা ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের পর প্রধানত কৃষক সমর্থন এবং গ্রামাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল ছিল। নবগঠিত কুয়ো-মিন-তাং এবং কমিউনিস্ট দল উভয়েরই আবির্ভাব ঘটেছিল প্রায় একই সঙ্গে এবং শীঘ্রই তারা জাতীয়তাবাদী এবং সমরশাসন বিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবন্ধ হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে চীনা কমিউনিস্ট দলের উদ্ভব হয়েছিল। আর ১৯২২-এর শেষে সান-ইয়াৎ-সেন কর্তৃক নবগঠিত কুয়ো-মিন-তাং দল যেটি একটি প্রাথমিক পর্যায়ে অসংবন্ধ দল ছিল এবং প্রধানত শহরভিত্তিক বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা গঠিত ছিল। এটি ছিল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের তুং-মেং-হুই বৈপ্লবিক সংগঠনের উত্তরাধিকারী। কুয়ো-মিন-তাং দল সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে সাহায্য এবং উপদেশ লাভের ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছিল এবং একটি জনগণতান্ত্রিক কেন্দ্রীভূত দল হিসেবে নিজেকে সংগঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কুয়ো-মিন-তাং এবং কমিউনিস্ট দল উভয়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের পরামর্শক্রমে চলতে শুরু করে এবং একটি জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য ঐক্যবন্ধভাবে কাজ করতে সম্মত হয়। কুয়ো-মিন-তাংকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সান-ইয়াৎ-সেন রুশ উপদেষ্টা মিখাইল বোরোদিনের পরামর্শ লাভ করেন। এর ফলে চীনা কমিউনিস্টদের ব্যক্তিগতভাবে কুয়ো-

মিন-তাং-এর সদস্যপদ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। কমিউনিস্টরা সদস্যপদ গ্রহণ করায় কুয়ো-মিন-তাং-এর মধ্যে একটি শক্তিশালী বামপন্থী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। কুয়ো-মিন-তাং-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে লি-তা-চাও সহ তিনজন কমিউনিস্ট সদস্য ছিলেন। মাও-জে-দং সহ আরও ছ'জন কমিউনিস্টকে কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কুয়ো-মিন-তাং ও কমিউনিস্ট সম্পর্ককে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ পর্ব (১৯২১-১৯২৭), দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ পর্ব (১৯৩৭-১৯৪৫)।

১৯২৩ থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কুয়ো-মিন-তাং এবং ১৯২৪ থেকে কামিউনিস্টরা একযোগে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে। প্রথমত ক্যান্টনকে কেন্দ্র করে একটি কার্যকরী জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন করা হয়। দ্বিতীয়ত একটি সুশিক্ষিত, সশস্ত্র, কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সেনাবাহিনী গঠন করা হয় এবং সেটিকে সমরশাসন উচ্ছেদ ও চীনকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য উত্তর চীন অভিযানের উদ্দেশ্যে তালিম দেওয়া হয়। তৃতীয়ত একটি কেন্দ্রীভূত গণভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দল হিসেবে গড়ে তোলার কাজ করা হয়। সমরশাসনের উচ্ছেদের জন্য কুয়ো-মিন-তাং-এর শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সোভিয়েত আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের একটি বড় ভূমিকা ছিল। 'হোয়াম্পোয়া মিলিটারি একাডেমী' নামক সৈন্য প্রশিক্ষণ স্কুলে চীনা ও রুশ প্রশিক্ষকদের সাহায্যে প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়। নবগঠিত এই বৈপ্লবিক যুক্তফ্রন্ট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকে।

১৯২৫ সালে কুয়ো-মিন-তাং নেতা সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর কুয়ো-মিন-তাং দলের রাজনৈতিক দায়িত্ব লাভ করেন দুই নেতা ওয়াং-চিং-উই এবং হু-হ্যান-মিন। সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে আসেন চিয়াং-কাই-শেক। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুলাই দক্ষিণ চীনের ক্যান্টনে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকারের রাষ্ট্রপতি হন ওয়াং-চিং-উই। উত্তর চীন তখন ছিল সমরশাসকদের অধীনস্থ। সমরশাসকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উ-পেই-ফু, ফেং-ইউ-সিয়াং, সুন-চুয়ান-ফ্যাং, ইয়েন-সি-শান প্রমুখ। এছাড়া প্রধান সেনাপতি হিসেবে ছিলেন চ্যাং-সো-লিন।

শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় কুয়ো-মিন-তাং দলের দক্ষিণপন্থীরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট দল চীনে তাদের সংগঠনকে আরো দৃঢ় করার জন্য শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলন এবং ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে চীনে কৃষক বিদ্রোহগুলিতে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল কমিউনিস্ট দল। ১৯২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কুয়ো-মিন-তাং এবং কমিউনিস্ট দলের বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের একটি অনিবার্য কারণ ছিল যে কমিউনিস্টরা কুয়ো-মিন-তাং-এ যোগদানের পরেও কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশেই চলতে থাকেন যা কুয়ো-মিন-তাং দক্ষিণপন্থী সদস্যদের মনঃপূত ছিল না। তাঁরা দল থেকে কমিউনিস্টদের বিতাড়নের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট প্রভাবিত চুং-শান যুদ্ধজাহাজের সর্বাধিনায়ক চিয়াং-কাই-শেককে অপহরণের চেষ্টা করলে তিনি দলের কমিউনিস্ট সদস্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। জাতীয় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব থেকে কমিউনিস্ট সদস্যদের বহিষ্কারের চেষ্টা শুরু হয়। এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে চিয়াং-কাই-শেক উত্তর চীন অভিযান করেন। এই অভিযানে সোভিয়েত ইউনিয়নের

সাহায্য পাওয়া যায়। বিপ্লবীবাহিনী ক্যান্টন থেকে মধ্যচীন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কুয়ো-মিন-তাং সরকারের প্রধান কেন্দ্র উ-হানে স্থানান্তরিত করা হয়। চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্টদের উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। এ ব্যাপারে তিনি সাংহাই-নানকিং-এর ধর্মীয় বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করেন। সাংহাই, নানকিং, হ্যাংচাও, ফুচাও, ক্যান্টন প্রভৃতি স্থান থেকে কমিউনিস্টদের উচ্ছেদের প্রচেষ্টা শুরু হয়। জাতীয়তাবাদী সেনাদল এবং পুলিশবাহিনী কর্তৃক কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের চাপে কুয়ো-মিন-তাং সরকার চিয়াং কাই-শেককে জাতীয় বিপ্লবী বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ থেকে বরখাস্ত করলে ১৮ই এপ্রিল, ১৯২৭ খ্রিঃ চিয়াং নানকিং-এ নিজের জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন করেন। উ-হান-এর বিপ্লবী সরকারের অস্তিত্বও তখন বজায় ছিল। চিয়াং-কাই-শেকের কমিউনিস্ট দমননীতির চাপে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্টদের বিপর্যয়ের জন্য পার্টি সম্পাদক চেন-তু-সিউ-এর ভ্রান্ত নীতিকেই দায়ী করেছেন ঐতিহাসিক ইমানুয়েল সু। চীনা ঐতিহাসিকরাও চেন-তু-সিউ, তান-পিং-শান প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতাদের 'দক্ষিণপন্থী সুযোগসন্ধানী' বলে অভিহিত করেছেন। চেন তাঁর সমস্ত নীতি নির্ধারণ করেছিলেন কমিনটার্নের নির্দেশ অনুযায়ী যা কমিউনিস্টদের বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে মিত্রতা এবং মিখাইল বোরোদিনের পরামর্শ অনুযায়ী চেন-তু-সিউ-এর 'দুই বিপ্লব' তত্ত্বে বিশ্বাস ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিল। 'দুই বিপ্লব' তত্ত্ব অনুযায়ী বলা হয়েছিল যে চীনে প্রথম ঘটবে বুর্জোয়া বিপ্লব এবং তারপরই আসবে কমিউনিস্ট বিপ্লব। কিন্তু চীনা বুর্জোয়া শ্রেণি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। ফলে চীনে 'দুই বিপ্লবে'র তত্ত্বের সাফল্য সম্ভব ছিলনা। তবে মাও-জে-দং চীনা বুর্জোয়া শ্রেণির এই দুর্বলতা ও সুযোগসন্ধানী মানসিকতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং কৃষক বিদ্রোহের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্টদের দমন করার পর চিয়াং-কাই-শেক কুয়ো-মিন-তাং দল ও চীনের রাজনীতিতে নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বহু শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি, কৃষক ও কমিউনিস্টদের হত্যা করা হয়। সমরশাসক এবং বিভিন্ন বিরোধী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে চিয়াং জয়লাভ করেন। এ ব্যাপারে তিনি ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনও লাভ করেছিলেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চীনা পুঁজিপতি, শিল্পপতি এবং গ্রামীণ ভূস্বামী শ্রেণি যাঁরা সকল প্রকার শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন তাঁদেরও সমর্থন লাভ করেন চিয়াং-কাই-শেক। সান-ইয়াৎ-সেনের আদর্শ থেকে কুয়ো-মিন-তাং দল বিচ্যুত হয়।

এই পর্যায়ে পৌঁছে চীনা কমিউনিস্ট দল নিজেদের নীতির পরিবর্তনের দিকে জোর দেয়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ই অগাস্ট হ্যানকাও-তে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পার্টির সাধারণ সম্পাদক চেন-তু-সিউ-এর নীতির সমালোচনা ও তাকে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত করা হয়। সেইসঙ্গে কুয়ো-মিন-তাং শাসনের অবসান ঘটানোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। হুনান ও কিয়াং-সি প্রদেশের কৃষক বিদ্রোহ সংগঠনের দায়িত্ব মাও-জে-দং-এর ওপর অর্পণ করা হয়।

মাও-জে-দং গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত এবং ভূমি সংস্কার করতে প্রবৃত্ত হন। বৈপ্লবিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের তত্ত্ব প্রচার করেন। মাও এবং চু-তে-

র প্রচেষ্টায় চিন-কিয়াং পর্বতে কমিউনিস্টদের প্রথম বিপ্লবী ঘাঁটি গঠিত হয়। কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে গঠন করা হয় লালফৌজ বা Red Army। মাও-জে-দং হুনানে কৃষক আন্দোলন শুরু করলে গ্রামীণ ভূস্বামী সম্প্রদায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কুয়ো-মিন-তাং-বাহিনী বিদ্রোহী কৃষকদের দমন করে। ইতিমধ্যে ক্যান্টনে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা কমিউনিস্ট দল ক্যান্টন শহর অধিকার করে নেন এবং সেখানে একটি সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুয়ো-মিন-তাং বাহিনী কমিউনিস্টদের ওপর ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এই পরিস্থিতিতে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে চীনা কমিউনিস্ট দলের ষষ্ঠ কংগ্রেসে (মস্কোতে অনুষ্ঠিত) চীনের কমিউনিস্ট দলকে জনগণের সঙ্গো সম্পর্ক বজায় রেখে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাবার কথা বলা হয়। এছাড়া চীনে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধি সভা বা 'সোভিয়েত' স্থাপন, ভূমি সংক্রান্ত বিপ্লব, জমিদার গোষ্ঠীকে ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কথা বলা হয়। এই কংগ্রেসে মাও-জে-দং এবং চু-তে-র আন্দোলনকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিকূল হিসেবে গণ্য করা হয়। পার্টির নতুন নেতা রূপে নির্বাচন করা হয় লি-লি-সান এবং সিয়াং-চুং-ফা-কে।

অপরদিকে মাও-জে-দং-এর অভিমত ছিল কুয়ো-মিন-তাং ও সমরশাসকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা ও সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত করতে হবে কারণ গ্রামাঞ্চলে কুয়ো-মিন-তাং দলের নিয়ন্ত্রণ কম। গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করার পর লালফৌজ কর্তৃক গ্রামের মাধ্যমে শহরগুলিকে বেষ্টন করে বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু করতে হবে যা অনিবার্যভাবে বিপ্লবীদের জয় সম্ভব করে তুলবে। মাও-জে-দং এবং চু-তে এই উদ্দেশ্যে কিয়াং-সি প্রদেশ এবং হুনানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৈপ্লবিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা, কৃষক সংগঠন এবং 'সোভিয়েত' স্থাপন করতে শুরু করেন। এই সমস্ত এলাকায় ভূমি সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া হয়। ভূস্বামী শ্রেণিকে জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কৃষকদের মধ্যে ভূমি পুনর্বন্টন করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে মাও এবং চু-তের এই সকল কার্যধারা কমিউনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটি সমর্থন করতে পারেনি। পাশাপাশি চিয়াং-কাই-শেক ও তাঁর কুয়ো-মিন-তাং দল কিয়াং-শি প্রদেশে বৈপ্লবিক ঘাঁটি ধ্বংস করার অভিযান চালান ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। মাও এবং চু-তে-র নেতৃত্বাধীন লালফৌজ গেরিলা রণকৌশলের মাধ্যমে কুয়ো-মিন-তাং আক্রমণ প্রতিরোধ করে। এই ঘটনা কমিউনিস্টদের শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মাওপন্থীরা কিয়াং-শি প্রদেশে 'চীনা সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত ঘাঁটি এলাকাগুলিতে শ্রমিক ও কৃষকদের গণতান্ত্রিক সরকার যার কার্যনির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হল মাও-জে-দং এবং লালফৌজের সর্বাধিনায়ক মনোনীত হন চু-তে। কমিউনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গো মাও-এর নীতিগত বিরোধ স্পষ্ট হতে থাকে। চীনা কমিউনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে লি-লি-সানের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিপূর্বে একটি ঘটনা কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গো মাওবাদী ফ্রন্ট কমিটির বিরোধকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। এজন্য লি-লি-সান-এর ভ্রান্ত নীতি দায়ী ছিল। ১৯২৯ খ্রিঃ ১১ই জুন শহরাঞ্চলে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় কমিটি। এই উদ্দেশ্যে মধ্য চীনের উ-হান, চাং-সা এবং নান-চাং শহরে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হয়। নান-চাং-এ অভ্যুত্থানের দায়িত্ব অর্পিত হয় মাও ও চু-তে-র লাল ফৌজের ওপর। অপর দুটি অঞ্চলে আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয় ছো-লং ও পেং-তে-হুই-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ওপর। কুয়ো-মিন তাং সেনাদল

চাং-সার অভ্যুত্থান দমন করে এবং চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্যবাদী শ্রমিক সংগঠনগুলিকে দখল করে। এই ঘটনা শ্রমিক আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করে দেয়। এবং পরিপ্রেক্ষিতে মাও ও চু-তে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে নান-চাং আক্রমণে অস্বীকার করেন। লি-লি-সান-কে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করা হয়।

১৯২৯-৩০-এর বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে নবোদিত এশীয় পুঁজিবাদী শক্তি জাপান চীনের বাজারে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। ১৯৩১ খ্রিঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর জাপান মুকডেন অঞ্চলে সশস্ত্র অভিযান চালায়। এ ঘটনা 'মাঞ্চুরিয়া সংকট' নামে পরিচিত। চিয়াং-কাই-শেক জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পরিবর্তে 'সাংহাই যুদ্ধ বিরতি চুক্তি'-র দ্বারা সমঝোতা করেন, যা চীনা জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। কুয়ো-মিন-তাং দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ১৯৩১ খ্রিঃ চিয়াং-কাই-শেক সাময়িকভাবে ক্ষমতাচ্যুত হলেও ১৯৩২ খ্রিঃ জাপানের সহায়তায় তিনি পুনরায় ক্ষমতা লাভ করেন। অপরদিকে মাও-এর নেতৃত্বধীন কিয়াংসি প্রদেশের গণতান্ত্রিক সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্টদের বিপ্লবী ঘাঁটিগুলি দখল করার উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করে। ফলে মাও উভয় আক্রমণের সম্মুখীন হন। কেন্দ্রীয় কমিটির অসহযোগিতার ফলে লাল ফৌজের পক্ষে চিয়াং-কাই-শেকের আক্রমণ প্রতিরোধ করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। সোভিয়েত এলাকাগুলিতে কমিউনিস্টরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। মাও-জে-দং, চু-তে, লিন পিয়াও প্রমুখের নেতৃত্বে লাল ফৌজ অবরোধ ভেঙে নিরাপদ স্থানে পৌঁছবার জন্য এক দীর্ঘ, কষ্টকর এবং অবর্ণনীয় পদযাত্রা শুরু করেন, যা ইতিহাসে 'লং মার্চ' নামে বিখ্যাত। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর কিয়াংসি প্রদেশ থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়ে দীর্ঘ এক বৎসর বাদে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে উত্তর-পশ্চিম চীনের শেনশি প্রদেশে উপস্থিত হয়। এই দীর্ঘ ৬০০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে লাল ফৌজের বহু সৈন্য নিহত হন। ১৯৩৬ খ্রিঃ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ইয়েনানে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং এই সময় থেকে চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে মাও-এর প্রতিষ্ঠা হয়।

'লং মার্চ' মাও এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাদের অসম্ভবকে সম্ভব করার সাহস জুগিয়েছিল। বিপ্লবী সেনাদলের শক্তি এতটাই বেড়েছিল যে তারা জাপান এবং কুয়ো-মিন-তাং আক্রমণ উভয়কেই প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল। মাও লালফৌজকে বীরদের সেনাদল বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে লালফৌজের পথেই চীনে মুক্তি আসবে। যাইহোক শীঘ্রই শেনশি প্রদেশে মাও এবং লালফৌজ চিয়াং-কাই-শেকের আক্রমণের সম্মুখীন হন। সেইসঙ্গে জাপান উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব চীনে আধিপত্য স্থাপনের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যাপারে চিয়াং-কাই-শেকের নানকিং সরকারের নেতিবাচক মনোভাব চীনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের পরিবর্তে কমিউনিস্টদের দমন করাই চিয়াং-কাই-শেকের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। মাও-জে-দং তৎকালীন চীনা কেন্দ্রীয় সোভিয়েত সরকারের চেয়ারম্যান হিসেবে চিয়াং-কাই-শেকের কাছে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার আহ্বান জানান। এছাড়া চিয়াং-এর সঙ্গে যৌথভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে জাপানী আগ্রাসন রোধ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু চিয়াং-কাই-শেক ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে চ্যাং-সো-লিন এবং ইয়াং-হু-চেংকে উত্তর-পশ্চিম চীনে কমিউনিস্টদের দমন

করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং ৩রা ডিসেম্বর চিয়াং স্বয়ং শেনশি প্রদেশের রাজধানী সিয়ানে উপস্থিত হন। এখানেই উপরি-উক্ত দুই সেনানায়কের দ্বারা তিনি আকস্মিকভাবে বন্দী হন এবং তাঁর ওপর গৃহযুদ্ধের পরিবর্তে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। শেষপর্যন্ত কমিউনিস্ট নেতা চৌ-এন-লাই-এর প্রচেষ্টায় চিয়াংকে মুক্তি দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট এবং কুয়ো-মিন-তাং-এর মধ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়।

মাও-এর এই পদক্ষেপ তাঁর দূরদর্শিতা এবং বাস্তব জ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি চিয়াং-কাই-শেককে বিদ্রোহী সেনাদের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে চিয়াং তখনও তাঁর জনপ্রিয়তা সম্পূর্ণ হারাননি, যেহেতু চিয়াং-ই চীনে রাজনৈতিক ঐক্য এনেছিলেন। মাও চিয়াং-এর জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে সমগ্র জাতিকে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাঁর পাশে আনতে চেয়েছিলেন। মাও-এর কাছে চীন থেকে জাপানের বিতাড়নই ছিল প্রধান লক্ষ্য। অপরদিকে চিয়াংকে হত্যা করা হলে দেশে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল। কমিউনিস্টরা কোনোভাবেই তা চায়নি। একথা সত্য যে চৌ-এন-লাই-এর হস্তক্ষেপের ফলেই চিয়াংকে হত্যা করা হয়নি। চিয়াং যে আটটি শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন সেগুলি হ'ল—

(১) নানকিং সরকারের পুনর্গঠন এবং জাতীয় মুক্তির জন্য সকল দলের যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ,

(২) গৃহযুদ্ধের অবসান এবং জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ ;

(৩) সাংহাই আন্দোলনের নেতাদের মুক্তিদান ;

(৪) সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান ;

(৫) জনসাধারণের সভাসমিতি করার স্বাধীনতা দান ;

(৬) জনগণের জাতীয়তাবাদী সংগঠন করার অধিকার এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার রক্ষা ;

(৭) সান-ইয়াৎ-সেনের নীতিসমূহ কার্যকরী করা ;

(৮) দ্রুত একটি জাতীয় মুক্তি সম্মেলন আহ্বান।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর মাও ঘোষণা করেন যে, কমিউনিস্ট এবং কুয়ো-মিন-তাং দলের যুক্তফন্ট চীনা বিপ্লবের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করবে কারণ এটি জাতীয় স্তরে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতির সম্মতির ভিত্তিতে গঠিত। মাও-এর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে চিয়াং-কাই-শেক ঘোষণা করেন যে, চীনা কমিউনিস্ট দলের বক্তব্য প্রমাণ করে অন্যান্য সকল বিষয়ের ওপর জাতীয় সচেতনতার বিজয়।

নবগঠিত যুক্তফ্রন্ট সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠনে উদ্যোগী হয়। লাল ফৌজ চু-তে-র নেতৃত্বে 'এইটথ্ রুট আর্মি নামে পরিচিত হয়। 'নিউ ফোর্থ আর্মি নামক বাহিনীও ছিল কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন। কুয়ো-মিন-তাং নেতৃত্বাধীন জাতীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে 'এইটথ রুট আর্মি-র যোগাযোগ ছিল। চু-তে এবং পেং-তে-হুই এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। 'নিউ ফোর্থ আর্মি-র নেতৃত্ব ছিল ইয়ে-তিং এবং সিয়াং-ইং-এর ওপর।

কুয়ো-মিন-তাং-এর সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপনের পশ্চাতে মাও-এর উদ্দেশ্য ছিল গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সুযোগে কমিউনিস্টদের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং সাম্যবাদের সম্প্রসারণ ঘটানো।

১.৫ ❑ দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ এবং কুয়ো-মিন-তাং কমিউনিস্ট সম্পর্ক (১৯৩৭-১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ)

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জুলাই জাপান ও চীনের মধ্যে 'অঘোষিত যুদ্ধ' (Undeclared war) শুরু হয়। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধকালকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যেমন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই থেকে ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কাল ছিল প্রথম পর্যায়। ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ছিল তৃতীয় পর্যায়।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে জাপান উত্তর-পূর্ব চীনের বৃহদংশ দখল করে। এছাড়া ইয়াংসি নদীর উত্তরাঞ্চলের বেশির ভাগ প্রধান রেলপথ এবং শহরও দখল করে। দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ক্যান্টন, সোয়াটু, অ্যাময় প্রভৃতি বন্দরনগরীর ওপর জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্ট আঁতাত ছিল শক্তিশালী। কমিউনিস্টরা তাদের বেশ কিছু রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়তাবাদী সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। যুদ্ধ শুরু হলে জাপান সহজেই পিকিং ও তিয়েনচিন দখল করে। চিয়াং-কাই-শোক বিনা প্রতিরোধে জাপানকে সমগ্র উত্তর-পূর্ব চীন অধিকার করতে দিতে রাজী ছিলেন না। ফলে অগাস্ট মাসে সাংহাই অভিযানের ঘটনা ঘটে। সাংহাইতে জাপান শক্তিশালী চীনা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। চীনের সমরশাসকগণও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু তাঁদের অনুন্নত রণকৌশল জাপানী আক্রমণের সম্মুখে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তাঁরা অনেকেই নিহত হন বা তাঁদের বাহিনী নষ্ট হয়ে যায়। এই ঘটনা অবশ্য পরোক্ষভাবে চীনে সমরশাসকদের সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করেছিল। সাংহাই-এর যুদ্ধ জাপানের সামরিক শক্তির প্রাধান্য প্রমাণ করেছিল। সাংহাই-এর পতনের পর চীনা বাহিনী নানকিং-এর দিকে পশ্চাদপসরণ করে। কিন্তু জাপান হ্যানকাও দখল করে এবং নানকিং ধ্বংস করে। তবে, কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন 'এইটথ রুট আর্মি' এবং 'নিউ ফোর্থ আর্মি' উত্তর ও মধ্য চীনে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করে। কমিউনিস্টদের গেরিলা যুদ্ধ ও মাও-জে-দং-এর জাপানের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নীতি জাপানী সৈন্যবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তোলে। শেনশি, সানটুং, আনহুই, হুনান, কিয়াংসি প্রদেশে কমিউনিস্ট গণ সংগঠন গড়ে তোলা হয়। মাও-জে-দং 'On protracted war' নামক প্রবন্ধে তাঁর সমরকৌশল ব্যাখ্যা করেন।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরের শেষ থেকে জাপানী সৈন্যবাহিনী সাফল্য লাভ করতে শুরু করে। ফলে, আরও পশ্চিমে চুং-কিং-এ চীনা রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ২১শে অক্টোবর জাপান ক্যান্টন দখল করে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের শেষে জাপান অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। পিকিং-হ্যানকাও রেখার পূর্বাংশ জাপানের অধিকারে থাকে এবং পশ্চিমাংশ পরিচিত হয় 'স্বাধীন চীন' নামে। এই অঞ্চলের একাংশে কুয়ো-মিন-তাং জাতীয় সরকারের ও অপরাংশে কমিউনিস্টদের অধিকার থাকে। চুং-কিং হয় কুয়ো-মিন-তাং সরকারের রাজধানী এবং কমিউনিস্টদের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয় ইয়েনান। পিকিং এবং নানকিং-এ জাপান অধিকৃত চীনের দুটি শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। চীনা আধিকারিকদের ওপর পিকিং-এর শাসনভার ন্যস্ত হলেও তা পরিচালিত হয় জাপান সরকারের নির্দেশ অনুসারে। অপরদিকে নানকিং-এর শাসনভার থাকে ওয়াং-চিং-উই-এর ওপর, যিনি প্রকৃতপক্ষে জাপানপন্থী ছিলেন। ফলে নানকিং সরকার হয় জাপান প্রভাবিত সরকার।

১৯৩৮ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চীন-জাপান যুদ্ধে এক ধরনের স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। কিন্তু চীনা জনসাধারণের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন-রাশিয়া অনাক্রমণ চুক্তি (২১শে আগস্ট, ১৯৩৭ খ্রিঃ) ও আর্থিক সাহায্য এবং ঋণদানের মাধ্যমে চীনকে সহায়তা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের চীনকে সাহায্য করার আর একটি কারণ ছিল যে, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে জাপান জার্মানীর সঙ্গো কমিনটার্ন বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। যুদ্ধ চলাকালীন স্ট্যালিন চিয়াং-কাই-শেককে সমর্থন দিয়ে আসছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মাও-এর তুলনায় চিয়াং-ই স্ট্যালিনের সহায়তা লাভ করেন। আমেরিকা চীনের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে যেহেতু সে ছিল নিরপেক্ষ শক্তি সেই কারণে আমেরিকা চীনকে সক্রিয় সাহায্যদান থেকে বিরত ছিল। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে পার্ল হারবারে মার্কিন রণতরী জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হলে আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে জাপানের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট চীনকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা দিতে থাকেন এই যুক্তিতে যে একটি সুশিক্ষিত এবং উপযুক্ত চীনা সেনাবাহিনী জাপানকে চীন থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে। জেনারেল স্টিলওয়েল ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে চীনে আসেন মার্কিন নীতি কার্যকর করার জন্য। কিন্তু চিয়াং-কাই-শেকের সঙ্গো তাঁর মতবিরোধ ঘটে। জেনারেল স্টিলওয়েল কমিউনিস্ট সহ সেনাবাহিনীর সকলকেই অস্ত্রসাহায্যের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু চিয়াং এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল যুদ্ধের পর কমিউনিস্টরা তাদের শক্তি জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। এর পর জেনারেল স্টিলওয়েলকে প্রত্যাহার করা হয় এবং ১৯৪৪-এর অক্টোবরে অ্যালবার্ট ওয়েডমেয়ারকে নিযুক্ত করা হয়। চীনে বিপুল পরিমাণে মার্কিন সাহায্য ও সরবরাহ আসতে শুরু করে চীনা বাহিনীকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহারের পূর্বে যুদ্ধ থেমে যায়। যুদ্ধ পরবর্তী গৃহযুদ্ধে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সেগুলি ব্যবহারের জন্য চিয়াং-কাই-শেক প্রস্তুতি শুরু করেন।

কমিউনিস্ট ও কুয়ো-মিন-তাং সম্পর্কের পুনরবনতি

কমিউনিস্ট ও কুয়ো-মিন-তাং দলের মধ্যে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলেও উভয়ের মধ্যেই একটি অন্তর্নিহিত ঘৃণা ও অবিশ্বাসের স্রোত বহমান ছিল। যতদিন পর্যন্ত উভয়ের বিপদের আশঙ্কা ছিল, সংহতি ততদিন পর্যন্ত টিকে ছিল। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের শেষে জাপান ও চীনের যুদ্ধ এক ধরনের স্থিতাবস্থা ধারণ করেছিল। একথা সত্য যে, কুয়ো-মিন-তাং-এর সঙ্গো সহযোগিতার পশ্চাতে কমিউনিস্ট দলের মূল উদ্দেশ্য ছিল গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সুযোগে দলীয় শক্তিবৃদ্ধি করা। এ প্রসঙ্গো মাও-জে-দং তাঁর সহযোদ্ধাদের কাছে বলেছিলেন যে তাঁদের নীতি হল সত্তর শতাংশ সম্প্রসারণ, কুড়ি শতাংশ কুয়ো-মিন-তাং-এর সঙ্গো সহযোগিতা এবং দশ শতাংশ জাপানের বিরোধিতা। সেই সঙ্গো ভবিষ্যতের জন্য বৈপ্লবিক শক্তি সঞ্চয় করা। এজন্য যুদ্ধের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে সামরিক শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট দলের নীতি যদি এই প্রকার হয়, তাহলে একথা বলা যায় যে, চিয়াং-কাই-শেকেরও কমিউনিস্টদের প্রতি কোনো সম্মানজনক মানসিকতা ছিল না।

কমিউনিস্ট দল তাদের প্রভাব বৃদ্ধি এবং জাপান অধিকৃত চীনের যতটা সম্ভব বৃহত্তর অংশে

তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু করে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চে কমিউনিস্টরা শেনশি-কাংসু-নিংসিয়া সীমান্ত সরকার গঠন করে এবং তারপর স্থাপন করে শানশি-হুপেই-চাহার-সুইউয়ান সীমান্ত সরকার। খুব স্বাভাবিক কারণেই কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধি চিয়াং-এর মনঃপূত ছিল না। তবে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট আমলের শুরুর দিকে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধিকে জাতীয়তাবাদীরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ থেকে কুয়ো-মিন-তাং-কমিউনিস্ট সম্পর্কের পুনরায় অবনতি শুরু হয়। জাতীয়তাবাদীগণ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপেক্ষা কমিউনিস্টদের দমন করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। ১৯৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দে কুয়ো-মিন-তাং দল কমিউনিস্টদের গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করে। ফলে, কমিউনিস্টদের একই সাথে জাপান ও কুয়ো-মিন-তাং আক্রমণ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা শুরু করতে হয়। ১৯৩৯-এ রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি এবং ১৯৪১-এ রুশ-জাপান নিরপেক্ষ চুক্তি সম্পাদনের পর কমিউনিস্ট-কুয়ো-মিন-তাং সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইয়েনানের কমিউনিস্টদের ওপর আক্রমণ, যা 'দক্ষিণ আনহুই ঘটনা' নামে পরিচিত। এই ঘটনার পর দু পক্ষের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং কমিউনিস্টরা ১৯৩৮-এ গঠিত 'জনগণের রাজনৈতিক পরিষদ'-এ (People's Political council) যোগদান থেকে বিরত হয়।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মাও-জে-দং তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'On new democracy'-তে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তাত্ত্বিক ধারণা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, চীনের মত দেশে শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণির দ্বারা বিপ্লব সংঘটিত করা সম্ভব নয়। এজন্য কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে চীনের শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবি, বুর্জোয়া এবং পুঁজিপতি শ্রেণির সকলকেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হতে হবে। এর ফলেই চীনে গড়ে উঠবে 'নয়া গণতন্ত্র' যা পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বহারার একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা পৃথক। কারণ এই নতুন শাসনব্যবস্থায় চীনের চারটি শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ একনায়কতন্ত্র গড়ে উঠবে। নয়া গণতন্ত্রে বড় ব্যাঙ্ক, শিল্প ও বাণিজ্যিক উদ্যোগগুলি হবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। কৃষকদের মধ্যে ভূমিবণ্টন করা হবে। নয়া গণতন্ত্র হবে প্রথম পর্যায় যা পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতন্ত্রে পরিণত হবে। ১৯৩৭-৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চীনের কমিউনিস্ট দল তাদের প্রধান এলাকা ইয়েনানকে কেন্দ্র করে যেমন জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিল, তেমনি জাপান বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটিগুলিতে নয়া গণতন্ত্রের ভিত্তিতে এক নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। কৃষিভিত্তিক চীনা সমাজ এবং অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাও মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের প্রচারে অগ্রণী হন। সেইসঙ্গে গ্রামাঞ্চলে বৈপ্লাবিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা শুরু হয়। যদিও লি-লি-সান, ওয়াং-মিং প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতাগণ মাও-এর এই কর্মপন্থা অনুমোদন করেননি। তাঁরা কৃষক সম্প্রদায়ের পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণির ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন। মাও কৃষক শ্রেণির উন্নয়ন প্রচেষ্টা, কৃষকদের দ্বারা বৈপ্লবিক বাহিনী গঠন, কৃষি মজুদর ইউনিয়ন গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষক সম্প্রদায়কে সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন করে তোলেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাও-এর গৃহীত নীতিগুলি ছিল কৃষক, শ্রমিক ও নারী সংগঠন গড়ে তোলা এবং সেগুলিকে অর্থনীতি ও ক্ষমতা বিন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের উপযুক্ত করে তোলা, কমিউনিস্ট বাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা এবং সরল প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংগঠিত করা। বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় এবং কমিউনিস্টদের শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে একযোগে সাম্যবাদী আন্দোলনে

সামিল করার জন্য তিনি গ্রামমুখী পরিকল্পনা করেন। চীনের যে সমস্ত অঞ্চলে ভূমিসংস্কার হয়নি, সেই সকল অঞ্চলে ভূমি সংক্রান্ত করের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। গ্রামীণ অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য পারস্পরিক সহায়তা ও সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত করা হয়। সর্বোপরি গ্রামাঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক রূপান্তরের জন্য নবশিক্ষা আন্দোলন চালু করা হয়। এইভাবে, এই পর্যায়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

জাপানী ও কমিউনিস্ট আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে কমিউনিস্টরা কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও জনসমর্থন, তীব্র সংগ্রাম এবং সঠিক নেতৃত্ব কমিউনিস্ট দলকে শক্তি জুগিয়েছিল। এ সময় কমিউনিস্টদের সংগ্রাম প্রকৃত জনযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব ও সাফল্য এই আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দান করেছিল এবং কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল 'নতুন চীন' নামে পরিচিত হয়েছিল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কমিউনিস্টরা নতুন নতুন রণকৌশলে জাপানী সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কুয়ো-মিন-তাং বাহিনীর আক্রমণকেও তাঁরা সাফল্যের সঙ্গো প্রতিরোধ করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণে আসে। শেনশি-কাংসু-নিংশিয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে উত্তর চীনে কমিউনিস্ট মুক্তাঞ্চল গড়ে ওঠে। মধ্য চীনে আনহুই, কিয়াংসি, হুনান, হুপেই, কিয়াংসু প্রভৃতি অঞ্চল মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়। দক্ষিণ চীনের কোয়াংটুং এবং হাইনান ছিল কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত। মুক্তাঞ্চলগুলিতে কমিউনিস্টরা মাও-এর 'নয়া গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করেছিল।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৮-ই অগাস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরের দিন (৯ই অগাস্ট) জাপানীদের চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য মাও আহ্বান জানান। প্রধান সেনানায়ক চু-তে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাপানী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার নির্দেশ দেন। নতুন আক্রমণের সম্মুখে জাপানী বাহিনী অসহায় হয়ে পড়ে। ১৪ই অগাস্ট জাপান আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করে এবং ৩রা সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দীর্ঘ সংগ্রামের পর চীনা কমিউনিস্টরা জাপানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে।

১.৬ ❑ চূড়ান্ত সংগ্রাম (১৯৪৫-১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ) : গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে দীর্ঘ আট বছর জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চীনা জনগণকে ক্লান্ত করে তোলে। এক শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। জাপানের আত্মসমর্পণের পর চিয়াং-কাই-শেকের নেতৃত্বাধীনে কুয়ো-মিন-তাং দল সমগ্র চীনকে কুয়ো-মিন-তাং নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুয়ো-মিন-তাং দলকে বিশেষ সহায়তা দান করতে শুরু করে। চিয়াং সরকার পূর্ব, মধ্য এবং দক্ষিণ চীনের সকল প্রধান শহর ও যোগাযোগ পথের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তবে উত্তর চীনের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল এবং বেশ কয়েকটি শহর কমিউনিস্টদের অধিকারে থাকে। কমিউনিস্ট দল সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করে এবং জাপানী অস্ত্রসম্ভার দখল করে। তবে চীনা জনগণ যেহেতু শক্তির জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন, সেই কারণে কমিউনিস্ট দল গণসংযোগ বজায় রাখার জন্য ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের

২৫শে অগাস্ট একটি ইস্তাহারে গৃহযুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি ও গণতন্ত্রের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। এজন্য তারা কুয়ো-মিন-তাং দলের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেয়।

কুয়ো-মিন-তাং সরকারের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুং-কিং-এ চিয়াং-কাই-শেক এবং মাও-জে-দং-এর মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। দীর্ঘ চল্লিশ দিন আলোচনার পর একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এই বিবৃতির প্রধান বিষয়বস্তু ছিল অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি রদ করে চীনকে একটি শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে পুনর্গঠন করা হবে। এজন্য একটি রাজনৈতিক আলোচনা সংক্রান্ত সম্মেলন বা Political consultative Conference আহ্বান করা হবে। সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় একটি সর্বদলীয় সরকার গঠিত হবে। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান এবং গোপন পুলিশ ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা হবে। কমিউনিস্ট সেনবাহিনীকে কুড়ি ডিভিশনে নামিয়ে আনা হবে। অপরপক্ষে কুয়ো-মিন-তাং সৈন্যবাহিনীর ডিভিশনের সংখ্যা হবে এক শত কুড়ি। মুক্তাঞ্চলগুলির ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের প্রশ্নে মাও-এর সঙ্গে চিয়াং-কাইশেকের মতবিরোধ হয়। মাও উত্তর চীন, অন্তর্মঙ্গোলিয়া (Inner M ongolia) ও অন্যান্য কয়েকটি প্রধান শহরে কমিউনিস্ট আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে থাকলে চিয়াং তার বিরোধিতা করেন। ফলে, মাওকে এ সকল অঞ্চলে সংবিধান প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রস্তাবে সম্মত হতে হয়। চীনে জাপানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়ার প্রশ্নেও মাও-চিয়াং মতানৈক্য ঘটে। ফলে, চুং কিং আলোচনা সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছিল একথা বলা যায় না। এতদ্‌সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা চুং কিং আলোচনার শর্ত অনুযায়ী চেজিয়াং দক্ষিণ কিয়াংশু ও দক্ষিণ আনুহুই অঞ্চল থেকে সৈন্য অপসারণ করলেও কুয়ো-মিন-তাং দল কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত শানটুং ও হানটান অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করে। কিন্তু কমিউনিস্ট সেনার কাছে কুয়ো-মিন-তাং বাহিনী পরাজিত হয়। তারা ১৯৪৫-এর ১৫ই ডিসেম্বর কুনমিং-এ এক উদারপন্থী ছাত্র সমাবেশের ওপর আক্রমণ চালায়।

গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি যাতে বৃদ্ধি না পায় এজন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান জেনারেল মার্শালকে চীনে প্রেরণ করেন দু-পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করার জন্য। মার্কিন বিদেশ সচিব ডীন অ্যাচিসন তাঁর সঙ্গে আসেন। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল কুয়ো-মিন-তাং দলকে চীনে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা। যাই হোক, এই আলোচনায় কমিউনিস্ট দলের প্রতিনিধিত্ব করেন চৌ-এন-লাই। চিয়াং-কাই- শেক এবং চৌ-এন-লাই-এর মধ্যে আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী একটি চুক্তি হয়। এ সময়ই পিকিং-এ পাঁচ সপ্তাহব্যাপী রাজনৈতিক আলোচনা সংক্রান্ত সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এতে স্থির হয় যে ১৯৪৬-এর মে মাসে একটি জাতীয় সভা আহবান করা হবে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে। সংবিধানের মাধ্যমে চীনা প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে। জাতীয়তাবাদী দলের পঞ্চাশ শতাংশ সদস্যের দ্বারা গঠিত জাতীয় পরিষদ (State Council) সরকার গঠন করবে। কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত লাল ফৌজের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে এক জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করা হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে কুয়ো-মিন-তাং দল এই সম্মেলনের গৃহীত নীতিগুলি অগ্রাহ্য করতে থাকে এবং কমিউনিস্টদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। ফলে, পূর্বোক্ত যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে উভয় পক্ষের সংঘাত শুরু হয়। জাপানের আত্মসমর্পণের পর জাপানের প্রভাবাধীন মাঞ্চুকুয়ো রাজ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন দখল করে নিয়েছিল। কুয়ো-মিন-তাং দল মাঞ্চুরিয়া দখল করতে আগ্রহী ছিল। সোভিয়েত বাহিনী মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করার (১৯৪৬, মার্চ) অল্প কয়েকদিনের চিয়াং-কাই-শেক মুকডেন দখল করেন।

কমিউনিস্টরা কুয়ো-মিন-তাং-এর এই কাজের প্রতিবাদ করলে উভয়পক্ষে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। কুয়ো-মিন-তাং দল চ্যাং চুং, আনশন, চিলিন অধিকার করো অপরদিকে কমিউনিস্ট দল হারবিন সহ প্রায় সমগ্র উত্তর চীন অধিকার করে নেয় এবং উত্তর মুকডেনের সিপিং কাই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে কুয়ো-মিন-তাং বাহিনীকে।

১৯৪৬ খিস্টাব্দের ২৬শে জুন হুপেই-হুনান সীমান্তবর্তী কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল চিয়াং-কাই-শেকের বিশাল বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত মুক্তাঞ্চলগুলি ছিল তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। শানটুং, দক্ষিণ চাহার, কিয়াংশু-আনহুই, উত্তর হেবেই, দক্ষিণ শেনশি, রেহে প্রভৃতি অঞ্চল কুয়ো-মিন-তাং বাহিনী আক্রমণ করে। কমিউনিস্ট বাহিনী এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মুক্তাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি পরিত্যাগ করে চলে যায়। ফলে, ঐ অঞ্চলে উপস্থিত কুয়ো-মিন-তাং বাহিনী অকেজো হয়ে পড়লে কমিউনিস্টরা পূর্ণ শক্তিতে দক্ষিণ শানটুং, শেনশি ও ইয়াংসির নিম্ন উপত্যকা আক্রমণ করে। তবে ইয়েনান কমিউনিস্টদের হস্তচ্যুত হয়।

ইতিমধ্যে শান্তি স্থাপনের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর চিয়াং-কাই-শেক জাতীয় পরিষদ আহ্বান করলে কমিউনিস্ট দল তা বয়কট করে। কারণ তাদের দাবী ছিল চীনে একটি সর্বদলীয় সরকার গঠনের পর জাতীয় পরিষদ আহ্বান করা। জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত স্বৈরতান্ত্রিক সংবিধান অনুসারে চিয়াং-কাই-শেককে চীনের রাষ্ট্রপতি ও লি সুং জেনকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়। এই ঘটনা কমিউনিস্ট-কুয়ো-মিন-তাং বিরোধ বৃদ্ধি করে।

চীনে এই গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কুয়ো-মিন-তাং অধিকৃত অঞ্চলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দেখা যায়। চিয়াং-কাই-শেক ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এক চুক্তি অনুসারে প্রভূত আর্থিক সাহায্য লাভ করেছিলেন। কুয়ো-মিন-তাং অধিকৃত এলাকায় মার্কিন পণ্যের আধিক্য দেখা যায়। পাশাপাশি গৃহযুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সাধারণ জনগণের ওপর করভার বৃদ্ধি করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কৃষি সঙ্কট, শিল্প ও বাণিজ্যের অবনতি চীনে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। এর ফলে কুয়ো-মিন-তাং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ছাত্র, শ্রমিক সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণ প্রতিবাদী আন্দোলনে সামিল হন। চীন থেকে যাবতীয় মার্কিন সৈন্যের অপসারণ দাবী করা হয়। সাংহাইতে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিলে তা নির্মমভাবে দমন করা হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ ও জমিদার বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন কৃষক বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। কুয়ো-মিন-তাং শাসনের বিরুদ্ধে তাইওয়ানে সরকার বিরোধী দাঙ্গা দমন করে সৈন্যবাহিনী ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। এ সকল ঘটনা কুয়ো-মিন-তাং শাসনের অপদার্থতা প্রকট করে তোলে। এগুলি ব্যতীত ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে থেকেই কুয়ো-মিন-তাং দলের বিরুদ্ধে জঙ্গী ছাত্র আন্দোলন দেখা যায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, আর্থিক সঙ্কট, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি ছাত্র আন্দোলনের কারণ ছিল। সর্বোপরি, চিয়াং-কাই-শেকের স্বৈরতান্ত্রিক নীতি, ধর্মঘট-মিছিল-বিক্ষোভ নিষিদ্ধকরণ আইন ছাত্র সমাজকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও কুয়ো-মিন-তাং অপশাসনের উচ্ছেদকল্পে কুয়ো-মিন-তাং-এর বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী ১৯৪৮ খ্রিঃ কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। এছাড়া চীনের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে হাত মেলায়। এককথায় কুয়ো-মিন-তাং শাসনের বিরুদ্ধে ও কমিউনিস্টদের পক্ষে ঐক্য গড়ে ওঠে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে কমিউনিস্ট দল সর্বত্র তাদের শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাফল্য লাভ করতে থাকে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে তাদের ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। মাঞ্চুরিয়া থেকে কমিউনিস্টরা তাদের প্রতি আক্রমণ শুরু করে। একের পর এক অঞ্চল অধিকারের ফলে মাঞ্চুরিয়া থেকে ইয়াংসি পর্যন্ত অঞ্চলে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্টদের দখলে ছিল আধুনিক জাপানী অস্ত্রশস্ত্র যা রাশিয়ানরা মাঞ্চুরিয়ায় ফেলে রেখে গিয়েছিল। কমিউনিস্টরা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া থেকে জাতীয়তাবাদীদের বিতাড়িত করে। মুকডেন, চ্যাংচুং এবং চিনচাও অঞ্চলে কুয়ো-মিন-তাং বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর-নভেম্বরের মধ্যে কমিউনিস্ট সেনাপতি লিন পিয়াও ঐ তিনটি অঞ্চল অধিকার করেন। মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধে বহু কুয়ো-মিন-তাং সৈন্য নিহত হয়। কমিউনিস্ট দলের অপর একটি বাহিনী যার নেতৃত্বে ছিলেন চেন-য়ি, শানটুং অধিকার করে। সমগ্র উত্তর-পূর্ব চীন কমিউনিস্টদের দখলে চলে আসে। তিয়েনসিন-পুকাও এবং লুং-হাই রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত সুচাও আক্রমণের জন্য কমিউনিস্ট বাহিনী অগ্রসর হয়। ১৯৪৮-এর অক্টোবরে শুরু হয় হুয়াই-হাই যুদ্ধ এবং ১৫ই ডিসেম্বর সুচাও-এর পতন হয়। এই যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৯-এর ১০ই জানুয়ারী। কমিউনিস্ট দল কিছু অঞ্চল ব্যতীত পূর্ব চীন এবং চ্যাং-কিয়াং নদীর উত্তরে অবস্থিত মধ্যাঞ্চলের সমতলভূমি মুক্ত করে। কমিউনিস্ট তথা মাও-জে-দং-এর প্রধান লক্ষ্য এখন হয়ে দাঁড়ায় কুয়ো-মিন-তাং সরকারের রাজধানী নানকিং অধিকার। ফলে পিকিং-তিয়েনসিন অভিযান শুরু হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারীর মধ্যে তিয়েনসিন ও পিকিং-এর জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনী কমিউনিস্টদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। কয়েকদিনের মধ্যেই সমগ্র উত্তর-চীন কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

কুয়ো-মিন-তাং বাহিনীর এই শোচনীয় পরাজয়ের ফলে এবং দলের অভ্যন্তরীণ চাপ চিয়াং-কাই-শেককে রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করতে বাধ্য করে (২১শে জানুয়ারী ১৯৪৯)। উপরাষ্ট্রপতি লি-সুন-জেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। তিনি দক্ষিণ চীনের ওপর কুয়ো-মিন-তাং আধিপত্য বজায় রাখার জন্য কমিউনিস্টদের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করলেও মাও-জে-দং জাতীয়তাবাদী সরকারের সঙ্গে কোন রকম সমঝোতায় যেতে রাজি হন না। পরিবর্তে কমিউনিস্ট বাহিনী দক্ষিণ-চীন আক্রমণ করে এবং ১৯৪৯ সালে ২৪শে এপ্রিল কুয়ো-মিন-তাং রাজধানী নানকিং দখল করে নেয়। জাতীয়তাবাদী সরকার তাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করেন ক্যান্টনে, তারপর চুংকিং এবং শেষপর্যন্ত ১৯৪৯-এর ৮ই ডিসেম্বর স্থায়ীভাবে ফরমোজায় (তাইওয়ান) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৪৯-এর ১লা অক্টোবর মাও-জে-দং পিকিং-এর সুবিখ্যাত তিয়েনানমেন স্কোয়ারের বিশাল জনসভায় গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী সরকার ফরমোজায় চলে যাবার পর কার্যত সমগ্র চীনের ওপর কমিউনিস্ট আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মাও-জে-দং-এর নেতৃত্বে চীনের ইতিহাসে এক নতুন পর্বের সূত্রপাত হয়। তিয়েনানমেন স্কোয়ারে মাও ঘোষণা করেছিলেন যে চীনা সভ্যতাকে নতুন করে গড়ে তুলতে এবং বিশ্বশান্তি ও স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য চীনা জনগণকে সাহসের সঙ্গে কাজ করতে হবে। চীন আর কখনওই সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতিস্বীকার করবে না এবং কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই আর চীনকে পদানত করতে সক্ষম হবে না। এই দিন থেকেই মাও-জে-দং চীনের মুকুটহীন সম্রাটে পরিণত হন।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা চীনা জনগণকে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর শান্তি এবং এক ঐক্যবদ্ধ সরকার

উপহার দেয়। চীনা জনগণ প্রকৃতই শান্তির জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। মাও-এর নয়া গণতন্ত্র ছিল চীনের সকল বৈপ্লবিক শ্রেণির যৌথ একনায়কতন্ত্র যাতে শ্রমিক, কৃষক, পাতি বুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া সকলে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের উপরে ছিল কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্ব। 'গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র' কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাও বলেছিলেন যে এই দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয় অর্থাৎ জনগণের জন্য গণতন্ত্র এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের জন্য একনায়কতন্ত্র—উভয়ের মিলিত ব্যবস্থাই হল জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র। মাও-এর নয়া গণতন্ত্রের লক্ষ্য ছিল জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং জনগণের স্বার্থরক্ষা করা, এক কৃষিভিত্তিক দেশকে শিল্পভিত্তিক দেশে পরিণত করা এবং ধীরে ধীরে চীনকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যাওয়া।

চীন বিপ্লবে মাও-জে-দং-এর সাফল্যের কারণ হিসেবে কিছু কথা বলা যেতে পারে। চিয়াং-কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী সরকার চীনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার, ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষার প্রতি তাদের বেশি দৃষ্টি ছিল। জনসমর্থন গড়ে তোলার বিশেষ প্রচেষ্টা চিয়াং সরকারের ছিল না। একধরনের পুলিশী রাষ্ট্রব্যবস্থা, দমন নীতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রশাসনিক দুর্নীতি প্রভৃতি এই সরকারকে জনসমর্থন থেকে বঞ্চিত করেছিল। চীন-জাপান যুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি চীনা অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ ছিল অত্যাধিক কাগজী নোটের প্রচলন। এছাড়া ১৯৩০-এর দশকের শুরুতে খরা, অজন্মা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত করে। পাশাপাশি শহরাঞ্চলে ব্যবসায়ীদের কাছে চাল ও গমের প্রাচুর্য দেখা যায়। এই অবস্থায়ও উচ্চ করভার এবং জবরদস্তিমূলক শ্রম আদায়ের রীতি অব্যাহত থাকে। পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণ, কৃষকদের মধ্যে জমি সমভাবে বন্টন ইত্যাদি ক্ষেত্রে চিয়াং সরকারের ব্যর্থতা ছিল লক্ষণীয়। সর্বোপরি, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের চেয়ে কমিউনিস্টদের দমন করাই জাতীয়তাবাদী সরকারের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সকল কারণে চিয়াং-কাই-শেক এবং তাঁর সরকার দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও আর্থিক সাহায্য সত্ত্বেও চিয়াং-এর পক্ষে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়নি।

অপরপক্ষে জাতীয়তাবাদী সরকারের দুর্বলতাগুলিকে কাজে লাগিয়ে মাও-জে-দং এবং কমিউনিস্ট দল জনসমর্থন গড়ে তোলেন। ন্যায় ও শান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী চীন গঠনের জন্য মাও-এর প্রতিশ্রুতি এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিরোধ মাওকে জনসমর্থন লাভের সুযোগ এনে দিয়েছিল। এছাড়া কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি মাও-এর নীতি কৃষিপ্রধান চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন পেয়েছিল। কমিউনিস্টদের গৃহীত ভূমিসংস্কার নীতি ছিল উল্লেখযোগ্য। শহর বা বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের পরিবর্তে গ্রাম এবং কৃষক সম্প্রদায় ছিল মাও-এর আগ্রহের প্রধান লক্ষ্য। কমিউনিস্টরা দক্ষিণ চীনে ধনী-ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে তা পুনর্বণ্টন করেছিল। বিশেষত দরিদ্রতম কৃষি মজুরও যাতে এক খণ্ড জমি লাভ করে তা নিশ্চিত করেছিল। এর ফলে কমিউনিস্টরা ক্ষুদ্র ভূস্বামী ও কৃষকদের সমর্থনলাভে সক্ষম হয়। কুয়ো-মিন-তাং-এর বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সংগ্রাম একটি জনযুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মাও-জে-দং-এর নেতৃত্ব এবং চীনা জনগণের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা এবং সামাজিক ন্যায়-বিচার, শান্তি ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্যহীন চীন প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন মাও-জে-দং তাঁর দেশবাসীকে দেখিয়েছিলেন তা চীনা

জনগণের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। পাশাপাশি সংস্কারবিমুখ, দুর্নীতি-পরায়ণ চিয়াং সরকার জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, যা মাও-এর সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১.৭ ❑ বিশ্ব রাজনীতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বা সাম্যবাদী চীনের প্রভাব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে মাও-জে-দং-এর নেতৃত্বে সাম্যবাদী বা গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উত্থান। এই ঘটনা এশিয়া তথা বিশ্ব রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এ ঘটনা ছিল উল্লেখযোগ্য।

চীনে নতুন শাসন প্রতিষ্ঠার পর চীন অন্যান্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপীয় রাজ্যসমূহ, ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ইংলন্ড এবং স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলি সহ আরো কিছু দেশ নবোদিত চীনকে স্বীকৃতি জানায় এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী হয়। ১৯৪৯ সালে চীন ঘোষণা করে যে তার পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হবে নিজ সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা করা। বিশ্বশান্তি এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও আগ্রাসনের বিরোধিতা হবে চীনের প্রধান লক্ষ্য। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করবে চীন। বিদেশী রাষ্ট্রে বসবাসকারী চীনা নাগরিক এবং চীনে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার দিকেও তার লক্ষ্য থাকবে। চীনের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য হবে বিশ্বে সাম্যবাদী ভাবধারা প্রচার করা, সর্বহারাদের ঐক্যবদ্ধ করে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলা। মাও-জে-দং ঘোষণা করেন যে সান-ইয়াৎ-সেনের চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা এবং চীনা কমিউনিস্ট দলের আঠাশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে চীনকে জয়লাভের জন্য এবং সেই জয়কে সংহত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ অথবা সমাজতন্ত্র যে কোন একদিকে ঝুঁকতে হবে। তৃতীয় কোন পথ থাকতে পারে না।

চীনে সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার পর চীন তথা বিশ্ব রাজনীতিতে মাও-জে-দং এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। একটি যুদ্ধক্লান্ত, অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত দেশকে ঐক্যবদ্ধ এবং এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেছিলেন মাও-জে-দং। ক্ষমতালাভের পর মাও-এর প্রধান লক্ষ্য হয় চীনের অর্থনৈতিক সংস্কার এবং উন্নয়ন। মাও অবহিত ছিলেন যে চীনে সাম্যবাদী আন্দোলন ও গৃহযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে যথোচিত সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও তিনি অনুভব করেন যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হস্তক্ষেপ থেকে সদ্যজাত চীনকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েত সহায়তা প্রয়োজন। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বিশ্বরাজনীতিতে সোভিয়েত পক্ষই অবলম্বন করবে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারী চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদী এক পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সোভিয়েত নেতা স্ট্যালিন মাও-এর সঙ্গে সামরিক চুক্তি ছাড়াও চীনের শিল্পায়ন ও যুদ্ধাস্ত্রের আধুনিকীকরণে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এশীয় রাজনীতিতে চীনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমর্থন ছিল। অপরদিকে চীনও সোভিয়েত ইউনিয়ন

এবং পূর্ব ইউরোপের সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গো সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে।

পাশ্চাত্য দেশগুলির অনেকেই চীনকে সরকারী স্বীকৃতি দান করলেও ফ্রান্স স্বীকৃতিদানে বিরত ছিল। কারণ মাও ইন্দোচীনে ভিয়েতমিনকে সাহায্য দেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান যেমন গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে স্বীকৃতি দেননি, তেমনি চীনের সাম্যবাদী সরকারকে উৎখাতের কোন প্রচেষ্টাও মার্কিন তরফে দেখা যায়নি। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফরমোজায় জাতীয়তাবাদী চীনা সরকারকে সমর্থন করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চীনের প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পর আরও একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্রের উত্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্বস্তির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কোরিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে চীন মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এই যুদ্ধ একটি আঞ্চলিক সংঘর্ষ হিসেবে শুরু হয়ে বৃহত্তর সংঘাতে পরিণত হয় এবং ঠান্ডা লড়াই রাজনীতিকে এশিয়া মহাদেশে এনে ফেলে। এই যুদ্ধে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর কোরিয়ার পক্ষে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে চীনে সাম্যবাদী প্রশাসনকে দুর্বল করতে চেয়েছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। আর এই যুদ্ধের ফলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন পরস্পরের কাছাকাছি আসে। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার রুশ সাম্যবাদ বিরোধী মানসিকতাকে বিস্তারিত করে বৃহত্তর সাম্যবাদ বিরোধিতায় নিমজ্জিত হয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক জোট প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয় যার উদাহরণ ANZUS, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা চুক্তি, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে অকমিউনিস্ট চীনা তাইওয়ানের সঙ্গো পারস্পরিক সামরিক চুক্তি প্রভৃতি। এছাড়া ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক দলের অগ্রগতি রোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে ঠান্ডা লড়াই রাজনীতির প্রভাবে দুটি এশীয় রাষ্ট্র চীন ও জাপান পরস্পর বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে।

এশিয়ার রাজনীতিতেও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উত্থানের প্রভাব লক্ষণীয়। চীনের এশীয়নীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সঙ্গো সুসম্পর্ক বজায় রাখা। ভারত, পাকিস্থান, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, লাওস, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গো জোট বাঁধা থেকে বিরত রাখার জন্য চীন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথা ঘোষণা করেছিল। তবে চীন তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূল হিসেবে যে সমস্ত অঞ্চলগুলিকে বিবেচনা করেছিল সেগুলির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা থেকে সে বিরত হয়নি। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তাইওয়ান যেখান থেকে মার্কিন চাপ সত্ত্বেও চীন সরে আসেনি। তিব্বতকেও চীন তার প্রভাবাধীন অঞ্চল হিসেবে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে দখল করে নেয়। এবিষয়ে তিব্বতের ধর্মশাসক দলাই লামা এবং অন্যান্য দেশের প্রতিবাদেও সে কর্ণপাত করেনি। যাইহোক চীনে সাম্যবাদী শাসনের প্রতিষ্ঠা এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে নতুন উৎসাহ জুগিয়েছিল। সেইসঙ্গো মূলত কৃষকগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত মাও-জে-দং-এর আন্দোলন এশিয়ার বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এক নবদিগন্ত উন্মোনে করেছিল।

১.৮ ❑ চীন-সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্ক

ক. প্রথম পর্যায় (১৯৪৯-১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উত্থান বিশ্বরাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব যেমন বিশ্বে প্রথম একটি রাষ্ট্রে সাম্যবাদী শাসনের সূচনা করেছিল তেমনি চীনে সাম্যবাদী বিপ্লব এবং কমিউনিস্ট দলের ক্ষমতা দখল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরো একধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। তাই চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুটি সাম্যবাদী রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয়।

চীন-সোভিয়েত সম্পর্ককে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায় হিসেবে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে ধরা যায়। এই কালপর্ব ছিল প্রধানত চীন-সোভিয়েত সৌহার্দ্যের যুগ। চীনে মাও-জে-দং-এর নেতৃত্বে যখন বিপ্লব চলছে তখন সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন স্ট্যালিন। চীনে কুয়ো-মিন-তাং ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন চীনা কমিউনিস্ট দল সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যথোচিত সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত ছিল। বরং জাতীয়তাবাদী কুয়ো-মিন-তাং দল তথা চিয়াং-কাই-শেকের প্রতি স্ট্যালিন বেশি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন। উপরন্তু চিয়াং গোষ্ঠীর সঙ্গো মিত্রতা স্থাপনের পরামর্শ স্ট্যালিন দিয়েছিলেন মাও-জে-দংকে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানকে বিপর্যস্ত করে মাও যখন কুয়ো-মিন-তাং-এর সঙ্গো সংঘর্ষে যেতে চান তখনও স্ট্যালিন তা সমর্থন করেননি। শেষপর্যন্ত সোভিয়েত সহযোগিতা ব্যতীতই মাও-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট দল চীনে ক্ষমতা দখল করে। উল্লেখযোগ্য যে চীনে সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গো চীনা কমিউনিস্ট দলের মতপার্থক্য থাকলেও তা কখনই পারস্পরিক তিক্ততার সৃষ্টি করেনি। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের জন্মলগ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নই চীনকে প্রথম স্বীকৃতি জানায়।

১৯৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে মাও-জে-দং সহ অনেক চীনা নেতা সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য উভয় দেশই পারস্পরিক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী চীন-সোভিয়েত মৈত্রী, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. ওয়াই. ভিশিনিস্কি এবং চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপ—

(ক) চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কোন একটি রাষ্ট্র যদি জাপান বা জাপানের মিত্ররাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাহলে অপররাষ্ট্র তাকে ঐ আগ্রাসন প্রতিরোধে যথোচিত সামরিক সাহায্য করবে।

(খ) চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই জাপানের সঙ্গো দ্রুত একটি শক্তিচুক্তি স্থাপনে ঐক্যমত হয়। এছাড়া উভয়ের স্বার্থবিজড়িত সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনায় বসতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

(গ) উভয় দেশের মধ্যে একটি নিবিড় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে।

(ঘ) চীনের চ্যাং-চুং রেলপথ, পোর্ট আর্থার এবং দাইরেন সম্পর্কে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হয়। স্থির হয় যে জাপানের সঙ্গো চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন চ্যাং-

চুং রেলপথ ও পোর্ট আর্থারের উপর গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করবে। পোর্ট আর্থার থেকে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে।

(ঙ) চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে পাঁচ বছরের মধ্যে ত্রিশ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ হিসেবে দেবে। এছাড়া বিভিন্ন রকমের অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্য চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে লাভ করবে।

চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের এই চুক্তি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে দুই সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে যা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে মার্চ উভয় দেশের মধ্যে তেল এবং লৌহ ব্যতীত অন্যান্য ধাতুসম্পদ কাজে লাগানোর জন্য সিনকিয়াং-এ জয়েন্ট স্টক কোম্পানী প্রতিষ্ঠা এবং চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে তিনটি যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। চীনের বাণিজ্যের সত্তর শতাংশই চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এবং ক্রমশ এই বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিল্পোন্নয়নের জন্য রুশ বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তিবিদরা যেমন চীনে আসতে থাকেন তেমনি চীন থেকে বহু শ্রমিক শিল্প, খনি ও রেলপথ সংক্রান্ত কাজের প্রশিক্ষণ নিতে রাশিয়া যান। ১৯৫২ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর চীন এবং সোভিয়েত প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনায় স্থির হয় যে ১৯৫০-এ স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুযায়ী সোভিয়েত সরকার কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ ব্যতীতই চ্যাং-চুং রেলপথ যুগ্মভাবে শাসন করার অধিকার দেবেন। তবে পোর্ট আর্থার থেকে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী অপসারণের ক্ষেত্রে চীন সরকার তা বন্ধ রাখার প্রস্তাব দেয় কারণ জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এবং উত্তর চীনের উপকূল ভাগের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। সোভিয়েত সরকার চীনের এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে। ১৯৫০-এ কোরিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একত্রে উত্তর কোরিয়াকে সাহায্য করে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি কিন্তু চীন সরাসরি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে। ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি চুক্তির মাধ্যমে চীনে শিল্পায়নের জন্য অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত সাহায্য দানের অঙ্গীকার করে। এমনকি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে চীনকে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাহায্য দানের অঙ্গীকার করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সামগ্রিকভাবে এই পর্যায়ে চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক প্রধানত সম্প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

খ. দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫৪-১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উত্থানের পর যে সম্প্রীতির সম্পর্ক এই দুই সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তাতে ভাঙন ধরতে শুরু করে। তাই এই দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ১৯৫৪ থেকে মাও-জে-দং-এর মৃত্যু (১৯৭৬) পর্যন্ত সময়কাল ছিল দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধিতা ও তিক্ততার যুগ।

পঞ্চাশের দশকের প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত চীন-সোভিয়েত মৈত্রীর কোনো অবনতি ঘটেনি।

উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বর্তমান ছিল ১৯৫০-এ কোরিয়ার যুদ্ধের সময় উভয় দেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে সাহায্যের বিষয়টি অনেকটা হ্রাস পেলেও। এজন্য স্ট্যালিনের অনিস্থা বা বিরোধিতাকে দায়ী করেননি মাও-জে-দং। কিন্তু ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতায় আসেন নিকিতা ক্রুশ্চেভ। ক্রুশ্চেভের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্ট্যালিনের চেয়ে পৃথক। ক্ষমতালাভের পর তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় স্ট্যালিনবাদের উচ্ছেদ (Destalinzation)। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গেও সোভিয়েত সম্পর্ক পরিবর্তিত হতে শুরু করে। স্ট্যালিনের কাছে চীন ছিল সমমনোভাবাপন্ন আর একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র। ফলে, তাঁর চীন-নীতির মধ্যে আদর্শগত প্রভাব ছিল। কিন্তু ক্রুশ্চেভ তাঁর চীন সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করেছিলেন কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। শুধু তাই নয়, এ সময় থেকে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ সহ অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দেয় যা চীন-সোভিয়েত সম্পর্ককে তিক্ত করে তোলে। প্রথম পর্যায়ের সম্প্রীতির সম্পর্ক ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে।

পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকেই উভয় দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ মতাদর্শ সম্পর্কিত ভিন্ন মত পোষণ করতে শুরু করেন। যা থেকে রুশ-চীন প্রত্যক্ষ বিরোধের সূত্রপাত হয় বলে ধারণা করা হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত কমিউনিস্ট দলের বিংশতিতম সম্মেলনে ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনবাদ তীব্র আক্রমণ করেন। স্ট্যালিনের চিন্তাভাবনাকে অপ্রাসঙ্গিক বলে বর্ণনা করে শুরু করেন স্ট্যালিনবাদকে উচ্ছেদ বা Destalinization. স্ট্যালিনের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্লেষণ তিনি স্বীকার করতে পারেননি এবং উগ্র পুঁজিবাদ বিরোধিতাকে বর্তমান যুগে অযৌক্তিক বলে তিনি মনে করেন। যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল টিটোর তত্ত্বকে সমর্থন করে ক্রুশ্চেভ বলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন উগ্র পুঁজিবাদ বিরোধিতার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং শান্তির পথেই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অভিলাষী। ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের অতিরিক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে আক্রমণ করেন। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তিনি বলেন যে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগের বৈশিষ্ট্য হল সাম্রাজ্যবাদের ছিন্নভিন্ন অবস্থা। ফলে সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় বিরোধিতার পরিবর্তে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই কাম্য। এছাড়া উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে বহু রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় সশস্ত্র বিপ্লবের তত্ত্ব বর্তমানে মূল্যহীন। পুঁজিবাদ বিরোধিতার উগ্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথ থেকে সরে আসাই সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্য। সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতিতে ক্রুশ্চেভের এই পরিবর্তিত আদর্শের প্রভাব পড়ে। সোভিয়েত নেতৃত্বের ধারণা হয় যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ এড়াতে সক্ষম। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর কোন বড় যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন রাজী ছিল না। অপরদিকে চীনের ধারণা ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধই একমাত্র পথ। তাই চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সংশোধনপন্থী' বা 'সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী' আখ্যা দেয়। চীনের মতে, লেনিনের মতাদর্শ অনুযায়ী বিশ্ব সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লব শেষ হবে না। কিন্তু সোভিয়েত নেতৃত্ব এ আদর্শ থেকে বিচ্যুত এবং পুঁজিবাদের সঙ্গে আপোসের জন্য প্রস্তুত। চীনা নেতৃত্বের বিশ্বাস ছিল আফ্রিকা ও এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করা প্রয়োজন কমিউনিস্টদের, কারণ বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল ও পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে বিপ্লব আসা বা সাম্যবাদের জয়লাভ অসম্ভব। স্ট্যালিনের আমলে রুশ নেতৃত্বেরও

এই ধারণা ছিল। কিন্তু ক্রুশ্চেভ এ ধারণার পরিবর্তন করেন। তিনি সমর্থন করেন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির স্বাধীন বৈদেশিক নীতির অনুসরণ বা গণতন্ত্রীকরণ। তাঁর মতে, যুদ্ধ কখনই কাম্য নয় এবং চীনের নীতি আদৌ বাস্তবানুগ নয়। মতাদর্শের এই পার্থক্য দুই সাম্যবাদী রাষ্ট্রকে পরস্পরবিরোধী করে তুলেছিল।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত কমিউনিস্ট দলের বিংশতি সম্মেলনে ক্রুশ্চেভের নীতি ও কমিউনিস্ট দলের ভূমিকা চীন সমর্থন করতে পারেনি। চীন-সোভিয়েত বিরোধের উৎস এখানেই নিহিত ছিল। মতাদর্শের পার্থক্য সত্ত্বেও ১৯৫৬ সালে পোল্যাণ্ডে গোমুলকার নেতৃত্বে সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন যাতে সামরিক হস্তক্ষেপ না করে এ বিষয়ে রুশ নেতৃত্বকে চীন প্রভাবিত করতে পেরেছিল। আবার ঐ বৎসরেই হাঙ্গোরীর প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান দমনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত নীতিকে চীন সমর্থন করে। তবে যুগোশ্লাভ নেতা মার্শাল টিটোর সঙ্গো সোভিয়েত ইউনিয়নের আপসের চেষ্টা, সোভিয়েত মদতে যুগোশ্লাভিয়া কর্তৃক আলবানিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ চীন সমর্থন করেনি। ১৯৫৮ সালে ক্রুশ্চেভের চীন সফরের সময় মার্শাল টিটোর প্রতি কঠোর মনোভাব অবলম্বনের জন্য চীন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি করে। চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাঙন শুরু হয় ১৯৫৮ সাল থেকে এবং ১৯৫৯-এ এই ভাঙন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

১৯৫৯-এ চীনের বিপ্লবের দশম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ক্রুশ্চেভ চীনের নীতির সমালোচনা করলে তা চীনের অসন্তোষের কারণ হয়। সেই সঙ্গো ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাম্পডেভিডে ক্রুশ্চেভ এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারের আলোচনা চীন সুনজরে দেখেনি। চীনের ধারণা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মানবসমাজের প্রধান শত্রু। সুতরাং সেই রাষ্ট্রের সঙ্গো আপোসের পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের উচিত নিজ প্রাধান্য স্থাপন করা। তার পরিবর্তে ক্রুশ্চেভের ঘোষণা যে কমিউনিস্টরা যত শক্তিশালীই হোক না কেন পুঁজিবাদী বিশ্বের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকবে—যা চীনা নেতৃত্বের কাছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে গুরুতর বিচ্যুতি এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার জয় বলে মনে হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গো সোভিয়েত ইউনিয়নের আপোসের নীতিকে চীন রাশিয়ায় পুঁজিবাদের প্রত্যাবর্তন বলে অভিহিত করেছিল।

১৯৫৯-এ চীন-ভারত বিরোধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরপেক্ষতা দুই দেশের সম্পর্ককে অবনতির দিকে নিয়ে যায়। ১৯৬১ সালে কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র অপসারণের বিষয়টিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণের নামান্তর বলে চীন মনে করে। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারীতে ওয়ারশ চুক্তি জোটের এক সভায় চীনের নীতির সমালোচনা করে ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেন যে চীনকে আণবিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করার পরিকল্পনা সোভিয়েত ইউনিয়নের নেই।

১৯৬০ সালেই রোমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বুখারেস্টে। সেখানেও ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেন যে পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গো সংঘর্ষের প্রয়োজন নেই কারণ পুঁজিবাদ তার দুর্বলতার জন্যই নিজে থেকে ধ্বংস হবে। চীনের কাছে এ বক্তব্য পুঁজিবাদী বিশ্বের সঙ্গো সোভিয়েত ইউনিয়নের আপসের নামান্তর বলেই মনে হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে সোভিয়েত নেতৃত্ব থেকে ক্রুশ্চেভের অপসারণের পর সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন দুবার চীন সফরে গেলেও সম্পর্কের উন্নতি ঘটেনি। ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করে চীন। সত্তরের দশকে চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক

আরো অবনতির দিকে যায়। এই পর্বে চীন-মার্কিন সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং চীন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদকে আরো বড় শত্রু বলে চিহ্নিত করে। ১৯৭৬ সালে মাও-জে-দং-এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চীনের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েত বিরোধিতা।

শুধু মতাদর্শগত পার্থক্যই নয়, আরো অনেক বিষয় এই পর্যায়ে চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের অবনতির কারণ ছিল। প্রথমত ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সাহায্য দানের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে প্রায় তেত্রিশ কোটি ডলার ঋণ দিলেও চীন তাকে অপর্যাপ্ত বলে মনে করে। উপরন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ঋণশোধের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ শর্ত আরোপ করেছিল তা হল মাত্র ৪৩০ লক্ষ ডলার সাহায্য ব্যতীত অবশিষ্ট ঋণ চীনকে রপ্তানী বাণিজ্যের মাধ্যমে শোধ করতে হবে যা চীনের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অপরদিকে ক্রুশ্চেভ পূর্ব ইউরোপে রুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সেখানে পর্যাপ্ত সাহায্য পাঠান যা চীনকে ক্ষুব্ধ করে। এই পরিস্থিতিতে মাও-জে-দং রুশ সাহায্য ব্যতীতই চীনকে গড়ে তোলার জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের পরিকল্পনায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউন গঠনে তৎপর হন এবং তাঁর বিখ্যাত নীতি গ্রহণ করেন যা 'Policy of Great Leap Forward' নামে পরিচিত।

চীন-সোভিয়েত বাণিজ্যিক সম্পর্ক পঞ্চাশের দশকে বৃদ্ধি পেলেও সম্পর্কের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণও কমে যেতে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে চীন শুধু যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্যিক আদানপ্রদান হ্রাস করেছিল তা নয় পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গেও চীন বাণিজ্যিক আদানপ্রদান হ্রাস করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এর ফলে অভিযোগ জানায় যে চীনের উদ্দেশ্য হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করা। অপরদিকে চীন জানায় যে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য এর পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক হ্রাস করেছিল। কিন্তু মাও-জে-দং-এর নীতি চীনকে রুশ সাহায্য ছাড়াই আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছিল।

চীন-সোভিয়েত বিরোধের আর একটি কারণ ছিল সীমানা সংক্রান্ত সমস্যা। ১৯৬৩ সালে চীন ঘোষণা করে যে রাশিয়ার সঙ্গে জারের আমলের সীমানা বিষয়ক চুক্তিগুলি অসমান এবং সেগুলি অবিলম্বে রদ করা প্রয়োজন। চীনের এই দাবী সোভিয়েত নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করে। মাও-জে-দং-এর মতে চীনের পাঁচ লক্ষ আশি হাজার বর্গমাইল এলাকা সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। অপরদিকে ক্রুশ্চেভ জানান যে কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও সিনকিয়াং চীনের দ্বারা অধিকৃত হলেও সেখানে চীনা জনগণের বসবাস নেই। চীন-সোভিয়েত সীমান্ত সমস্যার কোন সমাধানও হয়নি।

সোভিয়েত নেতৃত্ব তথা ক্রুশ্চেভ চীনের যুদ্ধকামী মানসিকতা সমর্থন করেননি। পরিবর্তে তাঁরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী ছিলেন। এই কারণে চীনকে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপারে প্রাথমিক সাহায্য করলেও পর্যাপ্ত সাহায্য সোভিয়েত ইউনিয়ন করেনি। এর ফলে মাও-জে-দং অভিযোগ করেন যে চীনকে তৃতীয়শ্রেণির শক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্যই পরমাণুশক্তিধর সোভিয়েত ইউনিয়ন অপর বৃহৎ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে চীনকে পরমাণু অস্ত্র থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে। কিন্তু চীন মনে করত যে পারমাণবিক শক্তি ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল সম্ভব নয়। ফলে পারমাণবিক

অস্ত্রের উৎপাদন নিয়ে চীন-সোভিয়েত মতবিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। চীনা নেতৃত্ব একথা বলেন যে, পারমাণবিক শক্তিধর হওয়ার অর্থ এই নয় যে চীন যুদ্ধকামী। তবে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চীনকে প্রস্তুত থাকতে হবে। ১৯৬৪ সালে চীন পারমাণবিক অস্ত্রোৎপাদনে সাফল্য লাভ করে।

চীন-সোভিয়েত বিরোধের আর একটি কারণ ছিল সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে মতানৈক্য। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই নেতৃত্বের দাবীদার ছিল। কিন্তু জনসংখ্যা ও আয়তনে বিশালাকার চীন দাবী করে যে সংশোধনবাদী নীতি অনুসরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে দুর্বল করছে। যে রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা করে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণের অধিকার তার থাকতে পারে না। ষাটের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি চীনের এই মনোভাব পরিস্ফুট হয়। চীনের বক্তব্য ছিল সাম্যবাদী দুনিয়ার প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমান অধিকার রয়েছে। সুতরাং কোন একটি রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীন মতামতকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এই বক্তব্যের পিছনে চীনের অবশ্যই লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

উল্লেখযোগ্য যে, চীন-সোভিয়েত পারস্পরিক বিরোধিতার সুযোগে সত্তরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নে আগ্রহী হয়ে ওঠে। চীন-মার্কিন সম্পর্কের উন্নয়ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। তবে এ সত্বেও চীন তার স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখে।

গ. তৃতীয় পর্যায় (১৯৭৬-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ) ঃ

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পরিক সম্পর্কের যে তিক্ততা দেখা গিয়েছিল, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাও-জে-দং-এর মৃত্যুর পর থেকে সেই পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এ বছরই জানুয়ারী মাসে পরলোকগমন করেন চৌ-এন-লাই। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের গঠনের ক্ষেত্রে এই দুই ব্যক্তিত্বের অবদান ছিল অসামান্য। সত্তরের দশকের শেষের দিকে চীনে মাও-জে-দং-এর ধ্যানধারণার প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করে। কমিউনিস্ট দলের মধ্যেই একটি মাও বিরোধী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের ব্যর্থতা জনগণের কাছে শাসক দলকে অপ্রিয় করে তুলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জনপ্রিয়তা নষ্ট হচ্ছিল। ষাটের দশকের শুরুতে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মাও-এর 'Greal Leap Forward'–এর পাশাপাশি দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ মাও-এর নীতির ব্যর্থতা প্রমাণ করে। চীনের সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দেয়। চীনা নেতৃত্ব অনুভব করেন যে, ত্রুটিপূর্ণ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। চীনকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে এবং সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হলে মাও অনুসৃত নীতির পরিবর্তন আবশ্যক। মাও-এর মৃত্যুর পর তাঁরা চীনের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই সংশোধনের কাজে হাত দিলেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ অর্জনের পর চীনা নেতৃত্বের সামনে পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। চীনের অর্থনীতিকে উন্নত করার জন্য বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও প্রযুক্তিগত কলাকৌশল আমদানির প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের গোঁড়ামি বিসর্জন দিতে হবে। পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে চীনের পক্ষে বিচ্ছিন্ন

থেকে উন্নয়ন সম্ভব ছিল না ফলে, মাও-এর মৃত্যুর পর বহির্বিশ্বের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেও সম্পর্কের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণের পথ প্রশস্ত হয়।

সত্তরের দশকের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নও চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিবিধানে উৎসাহী হয়। কিন্তু ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ এবং কাম্পুচিয়ায় ভিয়েতনামের আগ্রাসন চীন সমর্থন করেনি। ফলে, উভয় দেশের সরকারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ-বৎসর দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। সোভিয়েত আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে চীন তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেনি। পরিবর্তে জাপান এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে চীন সোভিয়েত নেতৃত্বকে চিন্তায় ফেলে দেয়।

চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তনের স্রোত আসতে শুরু করে আশির দশকের শুরু থেকে। ১৯৮১ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট দলের ২৬তম সম্মেলনে চীনকে 'মহান সমাজতান্ত্রিক প্রতিবেশী' বলে অভিহিত করা হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান লিওনিদ ব্রেজনেভ চীন-সোভিয়েত পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও বিরোধ মীমাংসার জন্য উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুযায়ী ১৯৮২ সালে উভয়পক্ষের আলোচনা শুরু হয়। এই আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, উভয়দেশের সরকারী কর্মচারীদের সফর, পর্যটক ও ছাত্র বিনিময় শুরু হয়।

১৯৮৪ সালে রুশ-চীন সীমান্ত অঞ্চলে দুই দেশের সেনাবাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে উভয়দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে মস্কোয় আলোচনা হয়। আর্থিক, কারিগরী এবং বিজ্ঞান বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় এবং এই চুক্তিগুলি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে চীন-সোভিয়েত যুগ্ম কমিশন গঠন করা হয়। লিওনিদ ব্রেজনেভের শেষকৃত্যে চীনা বিদেশ মন্ত্রী হুয়াং হুয়ার অংশগ্রহণ ও সোভিয়েত উপপ্রধান মন্ত্রী আরখিপভের চীন সফর উভয় দেশের সম্পর্কের উন্নয়নের ইঙ্গিতবাহী ছিল। কিন্তু এর মধ্যে কয়েকটি ঘটনা উভয় দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল।

১৯৮৪ সালেই চীন মঙ্গোলিয়া এবং আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহার এবং কাম্পুচিয়া-ভিয়েতনাম সংঘর্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার দাবী জানায়। ঐ বছর এপ্রিল মাসে চীন সফরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নের সমালোচনার প্রতিবাদে আরখিপভের চীন সফর বাতিল করা হয়। চীনা প্রধানমন্ত্রী ঝাও জিয়াং কর্তৃক মার্কিন-সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদের বিরোধিতা এবং উত্তর চীন সীমান্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক তৎপরতা উভয়দেশের সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিল। তবে উভয় দেশই চাইছিল সম্পর্ককে স্বাভাবিক করে তুলতে।

১৯৮৬ সালের ২০শে মার্চ সোভিয়েত ও চীনা উপপ্রধানমন্ত্রী আরখিপভ ও লি ফেঙ-এর মধ্যে বেজিং-এ বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্যের বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জুলাই-অগাস্ট মাসে মস্কোয় চীনের বাণিজ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সেপ্টেম্বরে রুশ পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান এন. তালিজিন-এর চীন সফর, বেজিং-এ সোভিয়েত শিল্প ও বাণিজ্য মেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও চীন-সোভিয়েত সীমান্তে উভয়পক্ষের সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

১৯৮৭ সালে উভয়দেশের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের আলোচনা শুরু হয় নিউইয়র্কে। কাম্পুচিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য বেজিং-এ সোভিয়েত

পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোগাচ্যভ ও চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিয়ান-জেং-পিং-এর মধ্যে আলোচনা হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান মিখাইল গরবাচভ উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি সাধনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। অপরদিকে চীনা নেতা দেং-জিয়াও-পিং চীন-সোভিয়েত শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করেন। সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে ১৯৮৮ সালে দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও সমস্যার বিশেষ সমাধান হয়নি। তবে উভয় দেশের শীর্ষনেতাদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডুয়ার্ড শেভার্দনাদজে চীন সফরে এসে চীনা প্রধানমন্ত্রী লি-পেং এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা দেং-জিয়াও-পিং-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে উভয় দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের পথে যে সমস্ত বাধাগুলি আছে অর্থাৎ আফগানিস্থানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উপস্থিতি, মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েত সেনা, চীন-সোভিয়েত সীমান্ত সমস্যা এবং কাম্পুচিয়ায় ভিয়েতনামের আগ্রাসন—এই সকল বিষয়ে আলোচনা হয়। এই সকল বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সম্ভব হয়। উল্লেখযোগ্য যে গরবাচভ ১৯৮৮ সালেই রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ঘোষণা করেছিলেন যে, চীন সীমান্ত থেকে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে। সেই অনুযায়ী পূর্বোক্ত আলোচনায় স্থির হয় যে, ১৯৮৯ থেকে তিন বছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই দেশের পূর্ব সীমান্ত থেকে দুই লক্ষ এবং দক্ষিণাংশ থেকে ষাট হাজার সৈন্য প্রত্যাহার করবে। মঙ্গোলিয়া থেকে তিন-চতুর্থাংশ সৈন্য করা হবে এবং ১৯৮৯ সালের ১৫ই ফ্রেব্রুয়ারীর মধ্যে আফগানিস্তান থেকেও সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেওয়া হবে। ১৯৮৯-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাম্পুচিয়া থেকে ভিয়েতনামের সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের বিষয়ে চীন-সোভিয়েত মতৈক্য হয়। স্থির হয় অন্য দেশের হস্তক্ষেপ ছাড়াই কাম্পুচিয়া জাতীয় পুনর্মিলন ও অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। ১৯৮৯-এর ১৫ই মে থেকে গরবাচভের চারদিনের চীন সফর ছিল দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর কোন সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধানের সফর। তাঁর আগে ১৯৫৯ সালে নিকিতা ক্রুশেভ চীন সফরে এসেছিলেন। গরবাচভ চীনা প্রধানমন্ত্রী লি-পেং, রাষ্ট্রপতি ইয়াং-সাংকুন, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ঝাও-জিয়াং এবং প্রধান চীনা নেতা দেং-জিয়াও-পিং-এর সঙ্গে আলোচনা করেন। স্থির হয় চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সুসম্পর্ক উভয় দেশের নাগরিকদের যেমন স্বার্থরক্ষা করবে তেমনি বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার সহায়ক হবে। দুটি দেশই পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব এবং ভৌমিক অখণ্ডতা রক্ষায় য-বান হবে। আগ্রাসন পরিহার করে একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই হবে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রধান ভিত্তি। পারস্পরিক সমস্যার সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ আলোচনার পদ্ধতিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই চীন-সোভিয়েত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা করা হবে। সমাজতান্ত্রিক বিকাশ ও সংস্কার বিষয়ে। উভয় দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যোগাযোগ ও মতামত বিনিময় করা হবে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার থেকে দুপক্ষই বিরত থাকবে। গরবাচভের এই চীন সফর এবং শীর্ষ বৈঠক দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর ফলে যেমন এক নতুন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল তেমনি সমাজতান্ত্রিক বিকাশ এবং সংস্কার সম্পর্কে মতামত বিনিময় ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক মতানৈক্য দূর করার পথ উন্মুক্ত হয়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে দুদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য উভয় দেশের যৌথ উদ্যোগে 'সাংহাই-লেলিনগ্রাড কোম্পানী লিমিটেড' স্থাপনের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানও বৃদ্ধি পায়। গরবাচভের সফর চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক-স্বাভাবিকীকরণের ক্ষেত্রে এক

উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল। এই পর্যায়ে দুই দেশের সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়েছিল একথা বলা না গেলেও ষাটের দশকে তাদের মধ্যে যে তিক্ততা ও বিরোধিতা ছিল, যাকে ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড ক্র্যাঙ্কশ New cold war বা 'নয়া ঠাণ্ডা লড়াই' নামে অভিহিত করেছিলেন তা নব্বই-এর দশকের শুরুতে অনেকটাই প্রশমিত হয়েছিল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রুশ রাষ্ট্রপতি বরিস ইয়েলেৎসিন-এর বেজিং সফর ও ১৯৯৪-এ চীনা রাষ্ট্রপ্রধান জিয়াং জেমিন ও ১৯৯৬-এ জীনা প্রধানমন্ত্রী লি পেং মস্কো সফর করেন। উভয়পক্ষের রাষ্ট্রপ্রধানদের পারস্পরিক সফর দুই দেশের মধ্যে আপাসের পথকে অনেকটাই প্রশস্ত করে দেয়। ১৯৯৭ সালে চীন রাশিয়া, কাজাখ্স্তান, তাজিকিস্তান ও কিরঘিড়ুতানের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করে।

প্রকৃতপক্ষে নব্বই-এর দশক থেকে বহু বিভক্ত প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ও শক্তি অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের অতিবৃহৎ শক্তির মর্যাদা তার ছিল না। ফলে ইয়েলেৎসিনের আমলে রাশিয়াকে অনেকটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। অপরদিকে চীন তার গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছিল। ফলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মতাদর্শগত সংঘাত গৌণ হয়ে পড়েছিল।

১.৯ ❑ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। মাও-জে-দং-এর নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক অলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বিশ্ব রাজনীতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

২। ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চীন-সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কের প্রকৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। চীনের কোন্ দলের নাম পরিবর্তন করে 'কুয়ো-মিন-তাং' রাখা হয়?

২। 'লং মার্চ' কি?

৩। কত খ্রিস্টাব্দে মাও-জে-দং-এর মৃত্যু হয়?

১.১০ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১। পিটার কালভোকোবেশি—ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স সিনস্ নাইনটিন ফরটি ফাইভ।

২। উইলিয়াম আর কেলর—এ ওয়ার্ল্ড অফ নেশনস : দি ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার সিনস্ নাইনটিন ফরটি ফাইভ।

৩। থেডা স্কোচপল—স্টেটস অ্যান্ড সোস্যাল রেভোলিউশনস্।

৪। সি. পি. ফিটজেরাল্ড—দি বার্থ অফ কমিউনিস্ট চায়না।

৫। এইচ. এম. ভিনাক—এ হিস্ট্রি অফ দ্য ফার ইস্ট ইন মডার্ন টাইমস।

একক ২ ❑ আমেরিকা ভূখণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা : কিউবা এবং চিলি

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ সূচনা
২.২ কিউবা
 ক. কিউবার প্রাক্-ইতিহাস
 খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে কিউবা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক
 গ. ফিদেল কাস্ত্রো এবং কিউবা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক
 ঘ. কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট : মার্কিন সোভিয়েত পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা
 ঙ. উপসংহার
২.৩ চিলি
 ক. চিলির প্রাক্-ইতিহাস
 খ. সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী চিলি
 গ. চিলিতে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা
 ঘ. সালভাদোর এলেন্দের অধীনে চিলি (১৯৭০-১৯৭৩ খ্রিঃ)
 ঙ. এলেন্দে-পরবর্তী চিলি।
২.৪ অনুশীলনী
২.৫ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ ❑ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককের উদ্দেশ্য হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের পটভূমিকায় পশ্চিম গোলার্ধ বা লাতিন আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তারের বিষয় আলোচনা করা। এই প্রসঙ্গে দুটি রাষ্ট্রের বিষয়ে আলোচনা করা। করা হবে। রাষ্ট্র দুটি হল কিউবা এবং চিলি।

২.১ ❑ সূচনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেমস্ মনরো বিখ্যাত 'মনরো নীতি'র (Monroe Doctrine) মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে না এবং অপর কোনো শক্তি কর্তৃক পশ্চিম গোলার্ধে হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং ১৯০৪-০৫-এর রুশ-জাপান যুদ্ধ ব্যতীত বিংশ শতাব্দীর সূচনা

পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ-বিরোধী পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করে চলে। উল্লেখযোগ্য যে, 'মনরো নীতি' মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ইউরোপীয় শক্তিগুলির আগ্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফ্রান্স, ইংলন্ড এবং জার্মানী দক্ষিণ আমেরিকায় অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের সক্রিয় প্রচেষ্টা চালায় এবং এখানকার অর্থনীতিকে ইউরোপীয় অর্থনীতি ও বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'মনরো নীতি' থেকে সরে আসতে হয়েছিল। এই পর্যায়ে অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তির বিস্তারের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে এবং লাতিন আমেরিকায় স্বীয় প্রভাব বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হয়। পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন নীতি হয়ে দাঁড়ায় আধিপত্যমূলক এবং হস্তক্ষেপধর্মী। পশ্চিম গোলার্ধের নিরাপত্তা রক্ষা এবং আমেরিকান সংহতির আদর্শের আড়ালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে সামরিক হস্তক্ষেপ এবং অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। মার্কিন আধিপত্য বিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে আমেরিকান ভূখণ্ডে এমন কোনো রাজনৈতিক শক্তির উত্থান সহ্য করতে রাজী ছিল না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। লাতিন আমেরিকায় এই প্রকার নীতির দুটি প্রধান উদাহরণ হল কিউবা এবং চিলিতে মার্কিন হস্তক্ষেপ নীতি।

২.১ ❑ কিউবা

ক. কিউবার প্রাক্-ইতিহাস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপ কিউবা। ১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলোম্বাস এই দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে এই দ্বীপরাষ্ট্র স্পেনের উপনিবেশে পরিণত হয়। স্পেনীয় শাসন দীর্ঘদিন কিউবাকে পরাধীন করে রেখেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কিউবায় স্পেনীয় অধীনতা থেকে মুক্তির জন্য বেশ কিছু গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল যদিও সেগুলি বিশেষ সাফল্য লাভ করেনি। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কিউবার জনগণের মানসিকতা থেকে অপসারিত হয়নি। কিউবায় স্পেনীয় ঔপনিবেশিক শাসন ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অযোগ্য। কিউবাকে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন দানে স্পেনের ব্যর্থতা, কিউবার জনগণের ওপর অত্যধিক করভার স্থাপন প্রভৃতি কিউবার প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের উদ্ভব ঘটায়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দশবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধে কোনো মীমাংসা অবশ্য হয়নি। ত্রিশের দশক থেকেই কিউবা ছিল বিশ্বের সর্বাধিক চিনি উৎপাদনকারী দেশ। প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল পশ্চিম কিউবার ধনী চিনি উৎপাদক গোষ্ঠী এবং কিউবার সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্রীতদাসগোষ্ঠীর সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের ঐক্য গড়ে ওঠেনি। এছাড়া দাসপ্রথা, পূর্ণস্বাধীনতা এবং কিউবায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য স্থাপনের প্রশ্নে তাদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্পেন এই দ্বীপরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ কিউবার জনগণ এবং জাতীয়তাবাদী নেতা আন্তনিয় ম্যাসিও তা মানতে অস্বীকার করেন।

১৮৯৫ সাল নাগাদ কিউবায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট চরমে ওঠে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে হোসে মার্তি নামক জনৈক কিউবান বিপ্লবী মুক্তিসংগ্রামের জন্য একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। ১৯১৫

খ্রিস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তাঁর নেতৃত্বে কিউবা স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য স্পেনীয় সরকার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করেন। বিদ্রোহের শুরুতেই হোসে মার্তি নিহত হলেও বিপ্লব থেমে থাকেনি। উভয়পক্ষেই বহু হতাহত হয় এবং বহু শহর ও এস্টেট অগ্নিদগ্ধ করা হয়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ এই পরিস্থিতিতে কিউবার বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এবং মার্কিন সরকার কিউবার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ম্যাকেনলি কিউবায় সক্রিয় হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কিউবার হাভানায় 'মেইন' নামক এক মার্কিন যুদ্ধজাহাজ নিমজ্জিত হলে স্পেনকে দায়ী করা হয় এবং মার্কিন নৌবাহিনীর উপাধ্যক্ষ থিয়োডোর রুজভেল্ট স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার দাবী করেন। ১৮৯৮ সালে ২৫শে এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শীঘ্রই ফিলিপাইন, গুয়াম এবং পুয়ের্তোরিকো দখল করে। অগাস্ট মাসে ওয়াশিংটনে একটি শান্তিচুক্তির মাধ্যমে দুইপক্ষের শত্রুতার অবসান ঘটে।

১৮৯৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্যারিসের চুক্তির মাধ্যমে কিউবার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। ১৮৯৯-এর ১লা জানুয়ারী কিউবা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলেও কিউবার ওপর মার্কিন প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিন সামরিক গভর্নর জেনারেল জন ব্রুক সরকার থেকে কিউবানদের অপসারণের চেষ্টা করেন। কিউবার সামরিক বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়। কিউবায় মার্কিন সামরিক আধিপত্য স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। বহু বিদ্যালয় স্থাপন, পথ ও সেতু নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে কিউবাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। হাভানাকে আধুনিক শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। এবং হাভানার বন্দরের উপর মার্কিন নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক আগ্রহ ছিল কিউবাকে মার্কিন অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া, এছাড়া রাজনীতি থেকে আফ্রো-কিউবানদের অপসারিত করা।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কিউবায় একটি প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়। এই সংবিধান অনুসারে মার্কিন পরিচালনায় কিউবায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তোমাস এস্ত্রাদা পালমা কিউবার প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ বছরেই প্লাট সংশোধনীর মাধ্যমে কিউবার আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকর্ম, অর্থনীতি এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অধিকার দেওয়া হয় এবং কিউবার গুয়ান্তানামো উপসাগরে একটি মার্কিন নৌকেন্দ্র স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়। বলা হয় কিউবার স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই কিউবায় মার্কিন অনুপ্রবেশ প্রয়োজন। কিউবায় মার্কিন হস্তক্ষেপের অবসান ঘটানোর জন্য কিউবার সংবিধানে ধারা সংযোজন করা হয়। কিউবার জনগণ মার্কিন হস্তক্ষেপকে তাদের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত বলে মনে করে যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯০৬ এবং ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র দুবার কিউবায় সামরিক হস্তক্ষেপ করেছিল। কার্যত স্পেনের অধীনতা মুক্ত হবার পর কিউবায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পিটার কালভোকোরেসির মতে এই পর্যায়ে কিউবা একধরনের ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সুযোগসুবিধা ভোগ করতে পারেনি।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তোমাস এস্ত্রাদা পালমার অধীনে কিউবায় একটি প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গঠিত হলেও মার্কিন প্রভাবের জন্য পালমাকে বিভিন্নধরনের অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। ১৯০৫ এবং

১৯০৬-এর নির্বাচনে পালমা তাঁর ক্ষমতা রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে কিউবায় উদারপন্থীদের বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এবং মার্কিন রণসচিব উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফট বিবাদের মীমাংসা করতে ব্যর্থ হন এবং এস্ত্রাদা পালমা পদত্যাগ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে চার্লস মাগুন কিউবার জাতীয় পতাকা ও সংবিধানের অধীনে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে থাকেন এবং ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী উদারপন্থী রাষ্ট্রপতি জোশ মিগুয়েল গোমেজের হাতে সরকারের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকেও কিউবা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করছিল। গোমেজের শাসনব্যবস্থা (১৯০৯-১৩) ছিল দুর্নীতিপূর্ণ এবং অপদার্থ। আফ্রো-কিউবানদের প্রতি এই সরকারের বিরূপ মনোভাব এভারিস্তো এস্তোনোজ এবং পেদ্রো ইভোনেৎ-এর নেতৃত্বে আফ্রো-কিউবান বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। তাদের দাবী ছিল আরো ভালো কর্মসংস্থান এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সরকারী বাহিনী এদের দমন করেছিল। কিউবার রাজনীতিতে দুর্নীতি এবং অবক্ষয় এক স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। কিউবার অর্থনীতি হয়ে পড়ে মার্কিন নিয়ন্ত্রিত। মার্কিন কোম্পানীগুলি কিউবার শিল্পগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এই শিল্পগুলির মধ্যে প্রধান ছিল চিনি, তামাক, বস্ত্র, লৌহ, নিকেল, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, কাগজ এবং রাম। এছাড়াও মার্কিন কোম্পানীগুলি কিউবার ভূমির অর্ধাংশ, রেলপথের তিন-পঞ্চমাংশ, সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং টেলিফোন ব্যবস্থার ওপর আধিপত্য স্থাপন করেছিল। কিউবার রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান বাজার ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই বাণিজ্যের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল চিনি। লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় কিউবা সমৃদ্ধিশালী হলেও চিনির বাণিজ্যের ওপরে সে ছিল বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল এবং দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। কিউবার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল বেকারত্ব। এই সমস্যার সমাধানের কোনো প্রচেষ্টা দেখা দেয়নি। দুর্নীতিপূর্ণ সরকারী অফিসারদের আর্থিক প্রাচুর্য সমাজে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। ১৯১৩ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত কিউবার অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ভোগ করে। এরপর মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের সময় 'Good Neighbour Policy' প্রচলিত হলে লাতিন আমেরিকার ওপর মার্কিন প্রভাব ও প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকে এবং পারস্পরিক মিত্রতা নীতি অনুসৃত হতে থাকে। কিউবায় মার্কিন হস্তক্ষেপের সমর্থনে যে প্লাট সংশোধনী গ্রহণ করা হয়েছিল তা ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বাতিল করা হয়।

খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে কিউবা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ঃ

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন সহায়তায় ফালজেনসিও বাতিস্তা কিউবায় ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। বাতিস্তা ছিলেন একজন সেনানায়ক। কিউবার রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে তিনি ১৯৩০-এর দশক থেকে ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন এবং কিউবার রাজনীতির অন্যতম নির্ণায়ক হয়ে ওঠেন এবং কিউবার রাজনীতির অন্যতম নির্ণায়ক হয়ে ওঠেন। বাতিস্তা প্রথম পর্যায়ে ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ক্ষমতা ভোগ করেন। এই পর্বে তিনি জাতিকে শক্তিশালী ও যোগ্য সরকার দান করেছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ, জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছিল কিউবায়।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে Rio-Pact বা The Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের আঞ্চলিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। স্বাক্ষরকারী দেশগুলির যে কোনো একটির বিরুদ্ধে আক্রমণ হলে সকলের বিরুদ্ধে আক্রমণ হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে এবং সেইভাবে সামরিক সাহায্য দান করা হবে—এই মর্মে চুক্তি করা হয়। কিউবা এই চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ ছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'চার্টার অফ দ্য অরগানাইজেশন অফ অ্যামেরিকান স্টেটস' (O.A.S) রিও প্যাক্টের শর্তাদি কার্যকরী করার জন্য রচিত হয়। এই সংগঠন তার সদস্যদের অর্থনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার জন্য গঠিত হয়েছিল। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সদস্য রাষ্ট্রগুলির ওপর কোনো বহির্রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা এবং লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি রক্ষা করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্র অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। ফলে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে ঠান্ডা লড়াইয়ের পটভূমিকায় এই অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষা করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিউবা O.A.S.-এর সদস্য রাষ্ট্র হওয়ার ফলে লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের মতো কিউবাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক নিরাপত্তার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল।

বাতিস্তা ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে অবসর নিয়ে ফ্লোরিডায় চলে যান এবং সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করেন। দীর্ঘ আটবছর পর আর একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবৈধভাবে কিউবার ক্ষমতা দখল করেন এবং একজন একনায়ক হিসেবে শাসনকার্য চালাতে শুরু করেন। এই পর্যায়ে তিনি মার্কিন সমর্থনে এক তীব্র স্বৈরাচারী শাসন জারি করেন। বাতিস্তা দেশে কোনো সংস্কার প্রবর্তনে উৎসাহী ছিলেন না। পরিবর্তে তাঁর বিরোধীদের কারারুদ্ধ করে সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে কিউবায় এক সন্ত্রাসের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রের স্বার্থ অপেক্ষা তাঁর নিজের এবং সহযোগীদের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষাই এই পর্যায়ে বাতিস্তার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিয়ন্ত্রণ, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, প্রকাশ্যে বিরোধী রাজনীতির নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি কিউবার জনগণের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। বাতিস্তার আমল যে শুধুমাত্র দুর্নীতিপূর্ণ ছিল তা নয়, প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল পাশবিক যার ফলে কিউবায় ধীরে ধীরে বাতিস্তাবিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। বাতিস্তা সরকারের অকর্মণ্যতা, অত্যাচার ও দুর্নীতি সরকারের সমর্থক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবও বিরূপ করে তোলে। ১৯৫৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার বাতিস্তা সরকারকে সামরিক সাহায্যদান বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল তা লাতিন আমেরিকার কোনো কোনো অংশে সাম্যবাদী প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছিল। কিউবাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বাতিস্তার অপশাসন কিউবায় গণ-অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। এক সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা জাগ্রত হচ্ছিল। এক্ষেত্রে নেতৃত্ব এসেছিল এক তরুণ আইনজীবি ফিদেল কাস্ত্রোর কাছ থেকে। ক্ষমতা লাভের পূর্বে একজন কমিউনিস্ট অপেক্ষা কাস্ত্রো ছিলেন অনেকটাই উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী। তাঁর লক্ষ্য ছিল কিউবা থেকে বাতিস্তার অপশাসন দূর করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিপ্লবী দল সংগঠনের কাজ শুরু করেন। ২৬শে জুলাই, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। কাস্ত্রোকে পনেরো

বছরের জন্য কারারুদ্ধ করার নির্দেশ জারি হলেও দু'বছর বাদে ১৯৫৫ খ্রিঃ তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি ও তাঁর ভাই রাউল মেক্সিকোতে গিয়ে বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। ফিদেল কাস্ত্রো মেক্সিকোতে একটি সুশৃঙ্খল গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। আর্জেন্টিনাজাত এরনেস্টো চে গুয়েভারা এসময়ে কাস্ত্রোর সঙ্গো যোগ দেন। কাস্ত্রো এবং গুয়েভারার গেরিলাবাহিনী শক্তি সঞ্চয় করার ফলে বাতিস্তা সরকার দিশেহারা হয়ে পড়েন। বিদ্রোহ দমনের জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কাস্ত্রো ১৯৫৬ সালে কিউবায় ফিরে বিদ্রোহ সংগঠন করতে থাকেন। কিউবার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমর্থন কাস্ত্রোর প্রতি দেখা যায়। বাতিস্তার দুর্বল সৈন্যবাহিনীর পক্ষে এই বিপ্লব প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয় না। সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সময় বাতিস্তা সরকারকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৯ সালে ১লা জানুয়ারী বাতিস্তা সরকারের পতন ঘটে এবং ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে নতুন বিপ্লবী সরকার কিউবায় যাত্রা শুরু করে। কাস্ত্রোর জয়লাভ ছিল কিউবার এক বৈপ্লবিক ঘটনা।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈপ্লবিক নেতা হিসেবে ফিদেল কাস্ত্রো নতুন অস্থায়ী সরকারের সৈন্যবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ হন। এই সরকারের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন ম্যানুয়েল উরুতিয়া যিনি ছিলেন একজন উদারপন্থী। ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে উরুতিয়াকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয় এবং ফিদেল কাস্ত্রো কিউবার রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করেন। কাস্ত্রোর ক্ষমতা লাভের পেছনে কিউবার জনগণের সমর্থন ছিল। কাস্ত্রো তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন করা, একটি সৎ শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন, রাজনৈতিক স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সংস্কার প্রবর্তনের। তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর কাস্ত্রো আরো উগ্র নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেন যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গো কিউবার মনোমালিন্য অনিবার্য করে তোলে।

গ. ফিদেল কাস্ত্রো এবং কিউবা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ফালজেনসিও বাতিস্তার অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে ফিদেল কাস্ত্রো কিউবায় ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতায় আসার পর কাস্ত্রো প্রথমদিকে মার্কিন বিরোধিতার কোনো পরিচয় দেননি। বাতিস্তার অপশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বিরোধী মনোভাবের সূচনা করেছিল। ফলে, ফিদেল কাস্ত্রো ক্ষমতায় আসার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তিনি একজন সংস্কারপন্থী শাসক হিসেবে সমর্থিত হয়েছিলেন। ১৯৫৯-এর এপ্রিল মাসে কাস্ত্রো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। এই সফরে তিনি দু-দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন এবং ঘোষণা করেন যে কিউবা 'প্যান-আমেরিকান ডিফেন্স প্যাক্টের' অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়া কিউবায় বৈদেশিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে না এবং বিদেশী বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাস্ত্রো বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি একথাও বলেন যে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার বক্তব্য উপলব্ধি করেছে।

লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় কিউবা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী ছিল। কিন্তু এর সবচেয়ে দুর্বল স্থান ছিল চিনি রপ্তানীর ওপর নির্ভরতা। আর তার চিনি রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র ছিল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর ফলে বৈদেশিক অর্থাগমের জন্যও কিউবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু কিউবায় কাস্ত্রোর বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সংস্কার প্রকল্প কিউবা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া ১৯৫৯-এর মে মাস থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিউবা ক্রমশই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে থাকে যা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উষ্মার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৫৯-এর জুন মাসে কাস্ত্রো কিউবায় কৃষি সংস্কার আইন জারি করেন। এই আইন অনুযায়ী মার্কিন মালিকানাধীন সমস্ত আখের ক্ষেত এবং চিনির কারখানা জাতীয়করণ করা হয়। এছাড়া এর ফলে কিউবায় মার্কিন চিনি উৎপাদনকারী কারখানাগুলি ১.৬ মিলিয়ন কৃষিজমির উপর তাদের অধিকার হারায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এজন্য কিউবার কাছে ক্ষতিপূরণের দাবী জানায়। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত বাণিজ্যমন্ত্রী মিকোয়ান হাভানায় আসেন এবং কিউবার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবাকে তেল রপ্তানী করবে এবং আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য প্রদান করবে। ঐ বছরেই কাস্ত্রোর সহযোগী চে গুয়েভারা পূর্ব ইউরোপ সফর করেন এবং কিউবা মস্কোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং কমিউনিস্ট বলয় থেকে অস্ত্র ক্রয় করতে শুরু করে। কিউবার তৈলশোধনাগারগুলি মার্কিন সমর্থক ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হওয়ায় সেগুলি রাশিয়া থেকে আমদানী করা তৈল শোধন করতে অস্বীকার করে। ফলে কাস্ত্রো ১৯৬০-এর জুলাই মাসে তৈলশোধনাগারগুলি জাতীয়করণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর প্রতিবাদ জানালে কিউবা এক আইনের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে কিউবায় অবস্থিত যে কোনো মার্কিন সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ ব্যতীতই বাজেয়াপ্ত করা যাবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে আইজেনহাওয়ার সরকার কিউবার প্রতি কড়া মনোভাব প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিউবা থেকে আমেরিকায় আমদানীকৃত চিনির পরিমাণ ৯৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়, অত্যাবশ্যক খাদ্যসামগ্রী এবং জীবনদায়ী ওষুধ ব্যতীত সমস্ত মার্কিন রপ্তানী বন্ধ করে দেওয়া হয়। এককথায় কিউবার সঙ্গে একধরনের বাণিজ্যিক বয়কট অনুসরণ করা হয় এবং ১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের এই অবনতি কিউবাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী করে তোলে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ৯ই জুলাই সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেছিলেন যে কিউবার জনগণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য যে সংগ্রাম চালাচ্ছে তা উল্লেখযোগ্য। এজন্য তারা রাশিয়ার সমর্থন পাবে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় হস্তক্ষেপ করতে চাইলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সামরিক শক্তি দ্বারা কিউবার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। প্রকৃতপক্ষে ক্রুশ্চেভ চেয়েছিলেন মার্কিন বলয়ে এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অধিকতর চাপ সৃষ্টি করা। অপরদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ারও ঘোষণা করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম গোলার্ধে সাম্যবাদ সমর্থিত কোনো শাসনব্যবস্থার উত্থান মেনে নেবে না। ১৯৬০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি চুক্তির মাধ্যমে কিউবাকে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দানের কথা ঘোষণা করে। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু কিউবা থেকে চিনি আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করে দিয়েছিল সেই কারণে কিউবার অর্থনীতি চাঙ্গা রাখার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবা থেকে প্রায় চার মিলিয়ন টন চিনি আমদানী করতে সম্মত হয়। পাশাপাশি কিউবাকে সামরিক সাহায্য দিতেও শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৬০

সালের সেপ্টেম্বরে ক্রুশ্চেভ এবং ফিদেল কাস্ত্রো উভয়ই রাষ্ট্রসঙ্ঘের বার্ষিক সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেছিলেন। সেই সম্মেলনে কাস্ত্রো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করেন যা মার্কিন-কিউবা সম্পর্ককে তিক্ত করে তোলে।

ফিদেল কাস্ত্রোর সম্মুখে সমস্যা ছিল যে ইতিপূর্বে কিউবার সরকার এবং প্রশাসন হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দারিদ্র ও বেকারত্ব পরিস্থিতিকে আরো সঙ্কটজনক করে তুলেছিল। কাস্ত্রোর নতুন সরকার নিষ্ঠার সঙ্গে এই সকল সমস্যার মোকাবিলায় উদ্যোগী হয়েছিল। কৃষিজমি রাষ্ট্রকর্তৃক অধিগৃহীত হয়েছিল এবং যৌথ খামারব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। কলকারখানা এবং ব্যবসাবাণিজ্যের জাতীয়করণ, চিনি উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করে চিনির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, চিকিৎসার সুযোগ এবং যোগাযোগ ব্যবহার উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের সাম্যের অধিকার এবং নারীর আরো বেশি অধিকার দান করা হয়। কাস্ত্রোর ব্যক্তিত্ব, উৎসাহ, এবং বাগ্মিতা জনমানসে প্রেরণার সঞ্চার করে। কিউবাকে এক নতুন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মার্কিন শোষণ ও আধিপত্যবাদের অবসান ঘটানো ছিল কাস্ত্রোর প্রধান লক্ষ্য। তাঁর মতে, লাতিন আমেরিকার স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলিকে মদত দিয়ে চলেছে মার্কিন প্রশাসন এবং সরকারের উত্থান-পতনের জন্য এই প্রশাসনই দায়ী। কাস্ত্রো তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।

পিটার কালভোকোরেসির মতে ১৯৬১ সালের শেষের দিকে ফিদেল কাস্ত্রো নিজেকে মার্কসবাদী ও কিউবাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। কিউবার কমিউনিস্ট দল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রথম দিকে কাস্ত্রোর ২৬শে জুলাই আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেনি। কিউবার কমিউনিস্ট দল বাতিস্তার আমলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। প্রথম তিন দশক ধরে কমিউনিস্ট দল স্টালিনের নীতি অনুসরণ করে এসেছিল এবং ১৯৪০ এবং ৫০-এর দশকে এই দলের অনেক সদস্যই বাতিস্তার আমলে সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট দল 'পিপলস সোস্যালিস্ট পার্টি' নামে পরিচিত হয়। ১৯৬১ সালে এটি কাস্ত্রোর বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে মিশে যায় যা ১৯৬২ সালে 'ইউনাইটেড পার্টি অফ দ্যা সোস্যালিস্ট রেভোলিউশন' নামে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৬৫ সালের ৫ই অক্টোবর এটি ভেঙে দেওয়া হয় এবং কিউবার 'কমিউনিস্ট পার্টি' নামে পরিচিত হয়। এই নতুন দলে ফিদেল কাস্ত্রো এবং তার ভাই রাউলের আধিপত্য বজায় থাকে। উল্লেখযোগ্য কিউবা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কমিউনিস্ট বিশ্বের একটি অংশ হয়ে উঠলেও কাস্ত্রো কখনই একজন গোঁড়া কমিউনিস্ট ছিলেন না। পিটার কালভোকোরেসির মতে মাও বা টিটোর মত অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনভাবে চলার পক্ষপাতী ছিলেন এবং যে আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা ছিল অংশত সাম্যবাদী।

ফিদেল কাস্ত্রোর মার্কিন বিরোধিতা এবং মার্কিন ভূখণ্ড থেকে মাত্র নব্বই মাইল দূরে কিউবার মত এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপস্থিতি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক এই রাষ্ট্রকে মদতদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চিন্তান্বিত করে তুলেছিল। এই কারণে, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধ থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র C.I.A.-র সহায়তায় কিউবায় একটি কাস্ত্রো-বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রচেষ্টায় রত ছিল। ১৯৬১

খ্রিস্টাব্দে নব নির্বাচিত মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি তাঁর পূর্বসূরীদের পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সচেষ্ট হন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কিউবার কমিউনিস্ট-বিরোধী দেশত্যাগীদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। উদ্দেশ্য ছিল তাদের মাধ্যমে কিউবায় কাস্ত্রো-বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটানো। এইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় দেশত্যাগী কিউবানদের নিয়ে এক রাজনৈতিক কমিটি গঠন করা হয়। মধ্য আমেরিকার গুয়াতেমালায় কমিউনিস্ট-বিরোধী কিউবানদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা C.I.A-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল এইসব সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলকে দিয়ে কিউবায় কাস্ত্রো-বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করা এবং প্রয়োজনে মার্কিন বিমানবাহিনী দিয়ে তাদের সহায়তা করা। কিউবায় অভিযান চালানোর জন্য নিউইয়র্কে 'কিউবান ন্যাশনাল রেভোলিউশনরি কাউন্সিল' নামে একটি ক্ষুদ্র সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার নেতা ছিলেন কিউবার ক্ষমতাচ্যুত অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী মিরো কারদোনা। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল ১৪০০ ব্যক্তির এক ক্ষুদ্র বাহিনী কিউবার 'বে অফ পিগস্'-এ অবতরণ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্কিন সাহায্য না পাওয়ায় সহজেই কাস্ত্রোর সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। বে অফ পিগস-এর ব্যর্থ অভিযান বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। অপরদিকে কাস্ত্রো সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে উদ্যোগী হন। বিশ্বের কমিউনিস্ট এবং অকমিউনিস্ট গোষ্ঠীর কাছ থেকেও কাস্ত্রো সমর্থন লাভ করতে থাকেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে 'আমেরিকা রাষ্ট্র সংঘে'র (Organization of American Sates বা O.A.S.) পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কিউবাকে O.A.S. থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভোটে লাতিন আমেরিকার ছয়টি প্রধান ও প্রভাবশালী রাষ্ট্র (আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, চিলি, ব্রাজিল, মেক্সিকো এবং ইকোয়েডর) ভোটদানে বিরত ছিল। এদের সঙ্গে আরও কয়েকটি রাষ্ট্রের অভিমত ছিল কিউবার ওপর কোনো কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া চলবে না। শুধুমাত্র কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে হওয়ার কারণেই কিউবার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপেরও বিরোধী ছিল লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র। এই ঘটনা প্রমাণ করেছিল যে লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের ওপর মার্কিন প্রভাব অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

ঘ. কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট ঃ মার্কিন-সোভিয়েত পরমাণু যুদ্ধের সম্ভবনা ঃ

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে বিশ্বরাজনীতি আলোড়িত হয়েছিল কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কটকে কেন্দ্র করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিউবার প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং আমেরিকান রাষ্ট্রসংঘ থেকে কিউবার বহিষ্কার ফিদেল কাস্ত্রোকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবাকে এক সুদক্ষ সেনাবাহিনী দ্বারা সাহায্য করতে সম্মত হয়। সেভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান নিকিতা ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি কিউবা-বিরোধী অভিযান চালায় তাহলে রুশ সৈন্যবাহিনীও কিউবার নিরাপত্তার জন্য প্রস্তুত থাকবে। চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬২ সালে কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র মিগ-২১, ২৮টি জেট আনবিক বোমারু বিমান সরবরাহ করে।

কিউবায় সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক গোপনে যে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি স্থাপন করা

হয়েছিল তা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে নির্দেশ করা। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলির পাল্লা ছিল দু'হাজার মাইল যার ফলে মধ্য ও পূর্ব আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি যেমন নিউইয়ার্ক, ওয়াশিংটন, শিকাগো এবং বোস্টন প্রভৃতি ক্ষেপনাস্ত্রের পাল্লার মধ্যে ছিল। এই ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি স্থাপন গোপনে করা হলেও ১৯৬২-র অক্টোবর মাস নাগাদ মার্কিন গুপ্তচরসংস্থা এর সংবাদ পায় এবং তা মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির কাছে পেশ করা হয়।

কিউবায় সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি স্থাপনের সংবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রপতি কেনেডি দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে আশঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এছাড়াও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে এই ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয় সমগ্র পশ্চিম গোলার্ধের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনা রুশ-মার্কিন সম্পর্ক তথা স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে তোলে এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিউবা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ওঠে যে ক্রুশ্চেভ কেন এই বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক নর্মান লোয়ীর মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি স্থাপনের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একই রকমের ধাক্কা দিতে চেয়েছিল যে ধাক্কা সোভিয়েত ইউনিয়ন পেয়েছিল তুরস্কে মার্কিন ক্ষেপনাস্ত্র বসানোর ফলে। ক্রুশ্চেভ তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামরিক ঘাঁটি দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছে। এখন তাদের বোঝার সময় এসেছে যে শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র নিজের দেশের প্রতি নির্দেশ করা থাকলে কি ধরনের অনুভূতি হতে পারে। সম্ভবত ক্রুশ্চেভ কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি স্থাপন করে পশ্চিমী জগতের সঙ্গে একটি দর কষাকষি করতে চেয়েছিলেন যাতে করে ইউরোপ থেকে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রের অপসারণ এবং বার্লিন থেকে পশ্চিমী শক্তির অপসারণকে সম্ভব করে তোলা যায়। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন মার্কিন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করেছিল যে কিউবায় স্থাপিত ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি এবং কিউবায় প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র আত্মরক্ষামূলক। এর পিছনে কোনো আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য নেই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের আশ্বাসবাণীতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আস্থা ছিল না। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে আসন্ন সংকট সম্পর্কে যে শুধুমাত্র আমেরিকাবাসীকে অবহিত করলেন তা নয় তিনি সমগ্র লাতিন আমেরিকাকেও এই পরিস্থিতির বিপদ সম্পর্কে অবহিত করলেন। কেনেডির সামরিক উপদেষ্টাগণ তাঁকে কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটির ওপর বিমান হানার পরামর্শ দিলেও কেনেডি এ বিষয়ে কিছুটা সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ২২শে অক্টোবর ১৯৬২-তে কেনেডি ঘোষণা করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র তল্লাসি করার জন্য কিউবার বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধের ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু কিউবায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য পরিবহণের ক্ষেত্রে কোনো বাধার সৃষ্টি করা হবে না। কেনেডি আরো ঘোষণা করেন যে কিউবায় ঘাঁটি প্রস্তুত করে পশ্চিম গোলার্ধের যে কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের সামিল। সুতরাং এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো ভাবেই নিশ্চুপ থাকতে পারে না। তবে কেনেডি কিউবায় সোভিয়েত সামরিক প্রস্তুতির ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করেন। সেই সঙ্গে ক্রুশ্চেভের প্রতি এই অনুরোধও জানান যাতে ক্ষমতা এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিবর্তে শান্তি, স্থিতাবস্থা রক্ষা এবং বিশ্বকে আসন্ন

পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হতে। কিউবা থেকে সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি অপসারণের ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করলেও পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়ে কিভাবে এই উদ্দেশ্য সাধন করা যায় তাই ছিল কেনেডির উদ্বেগের কারণ। যদিও কেনেডি ঘোষণা করেছিলেম কিউবা থেকে কোনো ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে দায়ী করবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর প্রতিআক্রমণে দ্বিধা করবে না। প্রকৃতপক্ষে এই সঙ্কটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য কিউবা ছিল না, ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। কেনেডি একথাও ভেবেছিলেন যে কিউবার ওপর আক্রমণ হানলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম ইউরোপে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির ওপর আঘাত জানতে পারে। এইসব কারণে সঙ্কট অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে।

পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নও সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রাখতে শুরু করে। ১৯৬২-র অক্টোবর মাসে প্রতিশ্রুতি মতো অস্ত্র সরবরাহের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের ২৫টি জাহাজ কিউবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব রবার্ট ম্যাকনামারা সোভিয়েত জাহাজের গতিরোধ করার জন্য কেনেডির কাছে নৌ-অবরোধের প্রস্তাব পেশ করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ন্যাটোর সদস্যদের কাছেও এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। এই পরিস্থিতিতে লাতিন আমেরিকাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেকে সমর্থন জানায়। ইতিমধ্যে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ সোভিয়েত ইউনিয়ানের অস্ত্রবাহী জাহাজের গতিরোধ করে (২৪শে অক্টোবর ১৯৬২)। রাষ্ট্রসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উ-থান্ট কেনেডি এবং ক্রুশ্চেভকে এই যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে নিরস্ত হবার অনুরোধ জানান। তবে অবরোধ ব্যবস্থা শুরু হলে ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী জাহাজগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবরোধ সীমার বাইরে ঘুরিয়ে দেয়। ২৫শে অক্টোবর মার্কিন নৌবাহিনী একটি সোভিয়েত তৈলবাহী জাহাজ এবং ২৬শে অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক কিউবায় প্রেরণ করা পণ্যবাহী লেবাননের একটি জাহাজ আটক করলেও শেষপর্যন্ত সেগুলিতে কোনো আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান না পেয়ে সেগুলিকে মুক্ত করে দেয়। যে কোনো মূহুর্তে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সম্ভাবনাময় এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব উথান্টের অনুরোধে ক্রুশ্চেভ প্রহরারত মার্কিন জাহাজের আশপাশ থেকে সকল সোভিয়েত জাহাজকে দূরে থাকার নির্দেশ দেন। ২৭শে অক্টোবর ক্রুশ্চেভ মার্কিন রাষ্ট্রপতি কেনেডির কাছে প্রস্তাব করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবা আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দিলে এবং নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র অপসারণ করবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও তুরস্ক থেকে ক্ষেপনাস্ত্র অপসারণের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। উভয় রাষ্ট্র প্রকৃতই ক্ষেপণাস্ত্র অপসারণ করছে কিনা তা রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধিগণ লক্ষ্য রাখবে। কিন্তু কেনেডি ক্রুশ্চেভের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং উল্লেখ করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখার পরেই আলোচনা সম্ভব। ক্রুশ্চেভ এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং ২৮শে অক্টোবর নিঃশর্তে কিউবা থেকে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র অপসারণের কথা ঘোষণা করা হয়। ২০শে নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার করে। এইভাবে ১৯৬২-র শেষার্ধে বিশ্ব এক পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়।

কিউবা সঙ্কটের এই পরিণামের প্রধান তাৎপর্য হচ্ছে এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, এই দুই বৃহৎ শক্তি পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে নিজেদের সংযত করেছিল।

সমসাময়িক স্নায়ুযুদ্ধের পটভূমিকায় এই সংযম ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক ক্র্যাবের মতে, লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ মার্কিন আধিপত্যবাদের প্রতি বিরূপ থাকলেও ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কটের কালে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল যা সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চাদপসরণের অন্যতম কারণ ছিল। যদিও ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কটের অবসানের পর লাতিন আমেরিকার অনেক দেশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে উৎসাহী ছিল না। তৃতীয়ত, এই সংকট প্রমাণ করেছিল যে পুরোনো পদ্ধতিতে যুদ্ধ বর্তমান কালে অচল। কারণ আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনো স্থানে আঘাত হানা সম্ভব। লাতিন আমেরিকায় সাম্যবাদ বা পূর্ব ইউরোপে মার্কিন অনুপ্রবেশ রোধ করার সমর্থ্য দুই বৃহৎ শক্তিরই আয়ত্তের বাইরে। চতুর্থত, এই ঘটনার পর রুশ-মার্কিন সম্পর্ক অনেকটাই সৌহার্দ্যমূলক হয়ে উঠতে শুরু করে। যার প্রমাণ, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে স্বাক্ষরিত আণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধকরণের জন্য চুক্তি সম্পাদন। ক্রুশ্চেভের সহাবস্থান নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রশংসিত হয়েছিল। তবে এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের যে প্রস্তাব রেখেছিল, শান্তিপূর্ব সহাবস্থানের লক্ষ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তা কিউবাকে মেনে নিতে বাধ্য করেছিল। যার অর্থ ছিল কিউবার সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত এবং কিউবাকে এক প্রকার অসহায় পরিস্থিতির সম্মুখে নিয়ে আসা। এজন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। কাস্ত্রো কিউবাকে অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছিলেন আর সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবাকে এক সশস্ত্র দাবার খুটি হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

ঙ. উপসংহার

ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কটের পর মার্কিন-কিউবা সম্পর্ক কিছুটা শীতল হয়ে পড়ে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান রাষ্ট্রসঙ্ঘ (O.A.S.) থেকে কিউবাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এর ফলে কিউবা আরও বেশি করে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যেহেতু কিউবার অর্থনীতি মূলত চিনি শিল্পের ওপর এবং বাজারে চিনির মূল্যের ওঠানামার ওপর নির্ভরশীল ছিল, সে কারণে চিনি রপ্তানির জন্য তার পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না। ফিদেল কাস্ত্রো অবশ্য তাঁর শাসনের প্রথম দশ বছরে এক দরিদ্র ও পশ্চাদ্পদ কিউবাকে নবজীবন দান করেছিলেন। কৃষিজমির রাষ্ট্রীয়করণ, যৌথ খামারব্যবস্থা প্রচলন, কলকারখানা জাতীয়করণ, চিনি উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কিউবার অর্থনীতি চাঙ্গা করে তোলার প্রচেষ্টা হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, পরিবহণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সংস্কার করা হয়। ফলে, সত্তরের দশক নাগাদ এই সকল ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় আরও অনেক বেশি মানুষ শিক্ষার আওতায় আসে, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দুর্নীতি ও বেকারত্ব হ্রাস পায়। পূর্বের তুলনায় সাম্য ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই সকল কারণে কিউবায় কাস্ত্রো সরকার জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তবে, অপরদিকে কিছু ব্যর্থতার দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না। শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা যথোপযুক্ত সাফল্য লাভ না করায় কিউবাকে চিনি উৎপাদনের ওপরই অধিক নির্ভর

করতে হয়েছিল। কিউবার অর্থনীতিও চিনি উৎপাদন, বিশ্ববাজারে চিনির মূল্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত প্রভাবাধীন দেশগুলির চিনি উৎপাদন ক্রয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। আশির দশকে চিনি ও তামাক উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, যা কিউবার অর্থনৈতিক সঙ্কটের সূত্রপাত করে। বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় এবং কিউবার বহু মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে থাকে। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কিউবা সোভিয়েত ইউনিয়নের মত এক শক্তিশালী মিত্রকে হারায় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একাকীত্বের শিকার হয়। এ সত্ত্বেও ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে কাস্ত্রো পুনরায় পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তী বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিল ক্লিন্টন প্রশাসন ফ্লোরিডায় নির্বাসিত কিউবানদের রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করে অবরোধ নীতি কিছুটা শিথিল করেন এবং কাস্ত্রো বাৎসরিক কুড়ি হাজার কিউবানকে দেশত্যাগের অনুমতি দেন। তাদের প্রায় সকলেই ফ্লোরিডায় তাদের স্বদেশীয়দের সঙ্গে যোগ দেয় যা কিউবার সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক-দশমাংশ ছিল। পরবর্তীকালে মার্কিন-কিউবা সম্পর্কের উন্নতি হয়েছিল একথা বলা না গেলেও ষাটের দশকের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। ফিদেল কাস্ত্রো দীর্ঘকালব্যাপী কিউবায় ক্ষমতাসীন থাকতে সক্ষম হন।

২.৩ ❑ চিলি

ক. চিলির প্রাক্-ইতিহাস

লাতিন আমেরিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী রাষ্ট্র চিলি। লাতিন আমেরিকায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যলাভের অন্যতম নিদর্শন এই দেশটি। চিলিতে সমাজতান্ত্রিক শাসন স্বল্পস্থায়ী হলেও তা ছিল উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়টি আলোচনার পূর্বে দেশটির পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে চিলিতে স্পেনীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। চিলিতে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভাই জোসেফ বোনাপার্ট স্পেনের সিংহাসন দখল করার ফলে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। চিলির স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে ১৮১০ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর সিংহাসনচ্যুত রাজা সপ্তম ফার্দিনাণ্ডের নামে একটি জাতীয় চক্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পর্যায়টি 'প্যাট্রিয়া ভিয়েজা' (পুরোনো প্রজাতন্ত্র) নামে পরিচিত। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্পেন চিলিতে তার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে যা চিলির ইতিহাসে 'একনকুইস্তা' বা 'পুনরধিকার' নামে পরিচিত। এই ঘটনা পরবর্তীকালে দীর্ঘ সংগ্রামের সূচনা করে। এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল জোস দ্য সান মার্টিন এবং তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন বার্নাডো ও'হিগিনস্। সান মার্টিন তাঁর অবিশ্বাস্য নেতৃত্বের মাধ্যমে আন্দিজ পর্বতের অপরপ্রান্তে অবস্থিত আর্জেন্টিনা থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসেন। এঁরা ছাড়াও অন্যান্য বৈপ্লবিক নেতারা ছিলেন ম্যানুয়েল রডরিক্স এবং নির্বাসিত ব্রিটিশ নৌসেনাধ্যক্ষ টমাস কোচরেন যিনি ১৮১৭ থেকে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চিলির নৌবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে চিলিকে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা দান করা হয় এবং চিলির ভূখণ্ডের সর্বশেষ অংশ চিলোয়ি স্পেনীয় শাসন থেকে মুক্ত হয় ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে।

চিলির স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বার্নাডো ও'হিগিনস্ চিলিতে একটি সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ওঁহিগিনস্ ক্ষমতায় ছিলেন ১৮১৮ থেকে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ে তাঁর নেতৃত্বে চিলির একটি নৌবাহিনী গড়ে ওঠে এবং তিনি তাঁর একনায়কতান্ত্রিক শাসনে চিলির সরকারের ক্ষমতা সংহত করেন। কিন্তু তাঁর অভিজাত ও যাজকবিরোধী নীতি তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস করে। তাঁর নীতির বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা দেখা দেয় এবং ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

পরবর্তী কয়েক বছর চিলিতে দুটি রাজনৈতিক দলের বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই দুটি দল হল রক্ষণশীল এবং উদারপন্থী। এরা উভয়েই ছিল একটি সঙ্কীর্ণ অভিজাততান্ত্রিক দল এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রক্ষণশীল দল একধরনের ঐতিহ্যিক ধর্মাশ্রয়ী কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিল। অপরপক্ষে উদারপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষ পার্লামেন্টীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমর্থক ছিল। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দুই দলের বিরোধ চিলিতে এক গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। শেষপর্যন্ত রক্ষণশীল নেতা দিয়েগো জোস ভিক্টর পোর্টালেস রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেন। পোর্টালেস ১৮৩০ থেকে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পরোক্ষভাবে একনায়ক হিসেবে দেশ শাসন করেন। তিনি যে রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই পর্যায়ে ম্যানুয়েল বুলনেস (১৮৪১-৫১) এবং ম্যানুয়েল মন্ট-এর (১৮৫১-৬১) শাসনে দেশে প্রশাসনিক সংস্কার এবং বৈষয়িক উন্নতি দেখা যায়। ১৮৬১ থেকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রক্ষণশীল দল উদারপন্থী দলের সঙ্গো ক্ষমতা ভাগ করে নিতে বাধ্য হয়। উদারপন্থী সংস্কারের মাধ্যমে রোমান ক্যাথালিক চার্চের এবং রাষ্ট্রপতির দপ্তরের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। এই পর্যায়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল চিলির সামরিক কৃতিত্ব। অরোকেনিয়া অধিকারের মাধ্যমে সান্তিয়াগো সরকার দক্ষিণ দিকে তার আধিপত্য বিস্তার করে। ১৮৮১ সালে আর্জেন্টিনার সঙ্গো একটি চুক্তির মাধ্যমে স্ট্রেট অফ ম্যাগেলানের ওপর চিলির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৯-১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পেরু এবং বলিভিয়ার সঙ্গো প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের মাধ্যমে চিলি উত্তর দিকে তার রাজ্যাংশ বৃদ্ধি করে। এই অঞ্চলের মূল্যবান নাইট্রেট ভাণ্ডারের ওপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জলপথে এবং স্থলপথে জয়লাভের পর ১৮৮১ সালে চিলির বাহিনী পেরুর রাজধানী লিমায় প্রবেশ করে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির মাধ্যমে পেরু তারাপাকা এবং বলিভিয়া আন্তোফাগাস্তা চিলিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৮৭০-এর দশকে কয়েকটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে চিলিতে চার্চের প্রভাব খর্ব করা হয় এবং চার্চের বেশ কিছু ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া হয়। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে জোস ম্যানুয়েল বালমাসেডা চিলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তাঁর অর্থনৈতিক নীতি প্রচলিত উদানৈতিক নীতিগুলিকে পরিবর্তিত করতে থাকে। তিনি ক্রমশ চিলিতে একটি একনায়কতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা শুরু করেন। তাঁকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের চেষ্টা শুরু হয়। জর্জ মন্ট তাঁর বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন যা শীঘ্রই ১৮৯১-এর গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। বালমাসেডা পরাজিত হয়ে আর্জেন্টিনায় পলায়ন করেন এবং সেখানে তিনি আত্মহত্যা করেন। জর্জ মন্ট চিলির নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

খ. সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী চিলি

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর চিলিতে পার্লামেন্টারী শাসনের যুগ শুরু হয়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে একটি সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে চিলিতে এই শাসনের অবসান ঘটে। চিলির ইতিহাসে এই যুগকে পার্লামেন্টারী প্রজাতন্ত্রের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। কারণ এই যুগে পুরাতন ১৮৩৩ সালের সংবিধানের ওপর ভিত্তি করে এক আধা-পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। প্রকৃত পার্লামেন্টারী প্রথার সঙ্গে এর পার্থক্য ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নাইট্রেট থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের ভিত্তিতে চিলির জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেও বিদ্রোহের বীজও একই সঙ্গে অঙ্কুরিত হয়েছিল। খনি শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক এবং কলকারখানার শ্রমিকরা এই সমৃদ্ধির অংশীদার না হওয়ায় পরিবর্তনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। যুদ্ধ পরবর্তীকালে চিলির শিল্প ও বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয় এবং দেশটি পুনরায় গৃহযুদ্ধের কিনারায় এসে দাঁড়ায়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণির জোট আর্তুরো আলেসান্দ্রি পালমা-কে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে। জনৈক ইতালীয় অভিবাসীর পুত্র পালমা ক্ষমতা লাভ করে একদিকে বামপন্থীদের পরিবর্তনের দাবি এবং অপরদিকে দক্ষিণপন্থীদের উদারনীতি বিরোধিতার সম্মুখীন হন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে একটি আকস্মিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হলেও পরের বছর আর একটি প্রতি-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আলেসান্দ্রি পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। আলেসান্দ্রির দ্বিতীয় শাসনের মেয়াদ ছিল মাত্র ছ'মাস কিন্তু তিনি এই সময়ের মধ্যে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন (১৮ই অক্টোবর ১৯২৫)। এই সংবিধানে একজন শক্তিশালী রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা রাখা হয় এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠনের কথা বলা হয়। আলেসান্দ্রি নির্বাচন পর্যন্ত প্রশাসন চালানোর অধিকার পান।

১৯২৬ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত সময়কাল ছিল চিলির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগ। কিন্তু ত্রিশের দশকের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা চিলিকে আঘাত করে তার খনিজ রপ্তানীর ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং বিশ্ববাজারের ওঠানামার জন্য। নাইট্রেটের বাজার ভেঙে পড়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চিলিতে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণির উত্থান এবং তাদের ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের স্বীকৃতির ফলে শ্রমিক শ্রেণি আরো শক্তিশালী হয়েছিল। এছাড়াও মার্কসবাদীরা দেশে একটি পরিপূর্ণ সামাজিক সংস্কারের কথা প্রচার করে আসছিল। প্রগতিবাদী এবং রক্ষণশীলদের মধ্যে সংঘাতের ফলে বেশ কিছু সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন করা হচ্ছিল তেমনি বলপূর্বক প্রগতিবাদী বিশেষত কমিউনিস্টদের দমন করার চেষ্টা হয়েছিল। আলেসান্দ্রির দ্বিতীয় শাসনকালে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হলেও তিনি দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রমিকশ্রেণিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৩৮ সাল নাগাদ চিলি অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ওঠে এবং নতুন সংবিধান অনুযায়ী ঐ বছরে চিলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮-এর নির্বাচনে একটি গণতান্ত্রিক বামপন্থী মোর্চা ('পপুলার ফ্রন্ট') সঙ্কীর্ণ ব্যবধানে জয়লাভ করে। প্রগতিবাদী নেতা পেদ্রো অগুইরি সেরদা চিলির রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। এই নির্বাচনে শ্রমিক শ্রেণি এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির অসন্তোষ প্রতিফলিত হয়েছিল। অগুইরি সেরদা মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি ছিলেন এবং যে 'পপুলার ফ্রন্টে'র সহায়তায় তিনি জয়লাভ করেছিলেন সেটি গঠিত ছিল প্রগতিবাদী, সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট দল নিয়ে। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বাম-প্রভাবিত শ্রমিকদের কনফেডারেশন। অগুইরি সেরদার উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'নিউ ডিল' পরিকল্পনা বিশেষ সাফল্য লাভ করেনি কারণ তিনি চিলির রাজনীতির এক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের

জানুয়ারী মাসে তাঁর সংযুক্ত মোর্চা আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঘে যায় এবং নভেম্বর মাসে অগুইরির মৃত্যু হয়। অগুইরির মৃত্যুর পর প্রগতিবাদী দলের জোয়ান আন্তোনিও রিয়োস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। চিলি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিল। ১৯৪৩ সালে চিলি অক্ষশক্তির সঙ্গো সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চিলিতে মুদ্রাস্ফীতি, দাঙ্গা, ধর্মঘট বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে রিয়োসের মৃত্যু হয় এবং একটি বিশেষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রগতিবাদী দলের গ্যাব্রিয়েল গঞ্জালেস ভিদেলা রাষ্ট্রপতি নির্বাচতি হন। এক্ষেত্রে তিনি কমিউনিস্টদের সমর্থন পান। ভিদেলার প্রথম মন্ত্রীসভায় কমিউনিস্ট মন্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সমসাময়িক স্নায়ুযুদ্ধ এবং চিলির অভ্যন্তরীণ সমস্যা শীঘ্রই ভিদেলাকে দক্ষিণপন্থীদের দিকে ঠেলে দেয়। ১৯৪৮ সালের পর তিনি কমিউনিস্ট দলকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। ভিদেলা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গোও সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। লাতিন আমেরিকার অন্য দেশগুলির তুলনায় চিলির পরিস্থিতি দীর্ঘদিনব্যাপী স্থিতিশীল থাকলেও এখন সেখানে রাজনৈতিক উত্তেজনা, হিংসা, ধর্মঘট বৃদ্ধি পায়। অগুইরি এবং রিয়োসের শাসনকালে শিল্পায়নের যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল তা সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি করেছিল কারণ শহরাঞ্চলগুলি বেকার গ্রাম্য শ্রমিকের দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। জীবনধারণের মান বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমজীবি শ্রেণির উগ্রপন্থাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। ভিদেলা উদারপন্থী দলের সমর্থনে শাসন চালাতে থাকেন।

১৯৩০-এর অর্থনৈতিক সঙ্কটের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গো চিলির যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তা আরো শক্তিশালী হয়। চিলিতে মার্কিন অর্থবিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রায়। প্রযুক্তিবিদ এবং অধ্যাপক বিনিময় দুই দেশের প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক সংযোগকে সুদৃঢ় করে। ভিদেলার শাসনকালে উদারপন্থীরা রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রগতিবাদী দলের রাষ্ট্রপতিগণ চিলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ সফল হননি। ১৯৪০ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চিলির জনসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তেষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছেছিল। বিশেষত শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও সামাজিক বৈষম্য বজায় ছিল। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মঘট দেখা দেয়।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে প্রাক্তন একনায়ক জেনারেল কার্লোস ইবানেজ দেল ক্যাম্পো জয়ী হন। তিনি বেশ কয়েক বছর পূর্ব থেকে ক্ষমতালাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। প্রগতিবাদী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে ভাঙনকে কাজে লাগিয়ে তিনি ভিদেলাকে পরাজিত করেন। প্রগতিবাদী দলের রাষ্ট্রপতিদের শাসনকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণি অভিজাত ভূস্বামীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায় আঘাত না করেও তাদের রাজনৈতিক গুরুত্বকে নিশ্চিত করেছিলেন। কিন্তু নিম্নবিত্ত শ্রেণি সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। ইবানেজ কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নয়, এক মিশ্র গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ছিলেন। ইবানেজ জনগণকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা গঠন করবেন এবং সম্ভব হলে পার্লামেন্টকে বাদ দিয়েই শাসন করবেন। কিন্তু তিনি তাঁর ছয় বছরের শাসনকালে (১৯৫২-১৯৫৮ খ্রিঃ) দক্ষিণপন্থীদের সমর্থনে প্রশাসন চালান যা তাঁকে যে কোনো সংস্কারপ্রচেষ্টায় বাধাদান করেছিল। প্রগতিবাদী মন্ত্রিসভা অর্থনীতি ও শিল্পের ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের

যে নীতি নিয়েছিল ইবানেজ তা অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৯৫৮ সাল নাগাদ চিলিতে জীবনধারণের মান বৃদ্ধি পায় এবং চিলির বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়। বিভিন্ন কারণে ১৯৫৮-র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ তীব্র হয়ে ওঠে।

১৯৫৮-র নির্বাচনে রক্ষণশীল ও উদারপন্থী দলের সমর্থনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জর্জ আলেসান্দ্রি রডরিগজ (পূর্বতন রাষ্ট্রপতি আলেসান্দ্রি পালমাব পুত্র)। এই নির্বাচনে সমাজতান্ত্রিক দলের সালভাদোর এলেন্দে গোসেনস তাঁর নিজ দল ও সদ্য বৈধতা প্রাপ্ত কমিউনিস্ট দলের সমর্থনে ২৯% ভোট পান এবং এডুয়ার্ডো ফ্রেই মন্টালভা নব গঠিত 'ক্রীশ্চান ডেমোক্রাটিক' দলের প্রার্থী হিসেবে ২০% ভোট লাভ করেন। দেশের পরিকাঠামোকে আমূল পরিবর্তন না করে জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্য আলেসান্দ্রি কতগুলি সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি একটি দশশালা উন্নয়ন পরিকল্পনা নেন। বেকার সমস্যার সমাধান, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস (বছরে ৬০-৭০%), কর সংস্কার, কৃষি সংস্কার ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলেসান্দ্রি সরকার কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির ব্যাপারে কঠোরতা জারী করেন। ১৯৬০ সালের সুনামি ও ভূমিকম্প আলেসান্দ্রির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ চিলির জনসংখ্যা এবং সম্পদের ওপর তীব্র আঘাত সৃষ্টি করেছিল। আলেসান্দ্রি বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কিউবার সঙ্গো কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ১৯৬৪ সাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গো পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করেন।

গ. চিলিতে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা ঃ

লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের তুলনায় চিলির সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটাই স্থিতিশীল ছিল। ১৮৯১-এর বিদ্রোহের পর অভিজাত ভূস্বামীরা তাদের ক্ষমতা হারায় এবং চিলি অনেকটা গণতান্ত্রিকতার দিকে এগিয়ে যায়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে 'পপুলার ফ্রন্ট' ক্ষমতা অর্জন করে, যাদের মধ্যে কমিউনিস্টরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি, সামাজিক অসাম্য এবং অস্থিরতা চিলিতে বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলে। ষাটের দশকে গণ-অসন্তোষ চিলিতে মার্কসবাদ-অনুপ্রাণিত সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট দলের পুনরুত্থানে সাহায্য করে। এই সময় চিলিতে তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর উপস্থিতি ছিল। এগুলি হল ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে নবগঠিত 'ক্রীশ্চান ডেমোক্র্যাটিক দল'। ১৯৫৮-র নির্বাচনে এই দলের প্রার্থী এডুয়া ফ্রেই মন্টালভা কুড়ি শতাংশ ভোট পান। এই দলের উদ্ভব ঘটেছিল চিলির রক্ষণশীল দলের একাংশের দলত্যাগের মাধ্যমে। এছাড়া ছিল 'ইউনাইটেড পপুলার' নামক বামপন্থী মোর্চা, যেটি কমিউনিস্ট, সমাজতান্ত্রিক, প্রগতিবাদী বা র‍্যাডিক্যাল এবং সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল এবং তৃতীয়টি ছিল জাতীয়তাবাদী দল যা উদারপন্থী এবং রক্ষণশীল দলের যৌথ মোর্চা ছিল। কমিউনিস্ট দল সমাজতান্ত্রিক দলের সঙ্গো জোটবদ্ধভাবে শান্তিপূর্ণভাবেই তাদের শক্তি অনেকটা বাড়িয়ে তুলেছিল এবং অমার্কসবাদীদের সঙ্গো জোটবদ্ধ হওয়ার ধারণাকে খারিজ করে দিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি আলেসান্দ্রি রডরিগজের শাসনকালে দক্ষিণপন্থী দলগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ক্রীশ্চান ডেমোক্রেটিক দল এবং মার্কসবাদী দলগুলির মধ্যে একটি ব্যাপারে ঐক্যমত ছিল যে তারা উভয়েই পুরোনো অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অভিজাততন্ত্র

ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল এবং কৃষিক্ষেত্রে আরো সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে চিলিকে এক উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল।

১৯৬৪ সালের নির্বাচনে ক্রীশ্চান ডেমোক্রেটিক দলের এডুয়ার্ডো ফ্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে জয়ী হন। ফ্রেই সামাজিক সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে ফ্রেই-এর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সমাজতান্ত্রিক দলের সালভাদোর এলেন্দে। নির্বাচনে সমাজতান্ত্রিক দলের জয়লাভের সম্ভাবনা থাকায় তদানীন্তন মার্কিন সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন রিচার্ড নিক্সন। মার্কিন সরকার এবং সি. আই. এ.-র পক্ষ থেকে চিলির ক্রীশ্চান ডেমোক্রেটিক দলকে বিপুল অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ফ্রেই চিলির নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

চিলিতে এডুয়ার্ডো ফ্রেই-এর শাসনকাল ছিল ১৯৬৪-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ফ্রেই সরকার চিলিতে বহুবিধ সংস্কারের প্রচেষ্টা করেন। ফ্রেই গভীর উদ্যমের সঙ্গে কাজ শুরু করেন ক্ষমতালাভের পর। মুদ্রাস্ফীতি ৩৮ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে নেমে আসে। ধনী নাগরিকগণকে কর প্রদানে বাধ্য করা হয়। বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি করা হয় এবং সীমিত অর্থে ভূমিসংস্কার চালু হয়। ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করা হয়। চিলির প্রধান সম্পদ তামার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। চিলিতে অবস্থিত মার্কিন তামা কোম্পানীগুলির একান্ন শতাংশ অংশীদারত্ব রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে। এর দ্বারা প্রাপ্ত আয় থেকে শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়। ব্যাপক কৃষিসংস্কারের পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষিজ পণ্য আমদানির পরিমাণ হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ফ্রেই। মার্কিন সরকার ফ্রেই-এর সংস্কার পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য বিপুল অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়।

ফ্রেই-এর শাসনের প্রথম কয়েক বছর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রভূত সমর্থন লাভ করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশকে সরকারের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জনের জন্য। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট দলের সমর্থনে কৃষিসংস্কার আইন পাশ করা হয় যা সরকারকে পতিত জমি অধিগ্রহণের অধিকার দান করে। এই সঙ্গে প্রত্যেক জমি মালিক কর্তৃক জমি সংরক্ষণের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়। সেইসকল জমিতে কৃষি সমবায় স্থাপনের কথা বলা হয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষকদের উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষি-সংস্কারের কাজ কিছুটা মন্থর গতিতে শুরু হলেও ১৯৭০ সাল নাগাদ ৫০ লক্ষ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়।

ফ্রেই-সরকারের সংস্কারমুখী পরিকল্পনা দরিদ্র জনগণকে রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা পালনে উৎসাহ জোগায়। এই শ্রেণির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কমিউনিস্ট এবং সমাজতান্ত্রিক দলের সহায়ক হয়। ১৯৬৯ সালে বামপন্থী দলগুলি 'ইউনাইটেড পপুলার' নামে একটি মোর্চা গঠন করে এবং সালভাদোর এলেন্দে গোসেনস্ নামক এক সমাজতান্ত্রিক মার্কসবাদী চিকিৎসককে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাদের প্রার্থী মনোনীত করে। বামপন্থীদের বক্তব্য ছিল ফ্রেই সরকারের ভূমিসংস্কার নীতি বেশি সাবধানী এবং তারা চিলির প্রধান রপ্তানী দ্রব্য তামাশিল্পের সম্পূর্ণ জাতীয়করণ দাবী করেছিল। অপরদিকে দক্ষিণপন্থীরা মনে করছিলেন যে ফ্রেই সরকার সংস্কারের ক্ষেত্রে যথেষ্টই অগ্রসর হয়েছে। ১৯৬৯ সালে চিলিতে

ব্যাপক অনাবৃষ্টি হয় ফলে চিলির এক-তৃতীয়াংশ ফসল নষ্ট হয়। বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য আমদানী করতে হয় যা মুদ্রাস্ফীতিকে বর্ধিত করে। বর্ধিত বেতনের দাবীতে খনিশ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু হয় এবং সরকারী বাহিনীর দ্বারা বেশকিছু খনিশ্রমিক নিহত হন। ১৯৭০ সালে নির্বাচনী প্রচারের সময় এলেন্দে প্রচার করেন যে ফ্রেই সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় দেয় প্রতিশ্রুতি পালনে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। এলেন্দের সংযুক্ত মোর্চা বিরোধী দলগুলির তুলনায় অনেক ভালো নির্বাচনী প্রচার চালায় এবং বহু মানুষ তাদের সমর্থকে পরিণত হয়। এলেন্দের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি এই প্রচারের সহায়ক হয়। তিনি কখনই একজন উগ্র বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়াও সাম্যবাদ জয়যুক্ত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে চিলিতে সমাজতান্ত্রিক দলের জয়লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন সরকার চিলিতে সমাজতান্ত্রিক দলের জয় প্রতিরোধের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। চিলির সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে বিপুল অর্থসাহায্য দেওয়া হয় কিন্তু শেষপর্যন্ত বিরোধী শিবির বিভক্ত হয়ে যাবার জন্য ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সালভাদোর এলেন্দে জয়লাভ করেন। এলেন্দের জয়লাভের ফলে লাতিন আমেরিকার কোনো দেশে প্রথম একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। এই দিক থেকে চিলির ইতিহাসে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সালভাদোর এলেন্দের ক্ষমতালাভ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ঘ. সালভাদোর এলেন্দের অধীনে চিলি (১৯৭০-৭৩) ঃ

চিলির ইতিহাসে সালভাদোর এলেন্দের জয়লাভ চিলিতে সমাজতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭০-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রধানত তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এঁরা হলেন জর্জ আলেসান্দ্রি, রাদোমিরো টোমিক এবং সালভাদোর এলেন্দে। এঁদের মধ্যে সালভাদোর এলেন্দে সমগ্র ভোটের ৩৬.৫%, আলেসান্দ্রি ৩৫.২% এবং টোমিক ২৮% ভোট পান। ০.৩% ব্যালট পেপার প্রতিবাদ হিসাবে ফাঁকা ছিল। যেহেতু কোনো প্রার্থীই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেননি তাই সংবিধান অনুযায়ী দুই প্রধান প্রার্থীর মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দায় বর্তেছিল চিলির কংগ্রেসের ওপর। এক্ষেত্রে ক্রীশ্চান ডেমোক্রেটিক দল এলেন্দেকে সমর্থন করায় পশ্চিম গোলার্ধে এই প্রথম এক মার্কসবাদী মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করলেন।

সালভাদোর এলেন্দে সরকার চিলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয় এবং বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে। একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, এক নতুন বামপন্থী সংবিধান এবং কিউবা, চীন এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হয়। কিন্তু নবগঠিত সরকার প্রভূত সমস্যার সম্মুখীন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এ সময় চিলিতে মুদ্রাস্ফীতি ত্রিশ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। বেকারত্ব বাড়ে কুড়ি শতাংশ এবং শিল্পক্ষেত্রে একধরনের স্থবিরতা দেখা দেয়। দেশে নব্বই শতাংশ জনগোষ্ঠী এতটাই দারিদ্রের মধ্যে বাস করে যে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অর্ধেকের মৃত্যু হয় অপুষ্টিজনিত কারণে।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে শাসনভার গ্রহণের পর এলেন্দে তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করার ব্যাপারে তৎপর হন। এলেন্দে বিশ্বাস করতেন যে, আয়ের পুনর্বণ্টন দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করবে। অর্থনীতির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে চিলির তামার খনিগুলি সম্পূর্ণরূপে জাতীয়করণ করা হয়। কয়লা এবং ইস্পাত শিল্পগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। বিদেশি ব্যাঙ্ক সহ দেশের পঞ্চাশ শতাংশ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে আনা হয়। এই সকল শিল্প ও ব্যাঙ্কের মধ্যে অধিকাংশ ছিল মার্কিন মালিকানাধীন। এরা দীর্ঘকালব্যাপী চিলি থেকে প্রভূত অর্থ আয় করার ফলে এই সকল শিল্প ও ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার জন্য কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না বলে এলেন্দে ঘোষণা করেন। এর পাশাপাশি এলেন্দে চিলিতে আয়ের পুনর্বণ্টন প্রথা চালু করেন। বেতন বৃদ্ধি এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এলেন্দের শাসনের প্রথম বছরে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। জনগোষ্ঠীর দরিদ্র অংশের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। ফ্রেই-এর আমলে জমির পুনর্বন্টন প্রথাকে আরো গতিশীল করা হয়। সেনাবাহিনীর বেতনও বৃদ্ধি করা হয়। বৈদেশিক ক্ষেত্রে এলেন্দে সরকার ফিদেল কাস্ত্রোর কিউবা, চীন এবং পূর্ব জার্মানীর মতো সাম্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গো কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

এলেন্দে সরকারের এই সকল পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। মার্কিন ভূখণ্ডে চিলির মতো একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উত্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুনজরে দেখেনি। এলেন্দে সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিলিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিল। আর এখন মার্কিন শিল্প ও ব্যাঙ্কগুলি জাতীয়করণ করার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মার্কিন বাণিজ্যিকমহল মার্কিন সরকারকে চিলির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এই চাপের ফলে মার্কিন সরকার চিলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবরোধ নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে। চিলিতে মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। শুধু তাই নয় সরকারী এবং বেসরকারী ঋণদানের ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে চিলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবিত বিশ্বব্যাঙ্ক, ইন্টার আমেরিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক ইত্যাদি থেকে ঋণ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়। মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা 'সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি' বা সি. আই. এ-এর পক্ষ থেকে চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি এলেন্দেকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টাও শুরু হয়। গোপনে চিলিতে ধর্মঘট এবং অস্থিরতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়া হতে থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা এবং অসহযোগিতা সত্ত্বেও এলেন্দে তাঁর সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন। দেশে কৃষিজমি অধিগ্রহণ এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে তা পুনর্বণ্টনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কলকারখানার শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবরোধ চিলিতে পুনরায় মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে। ১৯৭৩ সালের প্রথমার্ধে প্রায় ১৫০ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি, পণ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি চিলিতে সামাজিক সঙ্কট সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে বামপন্থীদলের উগ্র সমর্থকবৃন্দ দেশে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দাবী জানাতে থাকে। কিন্তু এলেন্দের মতো সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধী ব্যক্তি দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্র আনার লক্ষে স্থির থাকেন।

উপরি-উক্ত পরিস্থিতির সঙ্গো আরো কিছু বিষয় যুক্ত হয়ে এলেন্দে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা বৃদ্ধি করে। দেশে যে জমির পুনর্বন্টন প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছিল তা কৃষি উৎপাদনে একধরনের অধোগতি নিয়ে আসে। কারণ যে সকল কৃষকের জমি অধিগ্রহণের কথা ঘোষণা করা হয় তারা জমিতে কৃষিকাজ

বন্ধ করে দেয় এবং তাদের গবাদি পশুগুলিকে হত্যা করে। এর ফলে দেশে খাদ্যসঙ্কট এবং আরো মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন এবং সরকার শিক্ষা, বাসস্থান, সমাজসেবা ইত্যাদি সামাজিক সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসঙ্কটে পড়ে। তামার খনির জাতীয়করণের বিষয়টি আরো হতাশাজনক হয়েছিল। কারণ বর্ধিত বেতনের জন্য শ্রমিকদের দীর্ঘ ধর্মঘট উৎপাদন ব্যাহত করে। বিশ্ববাজারে তামার মূল্য হঠাৎ প্রায় ত্রিশ শতাংশ কমে যাওয়ায় সরকারী রাজস্বে ঘাটতি দেখা দেয়। চিলির কমিউনিস্টদের একাংশ দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য কিউবার ফিদেল কাস্ত্রোর মত আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। ফলে তাঁরা এলেন্দের সাবধানী সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠেন। রাজনৈতিক দিক থেকে এলেন্দে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। 'পপুলার ইউনিটি' জোটকে ঐক্যবন্ধ রাখা তাঁর পক্ষে সমস্যাসঙ্কুল হয়ে ওঠে। উগ্র বামপন্থীদের সন্তুষ্ট করা এবং দলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মোকাবিলা করা ব্যতীত পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা সম্ভব ছিল না। 'পপুলার ইউনিটি' জোটে সর্ববৃহৎ দল ছিল সমাজতান্ত্রিক দল। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও এই দলটি এলেন্দেকে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করে চলেছিল। 'পপুলার ইউনিটি' জোটের বাইরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বামপন্থী গোষ্ঠী ছিল 'মুভমেন্ট অফ দ্য রেভোলিউশনরি লেফট' বা MIR• এই গোষ্ঠী ক্ষুদ্র হলেও এরা কিউবার বিপ্লবের অনুরাগী ছিল এবং আরও দ্রুত কৃষক ও শ্রমিকের সম্পত্তি ও বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া নিজেদের হাতে গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দল ছিল খ্রীশ্চান ডেমোক্র্যাটিক দল। এরা 'জাতীয় দল' এবং সম্পত্তিভোগী শ্রেণির সঙ্গে যৌথভাবে একটি এলেন্দে বিরোধী গোষ্ঠী গঠন করেছিল। এছাড়াও কয়েকটি আধা-ফ্যাসিবাদী দলের অস্তিত্ব ছিল।

'পপুলার ইউনিটি' সরকার আপাতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল। কিউবা, চীন, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম ও আলবানিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় চিলি সোভিয়েত সাহায্য লাভ করেছিল। অবশ্য কিউবাকে দেওয়া সোভিয়েত সাহায্যের তুলনায় তার পরিমাণ অনেক কম ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সময় চিলির প্রতি এক প্রকার দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করেছিল। তামার খনি জাতীয়করণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিলির সম্পর্ক শীতল হলেও তা সরাসরি শত্রুভাবাপন্ন ছিল না। তবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিলির প্রতি নানাবিধ অর্থনৈতিক অবরোধ জারি এবং গোপনে চিলিতে এলেন্দে-বিরোধী অভ্যুত্থানে মদত দিয়ে আসছিল।

এলেন্দের শাসনকালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে দেশে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ হ্রাস পায়। অর্থনীতি সঙ্কটের মুখে পড়ে। নতুন বিনিয়োগ এবং বিদেশী মুদ্রাভাণ্ডার হ্রাস পায়। মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারী প্রবল হয়ে ওঠে। ঘাটতি পূরণ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণপন্থী জোট কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এলেন্দে সরকারের সকল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বিভিন্ন বিষয়ে মন্ত্রীসভাকে নাস্তানাবুদ করতে থাকে। শাসনব্যবস্থাকে অবৈধ এবং অসাংবিধানিক বলে প্রচার করতে থাকে।

এলেন্দে মন্ত্রীসভাকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন কিন্তু কোনো মন্ত্রীসভাই শৃঙ্খলা স্থাপন করতে সক্ষম হয় না। এমনকি ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রীমণ্ডলীতে

সামরিক অফিসারদের নিয়োগ করা সত্ত্বেও বিরোধিতার অবসান হয়নি। পরিবর্তে এই ঘটনা সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিকীকরণে সহায়তা করে। সরকারের বাইরে এলেন্দের সমর্থকগণ জমি এবং ব্যবসা অধিগ্রহণের কাজ অব্যাহত রাখার ফলে অর্থনীতি আরো বিপর্যস্ত হয় এবং জমির মালিক সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ১৯৭৩ সালের মার্চে চিলির কংগ্রেসের নির্বাচনে এলেন্দেকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার জন্য বিরোধীদের প্রচেষ্টা স্বল্প ভোটের ব্যবধানে ব্যর্থ হয়। এরপর দুপক্ষের মধ্যে সংঘাত আরো বৃদ্ধি পায়। বিরোধীপক্ষ সামরিক বাহিনীর সাহায্যে সমাধানের আশা করতে থাকে। এলেন্দের পদত্যাগ অথবা সামরিক হস্তক্ষেপের দাবীতে তারা সোচ্চার হয়ে ওঠে। অপরদিকে সামরিক বাহিনীর মধ্যেও একধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। আপসরফার ক্ষেত্রে ক্যাথলিক চার্চের প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইতিমধ্যে দেশে বাৎসরিক মুদ্রাস্ফীতির হার ৫০০ শতাংশ অতিক্রম করে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে চিলির অর্থনীতি এবং সরকার প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়ে। ১৯৭৩-এর অগাস্ট মাসে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান অবমাননার অভিযোগ আনা হয়।

চিলির সংবিধান অনুযায়ী দেশের রাষ্ট্রপতির দ্বিতীয়বার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার ছিল না। বিরোধীপক্ষের আশঙ্কা হয় যে, এলেন্দে সংবিধান পরিবর্তনের পরিকল্পনা করতে পারেন এবং দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে পিছিয়ে দিতে পারেন। এই আশঙ্কা থেকে বিরোধী গোষ্ঠীগুলি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এলেন্দে কোনো বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেই তারা সক্রিয় হয়ে উঠতে চায়। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও খুব স্বাভাবিক কারণে এলেন্দের নীতির বিরোধী ছিল। দেশের দক্ষিণপন্থীরা সর্বাত্মক ধর্মঘটে সফল হয় এবং সেনাবাহিনীর সমর্থন লাভ করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মার্কিন সহযোগিতা। লাতিন আমেরিকায় সাম্যবাদের প্রসার প্রতিরোধ করা তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিলির সৈন্যবাহিনীর একাংশ এলেন্দে সরকারের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভুত্থান ঘটায়। নৌবাহিনীর একাংশ চিলির প্রধান বন্দর ভ্যালপ্রাইসো দখল করে। বিদ্রোহী সেনাদের আর এক অংশ চিলির রাজধানী সান্তিয়াগো-তে রাষ্ট্রপতির বাসভবন আক্রমণ করে। এলেন্দেকে তাঁর প্রাসাদে গুলিবিদ্ধ ও মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সরকারীভাবে তাঁর আত্মহত্যা করার কথা প্রচার করা হলেও ধারণা করা হয় যে, তিনি সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছিলেন। এলেন্দের মৃত্যুর সঙ্গে চিলিতে সমাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে। মার্কিন মদতে চিলিতে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটে এবং দেশে মার্কিন সমর্থিত সামরিক শাসন জারি করা হয়। জেনারেল অগুস্তো পিনোশে চিলির ক্ষমতা লাভ করেন। চিলিতে সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতন প্রমাণ করে যে পশ্চিম গোলার্ধে মার্কিন আধিপত্য বা প্রভাব বিস্তারের প্রতিবন্ধক কোনো শক্তির উত্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না।

চিলিতে সালভাদোর এলেন্দের পতনের কারণ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। বিশেষত এলেন্দে কেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষা করতে বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন না এ বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। বামপন্থী সমালোচকগণ এলেন্দের পতনের জন্য সংস্কারের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পথ অবলম্বন করাকে দায়ী করেন যা দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছিল। সংস্কারের সীমা সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় এই প্রক্রিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে শঙ্কিত করে তুলেছিল এবং বিরোধীপক্ষের হাত শক্ত করেছিল। দক্ষিণপন্থী সমালোচকগণ 'পপুলার ইউনিটি' সরকার এবং মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র উভয়কেই অর্থনীতি ধ্বংস করার জন্য দায়ী করেছেন। এছাড়া উগ্র বামপন্থীদের চরমপন্থাও এলেন্দে সরকারের পতনের জন্য দায়ী বলে মনে করেন সাধারণ পর্যবেক্ষকগণ। একথাও বলা হয় যে একজন সংখ্যালঘু রাষ্ট্রপতি যাঁকে দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে উগ্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁর পক্ষে একই সঙ্গো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতন্ত্র স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। সামরিক বাহিনী তাদের অভ্যুত্থানকে এইভাবে যৌক্তিকতা দেবার চেষ্টা করেছিল যে মার্কসবাদ অপসারণের জন্য, শ্রেণিযুদ্ধ এড়ানোর জন্য এবং শৃঙ্খলা স্থাপন ও অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্য এই অভ্যুত্থান প্রয়োজনীয় ছিল।

ঙ. এলেন্দে-পরবর্তী চিলি

চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে সালভাদোর এলেন্দের পতনের পর সামরিক নেতা জেনারেল অগুস্ত পিনোশে উগার্তে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেন এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। চিলির ষোল বছরের সামরিক শাসনের (১৯৭৩-১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ) সময় শুধুমাত্র যে দেশ থেকে মার্কসবাদের অপসারণের চেষ্টা করা হয়, তা নয়, সর্বপ্রকার বামপন্থা, শ্রমিক সংগঠন, সংস্কার প্রচেষ্টা সব কিছুরই বিরোধিতা করা হয়। সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয় চিলির অর্থনীতির বেসরকারীকরণকে, যে অর্থনীতি গত তিন দশক ধরে রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এলেন্দের আমলে এই প্রক্রিয়া আরও গতিলাভ করেছিল। এর ফলে বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ আকৃষ্ট হতে থাকেন।

প্রথমদিকে সামরিক শাসন চিলির অভিজাত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশ এবং দক্ষিণপন্থীদের সমর্থন লাভ করে। ক্রীশ্চান ডেমোক্র্যাট সহ নরমপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সমর্থনের কারণ ছিল যে, তাদের আশা ছিল এই একনায়কতন্ত্র দেশে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী স্থিতাবস্থার পরিস্থিতিতে উত্তরণে সহায়তা করবে। তবে শীঘ্রই তাদের মেনে নিতে হয় যে, ক্ষমতাসীন সামরিক নেতৃত্বের নিজস্ব রাজনৈতিক লক্ষ্য রয়েছে। তা হল সকল প্রকার বামপন্থী এবং কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তিকে দমন করা। ক্রীশ্চান জেমোক্র্যাট, জাতীয় দল, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল প্রভৃতিকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করা হয়। কমিউনিস্ট, সমাজতান্ত্রিক এবং প্রগতিবাদী দলকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চিলির ঐতিহ্যিক দলগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। ফলে দেশে বিরোধীপক্ষের তেমন কোনো অস্তিত্ব থাকে না। মানবিক ও নাগরিক অধিকারগুলি হরণ করা হয়। বামপন্থীদের ওপর একধরনের সন্ত্রাসের শাসন চালানো হয়। অসংখ্য মানুষকে কারারুদ্ধ, অত্যাচার, হত্যা বা নির্বাসিত করা হয়।

ক্ষমতালাভের পরবর্তী কয়েক বছর সামরিক চক্র চিলির ওপর কঠোর শাসন প্রবর্তন করে। চিলি কার্যত একটি পুলিশী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন সংবিধান জারি করে রাষ্ট্রপতি হিসেবে পিনোশের মেয়াদ আরও আট বছর বর্ধিত করা হয়। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে পিনোশে আরও আট বছরের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার অধিকার লাভ করেন। ১৯৭০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং মানবাধিকার রক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি চিলির পরিস্থিতির নিন্দাবাদে মুখর হয়ে ওঠে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ সরকারীভাবে নিরপেক্ষ হলেও তার এই ভূমিকা সামরিক চক্রের সঙ্গো সংঘাত বৃদ্ধি করে। 'পপুলার ইউনিটি' ফ্রন্টের সদস্যরা

হয় আত্মগোপন করেন অথবা নির্বাসনে চলে যান। সামরিক শাসনের প্রথম বছরগুলিতে তাঁরে একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় আত্মরক্ষা। কমিউনিস্টরা যদিও সবচেয়ে পাশবিক পরিস্থিতির শিকার হন, তা সত্ত্বেও তাঁদের সংগঠনকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সত্তরের দশকের শেষে সমাজতান্ত্রিক দল প্রায় অন্তর্হিত হয়ে যায়। মার্কসবাদীদের পক্ষে প্রতি আক্রমণের বিশেষ সুযোগ থাকে না। ফলে তারা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত জাগ্রত করার ও কূটনৈতিক দিক থেকে এই শাসনকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ক্রীশ্চান ডেমোক্র্যাটরাও সামরিক শাসনের বিরোধী হয়ে ওঠে। পিনোশে চিলিতে একনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার পাশাপাশি সামরিক বাহিনীরও সর্বময় ক্ষমতা তাঁর হাতে থাকে।

পিনোশের অর্থনৈতিক নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ এবং মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন। এ সময় দেশের আর্থিক বিকাশ আশানুরূপ হয়নি। জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি পায়। আর্ন্তজাতিক বাজারে তামার মূল্য হ্রাস পায় এবং চিলিতে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দেশে তীব্র সরকার বিরোধী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ক্রীশ্চান ডেমোক্র্যাট সহ বিরোধী দলগুলি 'ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স' নামে এক বিরোধী মোর্চা গঠন করে। ১৯৮৩-র পর থেকে বামপন্থী গোষ্ঠীগুলিও তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকে। রোমান ক্যাথলিক চার্চও প্রকাশ্যে বিরোধীদের সমর্থন করতে থাকে। ১৯৮৪ সালে এগারোটি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে ১৯৮৯-এর পূর্বেই নির্বাচনের দাবী জানায়। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পিনোশেকে হত্যার এক ব্যর্থ চেষ্টা হয়। এর পর থেকে পিনোশে তাঁর দমননীতি আরও শক্তিশালী করেন।

চিলিতে সামরিক শাসনের প্রথম কয়েক বছরে চিলির প্রতি মার্কিন সাহায্য ও ঋণের পরিমাণ অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষত মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন এবং জেরাল্ড ফোর্ডের আমলে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের আমলে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ওয়াশিংটনে পিনোশের গোপন পুলিশের দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত চিলির প্রাক্তন রাষ্ট্রদূতের হত্যা দুই দেশের সম্পর্ক তিক্ত করে। আশির দশকে চিলিতে পিনোশের সন্ত্রাসবাদী শাসন এবং দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পিনোশের অনীহা, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রভৃতি ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্র যারা চিলিকে অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়েছে, তাদের বিরক্ত করে তোলে। পিনোশে শেষ পর্যন্ত ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে চিলিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক জোটের প্রার্থী ক্রীশ্চান ডেমোক্র্যাট দলের প্যাট্রিসিও আইলউইন জয়লাভ করেন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি শাসনক্ষমতা লাভ করেন। এই নির্বাচন চিলিতে গণতন্ত্রের জয় ঘোষণা করলেও চিলি সামরিক বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টির অধীনেই থেকে যায়। কারণ পিনোশে রাষ্ট্রপতির পদ হারালেও সামরিক বাহিনীর প্রধান হিসেবে ক্ষমতা ধরে রাখেন। আইলউইন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা নরমপন্থী সংস্কার প্রবর্তন করেন এবং একটি কমিশন নিয়োগ করেন যার উপর পিনোশের আমলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সামরিক শাসনের আমলে দু'হাজার পঁচানব্বইটি হত্যাকাণ্ড এবং এক হাজার একশ দুটি অন্তর্ধানের ঘটনা কমিশন লিপিবদ্ধ করলেও আরো যে অসংখ্য মানুষকে কারারুদ্ধ, অত্যাচার ও নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল তা ধরা হয়নি। সামরিক আমলের এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো পদক্ষেপও নেওয়া

যায়নি কারণ আইলউইনের শাসনব্যবস্থা সামরিক আমলে পাশ হওয়া সংবিধান দ্বারা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছিল। পিনোশে তাঁর সুবিধা মত সংবিধান সংশোধন করেছিলেন। সেই সংবিধানে আটজন যাবজ্জীবন সিনেটর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার পেয়েছিলেন। আটজন সিনেটর সামরিক বাহিনীর সমর্থক হওয়ায় সিনেটে গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা বা সংবিধান পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। সুপ্রিমকোর্টেও যে সমস্ত বিচারক ছিলেন তাঁদের অনেকেই পূর্ববর্তী সামরিক শাসনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

১৯৯৩-এর নির্বাচনে ক্রীশ্চান ডেমোক্রাট দলের এডুয়ার্ডো ফ্রেই রুইজ-তাগল রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতি এডুয়ার্ডো ফ্রেই মন্টালভার পুত্র। তাঁর আমলে নব্বই-এর দশকের শুরুতে চিলিতে অর্থনৈতিক সংস্কার বলবৎ থাকে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলির বেসরকারীকরণের প্রতি জোর দেওয়া হয়। বিদেশী বিনিয়োগের সংরক্ষণ এবং উদার বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করা হয়। তামার ক্ষেত্রে চিলি বিশ্বের প্রথম সারির উৎপাদক এবং রপ্তানীকারক দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯৯৮ সালে পিনোশে সামরিক বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করলেও যাবজ্জীবন সিনেটর পদে অধিষ্ঠিত হন। সরকার এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা যথারীতি বহাল থাকে। ১৯৯৮ সালের অক্টোবরে পিনোশে অস্ত্রোপচারের জন্য লণ্ডনে গেলে স্পেনের অনুরোধে ব্রিটিশ পুলিস পিনোশেকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে স্পেনে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অপহরণ ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিচারের কথা বলা হয়। চিলি, ইংলন্ড এবং স্পেনের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠতে থাকে। চিলিতেও সামরিক বাহিনী এবং সরকারের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়। ২০০০ সালের মার্চ মাসে অসুস্থতার কারণে পিনোশেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি চিলিতে ফিরে এলে তাঁকে সত্তরটি ফৌজদারী অপরাধে অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং যাবজ্জীবন সিনেটর পদ থেকে তাঁর অপসারণের চেষ্টা করা হয়। অসুস্থতার কারণে তাঁকে বিচারে উপস্থিত হওয়া থেকে চিলির আদালত রেহাই দিলেও তাঁকে সিনেট থেকে এবং রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়। ২০০০ সালের জানুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হন রিকার্ডো লাগোস এস্কোবার। সালভাদোর এলেন্দের পর তিনিই প্রথম সমাজতান্ত্রিক হিসেবে রাষ্ট্রপতি পদ লাভ করেন।

২.৪ ❑ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট আলোচনা করে দেখান যে কিভাবে এই সঙ্কট রুশ-মার্কিন পরমাণু সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল।

২। চিলিতে সালভাদোর এলেন্দের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করুন। এই সরকারের পতনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কি ছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফিদেল কাস্ত্রো সরকারের সঙ্গো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাতের কারণ কি?

২। সালভাদোর এলেন্দের পতনের পর থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি হিসেবে চিলিতে রিকার্ডো লাগোস এস্কোবারের নির্বাচন পর্যন্ত ইতিহাস সংক্ষেপ লিখুন।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। ফিদেল কাস্ত্রো কত খ্রিস্টাব্দে কিউবায় ক্ষমতালাভ করেন?

২। কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কটের সময় রুশ রাষ্ট্রপ্রধান কে ছিলেন?

৩। চিলিতে কার নেতৃত্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হয়?

২.২৫ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১। পিটার কালভোকোরেসি, ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স সিন্স নাইনটিন ফরটি ফাইভ।

২। উইলিয়াম আর কেলর, এ ওয়ার্ল্ড অফ নেশনস : দি ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার সিনস্ নাইনটিন ফরটি ফাইভ।

৩। জে. ক্র্যাব—নেশনস্ অফ মালটিপোলার ওয়ার্ল্ড।

একক ৩ ❑ আফ্রিকায় উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন : আলজিরিয়া ও কঙ্গো

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ সূচনা
৩.২ আলজিরিয়া
- ক. আলজিরিয়ায় ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা
- খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আলজিরিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন
- গ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আলজিরিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন
- ঘ. আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৯৫৪-১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ)
- ঙ. স্বাধীনতা-পরবর্তী আলজিরিয়া

৩.৩ কঙ্গো
- ক. কঙ্গোর স্বাধীনতা লাভ
- খ. কঙ্গো সঙ্কট

৩.৪ অনুশীলনী
৩.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ ❑ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককের উদ্দেশ্য হল একদা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' হিসেবে পরিচিত আফ্রিকায় উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন এবং তজ্জনিত সঙ্কটের আলোচনা করা। এখানে আফ্রিকা মহাদেশের দুটি রাষ্ট্রের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এই দুটি রাষ্ট্র হল আলজিরিয়া এবং কঙ্গো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই দুটি রাষ্ট্রে যথাক্রমে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই এককে আলজিরিয়া ও কঙ্গোর ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তি ও তৎপরবর্তী সমস্যাবলী ও সঙ্কট আলোচিত হবে।

৩.১ ❑ সূচনা

সমগ্র বিশ্বের প্রায় এক পঞ্চমাংশ ভূভাগ আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত। এই মহাদেশটি প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। ইউরোপের অতি নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক পর্যন্ত ইউরোপীয়দের কাছে আফ্রিকার বৃহদংশ অনাবিষ্কৃত এবং অজ্ঞাত থেকে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এটি পরিচিত ছিল 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' (Dark continent) নামে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শুধুমাত্র সাহারার উত্তরে আলজিরিয়া ফরাসীদের এবং দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ ও ট্রান্সভালে ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। তিউনিস এবং ত্রিপোলী তুরস্ক সাম্রাজ্যের শাসনাধীন ছিল এবং মিশরে তুরস্কের নামমাত্র অধিকার ছিল।

এগুলি ব্যতীত আফ্রিকা মহাদেশের বাকি অংশ ইউরোপীয়দের কাছে প্রধানত অজ্ঞাত ছিল।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ডেভিড লিভিংস্টোন, এইচ. এম. স্ট্যানলী, জন স্পেক, রিচার্ড বার্টন প্রমুখ অভিযাত্রী এবং ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টায় আফ্রিকা ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য জগতের কাছে উন্মুক্ত হয়। আফ্রিকার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিভিন্ন সম্ভাবনা পশ্চিমী শক্তিবর্গকে আফ্রিকা সম্পর্কে উৎসাহিত করে তোলে। তারা এই মহাদেশটির বিভিন্ন অংশ নিজেদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে আগ্রহী হয়। শুরু হয় আফ্রিকায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা এবং পারস্পরিক স্বার্থসংঘাতের বহিঃপ্রকাশ। যার ফলশ্রুতি আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে অতি দ্রুত ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ আফ্রিকাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। শুরু হয় আফ্রিকার সম্পদ লুণ্ঠন, আফ্রিকাবাসীর প্রতি শোষণ ও অত্যাচার এবং ক্রীতদাস হিসেবে আফ্রিকানদের ব্যবহার। আফ্রিকানরা এর বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে প্রতিবাদে সরব হলেও ইউরোপীয়দের উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের সম্মুখে তাদের প্রতিবাদ ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল। আফ্রিকায় যে সমস্ত দেশ প্রধানত উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং আফ্রিকাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল সেগুলি হল ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, স্পেন, পর্তুগাল, জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি। দেখা যায় যে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার এক-দশমাংশ অঞ্চলে ইউরোপীয় ঔপনিবেশ ছিল কিন্তু ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে অল্প কিছু অঞ্চল ছাড়া প্রায় সমগ্র আফ্রিকা ইউরোপীয় উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপীয় দেশগুলি আফ্রিকার উপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভোগ করেছিল কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আফ্রিকার দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আফ্রিকার জাতীয়তাবাদে গতি সঞ্চার করেছিল। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকার বহু মানুষ শিক্ষা লাভ করতে থাকে এবং নিজেদের জাতিগত বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন হয়। শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ মানুষের ওপর শোষণের হাতিয়ার হিসেবে তারা ঔপনিবেশিকতাবাদকে বিচার করতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকার দেশগুলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অবসান সূচিত করে। বর্তমান এককে আফ্রিকার দুটি দেশের আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এগুলি হল আলজিরিয়া এবং কঙ্গো।

৩.২ ❑ আলজিরিয়া

ক. আলজিরিয়ায় ফরাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা :

উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র আলজিরিয়া। উনবিংশ শতাব্দীতে এখানে ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তারও পূর্বে এটি অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামী সভ্যতা বিস্তারের প্রথম যুগে ইসলামী-আরবী সভ্যতার পশ্চিম সীমান্তকে 'মাগরিব' অঞ্চল বলে অভিহিত করা হত। আধুনিক যুগে 'মাগরিব' অঞ্চল বলতে উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশগুলি অর্থাৎ আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া এবং মরক্কোকে একত্রে অভিহিত করা হয়। যাদের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ উপনিবেশ ছিল আলজিরিয়া। প্রায় দেড়শ বছরের কাছাকাছি এখানে ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ফ্রান্স আলজিরিয়া আক্রমণ করে। সেখানকার প্রাদেশিক শাসক হুসেইন স্বল্প সামরিক সংঘাতের পর ফরাসীদের দাবি মেনে নির্বাসনে চলে যান এবং ফরাসী বাহিনী আলজিয়ার্সের আশপাশের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে, গৃহাদি এবং ধর্মীয় স্থানগুলি দখল করে, দেশের বিশাল পতিত জমির ওপরও তাদের দখল কায়েম হয়। এইভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের এক স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ হিসেবে তিন শতাব্দী ব্যাপী আলজিরিয়ার ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফরাসী সরকারের আশা ছিল যে, বিদেশে এই ধরনের কিছু দ্রুত জয়লাভ দেশে সরকারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করবে। কিন্তু আলজিরিয়ায় ফরাসী অধিকার স্থাপনের পরেই জুলাই বিপ্লবের ফলে ফরাসী সম্রাট দশম চার্লস লুই ফিলিপকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। উল্লেখযোগ্য যে, এই সময় ফরাসীদের অধিকারে আলজিয়ার্সের পার্শ্ববর্তী এক ক্ষুদ্র অঞ্চল ছিল। কারণ, এখানকার প্রাক্তন শাসক হুসেইন নিজেই প্রদেশে তাঁর অধীনস্থদের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন। পূর্বদিকের কনস্টানটাইন শহর পরবর্তী সাত বছর ধরে ফরাসী আক্রমণ প্রতিরোধ করে। পশ্চিম দিকে ফরাসীরা মাস্কারার শক্তিশালী শাসক আব্দেল কাদেরের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ১৮৩৯ সালে আব্দেল কাদের ক্রীশ্চান অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। দীর্ঘ সংঘাতের পর শেষপর্যন্ত ১৮৪৭ সালে তিনি ফরাসীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে পরবর্তীকালে তাঁকে পরিবারসহ সিরিয়ার দামাস্কাসে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। সেখানে ১৮৬০ সালের দাঙ্গার সময় আব্দেল কাদের ও তার অনুগামীরা বহু ক্রীশ্চানের প্রাণরক্ষা করেন। আব্দেল কাদের বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে আলজিরিয়ার জাতীয় প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। আলজিরিয়ার এক বৃহৎ অংশ ফরাসী অধিকারে আসার পর ফরাসী সরকার সেখানে উপনিবেশ বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু করেন। সেদেশে ইউরোপীয়দের বসবাসে উৎসাহ দেওয়া হয়। ১৮৮০-র দশকের মধ্যে আলজিরিয়ায় ইউরোপীয় জনসংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ অতিক্রম করে। অর্ধ শতাব্দী পরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। একই সময়ে আলজিরিয়ায় মুসলিম জনসংখ্যাও তিন লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে নয় লক্ষে পৌঁছে যায়। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে আলজিরিয়াকে ফ্রান্সের অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে লুই ফিলিপের পতনের পর আলজিরিয়ায় ফরাসী উপনিবেশ স্থাপনের প্রক্রিয়া দ্রুত হয়। ১৮৫২ সালে ফ্রান্সে দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আলজিরিয়ার দায়িত্ব আরো প্রত্যক্ষভাবে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আলজিরিয়ায় ইউরোপীয়দের অধিক মাত্রায় বসবাস স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া হয়। তবে তৃতীয় নেপোলিয়ন ঘোষণা করেন যে আলজিরিয়া একটি ফরাসী প্রদেশের চেয়েও একটি আরব দেশ, ইউরোপীয় উপনিবেশ এবং সবশেষে একটি ফরাসী শিবির। ফ্রান্সের প্রধান কর্তব্য এখানকার তিন লক্ষ আরব জনগোষ্ঠীর প্রতি। এই দৃষ্টিভঙ্গি আলজিরিয়ানদের মধ্যে আশার সঞ্চার করলেও ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের ফলে তাদের আশা বিনষ্ট হয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে আলজিরিয়ানরা মহম্মদ-আল-মাখরানির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় কিন্তু এদের বিদ্রোহ ফরাসী বাহিনী নির্মমভাবে দমন করে। তার ফলে আলজিরিয়ার আরো কিছু অঞ্চল ফরাসীদের অধিকারে আসে। এছাড়া ফরাসী ঔপনিবেশিকরা আলজিরিয়ার উপজাতি কৃষকদের জমিও আইনের ফাঁক দেখিয়ে দখল করতে থাকে। ধীরে ধীরে ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী দেশ এবং তার জনগণের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। একই সঙ্গে

ইউরোপীয়ানদের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, হাসপাতাল এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা ও শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করা হয়। আলজিরিয়ানদের জন্য শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে এবং শুধুমাত্র শহরাঞ্চলে অত্যন্ত সীমিত সুযোগ থাকে উচ্চশিক্ষা লাভের। কর্মসংস্থান প্রধানত শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকায় গ্রামাঞ্চল ও আধা-গ্রামাঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর বেকারত্বের বোঝা চেপে বসে। শ্বেতাঙ্গারা আলজিরিয়ার উৎপাদিত শস্যের অধিকাংশই রপ্তানী করতে থাকে যা বর্ধমান আফ্রিকান জনগোষ্ঠীর কাছে খাদ্য সঙ্কটের সৃষ্টি করে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটে। আলজিরিয়ার উর্বর জমির এক-তৃতীয়াংশ দেশীয় আলজিরিয়ানদের কাছ থেকে এখানকার ফরাসী অধিবাসীরা দখল করে নেয়।

খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আলজিরিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

আলজিরীয় জাতীয়তাবাদ তিনটি পৃথক প্রবণতার মধ্যে বিকশিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মুসলিম নেতৃত্বের এক নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে আলজিরিয়ায় এবং ১৯২০ এবং ৩০-এর দশকে তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। একটি গোষ্ঠী ক্ষুদ্র কিন্তু প্রভাবশালী শ্রেণি ছিল যারা 'ইভোলিউস' নামে পরিচিত ছিল। আর একটি ছিল অবশিষ্ট আলজিরিয়ানদের গোষ্ঠী যাদের স্বদেশ এবং স্বজাতি সম্পর্কে ধারণা যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রূপ লাভ করেছিল এবং তৃতীয়টি হল ধর্মসংস্কারক এবং শিক্ষকদের গোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে একশ্রেণির মানুষ ছিলেন সম্পদশালী মুসলিম পরিবারের অন্তর্গত যাঁরা ১৮৯০-এর দশকে সুচতুরভাবে ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিলেন এবং তাঁদের সন্তানদের জন্য ফরাসী শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করতে সফল হয়েছিলেন যা প্রগতিশীল আলজিরীয়দের কাছে আকাঙ্ক্ষিত ছিল। অবশিষ্ট আলজিরিয়ানরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং আরো কয়েক সহস্র আলজিরীয় কলকারখানায় কাজ করার মাধ্যমে ফ্রান্সের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছিল। ১৯১৮-র পর বহু আলজিরিয়ান ফ্রান্সে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং সেখান থেকে তাঁদের অর্জিত অর্থ আলজিরিয়ায় আত্মীয়স্বজনের কাছে প্রেরণ করতেন। এই জনগোষ্ঠী ফ্রান্সে এমন একধরনের জীবনযাপন করতেন তা যে তাঁদের স্বদেশের তুলনায় উচ্চস্তরের ছিল এ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়াও ফরাসীদের জন্য ফ্রান্সে যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি রয়েছে সে সম্বন্ধেও তাঁরা ওয়াকিবহাল ছিলেন। এর পাশাপাশি তাঁরা দেখছিলেন যে আলজিরিয়ায় বসবাসকারী ফরাসী জনগণ, ফরাসী সেনা এবং আমলাগোষ্ঠী সেই একই গণতান্ত্রিক অধিকার আলজিরিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দিতে রাজী নয়। বহু আলজিরিয়ান মধ্যপ্রাচ্যের আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। আলজিরিয়ায় রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য যে সমস্ত আন্দোলন হয়েছিল তারমধ্যে প্রথম যেটির নাম করা যায় সেটি ছিল একটি জাতীয়সংহতিবাদী গোষ্ঠী যারা 'ইয়ং আলজিরিয়ান' নামে পরিচিত ছিল। এর সদস্যরা এসেছিলেন একটি ক্ষুদ্র, উদারপন্থী, সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে যাঁরা নিজেদের একই সাথে মুসলিম এবং ফরাসী হিসেবে প্রমাণ করার সুযোগ দাবী করেছিলেন। ১৯০৮ সালে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লিমেনশ-র কাছে একটি দাবী পত্র পেশ করেন যাতে মুসলিমদের জন্য পূর্ণ নাগরিকত্বের দাবী করা হয়। এই সঙ্গে দেশের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলা হয়। করপ্রথার বৈষম্য হ্রাস, ভোটাধিকার নীতির বিস্তার, শিক্ষার জন্য আরো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

এবং দেশীয় মানুষদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার দাবীও করা হয়। ফরাসী ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে 'ইয়ং আলজিরিয়ান'রা একটি তাৎপর্যপূর্ণ দাবী তুলে ধরেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে সমস্ত মুসলিম ফ্রান্সের হয়ে যুদ্ধ করেছিল এবং মৃত্যু বরণ করেছিল তাদের পুরস্কৃত করার উদ্যেশে ক্লিমেনশ সংস্কারমুখী চার্লস জোনার্টকে আলজিরিয়ার গর্ভনর জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 'জোনার্ট ল' নামক আইনের মাধ্যমে সংস্কারের চেষ্টা করা হয়। প্রায় চার লক্ষ্য পঁচিশ হাজার মুসলিমকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। অপমানজনক 'কোড দ্য ল' ইনডিজেনাট'-এর আওতা থেকে সকল ভোটারকে মুক্তি দেওয়া হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আলজিরিয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয় মুসলিম নেতা ছিলেন খালিদ ইবন হাসিম (যিনি আমীর খালিদ নামেও পরিচিত ছিলেন)। তিনি ছিলেন আদেল কাদির এর পৌত্র এবং 'ইয়ং আলজিরিয়ান' দলের সদস্য। যদিও তিনি দলের একাংশের সঙ্গে 'জোনাট ল' গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতেন। দলের একাংশ সংস্কারের ফলে প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর মধ্যেই কাজ করতে আগ্রহী হলেও খালিদ 'ইয়ং আলজিরিয়ান' পরিকল্পনার সম্পূর্ণটাই কার্যকরী করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন : ১৯২৩ সালে তিনি আলজিরিয়া ত্যাগ করেন এবং দামাস্কামে বসবাস করতে থাকেন। ১৯২৬ সালে 'ইয়ং আলজিরিয়ান' দলের কিছু সদস্য 'ফেডারেশন অফ ইলেক্টেড নেটিভস' বা FEI নামে এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম হিসেবে নিজেদের ব্যক্তিগত মর্যাদা নষ্ট না করে ফরাসী সমাজে পূর্ণ নাগরিক হিসেবে নিজেদের আত্মীকরণ। এছাড়াও তাঁদের দাবী ছিল ফ্রান্সের একটি প্রদেশ হিসেবে আলজিরিয়ার সংহতিসাধন, সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে একই বেতনক্রম, ফ্রান্সে যাওয়া আসার ব্যাপারে বিধিনিষেধের অবসান, 'কোড দ্য ল' ইনডিজেনাট'-এর অবলুপ্তি এবং ভোটাধিকারের সংস্কার। উল্লেখযোগ্য যে, প্রাথমিক পর্যায়ের এইসব আন্দোলনকারীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কিছু সংস্কার। আলজিরিয়ার স্বাধীনতার দাবী এদের ছিল না।

আলজিরিয়ার স্বাধীনতার দাবী প্রথম যে সংগঠনটি উত্থাপন করে সেটি হল 'স্টার অফ নর্থ আফ্রিকা'। এটি ১৯২৬ সালে প্যারিসে গঠিত হয়। এটির উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সে উত্তর আফ্রিকার শ্রমিকদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের সমন্বয়সাধন করা এবং উত্তর আফ্রিকান মুসলমানদের বৈষয়িক, নৈতিক এবং সামাজিক স্বার্থ রক্ষা। দলের নেতৃবৃন্দের অনেকেই ফরাসী কমিউনিস্ট দল ও তাঁর শ্রমিক সংগঠনের সদস্য ছিলেন এবং আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তারা কমিউনিসট দলের কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন লাভ করেছিলেন। 'স্টার'-এর সেক্রেটারী জেনারেল আহমদ মেসালি হজ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে দলের দাবীগুলি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন। ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছাড়াও এঁদের দাবী ছিল সংবাদপত্র ও সভাসমিতির স্বাধীনতা, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত পার্লামেন্ট, বৃহৎ খামারের বাজেয়াপ্তকরণ এবং আরবী বিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'স্টার'কে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দলটি আত্মগোপন করে তার কাজ চালিয়ে যায়। এই সময় দলের সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ৪৩, ৫০০ তে দাঁড়ায়। আরব জাতীয়তাবাদী ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মেসালি হজ কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ থেকে সরে এসে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। এ কারণে ফরাসী কমিউনিস্ট দল 'স্টার'কে অভিযুক্ত করে। মেসালি শ্রমিক এবং কৃষকদের সংগঠিত

করার জন্য আলজিরিয়ায় ফিরে আসেন এবং ১৯৩৭ সালে গঠন করেন 'আলজিরিয়ান পিপলস্ পার্টি'। এর উদ্দেশ্য ছিল দেশে এবং ফ্রান্সে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আলজিরিয়ার শ্রমিক শ্রেণিকে তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সক্রিয় করে তোলা। মেসালি হজ, যিনি কঠোর হাতে 'আলজিরিয়ান পিপলস্ পার্টি'কে পরিচালনা করতেন তাঁর কাছে একটি স্বাধীন আলজিরিয়ার জন্য সংগ্রামের সঙ্গো এই সকল লক্ষ্য অবিচ্ছেদ্য মনে হয়েছিল এবং এর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক এবং ইসলামী মূল্যবোধ একীভূত হয়ে গিয়েছিল।

আলজিরিয়ার ইসলামী সংস্কার আন্দোলন মিশরীয় সংস্কারক মহম্মদ আবদুল এবং মহম্মদ রশিদ রিদা-র কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল এবং দেশের আরব ও ইসলামী ভিত্তির ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছিল। আলজিরীয় মুসলমানদের সংগঠন 'উলেমা' আলজিরিয়ায় ইসলামের শুদ্ধিকরণকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। সংস্কারকগণ অনুসন্ধিৎসার আধুনিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিলেন এবং কুসংস্কারকে বর্জন করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব পত্রিকা এবং গ্রন্থাদি প্রকাশ করতেন এবং অবৈতনিক আধুনিক ইসলামী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফরাসীদের দ্বারা পরিচালিত মুসলমানদের জন্য বিদ্যালয়গুলির পরিবর্ত হিসেবে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি জোর দেওয়া হত। এই আন্দোলনে সংস্কারক শেখ আব্দাল হামিদ বেন বাদিস নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৩১ খ্রিঃ তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আলজিরিয়ান মুসলিম উলেমা অ্যাসোসিয়েশন' বা AUMA। ইসলামী সংস্কারকগণ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকলে ঔপনিবেশিক শাসকবৃন্দ ১৯৩৩ খ্রিঃ তাদের সরকারী মসজিদে প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এর ফলে এবং এ ধরনের আরও কিছু পদক্ষেপের ফলে দেশে কয়েক বর্ষব্যাপী বিক্ষিপ্ত ধর্মীয় অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল।

আলজিরিয়ার মুসলিম রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর ইউরোপীয় প্রভাবের কিছু ভূমিকা ছিল কারণ মেসালি হজ এবং ফারহাত আব্বাস তাঁদের ভাবাদর্শের জন্য ফ্রান্সের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতেন। আলজিরিয়ার ফরাসী অধিবাসীবৃন্দ (বা 'কোলন') অবশ্য যে কোনো সংস্কারমুখী আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। ফরাসী জাতীয় সভা, আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ওপর তাদের প্রভাব ছিল। এছাড়া আলজিরিয়ার প্রশাসন এবং পুলিশের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ তাদের সংস্কার বিরোধিতাকে শক্তিশালী করেছিল।

আলজিরিয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট দেশীয় সমাজের পুরোনো এবং নবোদিত শ্রেণিকে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অসংখ্য রাজনৈতিক প্রতিবাদে মুখর করে তুলেছিল। নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সরকার কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক আইন জারি করেছিল। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের 'পপুলার ফ্রন্ট' সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন লিঁয় ব্লুম। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মরিস ভায়োলেটকে নিযুক্ত করেন। আলজিরিয়ানদের প্রতি কিছু উদারনীতি গ্রহণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। যার অন্যতম উদাহরণ ব্লুম-ভায়োলেট প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে এক শ্রেণির মুসলিম 'এলিট'দের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সমতা সহ ফরাসী নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়। এই সকল মুসলিমদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, নির্বাচিত আধিকারিকবৃন্দ, সামরিক অফিসার এবং পেশাদার মানুষ। মেসালি হজের মতে, এই ভায়োলেট পরিকল্পনার মধ্যে ঔপনিবেশিকতার নতুন পদ্ধতি লুক্কায়িত ছিল। কারণ এর মাধ্যমে

সাধারণ আলজিরিয়দের সঙ্গে 'এলিট'দের পার্থক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। অপরদিকে আলজিরিয়ার ফরাসী অধিবাসীরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। যদিও এই প্রস্তাবের মাধ্যমে ২১,০০০ মুসলিমকে ফরাসী নাগরিকত্ব এবং ভোটাধিকার দান করা হয়েছিল এবং প্রতি বছর আরও কয়েক হাজার মুসলিমকে ভোটাধিকার দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কিন্তু ফরাসী অধিবাসী বা 'কোলন'দের মুখপাত্র এই অভিযোগ করেন যে, এর ফলে ইউরোপীয় ভোটদাতাগণ মুসলিমদের তুলনায় সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন। শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ইতিমধ্যে মেসালি হজ নাটকীয়ভাবে আলজিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং জনগণকে তাঁর দল 'স্টার অফ নর্থ আফ্রিকা'র প্রতি আকৃষ্ট করেন। তাঁর সাফল্যের প্রমাণ হল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে সরকার এই দল ভেঙে দেন। এ বছরই মেসালি হজ 'আলজিরিয়ান পিপলস্ পার্টি' গঠন করেন। কিন্তু আলজিয়ার্সে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় তাঁকে ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। মেসালি হজ কয়েক বছর কারারুদ্ধ থাকলেও তাঁর দল সকল বিরোধী গোষ্ঠীর সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে এই দলকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। বিরোধী গোষ্ঠীর ঐক্যও ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে।

গ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আলজিরিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও আলজিরিয়ার মুসলিমরা ফ্রান্সের সহযোগিতা করে। নাৎসী জার্মানীর কাছে ফ্রান্সের পরাজয় এবং ফ্রান্সে নতুন সরকারের প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র মুসলমানদের সমস্যা বৃদ্ধি করেছিল তা নয়, আলজিরিয়ার ইহুদী সম্প্রদায়েরও বিপদের কারণ হয়েছিল। আলজিরিয়ার প্রশাসন ইহুদী-বিরোধী আইন কার্যকর করতে থাকে। এর ফলে ইহুদীদের ফরাসী নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়। ইউরোপীয় ও মুসলিম গোষ্ঠীর সম্ভাব্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় অ্যাংলো-মার্কিন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে ফ্রি ফ্রেঞ্চ কন্যান্ডার হেনরী জিরড চরমপন্থী 'কোলন'দের বিরোধিতা সত্বেও দমনমূলক আইন ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে নেন। তিনি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মিত্রশক্তির যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে সাহায্য করার আহ্বান জানান। ফারহাত আব্বাস এবং অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ জানান যে, আলজিরিয়ানরা তাদের দেশকে মুক্ত করার জন্য মিত্রশক্তির সঙ্গে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁরা সেই সঙ্গে মুসলিম প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বানের দাবী জানান, যার লক্ষ্য হবে একটি প্রয়োজনীয় ফরাসী কাঠামোর মধ্যে দেশীয় জনগোষ্ঠীর জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটানো। জিরড যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রস্তাব বিবেচনা করতে রাজী হন না।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ফারহাত আব্বাস ফরাসী প্রশাসনের কাছে ছাপ্পান্ন জন আলজিরীয় জাতীয়তাবাদী এবং আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত আলজিরীয় জনগণের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার এক ঘোষণাপত্র পেশ করেন। ঔপনিবেশিক শাসনের দোষত্রুটি এবং দমননীতি উল্লেখ করার পাশাপাশি এই ঘোষণাপত্রে একটি নির্দিষ্ট আলজিরীয় সংবিধানের দাবী করা হয় যাতে মুসলিমদের জন্য রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও আইনগত সাম্যের নিশ্চয়তা থাকবে। এছাড়াও এতে কৃষিসংস্কার, ফরাসী ভাষার সঙ্গে

সমভাবে সরকারী ভাষা হিসেবে আরবীর প্রচলন, সম্পূর্ণ বেসামরিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং সকল দলের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয়।

ফরাসী গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত প্রভাবশালী মুসলিম ও ইউরোপীয়দের দ্বার গঠিত একটি কমিশন এই ঘোষণাপত্রটি বিচার করে এক সংস্কার পরিকল্পনা পেশ করে। এটি মুক্ত ফরাসী আন্দোলনের নেতা জেনারেল শার্ল দ্য গল-এর কাছে প্রেরণ করা হয়। দ্য গল এবং আলজিরিয়ায় তাঁর নবনিযুক্ত গভর্নর জেনারেল উদারপন্থী জর্জ কাত্রো ইউরোপীয় ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কাত্রো 'কোলন'দের অন্ধ সামাজিক রক্ষণশীলতার দ্বারা ব্যথিত হলেও এই ঘোষণাপত্রকে দুই গোষ্ঠীর সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেননি। কারণ, তিনি মনে করেন যে, একটি মুসলিম রাষ্ট্রে এটি সংখ্যালঘু ইউরোপীয়দের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তা সত্ত্বেও ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী প্রশাসন একটি সংস্কার পরিকল্পনা গঠন করে ১৯৩৬-এর ভায়োলেট পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে। এতে আলজিরীয় মুসলিমদের এক বিশেষ প্রতিভাবান শ্রেণিকে সম্পূর্ণ ফরাসী নাগরিকত্ব দান করার কথা স্বীকার করা হয়, যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ষাট হাজার। এঁদের মধ্যে ছিলেন সামরিক অফিসার, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, সরকারী অফিসার এবং 'লিজিয়ন অফ অনার' প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ।

ভায়োলেট পরিকল্পনা পুনরায় চালু করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াকে একটি নতুন বিষয় প্রভাবিত করেছিল সেটি হল ফারহাত আব্বাসের মানসিকতার পরিবর্তন। তিনি এই সময় থেকে ফরাসী যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীন আলজিরিয়ার দাবী তুলে ধরতে শুরু করেন। এ ব্যাপারে তিনি 'আলজিরীয় মুসলিম উলেমা এ্যাসোসিয়েশন' বা A.U.M.A. এবং মেসালি হজের সমর্থন লাভ করেন। মেসালি হজ ফারহাত আব্বাসের সঙ্গে যোগ দিয়ে 'ফ্রেন্ডস অফ দ্যা ম্যানিফেস্টো এ্যান্ড লিবার্টি' (AML) নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন যার উদ্দেশ্য ছিল আলজিরিয়ার স্বাধীনতার জন্য কাজ করা। এই সময় অবৈধ হিসেবে ঘোষিত 'আলজিরিয়ান পিপলস্ পার্টি' (PPA) গোপনে সারা দেশে রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করে এবং কাবিলি এবং কনস্ট্যানটাইন অঞ্চলে আধা-সামরিক গোষ্ঠী তৈরি করে। এছাড়া PPA সমর্থকরা AML-এর সঙ্গে যোগ দিয়ে মেসালি হজের স্বাধীনতার ধারণাকে রূপ দিতে চেষ্টা করে। ১৯৪৪-৪৫-এ গম উৎপাদনের স্বল্পতা, শিল্পজাত পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং তীব্র বেকারত্ব আলজিরিয়ায় সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। আলজিয়ার্স ও ওরান সহ বিভিন্ন অঞ্চলে হিংসার প্রকাশ দেখা যায়। ১৯৪৫-এর ৮ই মে মুসলিম এবং ফরাসী অধিবাসীদের (কোলন) মধ্যে উত্তেজনার বিস্ফোরণ ঘটে যার ফলে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মেরুকরণ স্পষ্ট হয়ে যায়। আলজিরিয়ার সেতিফ্ অঞ্চলে পুলিসের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে AML-সংগঠকরা জাতীয় পতাকা সহ মিছিল শুরু করলে তাদের ওপর গুলি বর্ষণ করা হয়। বহু পুলিশ, আন্দোলনকারী এবং ইউরোপীয় নিহত হন। গ্রামবাসীরা 'কোলন'দের অঞ্চল এবং সরকারী ভবন আক্রমণ করে। সৈন্যবাহিনী, সামরিক বিমান ও জাহাজ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল আক্রমণ করে। বহু মুসলিম মৃত্যুবরণ করে। সেতিফ্ দাঙ্গার পর AML-কে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। ফারহাত আব্বাসসহ পাঁচ সহস্রাধিক মুসলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৬ সালে আব্বাস ফ্রান্সের সঙ্গে শিথিলভাবে যুক্ত একটি স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রজাতান্ত্রিক আলজিরিয়ার দাবী তোলেন। পাঁচ বছর গৃহবন্দি থাকার পর মেসালি হজ আলজিরিয়ায় 'মুভমেন্ট ফর দ্যা ট্রায়াম্প অফ ডেমোক্রেটিক লিবার্টিজ' (MTLD)

গঠন করে স্বাধীনতার দাবী তোলেন কিন্তু আব্বাসের যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ১৯৪৭ সালে MTLD–র মধ্যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চালানোর জন্য হোশিন আইত আহমেদ কর্তৃক এক 'বিশেষ সংগঠন' বা OS তৈরি করা হয়। আইত আহমেদের পরবর্তীকালে এই গোষ্ঠীর নেতা হন আহমেদ বেন বেলা যিনি ছিলেন আলজিরিয়ার প্রথমদিকের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের অন্যতম।

১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাসে ফরাসী সরকার আলজিরিয়ান অ্যাসেম্বলি গঠন করার জন্য আইন পাশ করেন। স্থির হয় এটি দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত হবে। একটি কক্ষে থাকবেন ইউরোপীয় এবং 'প্রভাবশালী' মুসলিমদের প্রতিনিধিগণ এবং অপর কক্ষ গঠিত হবে বাকি আট লক্ষাধিক মুসলমানের প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই আইনে আলজিরীয় সাহারায় সামরিক সরকারের বিলুপ্তি ঘটানো হয়। ফরাসীর সঙ্গে সরকারী ভাষা হিসেবে আরবী ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং মুসলমান নারীদের ভোটাধিকারের প্রস্তাব করা হয়।

১৯৪৭ সালের পৌর নির্বাচনে মেসালি হজের MTLD দলের বিপুল জয়লাভ 'কোলন'-দের সন্ত্রস্ত করে। পরের বছর আলজিরীয় এ্যাসেম্বলির প্রথম নির্বাচনে MTLD নটি আসন লাভ করে। আব্বাসের UDMA আটটি এবং সরকার-স্বীকৃত 'ইনডিপেনডেন্ট'দের পঞ্চান্নটি আসন দেওয়া হয়। এই নির্বাচন 'কোলন'-দের কিছুটা আশ্বস্ত করলেও বহু মুসলিমের কাছে এই সত্য প্রতীয়মান হয় যে আলজিরীয় সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়। 'কোলন'-নিয়ন্ত্রিত আলজিরীয় এ্যাসেম্বলি-র প্রথম অধিবেশনে জনৈক MTLD প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করা হলে অন্যান্য মুসলমান প্রতিনিধিরা প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। 'কোলন'দের বিরুদ্ধে ভোটে কারচুপির অভিযোগ আনা হয়েছিল। ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের বিরোধিতায় তার বিরুদ্ধে তদন্ত করা যায়নি। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনেও একই প্রকার কারচুপি হয়।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে 'OS' কর্তৃক ফ্রান্স বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে মেসালি হজকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং সরকারের দমননীতির ফলে MTLD দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য চরমপন্থী 'কোলন'রা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। আহমদ বেন বেলা 'রেভোলিউশনরি কমিটি অফ ইউনিটি এ্যান্ড এ্যাকশন' (CRUA) নামে এক নতুন দল গঠন করেন। এর মূল কেন্দ্র ছিল কায়রোতে। এই দলের নয়জন ঐতিহাসিক নেতৃবৃন্দ ছিলেন হোশিন আইত আহমেদ, মহম্মদ বাউদিয়াফ, বেলকাসেন ক্রিম, রাবাহ্ বিতাত, লারবি বেন মাহিদি, মৌরতি দিদৌচে, মুস্তাফা বেন বোলেদ, মহম্মদ খিদার এবং আহমদ বেন বেলা। এঁরাই আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা হিসেবে পরিচিত।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ থেকে অক্টোবরের মধ্যে CRUA আলজিরিয়ায় ৬টি সামরিক অঞ্চল নিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করে। মিশরের রাষ্ট্রপতি গামাল আব্দেল নাসের বেন বেলা প্রমুখকে উৎসাহ দান করতে থাকেন। বেন বেলা প্রমুখের লক্ষ্য ছিল বিদেশী সহায়তায় অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে CRUA নাম পরিবর্তন করে 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট বা FLN নামে পরিচিত হয়। FLN এবং তার সামরিক বাহিনী 'ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি' বা ALN–এর নেতৃত্বে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। যার লক্ষ্য একটি সার্বভৌম আলজিরীয় রাষ্ট্র।

ঘ. আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৯৫৪-১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ)

১৯৫৪ থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয় আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ। যার লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের অধীনতা থেকে আলজিরিয়ার মুক্তি। ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ ছিল আলজিরিয়ার মুক্তিসংগ্রাম। এর চরিত্রও ছিল জটিল। গেরিলা যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদ, অত্যাচার, ফরাসী বাহিনীর প্রতি-সন্ত্রাসবাদ এই যুদ্ধের প্রকৃতিকে জটিল করে তুলেছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর শুরু হওয়া এই যুদ্ধ চতুর্থ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের (১৯৪৬-১৯৫৮) ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছিল। আলজিরীয়রা প্রথম দিকে শান্তির পক্ষে থাকলেও পরবর্তীকালে তারা স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। অপরদিকে ফরাসীদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে মতবিরোধ দেখা যায়। একদিকে 'ফরাসী আলজিরিয়া', অপরদিকে স্থিতাবস্থা রক্ষা বা আলজিরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়।

আলজিরিয়ার নবগঠিত 'ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্ট' বা FLN–এর নেতৃত্বে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। একটি সার্বভৌম আলজিরীয় রাষ্ট্র গঠনের পাশাপাশি এদের লক্ষ্য ছিল এক ইসলামী পরিকাঠামোর মধ্যে সামাজিক গণতন্ত্র এবং আলজিরিয়ার যে কোনো অধিবাসীর জন্য সমনাগরিকত্ব। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য দুটি পথ অবলম্বন করা হয়। একটি হল দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা যুদ্ধ এবং অপরটি হল বহির্দেশে, বিশেষত রাষ্ট্রপুঞ্জে কূটনৈতিক ক্রিয়াকর্ম।

আলজিরিয়ায় প্রথম সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয় বাটনা এবং অরেস অঞ্চলে, যদিও সামরিক দিক থেকে তা খুব একটা সফল হয়নি। বহু MTLD সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহের সমর্থক ছিলেন না। সশস্ত্র অভ্যুত্থান অবশ্য শীঘ্রই বিস্তারলাভ করে এবং দেশের বৃহত্তর অংশকে প্রভাবিত করে। অভ্যুত্থান প্রতিরোধের জন্য ফরাসী 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি' জরুরী অবস্থা জারি করে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আলজিয়ার্সে নতুন গভর্নর জেনারেল হিসেবে উপস্থিত হন জ্যাক সুস্তেন। অগাস্ট মাসে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয় এবং উত্তর কনস্ট্যানটাইন অঞ্চলে শতাধিক ইউরোপীয় ও মুসলিম অফিসার নিহত হন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ফ্রান্সে রিপাবলিকান দলের নির্বাচনী জয়লাভের ফলে গাই মলে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি অভিজ্ঞ ও নরমপন্থী জেনারেল জর্জ কাত্রোকে আলজিরিয়ার গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মলের বিরুদ্ধে আলজিয়ার্সে এজন্য বিক্ষোভ শুরু হলে সমাজতন্ত্রী রবার্ট লাকস্তেকে কাত্রোর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। লাকস্তে সামরিক বাহিনীকে প্রভূত ক্ষমতা দান করেন। সেই সঙ্গে তিনি দেশে এক বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা স্থাপনে উদ্যোগী হন যা আলজিরিয়াকে কিছুটা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেবে।

আলজিরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্রোহীদের মোকাবিলার জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্যের এক ফরাসী বাহিনী প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে ফারহাত আব্বাস ও তৌফিক আল মাদানির মত AUMA নেতৃবৃন্দ FLN নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কায়রোতে যোগ দেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম FLN কংগ্রেসে যুদ্ধের লক্ষ্য স্থির করা হয়। আলজিরিয়াকে ছটি স্বয়ংশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রতিটিকে একজন গেরিলা কম্যান্ডারের অধীনে রাখা হয়। 'ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দ্য আলজিরিয়ান রেভোলিউশন' এবং 'কমিটি অফ কো-অর্ডিনেশন এ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট' নামে দুটি কমিটি স্থাপন করা হয়। শেষোক্তটি FLN–এর প্রশাসনিক শাখা হিসেবে কাজ করে।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের প্রধান ঘটনা ছিল মরক্কো এবং তিউনিসিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের জন্য ফরাসী সিদ্ধান্ত এবং 'ফরাসী আলজিরিয়া' বজায় রাখার ব্যাপারে ফ্রান্সের অনড় মনোভাব। আলজিরীয় সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য মরক্কোর সুলতান এবং তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী জাবিব বুরঘিবা আলজিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ যথা বেন বেলা, বাউদিয়াভ, খিদার, আইত আহমেদ প্রমুখের সঙ্গে তিউনিস-এ একটি আলোচনার প্রচেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হয় না কারণ আলজিরিয় নেতৃবৃন্দকে গ্রোপ্তার করা হয় ও যুদ্ধের অবশিষ্টকাল তাঁদের কারাগারে রাখা হয়। সমগ্র ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ ব্যাপী FLN আলজিয়ার্স-এর শাসনব্যবস্থা পঙ্গু করে দেবার প্রচেষ্টা চালায় যা 'আলজিয়ার্সের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। ইউরোপীয় সামরিক এবং বেসামরিক জনগণের ওপর FLN–এর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ফরাসী সামরিক বাহিনী সন্দেহভাজনদের ওপর অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালায়। স্বাধীন তিউনিসিয়া ও মরক্কোর সঙ্গে আলজিরিয়ার সকল প্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

১৯৫৮ সালে ফ্রান্সে চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের পতন হয় এবং শার্ল দ্য গল ক্ষমতা লাভ করেন এবং পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বছরই দ্য গল আলজিয়ার্সে যান এবং সেখানে সকল মুসলিমকে পূর্ণ ফরাসী নাগরিকত্ব দান করেন। ৩০শে অক্টোবর কনস্ট্যানটাইনে তিনি আলজিরীয় জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যালয় এবং চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এছাড়াও আলজিরীয়দের জন্য কর্মসংস্থান এবং সরকারী চাকরিতে উচ্চপদ দানের কথাও ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে দ্য গল প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে আলজিরীয়দের নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে আলজিরিয়ার ফরাসী অধিবাসীরা এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে। দ্য গল আলজিরীয় সমস্যা সমাধানের জন্য নানা সমাধান সূত্র সন্ধান করার চেষ্টা করেন। প্রাক্তন সেনানায়কদের একাংশ দ্য গলের প্রচেষ্টায় আশঙ্কিত হয়ে OAS নামক একটি গুপ্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন যার উদ্দেশ্য ছিল দ্য গলকে হত্যা করা। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আহমেদ বেন বেলা, যিনি ১৯৫৬ সাল থেকে কারারুদ্ধ ছিলেন তাঁকে শান্তি আলোচনার জন্য মুক্তি দেওয়া হয়। আলোচনায় স্থির হয় যে ১৯৬২-র জুলাই মাসে আলজিরিয়াকে স্বাধীনতা দান করা হবে। সেই অনুযায়ী ১৯৬২ সালের ৩রা জুলাই আলজিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে এবং দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে বেন বেলা নির্বাচিত হন। প্রায় আট লক্ষ ফরাসী অধিবাসী আলজিরিয়া ত্যাগ করে এবং নবগঠিত সরকার তাদের বেশিরভাগ জমি এবং ব্যবসা বাজেয়াপ্ত করে।

আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটায়। ধ্বংস হয় বহু গ্রাম, বনাঞ্চল। প্রায় কুড়ি লক্ষ অধিবাসী অন্যস্থনে চলে যান। যে সমস্ত ইউরোপীয় স্বাধীনতার সময় আলজিরিয়া ত্যাগ করে গিয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই ছিলেন অভিজ্ঞ প্রশাসক, প্রযুক্তিবিদ ইত্যাদি। এর ফলে দেশের কলকারখানায় প্রশাসকের অভাব দেখা দেয় যা উৎপাদনকে ব্যাহত করে। বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৩ সাল নাগাদ ফরাসীদের অধিকৃত সমস্ত জমি জাতীয়করণ করা হয়।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে আলজিরিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কলহপরায়ণ হয়ে ওঠে। ফরাসীদের কাছ থেকে বেন বেলাসহ পাঁচ নেতার মুক্তিলাভ দলে মতবিরোধের সূত্রপাত করে। সামরিক বাহিনীও সরকারি নেতৃত্বের মত বিভক্ত হয়ে যায়। এইচ. বাওমেদিয়েন এবং তাঁর শক্তিশালী সীমান্তরক্ষী বাহিনী বেন বেলার সমর্থনে এগিয়ে আসে। সেনাবাহিনীর একাংশ বেন খেদাকে সমর্থন করে। আবার অভ্যন্তরীণ

গেরিলাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ যাঁরা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা সমস্ত প্রকার সামরিক ও বেসামরিক বিবাদের বিরোধী ছিলেন। অঞ্চলভিত্তিক সামরিক সংঘাত এবং ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা আলজিরিয়ায় এক সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আট বছর ব্যাপী যুদ্ধের ফলে রণক্লান্ত জনগণ শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। বেন বেলা শেষপর্যন্ত ন্যাশানাল পিপলস্‌ এ্যাসেম্বলির নির্বাচন সংগঠন করতে সক্ষম হন। নবনির্বাচিত এ্যাসেম্বলি বেন বেলাকে দেশের প্রথম সরকার গঠনের আহ্বান জানান।

ঙ. স্বাধীনতা-পরবর্তী আলজিরিয়া

বাওমেদিয়েনের সামরিক সহায়তায় বেন বেলা আলজিরিয়ায় তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। বৃহত্তর কাবিলায় তাঁর সহযোগী বিদ্রোহী নেতা আইত আহমেদ এবং কর্ণেল মোহান্দ উ-এল-হজের নেতৃত্বে একটি আঞ্চলিক সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করা হয়। স্বাধীনতা লাভের সময় সমর্থন লাভের জন্য বেন বেলা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা একটি সুশৃঙ্খল প্রশাসন পরিচালনার সহায়ক ছিল না। ১৯৬৩-র এপ্রিল মাসে তীব্র রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে FLN–সেক্রেটারী জেনারেল মহম্মদ খিদার প্রভূত দলীয় অর্থসহ দেশত্যাগ করেন। কয়েক বছর পরে মাদ্রিদে তাঁকে হত্যা করা হয়। অন্যান্য বিরোধী নেতৃবৃন্দকেও ধীরে ধীরে বহিষ্কৃত করা হয়। ফলে সমগ্র ক্ষমতা বেন বেলা এবং সামরিক নেতা বাও-মেদিয়েনের হস্তগত হয়। ১৯৬৫-র জুন মাসে বাওমেদিয়েন ও তাঁর সমর্থকদের অপসারিত করার জন্য বেন বেলার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। বেন বেলার দুর্বল প্রশাসন আলজিরিয়ানদের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। বাওমেদিয়েনের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান বেন বেলাকে অপসারিত করে। বাওমেদিয়েন তাঁর ক্ষমতা সংহত করতে প্রয়াসী হন। FLN–কে পুনর্গঠনের প্রয়াস কিছুটা সাফল্য লাভ করে। ১৯৬৭ সালে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন এবং ১৯৬৯ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১৯৭৭ সালের আগে ন্যাশানাল পিপলস এ্যাসেম্বলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা যায়নি। বাওমেদিয়েন কৃষিসংস্কার, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন খামারগুলি অবলুপ্তি, সমবায়ভিত্তিকভাবে ভূমিহীন কৃষকদের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত জমি পুনর্বন্টনের মাধ্যমে এক সমাজতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। অর্থনীতি এবং দেশের সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১-এ ফরাসী পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস জাতীয়করণ করা হয়। বিদেশে তৈল বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রভূত রাজস্ব আদায় হয়। ১৯৭৩-এর মূল্যবৃদ্ধি এবং তার পরবর্তীকালে শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা নেওয়া হয়। শিল্পের প্রতিটি শাখাকে রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে বাওমেদিয়েনের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। সামরিক বাহিনী এবং FLN উভয়ই প্রাক্তন গেরিলা অফিসার কর্ণেল বেন্দজেদিদকে সমর্থন করেন। তিনি ১৯৭৯-র ফেব্রুয়ারীতে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

বেন্দজেদিদের অধীনে অর্থনীতির ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানীতে বিভক্ত করা হয়। নতুন আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে উৎসাহ দান করা হয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ফলে ধীরে ধীরে নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধি সভাগুলির ক্ষমতা

বৃদ্ধি পায়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় এবং বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে আলজিরীয়দের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়। পূর্ববর্তী আমলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ভেঙে পড়তে থাকে। ১৯৭৯-র ইরান বিপ্লব এবং আফগানিস্তান যুদ্ধের প্রভাব আলজিরিয়ার ওপর পড়ে। ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি পেট্রোলিয়ামের মূল্যহ্রাস দেশের অর্থনীতিকে আঘাত করে। খাদ্যসংকট সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ সামাজিক প্রয়োজন সরকারের পক্ষে মেটানো সম্ভব হয় না। ১৯৮৮-তে আলজিরিয়ার বিদেশী ঋণের পরিমাণ ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পায়। তীব্র বেকার সমস্যা দেখা দেয়। রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে সঙ্কুচিত কৃষিব্যবস্থা তীব্র খরার ফলে আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সঙ্কটকে আরো তীব্র করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দেশে গণ-অসন্তোষ শুরু হয়। আলজিয়ার্স, আন্নাবা এবং ওরানে দাঙ্গা শুরু হয়। এই সুযোগে বেন্দজেদিদ FLN-এর একচেটিয়া রাজনৈতিক আধিপত্য খর্ব করার জন্য উদারনীতির দিকে ঝোঁকেন। ১৯৮৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসে একটি নতুন সংবিধানের স্বীকৃতি দেওয়া হয় যাতে সমাজতন্ত্র এবং একদলীয় রাষ্ট্রের অবসান ঘটানো হয় এবং রাজনৈতিক বহুত্ববাদের সূত্রপাত ঘটানো হয়। আলজিরিয়া একটি বহুদলীয় রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন নতুন রাজনৈতিক দলের মধ্যে অন্যতম ছিল ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট (FIS)। এই দলটি শীঘ্রই জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ১৯৯০-এর প্রাদেশিক এবং পৌর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সরকারপক্ষ প্রথম পর্যায়ে নির্বাচন বাতিল করে। বেন্দজেদিদকে পদত্যাগ বাধ্য করা হয়। FIS-কে অবৈধ ঘোষণা করে এই দলের সহস্রাধিক সমর্থককে কারারুদ্ধ করা হয়। একটি জোড়াতালি দেওয়া কাউন্সিল অফ স্টেট স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা মহম্মদ বাউদিয়াফকে (যিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে বেন বেলার দ্বারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবার পর মরোক্কোয় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন) রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য রাজী করানো হয়। বাউদিয়াফ ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম এবং তিনি একটি বেধর্মীয়, বেসামরিক সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি নিহত হন। সামরিক বাহিনী জেনারেল লামিন জেরুয়েলকে তাঁর স্থলাভিষিতক্ত করে। বাউদিয়াফ বা তাঁর পরবর্তী জেরুয়েল উভয়ই FIS-কে ধ্বংস করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। এই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কঠোর ইসলামী আইন প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। অপর এক ক্ষুদ্র অংশ সুদান বা ইরানের মত ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৯৪ সালে জেরুয়েল FIS ছাড়া একাধিক দলীয় নেতার সঙ্গে আলোচনা করেন। কিন্তু এই সকল দলই FIS-এর সহযোগিতা ব্যতীত একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিল। ঐ বছরেই রোমে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে FIS যোগ দিলেও সরকারের তরফ থেকে তা বয়কট করা হয়। পরবর্তী বছর জেরুয়েল পুনর্নির্বাচিত হন। FIS তখনও অবৈধ থাকে। দেশে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আলজিরিয়ার একাংশ সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং অপরাংশে এই নিয়ন্ত্রণ অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বজায় রাখা হয়। ১৯৯৭ সালে এক নতুন সংবিধানের সাহায্যে জেরুয়েল রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করলেও প্রকৃত ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে থাকে। ১৯৯৮ সালে জেরুয়েল, সেনাবাহিনীর মধ্যে যাঁর সমর্থন ক্রমশ কমে আসছিল, আগামী বছর পুনর্নির্বাচনের জন্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে ঘোষণা করেন। সাতজন প্রার্থী নির্বাচনে মনোনয়নপত্র পেশ করলেও নির্বাচনের পূর্বে ছ'জন নাম প্রত্যাহার করে নেন এবং আব্দুল আজিজ বাউতেফ্লিকা যিনি ছিলেন একজন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী এবং দীর্ঘ কুড়ি বছর নির্বাসনে

ছিলেন, তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেন। দীর্ঘ সাত বছরের গৃহযুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানি হয়। বাউতেফ্লিকা আলজিরিয়ার রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন।

৩.৩ ❑ কঙ্গো

ক. কঙ্গোর স্বাধীনতা লাভ

মধ্য আফ্রিকার অন্যতম একটি রাজ্য কঙ্গো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কঙ্গোয় বেলজিয়ান রাজা তৃতীয় লিওপোল্ডের ব্যক্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই অঞ্চলটি লিওপোল্ডের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল ১৮৭৪-৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সেখানে হেনরি মর্টন স্ট্যানলীর অভিযানের সময় থেকে। ১৮৭৭-এর নভেম্বর মাসে লিওপোল্ড 'এ্যাসোসিয়েশন ইন্টারন্যাশানাল দ্যা কঙ্গো' নামে একটি কমিটি গঠন করেন যার উদ্দেশ্য ছিল কঙ্গো নদী বরাবর আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগকে ইউরোপীয় বাণিজ্যের জন্য কতটা উন্মুক্ত করা যেতে পারে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। ১৮৭৯-১৮৮২-র মধ্যে সেখানকার স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করা হয়। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ 'এ্যাসোসিয়েশান ইন্টারন্যাশানাল দ্যা কঙ্গো' ৪৫০টি স্বাধীন আফ্রিকান শাসকের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে এবং তার ভিত্তিতে সমগ্র অঞ্চলটিকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে শাসনের জন্য তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৮৪-৮৫-র 'বার্লিন ওয়েস্ট আফ্রিকা কনফারেন্সে' এই অঞ্চলটির নাম হয় 'কঙ্গো ফ্রি স্টেট' এবং এর সার্বভৌম শাসক হিসেবে দ্বিতীয় লিওপোল্ডকে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ স্বীকৃতি দেয়। ১৮৯০-এর দশকের শুরু থেকে লিওপোল্ড এই অঞ্চলের অভ্যন্তরে সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। আরব দাস ব্যবসায়ীদের এখান থেকে বিতাড়িত করা হয় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৯১-এ তামা এবং অন্যান্য খনিজসমৃদ্ধ কাটাঙ্গা দখল করা হয়। কঙ্গোর অভ্যন্তরে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ১৮৯০-৯৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রেলপথ স্থাপন করা হয়। তবে লিওপোল্ডের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীন এই শাসন এখানকার অধিবাসীদের কাছে ছিল দুর্বিষহ। তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজদ্রব্য ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য বলপূর্বক শ্রমদানে বাধ্য করা হত এবং তাদের প্রতি অত্যন্ত পাশবিক আচরণ করা হত। যার ফলে সমগ্র রাজ্যের জনসংখ্যা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল। এইসব কারণে ব্রিটেন এবং ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং লিওপোল্ড বেলজিয়াম সরকারের কাছে কঙ্গোর ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কঙ্গো ফ্রি স্টেটের অবসান ঘটানো হয় এবং তার নতুন নাম হয় 'বেলজিয়ান কঙ্গো' যা বেলজিয়ান পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রিত বেলজিয়ামের একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। কঙ্গোর অনভিজ্ঞ আফ্রিকানদের প্রতি বেলজিয়ামের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেকটা অভিভাবকসুলভ। প্রশাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আফ্রিকানদের কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু সেখানকার পুরোনো গোষ্ঠীপতিদের কর সংগ্রাহক এবং শ্রমিক সরবরাহকারী হিসেবে ব্যবহার করা হত। অসহযোগী গোষ্ঠীপতিদের ক্ষমতাচ্যুত করা হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন ও ইউরোপীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বেলজিয়ান কঙ্গোতে ব্যাপক অর্থ বিনিয়োগ করেছিল যার ফলে তূলা, তৈলবীজ, কফি, কোকো এবং রাবার চাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কঙ্গোর অভ্যন্তরে সোনা, হীরা, তামা, টিন, কোবাল্ট এবং জিঙ্ক খনি থেকে উত্তোলন করা হত। খনি এবং কৃষিজমিতে আফ্রিকানদের চার থেকে সাত বছরের চুক্তিতে শ্রমদানে বাধ্য করা হত। এজন্য ১৯২২ সালে একটি

আইন পাশ করা হয়। বাধ্যতামূলক শ্রমিকদের দ্বারা রাস্তাঘাট, রেলপথ, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই উপনিবেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ইউরেনিয়াম সরবরাহের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

উপনিবেশ স্থাপনের প্রায় প্রথম থেকেই অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশীয় প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। ১৯১৯ সালে কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলায় বিদ্রোহ দেখা দেয় যা ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের আগে দমন করা যায়নি। বিশ্ব-অর্থনৈতিক মন্দার বছরগুলিতে (১৯৩১-৩৬) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিক্ষোভ আরো বৃদ্ধি পায়। বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আক্রায় অনুষ্ঠিত সর্ব-আফ্রিকান সম্মেলনে আফ্রিকায় ঔপনিবেশিকতার অবসান দাবী করা হয়। বেলজিয়াম সরকারের ধারণা ছিল কঙ্গোয় কোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দেবে না। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল প্রতিপন্ন করে আক্রা সম্মেলনের স্বল্পকালের মধ্যেই কঙ্গোর লিওপোল্ডভিলে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। শেষ পর্যন্ত বেলজিয়াম সরকার ঘোষণা করে যে, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী কঙ্গোকে ঔপনিবেসিকে শাসনমুক্ত করে স্বাধীনতা দান করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৬০-এর ৩০শে জুন কঙ্গোকে স্বাধীনতা দান করা হয়। দীর্ঘ আশি বছর কঙ্গো বেলজিয়ামের অধীনস্থ থাকার পর একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

খ. কঙ্গো সঙ্কট

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে কঙ্গোর আত্মপ্রকাশ ঘটলেও স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায় কঙ্গো বা কঙ্গোবাসীদের পক্ষে সুখের ছিল না। এর অন্যতম কারণ ছিল, কঙ্গোর রাজনীতিবিদ্দের যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুত না করেই বেলজিয়াম কঙ্গোকে স্বাধীনতা দান করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনকালের শেষ বর্ষেও কঙ্গোর নেতৃবৃন্দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি। বেলজিয়ান শাসনে কঙ্গোবাসীদের মধ্যে শিক্ষার বিকাশও তেমন হয়নি। ১৯৬০ সালেও কঙ্গোর সমগ্র নিগ্রো জনগোষ্ঠীর মধ্যে একজন ইঞ্জিনিয়ারের দেখা মেলেনি। একজন আফ্রিকানও ডাক্তার বা আইনজীবি ছিলেন না। কঙ্গোর চোদ্দ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে অল্পসংখ্যকই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কঙ্গোর পরিস্থিতি স্বাধীনতালাভের উপযুক্ত ছিল না। প্রশ্ন ওঠে, এই পরিস্থিতিতে কঙ্গোকে স্বাধীনতাদানের পশ্চাতে বেলজিয়ামের উদ্দেশ্য কি ছিল ? প্রথম, লিওপোল্ডভিলের দাঙ্গা বেলজিয়াম সরকারকে শঙ্কিত করেছিল। কঙ্গোর প্রায় এক লক্ষ বেলজিয়ানের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া বেলজিয়াম সরকার নিরাপদ বলে বিবেচনা করেনি। দ্বিতীয়ত, একটি দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে আর্থিক ব্যয়, তা স্বীকার করতে রাজী ছিল না বেলজিয়াম। তৃতীয়ত, বেলজিয়ামের ধারণা ছিল যে, এই ধরনের দুর্বল অবস্থায় কঙ্গোকে স্বাধীনতাদানের অর্থ হবে যে, এই সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রটি তার অসহায় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য পুনরায় বেলজিয়ামের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং সেই সুযোগে কঙ্গোতে বেলজিয়ান প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হবে।

স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে কঙ্গোর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে কঙ্গোর নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কঙ্গোর বৃহত্তম দল 'মুভমেন্ট ন্যাশনাল কঙ্গোলিজ' বা M.N.C–র নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বা (যিনি একজন ডাকঘর কেরাণি ছিলেন) এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ঐক্যবন্ধ কঙ্গোর পক্ষপাতী ছিলেন। অপর নেতা জোশেফ কাসাভুবুর লভ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বলিত কঙ্গো। কোমাকোট উপজাতির নেতা ময়সে টিশোম্বে কঙ্গো যুক্তরাষ্ট্রের অধীন স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন বা স্বাধীন কাটাঙ্গার দাবি তোলেন। কঙ্গোতে প্রায় দেড়শ প্রকার উপজাতি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। ফলে, অভিজ্ঞ প্রশাসকদের পক্ষেও কঙ্গোকে ঐক্যবন্ধ রাখা কষ্টকর ঠিল। কঙ্গোর নির্বাচনে প্যাট্রিস লুমুম্বার M.N.C. দল বিজয়ী হয় এবং প্রধান দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও আরও প্রায় পঞ্চাশটি পৃথক দল ছিল। তাদের মধ্যে সহমত হওয়া সহজ ছিল না। যাইহোক, বেলজিয়াম লুমুম্বা এবং কাসাভুবুর কোয়ালিশন সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। প্যাট্রিস লুমুম্বা কঙ্গোর প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং জোসেফ কাসাভুবু রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত এই সরকারকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও উপজাতীয় গোষ্ঠীপতিরা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এর ফলে স্বাধীনতা অর্জনের কয়েকদিনের মধ্যেই কঙ্গোয় এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতি এবং দীর্ঘমেয়াদী গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই কঙ্গোর সামরিক বাহিনীতে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহী সেনাবাহিনী কঙ্গোর সামরিক বাহিনীতে উচ্চপদাধিকারী বেলজিয়ান অফিসারদের অপসারণ দাবী করে এবং নিজেদের জন্য বর্ধিত বেতনক্রম ও উচ্চপদে উন্নীত হবার সুযোগ দাবী করে। কঙ্গোর অধিবাসীদের ধারণা ছিল যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কঙ্গোর বেলজিয়াম নাগরিকদের সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে কিন্তু তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় অনেকেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। কঙ্গোর বিভিন্ন অঞ্চলে হিংসাত্মক ঘটনা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ চলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে কঙ্গো সরকার ভিক্টর লুনডুলা নামক জনৈক আফ্রিকান সেনাপতিকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করার পর কয়েকদিনের মধ্যে পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে।

কঙ্গোয় এই ধরনের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগে ১৯৬০ সালের ১০ই জুলাই বেলজিয়াম বাহিনী কঙ্গোর প্রধান প্রধান কয়েকটি শহর দখল করে। এই পরিস্থিতির মধ্যে ১১ই জুলাই ময়সে টিশোম্বের নেতৃত্বে কঙ্গোর সব থেকে সমৃদ্ধ প্রদেশ কাটাঙ্গার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। টিশোম্বে বেলজিয়াম সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। অপরদিকে বেলজিয়াম সরকার ঘোষণা করে যে কঙ্গোয় লুমুম্বা সরকারের অধীনে বেলজিয়ানদের জীবন ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বেলজিয়ামের পক্ষে কঙ্গোয় হস্তক্ষেপ করা ব্যতীত দ্বিতীয় পথ নেই। লুমুম্বার অভিযোগ ছিল বেলজিয়াম সরকার এবং টিশোম্বে যৌথভাবে কঙ্গোর স্বাধীনতা বিঘ্নিত করছে। বেলজিয়ানদের নিরাপত্তারক্ষার অজুহাতে বেলজিয়ান বাহিনী কাটাঙ্গা থেকে কঙ্গোর রাজধানী লিওপোল্ডভিলে প্রবেশ করে। বেলজিয়ান বাহিনীর সঙ্গে কঙ্গোর সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষ দেখা দেয়। বেলজিয়াম টিশোম্বেকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে লুমুম্বার অভিযোগের সত্যতা রয়েছে এবং কাটাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বেলজিয়াম তার প্রাক্তন উপনিবেশের ওপর পুনরায় আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে।

কঙ্গোর এই সঙ্কট যে শুধুমাত্র কঙ্গোর রাষ্ট্রীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক ছিল তা নয়, কঙ্গোকে কেন্দ্র করে ঐ অঞ্চলে স্নায়ুযুদ্ধের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কঙ্গো ছিল এ

অঞ্চলে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বেলজিয়ান বাহিনীর কঙ্গোয় অনুপ্রবেশ এবং কাটাঙ্গার বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা কঙ্গোকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল এবং এক্ষেত্রে দুই বৃহৎ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপের সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

কাটাঙ্গা কঙ্গোর সবচেয়ে সমৃদ্ধতম প্রদেশ হওয়ায় লুমুম্বা নবগঠিত রাষ্ট্র থেকে কাটাঙ্গাকে হারাতে চাননি। পাশাপাশি কাটাঙ্গার বিদ্রোহ দমনের জন্য কঙ্গোর বিদ্রোহী সামরিক বাহিনীর ওপর নির্ভর করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে তিনি রাষ্ট্রসংঘের কাছে কঙ্গোর সংহতি রক্ষার জন্য সাহায্যের আবেদন করেন। লুমুম্বার আশা ছিল সে রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীকে ব্যবহার করে কাটাঙ্গাকে পুনরায় কঙ্গোর সঙ্গে যুক্ত করা। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি ছিল জটিল কারণ বেশিরভাগ বেলজিয়ামবাসী স্বাধীন কাটাঙ্গার পক্ষপাতী ছিল কারণ স্বাধীন কাটাঙ্গার অস্তিত্ব তাদের প্রভাব বিস্তারের পক্ষে সহজ হত এবং তারা সেখানকার তামার খনির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল। যাইহোক লুমুম্বার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব দাগ হ্যামারশিল্ড রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে জরুরী সভা আহ্বান করেন এবং কঙ্গোয় রাষ্ট্রসংঘের সামরিক বাহিনী প্রেরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নিরাপত্তা পরিষদে কঙ্গো থেকে সকল প্রকার বেলজিয়ান সৈন্য প্রত্যাহার এবং আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন কঙ্গোয় বেলজিয়ামের সশস্ত্র অনুপ্রবেশের তীব্র নিন্দা করে। নিরাপত্তা পরিষদ কঙ্গো সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষমতা মহাসচিবকে দেয়। এছাড়া কঙ্গোয় রাষ্ট্রসংঘের শান্তিবাহিনী পাঠানোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কঙ্গোর জন্য রাষ্ট্রসংঘের যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তা 'ইউনাইটেড নেশানস্ অপারেশনস্ ইন দ্যা কঙ্গো' নামে পরিচিত।

১৪ই জুলাই ১৯৬০ রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের প্রতিনিধির সাথে লিওপোল্ডভিলে বেলজিয়ান প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থির হয় যে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিবাহিনী কঙ্গোয় প্রবেশ করলে বেলজিয়াম কঙ্গো থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবে। ১৫ই জুলাই রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী লিওপোল্ডভিলে প্রবেশ করে। রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী উপস্থিত হওয়ায় বেলজিয়ান বাহিনী কঙ্গো থেকে চলে যেতে শুরু করে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ কঙ্গো বেলজিয়ান বাহিনী মুক্ত হয়ে যায়। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা এবং রাষ্ট্রপতি কাসাভুবু নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ দাবী করেছেন। ফলে মার্কিন প্রতিনিধি হেনরি ক্যাবট লজ সোভিয়েত ইউনিয়নকে এক সতর্কবার্তায় জানান যে কঙ্গোয় সোভিয়েত হস্তক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করবে। নিরাপত্তা পরিষদ অবশ্য দুপক্ষকেই সংযত থাকার আবেদন জানায়।

রাষ্ট্রসংঘবাহিনী কঙ্গোয় প্রবেশ করা সত্ত্বেও সঙ্কটের সমাধান হয়নি। ইতিমধ্যে কাটাঙ্গার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দক্ষিণ কাসাই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা প্রকাশ করে আর কাটাঙ্গায় টিশোম্বের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে সেখানে রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না এবং কাটাঙ্গা থেকে বেলজিয়ান সৈন্য এবং উপদেষ্টাদের অপসারণের জন্য রাষ্ট্রসংঘ যে প্রস্তাব করেছিল তাও মানা হবে না। অগাস্ট মাসে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব দাগ হ্যামারশিল্ড নিরাপত্তা পরিষদের কাছে এ বিষয়ে

সিদ্ধান্ত গ্রহণের আবেদন জানায়। টিউনিশিয়া এবং সিংহল কর্তৃক উত্থাপিত এক প্রস্তাবে কাটাঙ্গায় রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর প্রবেশ এবং ঐ প্রদেশ থেকে সকল বেলজিয়ান সৈন্যের অপসারণ দাবী করা হয়। হ্যামারশিল্ড কাটাঙ্গায় রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর প্রবেশের বাধা অপসারণের জন্য এক স্বল্পসংখ্যক সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেখানে প্রবেশ করে। কাটাঙ্গায় রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে লুমুম্বার সঙ্গে মহাসচিবের মতবিরোধ শুরু হয়। লুমুম্বা চেয়েছিলেন কঙ্গো থেকে কাটাঙ্গার বিচ্ছিন্নতা রোধ করার জন্য রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু হ্যামারশিল্ডের বক্তব্য ছিল যে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের পক্ষ অবলম্বন করতে পারে না। ফলে লুমুম্বার ধারণা হয় যে হ্যামারশিল্ড তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। ২১শে অগাস্ট নিপাপত্তা পরিষদে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ হ্যামারশিল্ডের ভূমিকা সমর্থন করলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পোল্যান্ড তার বিরোধিতা করে। লুমুম্বা কাটাঙ্গার বিরুদ্ধে অভিযানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে সাহায্য নিতে শুরু করেন। মার্কিন চাপে রাষ্ট্রসংঘের তরফে তাঁকে এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লুমুম্বাকে মার্কিনবিরোধী সোভিয়েতপন্থী নেতা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তাঁকে অপসারণের চেষ্টা শুরু হয়। মার্কিন মহলের ধারণা হয় যে লুমুম্বা কঙ্গোকে সোভিয়েত-প্রভাবিত একটি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছেন।

কঙ্গো সঙ্কট আরও জটিল হয়ে ওঠে কঙ্গো সরকারের মধ্যে অন্তর্বিরোধের ফলে। লুমুম্বা সরকার এবং রাষ্ট্রসংঘের বিরোধ কঙ্গোর রাজধানী লিওপোল্ডভিলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট করে তোলে। সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ নাগাদ লুমুম্বা ও রাষ্ট্রপতি কাসাভুবুর মতপার্থক্য চরম পর্যায়ে পৌঁছয়। ৫ই সেপ্টেম্বর কাসাভুবু প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বাকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু কঙ্গোর পার্লামেন্ট লুমুম্বার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে এবং রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তকে বেআইনী ঘোষণা করে। লুমুম্বা সাময়িকভাবে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসেন।

কঙ্গো সরকারের অভ্যন্তরীণ বিরোধের সুযোগে কঙ্গোর সামরিক কর্তা জেনারেল মোবুটু কঙ্গোয় সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ খ্রিঃ)। কাসাভুবুর সহযোগিতায় মোবুটু লুমুম্বাকে লিওপোল্ডভিলে অন্তরীণ অবস্থায় রাখেন। সেখানে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের প্রতিনিধি অ্যান্ড্রু কোর্ডিয়ার পরিবর্তে ভারতের রাজ্যেশ্বর দয়াল নতুন প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন। তিনি লুমুম্বাকে কোনপ্রকার সাহায্য দানে অস্বীকৃত হন। এককথায় কঙ্গোর এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘ এক নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। মোবুটু ক্ষমতা গ্রহণ করে কঙ্গোর পার্লামেন্ট ভেঙে দেন। এছাড়া তিনি সোভিয়েত এবং চেক দূতাবাস বন্ধ করে দেন। বেলজিয়ান প্রশাসকদের বেসরকারী পরামর্শদাতা হিসেবে পুনর্নিয়োগ করা হয়। রচিত হয় নতুন সংবিধান। মোবুটু পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সাহায্য ও সমর্থন লাভ করলেও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা আনতে ব্যর্থ হন। কঙ্গোর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ওরিয়েন্টাল প্রদেশে লুমুম্বার সমর্থকগণ জেনারেল লুনডুলার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। এছাড়া অনেক রাজনৈতিক নেতা প্রকাশ্যে লুমুম্বাকে সমর্থন করতে থাকেন। ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে লুমুম্বা গোপনে ওরিয়েন্টাল প্রদেশের স্ট্যানলিভিলে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে থাইসভিগের কারাগারে বন্দী করা হয়। ১৯৬১ সালে ১৭ই জানুয়ারী কাটাঙ্গার রাজধানী এলিজাবেথভিলে যাবার চেষ্টা করলে লুমুম্বাকে আটক করা হয় এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে হত্যা করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন চাপের

কাছে নতি স্বীকার করে রাষ্ট্রসংঘ লুমুম্বার মুক্তির জন্য কোনো চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকে।

লুমুম্বার মৃত্যু-পরবর্তীকালে কঙ্গোয় এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। মোবুটু ও কাসাভুবু সরকার কঙ্গোয় শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। দেখা যায় যে মোবুটু ও কাসাভুবুর নিয়ন্ত্রণে লিওপোল্ডভিল থাকলেও ওরিয়েন্টাল প্রদেশ লুমুম্বার সমর্থক ছিল। অপরদিকে কাটাঙ্গা প্রদেশে ছিল টিশোম্বের নেতৃত্ব। লুমুম্বার এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী এ্যান্টনী গিজেঞ্জা স্ট্যানলিভিলে এক স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন এবং লিওপোল্ডভিলের মোবুটু ও কাসাভুবু সরকারের আধিপত্য অস্বীকার করেন। লুমুম্বার হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। বিশেষত আফ্রো-এশিয়ান দেশগুলি এর ফলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত লিওপোল্ডভিলের কেন্দ্রীয় সরকার ও গিজেঞ্জার মধ্যে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৬১-র অগাস্ট মাসে ক্রিরিল আদৌলার নেতৃত্বে এক নতুন সরকার গঠিত হয় এবং গিজেঞ্জা আদৌলার মন্ত্রীসভায় উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। এর ফলে স্ট্যানলিভিলের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বন্ধ হয়। অবশ্য এই আন্দোলন কখনই কাটাঙ্গার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সমগোত্রীয় ছিল না। যাইহোক আদৌলা সরকারের প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল কাটাঙ্গার বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন করা।

কাটাঙ্গার বিচ্ছিন্নতাবাদ রাষ্ট্রসংঘের কাছে এক বৃহৎ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘ কঙ্গোর গৃহযুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা করলেও কাটাঙ্গার বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের বিশেষ চেষ্টা করেনি। আর কঙ্গো সরকার কাটাঙ্গার বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়েছে। যাইহোক কাটাঙ্গার সৈন্যবাহিনীতে অনেক সুশিক্ষিত বিদেশী ভাড়াটে সৈন্য ছিল। তাদের অপসারিত করে রাষ্ট্রসংঘ শান্তি স্থাপনে উদ্যোগ নিলে কাটাঙ্গার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয়। এদিকে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টিশোম্বেকে সমর্থন করে। কঙ্গো থেকে বেলজিয়ান সৈন্য অপসারিত করার জন্য দুই আফ্রিকান রাষ্ট্র ঘানা এবং গিনি চাপ সৃষ্টি করে। টিশোম্বে এলিজাবেথভিলের বিদ্রোহী নেতা মুনোনগোর সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাস্তব পরিস্থিতির তদন্ত এবং টিশোম্বের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে মহাসচিব দাগ হ্যামারশিল্ড কাটাঙ্গা অভিমুখে যাত্রা করলে ১৯৬১ সালে ১৮ই নভেম্বর এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়।

হ্যামারশিল্ডের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রসংঘের নতুন মহাসচিব উ থান্ট নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বান করেন। নিরাপত্তা পরিষদের সভায় কঙ্গো থেকে সকল প্রকার সৈন্য, আধাসামরিক বাহিনী এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদের অপসারণের জন্য রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক সমর্থিত হয়। উ থান্ট কাটাঙ্গার রাজধানী এলিজাবেথভিলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীকে নির্দেশ দেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কাটাঙ্গার ওপর রাষ্ট্রসংঘের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তাঁর এই উদ্দেশ্যের সাফল্যলাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে গ্রেট ব্রিটেন এবং বেলজিয়াম। এই দুটি দেশ কাটাঙ্গার সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদের ওপর প্রচুর অর্থ লগ্নী করে রাখায় তারা কাটাঙ্গার ওপর রাষ্ট্রসংঘের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে।

উল্লেখযোগ্য যে, টিশোম্বের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সমর্থন ছিল। কারণ

তাদের কাছে টিশোম্বে কমিউনিস্ট বিরোধী নেতা হিসেবে পরিগণিত হতেন। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল টিশোম্বের মাধ্যমে কমিউনিস্ট বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করেন গিজেঙ্গা। যাই হোক, রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর অগ্রগতি টিশোম্বেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকারে বাধ্য করে (২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬১) এবং তিনি রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী কাটাঙ্গা থেকে সকল বিদেশী এবং ভাড়াটে সৈন্য অপসারণে রাজী হন। কাটাঙ্গা কঙ্গো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রস্তাব বাতিল করে এবং রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে আলোচনায় সম্মত হয়।

উপরি-উক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে টিশোম্বের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয় এবং রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব উ থাণ্ট কঙ্গোর ঐক্য সম্পর্কে এক প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, কাটাঙ্গার খনিজ সম্পদ থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব কেন্দ্র ও কাটাঙ্গার মধ্যে সমান হারে ভাগ করা হবে। কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কাটাঙ্গার সৈন্যবাহিনীকে যোগ করা হবে। কাটাঙ্গার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা হবে। রাষ্ট্রসংঘ অন্যভাবেও কাটাঙ্গার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। কাটাঙ্গাকে জানানো হয় যে, রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব অস্বীকার করা হলে কাটাঙ্গাকে আর্থিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বর্জন করা হবে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন এবং বেলজিয়াম এ ধরনের কঠোরতার বিরোধী ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিশোম্বে রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব স্বীকার করে নেন। কিন্তু কঙ্গোর আদৌলা সরকার কাটাঙ্গায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সফল হননি। আদৌলা ও টিশোম্বের মধ্যে স্বাক্ষরিত কিটোনা চুক্তি কার্যকর করার ব্যাপারেও নির্দিষ্ট সির্দ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই কঙ্গোয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পুনরায় প্রকট হয়ে ওঠে। টিশোম্বের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘ অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করে। এ বছরের শেষে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর সঙ্গে কাটাঙ্গার সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয়। ২৮শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী কাটাঙ্গার রাজধানী এলিজাবেথভিল দখল করে। টিশোম্বে ইউরোপে পলায়ন করেন। ১৯৬৩ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে আদৌলা মন্ত্রীসভায় তিনজন কাটাঙ্গানকে অন্তর্ভুক্ত করা সত্ত্বেও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থনৈতিক সমস্যা এবং অনৈক্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এই অবস্থায় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুনের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘ কঙ্গো থেকে তার সমস্ত সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়। কঙ্গোর অবস্থার অবনতি রোধ করার যে উদ্দেশ্য নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীকে কঙ্গোয় মোতায়েন করা হয়েছিল তা সফল হল না। কঙ্গোয় অভ্যন্তরীণ ঐক্যের পরিবর্তে নবপর্যায়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে টিশোম্বে ইউরোপ থেকে কঙ্গোয় প্রত্যাবর্তন করেন। কঙ্গোর পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় যখন রাষ্ট্রপতি কাসাভুবু টিশোম্বেকে ১৯৬৪ খ্রিঃ জুলাই মাসে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। টিশোম্বে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার সমর্থন সংগ্রহের মাধ্যমে রাজনৈতিক জোট গঠনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। গিজেঙ্গা স্ট্যানলিভিলে নতুন বিরোধী দল গড়ে তোলেন। আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দুই বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে মীমাংসা হয় না। টিশোম্বে দক্ষিণ আফ্রিকা ও বেলর্জিয়ামের ভাড়াটে সৈন্যদের সহায়তায় স্টানলিভিলের বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন তাঁকে সমর্থন করে। বিদ্রোহে বহু মানুষের মৃত্যু ও তাঁর পূর্বকীর্তি টিশোম্বের জনপ্রিয়তা হ্রাস করে। ১৯৬৪ খ্রিঃ টিশোম্বে কায়রোয় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যোগদানের ইচ্ছা

প্রকাশ করলেও অন্যান্য বহু দেশের বিরোধিতায় তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। আফ্রিকার যে সকল দেশ টিশোম্বের বিরোধী ছিল তারা স্ট্যানলিভিল সরকারকে যথাযথ সাহায্য করতে শুরু করে। ১৯৬৫ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে টিশোম্বে নির্বাচনে জয়লাভ করে মন্ত্রিসভা গঠন করলেও কিছুদিন পর কাসাভুবু তাঁকে অপসারিত করেন। জেনারেল মোবুটু এক সামরিক উত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করে ক্ষমতা দখল করেন এবং কঙ্গোয় সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। টিশোম্বে চিরদিনের জন্য কঙ্গো ত্যাগ করেন। যদিও পুনরায় ক্ষমতালাভের এক ব্যর্থ চেষ্টা তিনি করেছিলেন। ১৯৬৭ খ্রিঃ ১লা জুলাই টিশোম্বের বিমানকে ঘুরিয়ে আলজিরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাঁকে বন্দী রাখা হয়। কাটাঙ্গার সঙ্কট রাষ্ট্রসংঘের দুর্বলতাকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। টিশোম্বের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণে দুর্বলতা কাটাঙ্গার চক্রান্তের সুযোগ বৃদ্ধি করেছিল। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব কার্যকরী করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধির নিষ্ক্রিয়তা লুমুম্বা হত্যার ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছিল। কঙ্গো সঙ্কট প্রমাণ করেছিল যে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে মতৈক্য ব্যতীত আন্তর্জাতিক সঙ্কট সমাধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে সাফল্যলাভ সম্ভব নয়।

কঙ্গো সঙ্কট এই সত্য প্রতীয়মান করেছিল যে একটি অনুন্নত অর্থনীতি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বহুবিধ আঞ্চলিক তারতম্য, শিক্ষিত শ্রেণির অভাব প্রভৃতি সমস্যাসঙ্কুল কঙ্গোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি শক্তিশালী একনায়কতান্ত্রিক সরকারের প্রয়োজন। সামরিক উত্থানের মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতা দখল করে জেনারেল মোবুটু কঙ্গোবাসীকে সেই ধরনের সরকার দিতে চেয়েছিলেন। ফলে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে। কঙ্গোবাসীরা প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ইউরোপীয় মালিকানাধীন খনিগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে অর্থনীতি অনেকটাই উন্নত হয়। তবে সত্তরের দশকের শেষের দিকে কঙ্গোয় কিছু সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে কঙ্গোর নতুন নামকরণ হয় জাইর। ১৯৭৭ সালে এ্যাঙ্গোলাস্থিত ‘কঙ্গোলীজ ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্ট’ কাটাঙ্গায় (১৯৭২ থেকে এর নতুন নামকরণ হয়েছিল সাবা) দুটি বৃহৎ অভিযান চালায় যাতে পরোক্ষভাবে এ্যাঙ্গোলা সরকারের সহায়তা ছিল। দুটি ক্ষেত্রেই জাইরের মিত্ররাষ্ট্রগুলির হস্তক্ষেপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিল। এই সাহায্যের বেশিরভাগটাই এসেছিল ১৯৭৭-এ মরক্কোর কাছ থেকে এবং ১৯৭৮-এ ফ্রান্সের কাছ থেকে। তবে এই ঘটনা আফ্রিকান এবং ইউরোপীয়ান জনগোষ্ঠীর ওপর আঘাত হিসেবে নেমে এসেছিল। ১৯৭৫ সালের পর থেকে জাইরের অর্থনীতিও সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। বিশ্ববাজারে তামার মূল্য হ্রাস এবং দুর্ভিক্ষ ব্যয়সাধ্য খাদ্য আমদানীতে বাধ্য করেছিল। দারিদ্র ও বেকারত্ব দেশের অভ্যন্তরে মোবুটুর জনপ্রিয়তা হ্রাস করেছিল তেমনি দেশের বাইরেও তিনি তাঁর একনায়কতান্ত্রিক সরকার এবং বিশাল ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য সমালোচিত হচ্ছিলেন। নব্বই-এর দশকে মোবুটু একটি বহুদলীয় সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রক্ষা করা হয়নি। মোবুটুর শাসন আরো দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে থাকে। রোয়ান্ডা সরকার সমর্থিত লরেন্ট কাবিলার নেতৃত্বে বিদ্রোহী বাহিনী শক্তি সঞ্চয় করে এবং ১৯৯৬-এর শেষে পূর্ব-জাইরের বৃহত্তর অংশে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৭ সালে জাইরের নাম হয় ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অফ দ্যা কঙ্গো। ২০০১ সালে কাবিলা নিহত হন এবং তাঁর পুত্র জোসেফ কাবিলা ক্ষমতা দখল করেন।

৩.৪ ❑ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

২। কঙ্গো সঙ্কটের সূত্রপাত কিভাবে হয়? এই সঙ্কটের পরিণতি কি হয়েছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৯৫৪-১৯৬২ খ্রিঃ) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২। কঙ্গোর গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। স্বাধীন আলজিরিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

২। 'আলজিয়ার্সের যুদ্ধ' কি?

৩। প্যাট্রিস লুমুম্বা কে ছিলেন?

৩.৫ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১। পিটার কালভোকোরেসি, ওয়াল্ড পলিটিক্স সিনস্ নাইনটিন ফরটি ফাইভ।

২। উইলিয়ম আর. কেলর, এ ওয়ার্ল্ড অফ নেশনস : দি ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার সিনস্ নাইনটিন ফরটি ফাইভ।

৩। জে. জি. হারগ্রীভস—ডিকলোনাইজেশন ইন আফ্রিকা।

৪। চার্লস রবার্ট এগেরন—মডার্ন আলজিরিয়া : এ হিস্ট্রি ফ্রম এইটটিন থার্টি টু দ্য প্রেজেন্ট।

ইতিহাস—ষষ্ঠ পত্র

পর্যায়—৩

একক ১ ❑ ঔপনিবেশিকতাবাদ গঠন

গঠন

১.১ ঔপনিবেশিকতাবাদ

১.২ ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলন

১.৩ ঔপনিবেশিকতাবাদের অবনয়ন

১.১ ❑ ঔপনিবেশিকতাবাদ

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস আলেচনা করতে গেলে 'সাম্রাজ্যবাদ' বা 'উপনিবেশবাদ' এর কথা অনিবার্য ভাবেই এসে যায়। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের ধারাবাহিক ইতিহাস চর্চা করতে গেলে দেখা যায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যত্তি(স্বাতন্ত্র্যবাদ, এবং গণতন্ত্রের সাথে সাথে জন্ম নেয় বাণিজ্যের তথা শত্তি(সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা। ধনতন্ত্রের বিকাশ উত্তর আতলান্টিক উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিকে প্রযুত্তি(, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগ্রত দেশগুলি নিজেদের প্রয়োজনে এশিয়া আফ্রিকার অপে(াকৃত অনুন্নত দেশগুলিতে সামরিক অভিযান চালায়। এই প্রক্রিয়াকরণ চলতে থাকে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ(ত্রে যে দেশগুলির ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল গ্রেট ব্রিটেন। ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, নেদারল্যান্ড ইত্যাদি। যদিও এশিয়ার বেশ কয়েকটি সাম্রাজ্য তখনও তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল কয়েকটি কারণে। প্রথমত ''buffer states'' বলে খ্যাত কিছু অঞ্চল। দ্বিতীয়ত, আয়তন বা গুরুত্বের দিক দিয়ে যারা একেবারেই নগণ্য। এ প্রসঙ্গে ইথিওপিয়ার নাম উল্লেখ্য। করাণ একমাত্র ''Non-Europe'' এই দেশটি সমর্থ হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী স্পেনকে পরাজিত করতে।

অন্যদিকে মার্কিন যুত্ত(রাষ্ট্র এইসময় সম্প্রসারণ নীতিতে উৎসাহী ছিল না। যার ফলে কানাডা ছাড়া ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও দ(ণ আমেরিকায় বেশ কতগুলি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেখা যায়। যদিও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এরা উন্নত দেশগুলির মুখাপে(ী ছিল। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে প্রভুত্ব বিস্তারে ব্রতী হয়েছিল। দ(ণ আমেরিকায় এর চূড়ান্ত নগ্নরূপ প্রকাশ পায়। কিন্তু ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের নভেম্বর বিপ-ব কিছু দিনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন স্থগিত করেছিল।

সুতরাং দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদ হল পিরামিড সদৃশ ব্যবস্থা যার একেবারে নিচের স্তরে আছে 'Non European' মহাদেশগুলি এবং উপরের স্তরে পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক শত্তি(সংঘ। এই অবস্থা বি(কে দুটি শিবিরে বিভত্ত(করে। ইম্যানুয়েল ওয়ালার্স্টাইন এই অবস্থাকে 'core-periphery' তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, 'core' বা ঔপনিবেশিকবাদী দেশসমূহ 'periphery' বা প্রান্তীয় উপনিবেশগুলির উপর এক অভাবনীয় আগ্রাসী শোষণমুখী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়। লেনিনের মতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অনুন্নত দেশে শুধু পণ্যই যে রপ্তানী করে তা নয়, পুঁজিও রপ্তানী করে।

১.২ ❑ ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখা যায় তৃতীয় বিশ্বে মোটামোটি ভাবে প্রত্য(বা পরো(ভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির করতলগত। পাশ্চাত্য দেশগুলির কাছে উপনিবেশগুলি ছিল সস্তায় কাচামাল খনিজ পদার্থ যোগানের উপল(মাত্র। যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি(এবং উপনিবেশ বা আধাউপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। শোষণের সাথে সাথে মাঝে মধ্যে স্বল্প পরিমাণ সুযোগসুবিধার ধারাও ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বজায় রেখেছিল নিজেদের কর্তৃত্বের শিকড়কে শক্তি(শালী করার জন্য।

যার ফলে দেখা যায় পাশ্চাত্য শাসনব্যবস্থা, উৎপাদিত দ্রব্যের হাত ধরে পাশ্চাত্য 'ধ্যানধারণা' এবং 'জাতীয়তাবাদ' উপনিবেশগুলিতে সঞ্চারিত হয়। এশিয়া, আফ্রিকার মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে তাদের অবস্থানগত বৈষম্যের সাথে যা তাদের পরিচালিত করে রাজনৈতিক ল(্যের দিকে। ফলত, সংখ্যায় অতি নগণ্য হলেও, পাশ্চাত্য শি(ায় শি(িত যুব সম্প্রদায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে উপনিবেশগুলিতে। এই আন্দোলন কখনো সম্মুখীন হয়েছে নৃশংস প্রতিরোধের সামনে আবার কখনো আপোষের মাধ্যমে কায়েমি স্বার্থ তাদের প্রতিবাদী চরিত্রকে থমকে দিতে চেয়েছে।

যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই উপনিবেশগুলিতে বি(োভের আলো দেখা দিলেও এর ভয়াবহ রূপ দেখা দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে। আবার প্রতিবাদী আন্দোলনগুলির চরিত্র ছিল খানিকটা জটিল। কারণ এই আন্দোলনে আমরা দুটি পরষ্পর বিরোধী শিবির অর্থাৎ একদিকে পাশ্চাত্য শি(ায় শি(িত যুব সম্প্রদায় অন্যদিকে সনাতনপন্থীরা, যাদের মধ্যে দ্বিমতের অবকাশ ছিল অনেক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সব থেকে প্রাচীন ও বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি(বলে খ্যাত গ্রেট ব্রিটেন বেশ কিছু উপনিবেশের যেমন—কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এর স্বাধীনতাকে মেনে নিয়েছিল তবে আয়ার্ল্যান্ডে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

ভারতের জাতীয়বাদী আন্দোলন আন্তর্জাতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রবল অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক অধিকার এবং সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবাদ সারা ভারতে সরব হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। তবে প্রথমদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন পাশ্চাত্য শি(িত 'এলিট' সম্প্রদায় যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসনতান্ত্রিক সংস্কার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। যদিও ভারতের অগণিত অশি(িত, কুসংস্কারচ্ছন্ন মানুষ ছিল তাদের আন্দোলনের বাইরে। এই প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে সব থেকে দূরহ কাজ ছিল সনাতনপন্থী ভারতবাসীর মূল ভাবনায় আঘাত না দিয়ে, তাদের আধুনিক ভাবাদর্শে দী(িত করে আন্দোলনে সামিল করা।

ব্রিটিশ রাজশক্তি(র উদ্দেশ্য প্রণোদিত বঙ্গভঙ্গের চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রথম ভারতবর্ষের সাধারন জনগণ রাজনৈতিক মঞ্চে উঠে আসে। ল(ণীয় যে এই সময় হিন্দুত্ববাদকে সামনে রাখার ফলে সনাতনপন্থী জনগণ দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে নিজেদের আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিল। পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলিও তাদের অনুপ্রাণিত করছিল। যদিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন এর ফলে হয়নি। কিন্তু তারা ভারতবাসীর দাবী সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল। এবং কংগ্রেস প্রথম ১৯০৬ সালে 'স্বরাজ' এর দাবী তুলেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত হতাশা ও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ-বের প্রভাবে উপনিবেশসমূহে জাতীয় আন্দোলনের

তরঙ্গ পুনরায় ছড়িয়ে পড়ল। মিশরে 'Wafd' নামে পরিচিত এক রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। তিনবছর সংগ্রামের পর ব্রিটিশরা বাধ্য হয় মিশরে প্রত্য(শাসনের অবসান ঘটাতে।

ভারতবর্ষের মাটিতেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে। যদিও আন্দোলনের করাণ হিসাবে তুলে ধরা হয় জালিওয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদকে। কিন্তু প্রধানত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আপামর ভারতবাসীর সমর্থনে ও সহযোগিতায় ‘স্বরাজ’ দাবিকে ইংরেজদের সামনে তুলে ধরা। কিছু সময়ের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল এই আন্দোলন। সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল আন্দোলন। ব্রিটিশ সরকার সজাগ হয়ে উঠল ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। দ্বিতীয় গণ আন্দোলন সংগঠিত হয় ১৯৩০ এর দশকে। যার ফলে ব্রিটিশ সরকার পাশ করেন ১৯৩৫ এর আইন। এরপর ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় জাতীয়বাদী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

অন্যান্য উপনিবেশগুলিতেও গণ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ফ্রান্সের ইসলামিক উপনিবেশগুলিতে (আলজেরিয়া, মরক্কো) গণ আন্দোলনগুলি আধুনিক রূপে দেখা দেয়। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে দীি(ত ইন্দোনেশিয়ায় আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যদিও ডাচ্‌রা আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সফল হয়। কারণ হিসেবে বলা যায় বিপ্‌-বী দলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব যা তাদের ঐক্যবন্ধ সংগ্রাম ঘটাতে সফল করতে পারেনি। অন্যদিকে ত্রিনিদাদ, জামাইকা প্রভৃতি উপনিবেশেও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এক সংঘবন্ধ রূপ ধারণ করে।

বিভিন্ন আফ্রিকান উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। শিি(ত আফ্রিকান যুব সম্প্রদায় বিভিন্ন নব উদ্ভূত সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার চালাতে থাকেন। তাদের আক্রমণের ল(্যগুলি হল পুলিশ প্রশাসন সামাজিক বৈষম্য, বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক দুর্দশার বিরুদ্ধে কেনিয়ার Jomo kenyatta, নাইজেরিয়ার Dr. Nanodi Azikiwe এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তাঁরা প্রধানত মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রের 'black movement' আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বি(শ্বযুদ্ধের আগে দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদ তার অন্তিম লগ্নে উপস্থিত। এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্য অধিনায়কদের হাতে দুটি পথ খোলা ছিল আন্দোলনকারীদের কাছে নিজ পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া অথবা প্রাণপণ শক্তি দিয়ে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হওয়া।

ব্রিটেন ১৯৪০ এবং ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত তার গতি অব্যাহত রেখেছিল। এরপরে ‘কমনওয়েলথ-এ’ তার অধীনস্থ উপনিবেশগুলির সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়। আমেরিকা যুক্ত(রাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকা ও ফিলিপন্‌সে এই পথ অনুসরণ করে। ডাচ্‌রা ইন্দোনেশিয়ায় আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিলেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ফ্রান্স শেষবারের মত ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সাহায্যে ভিয়েতনাম আক্রমণ চালায়। কিন্তু ১৯৫৪ সালে তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। কিন্তু আমেরিকা বহুদিন পর্যন্ত দি(ণ ভিয়েতনামে তার শাসন অ(্ন রেখেছিল। অবশেষে দশ বছর রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমেরিকা পরাজয় বহন করে।

ইতিমধ্যে ইসলামীয় উপনিবেশগুলিতে অর্থাৎ পারস্য থেকে মরক্কো পর্যন্ত অঞ্চলে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিশেষত তেল ভাণ্ডারকেন্দ্রীক অঞ্চলগুলিতে আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। যেমন—ইরান। মিশরে নাসের এর নেতৃত্বে বি(োভ জোরদার হয়ে ওঠে। একইরকম ভাবে সিরিয়া ও ইরাকেও আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলনের কাছে নতিস্বীকারে বাধ্য হয় ফ্রান্স ও ব্রিটেন।

কেনিয়াতে ঘনঘন বি(াভ ও গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চলতে থাকে। যা মাও মাও (১৯৫০-৫৬) আন্দোলন বলে খ্যাত। ঘানাতেও আন্দোলন চলতে থাকে Kwame Nkrumah এর নেতৃত্বে।

এইভাবে দেখা যায় দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তূপ। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বি(েজয়ের পরিকল্পনা ও চেষ্টা শেষ হয়ে যায় গণ আন্দোলনের প্রতিরোধের সামনে।

১.৩ ❑ ঔপনিবেশিকতাবাদের অবনয়ন

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই তৃতীয় বি(ের বিভিন্ন জায়গায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিবর্তিত হতে থাকে। উপরোক্ত(আলোচনায় আমরা দেখলাম ভারত সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ এবং আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কি তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

যদিও ১৯৪৭ সালে ব্রিটেন অখণ্ডিত ভারতকে (মতা হস্তান্তর করতে পারেনি। ভারত বিভাজনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। হিংসাত্মক ঘটনাবলি বিভাজনকে অনিবার্য করে তুলেছিল। বাস্তুছাড়া হয়েছিল বহু মানুষ।

ব্রিটেন, শ্রীলঙ্কা, বার্মা এবং প্যালেস্টাইনে তার (মতা হস্তান্তর করে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। ইতিমধ্যে জাপান তার সাম্রাজ্য হারায় ১৯৪৫ সালে অমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। মালয় স্বাধীনতা অর্জন করেছিল অপে(াকৃত দেরিতে। ১৯৫৭ সালে মালয় স্বাধীন হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে গেরিলা পদ্ধতিতে চিনের সাথে যুদ্ধের ফলবাবদ ব্রিটেন পরাজিত হয়। সুতরাং ১৯৫০ এর মধ্যে একমাত্র ইন্দোচীন ছাড়া এশিয়া থেকে উপনিবেশবাদের অবসান হয়।

এরই মধ্যে ইসলামীয় উপনিবেশগুলিতে ঘনঘন বি(াভ। বিদ্রোহ পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করে তোলে। একমাত্র পর্তুগাল বহুদিন পর্যন্ত তার সাম্রাজ্যবাদ প্রক্রিয়া অ(্ণ রেখেছিল। কারণ— পর্তুগালের অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল আফ্রিকান সম্পদের ওপর। এই সমস্ত উদ্যত প্রতিরোধগুলিকে প্রতিহত করতে ব্রিটিশ, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ১৯৬১-৬২ এর মধ্যে নিজেদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটায়। এইভাবে দেখা যায় মধ্য ও দ(ণ আফ্রিকা ছাড়া ১৯৭০ সালের মধ্যে সমস্ত উপনিবেশগুলিতেই সামাজ্যবাদের অবসান ঘটে।

প্রাথমিকভাবে, de-colonization এর কারণ দুটি। প্রথমত, অর্থনৈতিকভাবে এটি অত্যন্ত ব্যয় সাপে(এবং রাজনৈতিকভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত করাও ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির প(সম্ভব ছিল না। এর ফলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রত্যাহত করে পরো(ভাবে নিজেদের প্রভাব অ(্ণ রাখাকে শ্রেয় মনে করল। de-colonization দ্রুততর গতিতে প্রয়োগ করার জন্য জাতিপুঞ্জ এগিয়ে এল।

এইভাবে দেখা যায় কখনোও রক্তাক্ত বি(াভ অথবা শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় de-colonization চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৮০ এর দশকে। এশিয়া মহাদেশের বহু স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম নেয়। এরমধ্যে অনেকে জাতিপুঞ্জের সদস্য। ১৯৫৫ সালে এশিয়ার ৭টি দেশ থেকে ১৯৭৭ সালে দাড়ায় ১১তে। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি আজ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং এই প্রক্রিয়াকরণে জাতিপুঞ্জের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

❑ গ্রন্থ পরিচিতি

Anderson, Benedict : Imagined Communities : Reflection on the Origins and Speread of Nationalism.

Eugeno kim, CJ

Szieing Lawrence : An Introduction to Asion Politics.

Frankel. J. The Making of Foreign policy.

International Relations in a Changing W orld.

D. C. Bhattacharyya : International Relations since the Twentieth Century.

❑ অনুশীলনী

১। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন কীভাবে অন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করে?

২। সাম্রাজ্যবাদের অবনয়ন বলতে কি বোঝায়?

একক ২ ❑ নিরস্ত্রীকরণ

গঠন

২.১ নিরস্ত্রীকরণ
২.২ নিরস্ত্রীকরণের প্রাথমিক পর্যায়
২.৩ প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র কমিশন
২.৪ নিরস্ত্রীকরণের জন্য বিবিধ উদ্যোগ
২.৫ সার্বিক পারমাণবিক পরী(া নিষিদ্ধকরণ চুক্তি

২.১ ❑ নিরস্ত্রীকরণ

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা র(ার ে(ত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিকল্পনায় তিনটি পর্যায়ের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই তিনটি পর্যায় হল (ক) বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা (খ) সমষ্টিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং (গ) নিরস্ত্রীকরণ। সুতরাং নিরস্ত্রীকরণ হল বি(েশান্তি সংর(ণের ে(ত্রে তৃতীয় পর্যায়ের ব্যবস্থা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে বিধ্বংসী দ্বিতীয় বি(েযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে। স্বভাবতই বি(েবাসীকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে র(া করতে জাতিপুঞ্জ অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অঙ্গিকার সূত্রে জাতিপুঞ্জ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এমন একটি পৃথিবী গড়ে তুলতে চয়ে যেখানে মারণাস্ত্র সমূহকে ধংস্ব করা হবে। স্বভাবতই পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এ প্রসঙ্গে নিরস্ত্রীকরণের ধারণা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। নিরস্ত্রীকরণ বলতে অস্ত্রশস্ত্রের সম্পূর্ণ বাতিলকরণ বোঝাতে পারে। কিন্তু এই অর্থে নিরস্ত্রীকরণ বর্তমান দুনিয়ায় একরকম অসম্ভব। কারণ একচেটিয়া জাতীয় (মতার ধারণা এখনও অব্যাহত। সুতরাং বর্তমান অস্ত্রশস্ত্রের আংশিক ও পর্যায় ক্রমিক হ্রাসকরণ নিরস্ত্রীকরণ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। নিরস্ত্রীকরণের এই ধারণা সঠিক অর্থে অস্ত্রশস্ত্র সীমিতকরণ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। তবে আদর্শগত ভাবে বলা যায় যে, অস্ত্র সম্ভার সৃষ্টির ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকা দরকার। এ প্রসঙ্গো আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। উত্তেজনাপ্রবণ অঞ্চলে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ নিষিদ্ধ হওয়া দরকার। কারণ এই সমস্ত অঞ্চলে অস্ত্রের আমদানী সশস্ত্র সংঘর্ষকে অনিবার্য করে তুলবে। সুতরাং নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টি ব্যাপকভাবে অর্থবহ। স্বভাবতই নিরস্ত্রীকরণে কর্মসূচিও বিশেষভাবে বিস্তৃত। তেমনি আবার নিরস্ত্রীকরণের কর্মসূচিকে কার্যকর করার বাধাও বিস্তর।

২.২ ❑ নিরস্ত্রীকরণের প্রাথমিক পর্যায়

রাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করার ব্যাপারে জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল। কিন্তু জাতিসংঘের ব্যর্থতার সাথে দ্বিতীয় বি(েযুদ্ধের সূচনা এবং তারই পরিপ্রে(িতে ১৯৪৬ সালের ৬ই ও ৯ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা

ও নাগাসাকিতে মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ। কিন্তু এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটার আগেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ রচনার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এই কারণে নিরস্ত্রীকরণের ওপর সনদে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয় বি(েযুদ্ধের পরবর্তীকালে নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাটি স্বমহিমায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ ইতিমধ্যে পারমাণবিক শক্তি মানুষের করায়ত্ত হয়েছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে। এখানে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাশ হয়। প্রস্তাবে আণবিক শক্তি(র ওপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের এবং আনবিক অস্ত্রের অবসানের কথা বলা হয়। 'পারমাণবিক শক্তি কমিশন' নামে কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের সদস্যরা হলেন নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্য এবং কানাডা। মূলত তিনটি উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ণের দায়িত্ব এই কমিশনের উপরে বর্তায়। এই তিনটি উদ্দেশ্য হল

(ক) শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য পারমাণবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা। (খ) ব্যাপকভাবে ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রকে বিলুপ্ত করা এবং (গ) এ বিষয়ে ফাঁকি দেওয়া ধরার জন্য পরিদর্শন ও বলবৎকরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বলা হল যে, এই প্রতিবেদন পেশ করবে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে।

পারমাণবিক শক্তি কমিশনে মার্কিন যক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত পার্থক্য প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে এই কমিশনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ছিল পৃথিবীর একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র। পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি পরিকল্পনা পেশ করে। এই পরিকল্পনা 'বারুচ পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনায় পারমাণবিক শক্তিকে আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বাধীনে রাখার কথা বলা হয়। তদনুসারে একটি কর্তৃপ(গঠন করার কথা বলা হয়। এই কর্তৃপ(টি হল 'আন্তর্জাতিক পারমাণবিক উন্নয়ন কর্তৃপ('। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারুচ পরিকল্পনার মাধ্যমে এই কর্তৃপ(কে পারমাণবিক ((ত্রে পর্যাপ্ত (মতা প্রদানের প্রস্তাব করেছিল। কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কখনোই এত ব্যাপক (মতা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়নি।

এর প্রত্যুত্তরে সোভিয়েত ইউনিয়ন 'গ্রোমাইকা প্রস্তাব' পেশ করে। এখানে বলা হয় পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন ও প্রয়োগ হল মানবতার বিরুদ্ধে একটি গর্হিত আন্তর্জাতিক অপরাধ। এখানে পারমাণবিক শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে এরকম অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়ন সার্বভৌমিকতার যুক্তি দেখিয়ে পারমাণবিক শক্তির উপর আন্তর্জাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করল। আবার পারমাণবিক শক্তির প্র(ে আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা অমান্য করার অপরাধে অমান্যকারীর শাস্তি ভেটো (মতা প্রয়োগ করে আটকানো যাবে না সম্পর্কিত মার্কিন প্রস্তাবকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্বীকার করল। প্রথমেই যাবতীয় পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করার সোভিয়েত প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করল না। তারফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের আশংকা দৃঢ়মূল হল। এভাবে জাতিপুঞ্জের প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থ হল।

২.৩ ❑ প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র কমিশন

১৯৪৭ ফেব্রুয়ারি মাসে নিরাপত্তা পরিষদ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পারে একটি কমিশন গঠন করে। এটি 'প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র কমিশন' নামে পরিচিত। উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা। কমিশনটি গঠিত হয় নিরাপত্তা পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দকে নিয়ে।

এই কমিশন আগস্ট মাসে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এতে বলা হয় যে, অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করার জন্য আন্তর্জাতিক (ে ত্রে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা। বি(ে স্ততা ও নিরাপত্তার ধারণা গড়ে তোলা দরকার। আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি অবলম্বনের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা।

এই প্রতিবেদনটি সাধারণ সভা সমর্থন করলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন করেনি। নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে প্রথম পদ(ে প হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি প্রস্তাব সাধারণ সভায় পেশ করে। এখানে বলা হয় যে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যসমূহের স্থল, জল ও বিমান বাহিনীর শক্তির সার্মথ্য এক তৃতীয়াংশ কমাতে হবে। এই প্রস্তাব বিচার বিবেচনার জন্য সাধারন সভা প্রচলিত অস্ত্র কমিশনকে জানায়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং তার যথার্থতা বাছাই করার পদ্ধতি প্রসঙ্গে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পেশ করতে কমিশনকে বলা হয়।

কমিশন নিরাপত্তা পরিষদের বিচার বিবেচনার জন্য প্রতিবেদন পেশ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সামরিক শক্তি প্রসঙ্গে কোন তথ্য দিতে অসম্মতি জানায় এবং ডেটো প্রয়োগ করে। তারফলে প্রতিবেদনটি বাতিল হয়ে যায়। নিরাপত্তা পরিষদে পাশ না হওয়ায় প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র কমিশনের সিদ্ধান্ত অর্থহীন হয়ে যায়।

২.৪ ❑ নিরস্ত্রীকরণের জন্য বিবিধ উদ্যোগ

নিরস্ত্রীকরণের (ে ত্রে পূর্ববর্তী উদ্যোগ সমূহের ব্যর্থতা বি(ে র শান্তিকামী মানুষের মনে হতাশার সৃষ্টি করেছে। তবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগে আয়োজন অব্যাহত থেকেছে। তবে নিরস্ত্রীকরণের সাথে প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দিয়েছে পূর্ব পশ্চিম বিরোধ বা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অবি(ে াসী সম্পর্ক, উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক ও সম্পর্কের অবনতি। তবে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটে স্তালিনের প্রয়াণের পর।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রচলিত সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র ও পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের জন্য স্বতন্ত্র কমিশন গঠনের মাধ্যমেই নিরস্ত্রীকরণের (ে ত্রে অধিকতর অভিপ্রেত সাফল্য পাওয়া যাবে। অবশেষে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ১৯৫২ সালে জানুয়ারি মাসে একটি কমিশন গঠিত হয়। এটি 'নিরস্ত্রীকরণ কমিশন' নামে পরিচিত। কমিশনটি গঠিত হয় নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্য ও কানাডাকে নিয়ে।

ওই বছর মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স একটি প্রস্তাব পেশ করে। এই প্রস্তাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার কথা বলা হয়। রাষ্ট্রবর্গের এই প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকার বা সমর্থন করেনি। মার্কিন

অভিমত অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকা অবশ্যক। এবং প্রকাশিত তথ্যের যথার্থতা বাছাই করা আবশ্যক, যা সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন করেননি।

নিরস্ত্রীকরণের জন্য একটি উপসমিতি গঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। এর সদস্যরা হলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। এর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সঙ্গোপনে আলাপ আলোচনা চালিয়ে একটি সর্বজন গ্রাহ্য প্রস্তাব প্রণয়ন করা। কিন্তু এই ব্যাপারে কোন সর্বজন গ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি।

এরপর ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধানরা একটি শীর্ষ সম্মেলনে সমবেত হন। কিন্তু এই বৈঠকও ব্যর্থ হয় ১৯৫৩ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসন হাওয়ার শান্তির জন্য পারমাণবিক শক্তির কর্মসূচি ঘোষণা করেন। উদ্দেশ্য ছিল অসামরিক (্রে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা। যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন একে সমর্থন করেননি। কিন্তু মার্কিন প্রস্তাব পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায় নি। পারমাণবিক শক্তিকে জনসাধারণের কল্যাণে ব্যবহার করার এই পরিকল্পনা একটি দ্বিপা(িক বিষয়ে পরিণত হয়। এই উদ্যোগ সুত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি(সংস্থা'।

১৯৫৭ সালে সাধারণ সভা পৃথিবীর শক্তিধর রাষ্ট্রের কাছে এক আবেদন জানায়। এই আবেদনে আণবিক বোমার পরী(মূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করার কথা বলা হয়। আবেদনে সাড়া দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট, গ্রেট ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৫৯ সালে সাধারণ সভায় সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী খুশ্চেভ একটি পরিকল্পনা পেশ করে। যাতে বলা হয় যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের যাবতীয় সামরিক শক্তি চার বছরের মধ্যে ধ্বংস করতে হবে। এই ব্যাপারে জেনেভায় আলাপ আলোচনা শুরু হয়, ১৯৫৯ সালে একটি নিরস্ত্রীকরণ কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্যসংখ্যা ছিল দশ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব অনতিবিলম্বে এই কমিটির একটি সভারও ব্যবস্থা করেন।

ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই এর তীব্রতা বহুলাংশে কমে এসেছে। ১৯৬১ সালে দশ সদশ্য বিশিষ্ট কমিটির পর সাধারণ সভা আঠারো জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সালে। অধিবেশনে একটি উপসমিতি গঠন করা হয়। এর সদস্যরা হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। পরী(ামূলক পারমাণবিক বিষ্ফোরণ বন্ধ করার ব্যাপারে উপায়-পদ্ধতি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রসমুহের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

ভূগর্ভে পরী(মূলক পারমাণবিক বিষ্ফোরণ নিষিদ্ধকরণের বিষয় ও উপায় পদ্ধতি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। মার্কিন প্রস্তাবে শুধুমাত্র জলে-স্থলে-বায়ুমণ্ডলে পরী(ামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করার কথা বলা হয়। 'আংশিক পারমাণবিক পরী(ামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধকরণ চুক্তি' নিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরে আলাপ আলোচনা চলল। ফ্রান্স ও চিন এই চুক্তিকে স্বীকার করেননি। এই দুই সদস্য ১৯৬৬ সালে পরী(ামূলক পারণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়।

কালক্রমে পৃথিবীর আরও অনেক রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করতে পারবে বলে আশংকা করা হয়। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ করার ব্যাপারে ১৯৬৬ সালে জেনেভায় আঠারোটি রাষ্ট্রের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐকমতে উপনীত হয়। এবং পারমাণবিক মারণাস্ত্রের প্রসার রোধে একটি চুক্তি সম্পাদন হয়। 'পারমাণবিক অস্ত্র প্রসাররোধে চুক্তি' (NPT) । চুক্তিতে পারমাণবিক শক্তির

ওপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ পরমাণু শক্তিধর দেশগুলির কর্তৃত্ব কায়েম রাখাই ছিল এই চুক্তির প্রচ্ছন্ন ল(্য। জাতিপুঞ্জে এই চুক্তিটি ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এই চুক্তিটি মানতে ভারতে সম্মত হয়নি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালে। প্রতি বছর জেনেভায় ছমাসের জন্য এই সম্মেলন আয়োজিত হয়। এই সম্মেলনের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত দুটি বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই দুটি বিষয় হল রাসায়নিক অস্ত্রশস্ত্র এবং ব্যাপকভাবে অস্ত্রশস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ। ১৯৭৮ সালে সাধারণ সভা নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে। এই অধিবেশনে নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে জাতিপুঞ্জের একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দপ্তরটি নিরস্ত্রীকরণের প(ে সমর্থন সৃষ্টির ব্যাপারে সক্রিয় হয়।

১৯৭২ সালে অন্তর্দেশীয় রকেট বিধ্বংসী (ে পনাস্ত্র ব্যবস্থা সীমিত করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সীমিত করার ব্যাপারে এই দুই শক্তির মধ্যে একটি চুক্তি সা(রিত হয়। এই চুক্তিটি SALT-I হিসাবে অভিহিত হয়। ১৯৭৯ সালে এ বিষয়ে দ্বিতীয় একটি চুক্তি সা(রিত হয় এই দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে। এই চুক্তিটি SALT-II নামে পরিচিত।

২.৫ ❑ সার্বিক পারমাণবিক পরী(া নিষিদ্ধ করণ চুক্তি, ১৯৯৬

১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় একটি বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগেই এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই ব্যাপারে অগ্রণি সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভারতও ছিল। প্রস্তাবটিতে সার্বিক পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরী(া নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে একটি চুক্তির কথা বলা হয়। ভারত তার প্রস্তাবে বলে যে, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের স্বার্থে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের উচিত নিজেদের এই অস্ত্র সম্ভারের অর্বসানের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

দীর্ঘ আলোচনার পর চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া তৈরি হল। পারমাণবিক বিস্ফোরণ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার কথা বলা হল। কিন্তু কম্পিউটার পরী(ার মাধ্যমে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রযুক্তিমূলক উন্নতি সাধনের উপর কোনোরকম বাধা নিষেধ রাখা হল না। পারমাণবিক অস্রশস্ত্রের প্রযুক্তিমূলক প্রকৌশল সকল রাষ্ট্রের নেই। পারমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্র পরী(ার অধিকার এই সমস্থ রাষ্ট্রের থাকল না।

ভারত চুক্তির এই খসড়াটি গ্রহণ করতে আপত্তি জানায়। ভারত তার আপত্তির কারণ ও সংশোধনী প্রস্তাব ব্যক্ত(করে। কিন্তু ভারতের সংশোধনী প্রস্তাব ও আপত্তিতে আমল দেওয়া হয়নি। ভারতের প্রস্তাব ছিল পারমাণবিক অস্ত্র সম্ভার সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পুরোপুরি ধ্বংস করতে হবে। এবং এ ব্যাপারে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলিকে অঙ্গীকারবন্ধ হতে হবে। ভারতের এই প্রস্তাবকে অবাস্তব কল্পনাবিলাস বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপহাস করে। এ ব্যাপারে জেনেভায় ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ভারতের ওপর এই চুক্তিটি চাপিয়ে দেবার ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়। কারণ আলোচ্য চুক্তিটির ১৪ ধারা অনুযায়ী সিটিবিটিকে কার্যকর করার জন্য অন্যান্য কিছু রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্মতিসূচক সা(রও অপরিহার্য বলে বলা হয়। চাপ সত্ত্বেও চুক্তিটি মেনে নিতে ভারত অস্বীকৃতি জানায়।

১৯৯৬ সালে সাধারণ সভায় সার্বিক পারমাণবিক পরী(া নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (CTBT) সংখ্যাধিক্যের ভোটে পাশ হয়। ভারত, ভুটান ও লিবিয়া বিপ(যায়। রাজস্থানের পোখরানে ভূগর্ভে ভারত আবার পাঁচটি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ১৯৯৮ সালের মে মাসে অনতিবিলম্বে পাকিস্থানও পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

সুতরাং সিটিবিটির উদ্দেশ্য হল পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহকে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রযুক্তিগত প্রকৌশলের উন্নতি সাধনের জন্য পরী(ামূলক বিস্ফোরণ থেকে বিরত করা। এবং এই ব্যবস্থার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে পারমাণবিক শক্তিহীন রাষ্ট্রগুলির চিরতরে পারমাণবিক শক্তি অর্জনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এই কারণে সমালোচকদের অভিমত অনযায়ী সিটিবিটিকে সার্বিক পারমাণবিক পরী(া নিষিদ্ধকরণ চুক্তি বলা যায় না।

❑ গ্রন্থ পরিচিতি

A. H. Ralert : Human Rights in the W orld.
Alan Janes : 'The Politics of Peaeckeeping.
F. H. Hartmen : The Relations of Nation.
L. Oppenheim : International Law.

❑ অনুশীলনী

১। সিটিবিটিকে কি সার্বিক পারমাণবিক পরী(া নিষিদ্ধকরণ চুক্তি বলা যায়?

২। নিরস্ত্রীকরণকে সার্থক করার (েত্রে জাতিপুঞ্জের ভূমিকা কি যথাযথ?

একক ৩ ❑ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

গঠন

৩.১ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উদ্ভব
৩.২ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও শান্তির(া
২.৩ শান্তির(া বাহিনী প্রয়োগের পদ্ধতি
৩.৪ জাতিপুঞ্জের শান্তির(া সংক্রান্ত ধারণা
৩.৫ মূল্যায়ন

৩.১ ❑ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্ভব

প্রথম বি(বযুদ্ধের বিভীষিকার পটভূমিকায় যেমন জাতিসংঘের উদ্ভব হয়েছিল ঠিক সেইভাবেই দ্বিতীয় বি(বযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নিয়েছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। ১৯৪১ সালে ৬ই জানুয়ারি মার্কিন কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের ঘোযনার মাধ্যমেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল। তাঁর ভাষণে যে চার প্রকার স্বাধীনতার কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন তা সর্বজনীনভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হল—

১। বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা
২। নিজস্ব পদ্ধতিতে ঈ(বের উপাসনার স্বাধীনতা
৩। অভাব থেকে মুক্তির স্বাধীনতা এবং
৪। ভীতি থেকে মুক্তির স্বাধীনতা

এই ধারণাসমূহের উপর ভিত্তি করেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় বি(বযুদ্ধের প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত ছিল। কিন্তু যদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ইওরোপের ঘটনাপ্রবাহের প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রপতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। ১৯৪১ সালের ১২ই জুন মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে একটি ঘোষণাপত্র সা(রিত হয়েছিল। এই সময় বহু দেশই পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতাকেই বি(ব শান্তির(ার প্রাথমিক শর্ত বলে মনে করেছিল। বস্তুত, মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা র(ার জন্য যুদ্ধের ভীতিমুক্ত এক পৃথিবী তখন আবশ্যিক ছিল। ১৯৪১ সালের ৯ই আগস্ট, রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট একটি যৌথ ঘোষণাপত্র প্রস্তুতের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবে দুই দেশের নেতা ১৯৪১ সালের ১২ই আগস্ট আটলান্টিক চার্টার সা(র করেছিলেন।

আটলান্টিক চার্টারে সা(রের কয়েক মাসের মধ্যেই জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বি(বযুদ্ধে যোগাদানে বাধ্য হয়েছিল। ''United Nations'' নামটি ছিল রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের উদ্ভাবন। ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারি ওয়াশিংটনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণাপত্রটিতে সা(র করেছিল মোট ছাব্বিশটি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ।

৩.২ ❑ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও শান্তির(া

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার অন্যতম পদ্ধতি হল শান্তির(া। শান্তির(া বলতে বোঝায় বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ প্রতিরোধের জন্য জাতিপুঞ্জের অধীনে বহুজাতিক বাহিনীকে প্রয়োগ করা। এই শান্তি র(ার পথিকৃৎ জাতিপুঞ্জ, যুদ্ধের হাতিয়ার হিসাবে নয়, শান্তির অনুঘটক হিসাবে কাজ করে থাকে।

ঠাণ্ডা লড়াই জনিত উদ্বেগ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সমাজ আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের জন্য ধীরে ধীরে জাতিপুঞ্জের শান্তির(া বাহিনীর ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে। শুধুমাত্র ১৯৮৮ এবং ১৯৮৯ সালেই জাতিপঞ্জ পাঁচটি (েত্রে শান্তির(া বাহিনী প্রেরণ করেছিল। পরবর্তী দুবছরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামরিক, অসামরিক এবং পুলিশ বাহিনী সহযোগে শান্তির(া বাহিনীকে বর্তমানে বিচিত্র ধরনের ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বরে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয় জাতিপুঞ্জের শান্তির(া বাহিনীকে।

জাতিপুঞ্জের শান্তির(াকারীদের অস্ত্রবিহীন পর্যবে(ক রূপে অথবা হালকা অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী হিসাবে প্রেরণ করা যেতে পারে। পরিস্থিতি পর্যবে(ণ করে মহাসচিবের কাছে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টি তত্ত্বধান করার জন্য অথবা চুক্তি অনুসরণ করে চলা হচ্ছে কিনা তার নিশ্চয়তা দানের জন্য শান্তির(া বাহিনী প্রেরণ করা যেতে পারে। যুদ্ধ বিরতি লঙঘনের অনুসন্ধান এবং বাফার অঞ্চলগুলিতে টহল দেওয়ার দায়িত্বও তারা পালন করে থাকে। নির্বাচনের তত্ত্বাবধান, আইন মেনে চলা হচ্ছে কিনা তার দিকে দৃষ্টি রাখা, কোনো ভূখণ্ডের স্বাধীনতা প্রাপ্তির নিশ্চয়তাদান প্রভৃতি কাজেও শান্তির(া বাহিনীকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্ম, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, সংঘর্ষের এলাকাগুলিতে স্বাভাবিক অসামরিক কাজকর্মের সূচনা প্রভৃতির দায়িত্বও নিয়ে থাকে।

৩.৩ ❑ শান্তির(া বাহিনী প্রয়োগের পদ্ধতি

জাতিপুঞ্জের কোনো সদস্য রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠী অথবা মহাসচিব স্বয়ং যখন কোনো অঞ্চলে শান্তির(া বাহিনী প্রেরণের প্রস্তাব রাখেন, তখন তিনটি শর্ত পালনের প্রয়োজন দেখা যায়। প্রথমত, সংকটাপন্ন দেশ অথবা দেশগুলির অনুমতি আবশ্যিক হয়। দ্বিতীয়ত, এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে আন্তর্জাতিক সমাজের ব্যাপক অংশের সমর্থন থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, সদস্য দেশগুলির প(থেকে বাহিনী প্রেরণের পর্যাপ্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। জাতিপুঞ্জ এ(েত্রে সম্পূর্ণ নিরপে(ভূমিকা প্রেরণ করে।

শান্তির(া বাহিনী প্রেরণের জন্য যখন নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব গ্রহণ করে তখন কোনো স্থায়ী সদস্য নেতিবাচক ভোট দিলে বিষয়টি বাতিল হয়ে যায়। মহাসচিব শান্তির(া বাহিনীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করে নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিবেদন পেশ করেন। পরিষদের অনুমতি পেলেই তিনি পরবর্তী পর্যায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

নিরাপত্তা পরিষদ স্থির করে যে, কীভাবে এই অভিযানের অর্থ সংগৃহীত হবে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে বিভিন্ন

সদস্য রাষ্ট্রের সাহায্যদানের মাধ্যমে, না সনদ অনুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক অনুদানের ওপর ভিত্তি করে। পরে সাধারণ সভা স্থির করে কীভাবে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই ব্যয় বণ্টন করে দেওয়া হবে।

বিশেষ পরিস্থিতিতেই শান্তির(া বাহিনী বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয়। এই বাহিনী হালকা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। আক্রান্ত হলে অথবা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জাতিপুঞ্জের নির্দেশ পালনে বাধা সৃষ্টি করা হলে এরা অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে।

শান্তির(া বাহিনীর কার্যকারিতা কতগুলি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন, সামরিক কর্মীদের উপস্থিতি। যাতে শান্তির(া বাহিনীর উপর গুলি বর্ষিত হলে তারাও প্রত্যুত্তরে গুলিবর্ষণ করতে পারে এমন পরিস্থিতি জাতিপুঞ্জের নৈতিক কর্তৃত্ব এবং সবশেষে বি[জনমতের চাপ। এই বিষয়গুলি শেষ পর্যন্ত শান্তির(া বাহিনীর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ বন্ধ হতে পারে।

৩.৪ ❑ জাতিপুঞ্জের সংক্রান্ত ধারণা

জাতিপুঞ্জের শান্তির(া সংক্রান্ত দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের হাতে। পরিষদ প্রথমে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিরোধ মীমাংসার প্রয়াস চালায়। বিবদমান দেশগুলি পরিষদের সুপারিশ মেনে চলতে অস্বীকার করলে সদস্য দেশগুলির সহযোগিতায় বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

জাতিপুঞ্জের উদ্ভবের পর থেকে মাত্র দুটি (েত্রে ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালে সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে। দুটি (েত্রেই পরিচিত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সমষ্টিগতভাবে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এই দুটি অভিযানকে শান্তির(ার পর্যায়ে ফেলা যায় না। কারণ শান্তির(া বাহিনীর উপস্থিতি বিবদমান দেশগুলির সমর্থনের ওপরে নির্ভর করে এবং আত্মর(ার প্রয়োজন ছাড়া এই বাহিনী বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয় না। এই বাহিনী মহাসচিবের নির্দেশাধীনে থাকে।

জাতিপুঞ্জের সনদে শান্তির(ার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়নি। ১৯৫৫ সালের সুয়েজ সংকটের পর থেকেই শান্তির(া বাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণের একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে এটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শান্তির(া বাহিনীর বিশেষ বিশেষ ভূমিকার ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে। যেমন—মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির(া, কঙ্গোয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অভিযান, সাইপ্রাসে জাতিপুঞ্জের শান্তির(া অভিযান, নামিবিয়ায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা, কাম্বোডিয়ায় জাতিপুঞ্জের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

৩.৫ ❑ মূল্যায়ন

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শান্তির(ী বাহিনী বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংকটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের পরিপ্রে(িতে ১৯৪৮ সালে কা[ীর অঞ্চলের জন্য জাতিপুঞ্জের সামরিক

পর্যবে(ক গোষ্ঠী প্রেরণ, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ভারতের কাশ্মীর অঞ্চলে হানা চালায়। যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি স্থাপনের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ একটি কমিশন গঠন করে। কমিশনের উদ্যোগে যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয় ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে। ওই দিনে উভয় দেশের সামরিক বাহিনীর অবস্থান অনুযায়ী 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা' নির্ধারিত হয়। এই যুদ্ধ বিরতি রেখা র(া করার উদ্দেশ্যে সং(-ষ্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত ক্রমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামরিক পর্যবে(ক গোষ্ঠী গঠন করা হয়। (ুদ্রাকৃতির দুর্বল বাহিনীটি প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

১৯৫৬ সালে সুয়েজ অঞ্চলের তদারকির জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জরুরি বাহিনী মোতায়েন করে। এই বাহিনীর নাম হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম জরুরি বাহিনী ঃ UNEF-1। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বাহিনী আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা পালন করেছে। সাইপ্রাসের জন্য জাতিপুঞ্জের শান্তি-র(ীবাহিনী পাঠিয়েছিল ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে। ১৯৭৮ সালে লেবাননের জন্য অন্তবর্তীকালীন জাতিপুঞ্জের বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনীর নাম হল 'UNIFIL'। এই বাহিনীর ওপর যে সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত হয় সেগুলি হল ঃ অধিকৃত দ(িণ লেবানন থেকে ইজরায়েল বাহিনী প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা, সং(-ষ্ট অঞ্চলে শান্তির পরিবেশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঐ অঞ্চলে লেবানন সরকারের কর্তৃত্ব পূনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। ঐ বাহিনী সং(-ষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের বহু ও বিভিন্ন মানবিক সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছে।

আরব ও ইজরায়েলের মধ্যে সৈন্য অপসারণের একটি সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়। এই সীমারেখা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটি বাহিনী গঠন করে। বাহিনীটির নাম হল UNEF-2। ১৯৭৩ সালে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এবং ১৯৭৯ সালে এই বাহিনীর কার্যকাল শেষ হয়। সিরিয়া ও ইজরায়েলের সৈন্য বাহিনীর মধ্যে সামরিক তৎপরতা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটি পরিদর্শক বাহিনী গঠন করে। এই বাহিনীর নাম হল 'United Nations Disengagement Observer Force''। এই পরিদর্শক বাহিনী গঠিত হয় ১৯৭৪ সালের মে মাসে। সিরিয়ার দামাস্কাসে এই বাহিনীর সদর দপ্তর বর্তমান। বিবদমান দুটি দেশের মধ্যে বন্দি বিনিময় ছাড়াও এই বাহিনী বহু ও বিভিন্ন মানবিক দায়দায়িত্ব পালন করেছে।

১৯৯০-৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ বি(েবাসীকে তৃতীয় বি(েযুদ্ধের আশঙ্কায় আতঙ্কিত করে তুলেছিল। এই যুদ্ধের পর বিবদমান কুয়েত ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি বিস্তীর্ণ অসামরিক অঞ্চল তদারকির উদ্দেশ্যে একটি পর্যবে(ণ মিশন গঠনের প্রস্তাব মিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। মিশন গঠিত হয় ১৯৯১ সালের ৯ই এপ্রিল এই পর্যবে(কের মিশনের নাম 'UNI KOM'।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের গোড়াতেই যুগো(-াভিয়া সাধারণ তন্ত্রে ভাঙ্গন দেখা দেয়। স্লোভেনিয়া, বসনিয়া, ক্রোয়োশিয়া, হারজেগোভিনা ম্যাসিডোনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যুগো(-াভিয়ার পূর্বতন অঙ্গা-প্রজাতন্ত্রীগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করে। বিচ্ছিন্ন পূর্বতন অঙ্গা-প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ধর্মীয় উন্মাদনা তাতে নতুন মাত্রা যোগ করে এই সংকট সমাধানের উদ্দেশ্যে মহাসচিব একটি র(ীবাহিনী গঠন করার প্রস্তাব করেন। এই বাহিনীর নাম হল UNPROFOR।

অনুরূপভাবে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ক্রমে ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে গঠিত হয় পশ্চিম সাহারায় গণভোটের উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জের মিশন। ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে গঠিত হয় সোমালিয়া জাতিপুঞ্জের সামরিক

মিশন, ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে গঠিত হয় সোমালিয়া জাতিপুঞ্জের সাহায্যকারী মিশন প্রভৃতি।

তবে বি(েশান্তি ও নিরাপত্তা র(ার (েত্রে জাতিপুঞ্জ বিশেষ কার্যকারী ভূমিকা নিতে পারেনি। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার পরিবর্তে কহল-বিবাদ দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ, রেষারেষি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক আবহাওয়াকে তিক্ত করে তুলেছে।

বি(েশান্তি ও নিরাপত্তা র(ার প্রধান দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের উপর ন্যস্ত আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক (েত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ অধিকাংশ (েত্রে ব্যর্থ হয়েছে। প্যালেস্টাইন সমস্যা, লেবানন সমস্যা, কা(ীর সমস্যা প্রভৃতির সমাধানের (েত্রে পরিষদ সফল হতে পারেনি। বস্তুত যে সকল সমস্যার সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের পঞ্চ-প্রধানের একজন কোনো না কোনো ভাবে জড়িত সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। ইজরায়েল ১৯৬৭ সালে আরব রাষ্ট্রসমূহের বিরুধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলের প(ওকালতি শুরু করে। এই অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদ কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

অনুরূপভাবে ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, লওেস প্রভৃতি ইন্দোচীনের (ুদ্রাকৃতির রাষ্ট্রগুলি ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎপরতা শুরু করে। এ(েত্রে নিরাপত্তা পরিষদ কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি। একইভাবে লেবাননের বিরুধে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণ, কঙ্গোর ওপর বেলজিয়ামের আক্রমণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উপসাগরীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু জাতিপুঞ্জ স্বস্তিতে নেই। বি(েশান্তি র(ার (েত্রে সাধারণ সভার ভূমিকাও হতাশার সৃষ্টি করেছে।

বি(েশান্তি বজায় রাখার (েত্রে জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের ভূমিকার ব্যর্থতাও উল্লেখ্য। মহাসচিব ট্রিগ ভী লী-র ভূমিকার নিরপে(তা সম্পর্কে প্র(দেখা দেয়। আফ্রিকার অবিসংবাদিত জননেতা প্যাট্রিস লুমুম্বার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। এ ব্যাপারে পরো(দায়িত্ব মহাসচিব দ্যাগ হ্যামার শীল্ড এর চাপানো হয়। মহাসচিব উথাট মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা বা ইন্দোচীন সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম ও বি(েশান্তি বজায় রাখার (েত্রে এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক সমস্যাদির সমাধানের (েত্রে অভিপ্রেত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

সুতরাং জাতিপুঞ্জের সাফল্যের সাথে এর অসাফল্যের নজিরও অসংখ্য। অনেকের মতানুসারে জাতিসংঘের পতনের পর জাতিপুঞ্জ গঠনের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ধ্যানধারণা ও উদ্দেশ্যগত বিচারে জাতিপুঞ্জ জাতিসংঘের ছায়ায় পরিণত হয়েছে।

❑ গ্রন্থ পরিচিতি

B. Shiva Rao - ''The Birth of the UN - Some Recollections.

L. L. Leonard - Inteanational Orgaizition.

R. Chakrab orti - 'International Relations'

UNO : A Study in Essential

❑ অনুশীলনী

১। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বি(শান্তি র(ার (েত্রে কতখানি সাফল্য অর্জন করেছে?

২। কোন্ পরিস্থিতিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্ভব ঘটেছিল?

একক ৪ ❑ বি(রাজনীতিতে দ(ণ আফ্রিকা লাতিন আমেরিকা

গঠন

৪.১ বর্ণবৈষম্য

৪.২ লাতিন আমেরিকা বা দ(ণ আমেরিকা

৪.৩ দ(ণ আমেরিকা এবং বি(রাজনীতি

৪.৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দ(ণ আমেরিকা

৪.১ ❑ বর্ণবৈষম্য

দীর্ঘকাল যাবৎ দ(ণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য এবং নিদারুণ ব্যবস্থা রূপে বলবৎ ছিল। আ(রিক অর্থে বর্ণবৈষম্য বলতে বোঝায় কোনো একটি বিশেষ জাতি বা মানুষের উন্নতিকল্পে একটি বিশেষ ব্যবস্থা। দ(ণ আফ্রিকা প্রধানত ব্রিটেনের অধীনস্থ উপনিবেশ ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই কালো চামড়ার মানুষের সংখ্যাধিক্যই ছিল বেশি। যাদেরকে ইওরোপীয়রা 'Coloured' বা 'Asian' বলে চিহ্নি(ত করত। কিন্তু যেহেতু এরা ইউরোপীয় বা সাদা চামড়ার মানুষ ছিল না। তাই তাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল পৃথক ব্যবস্থা। এরা নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে থাকতে পারত না। এমনকি সুযোগসুবিধা বা আইনগত অধিকারের ব্যবস্থাও ছিল বৈষম্যমূলক যেহেতু শাসকগোষ্ঠী ছিল ইওরোপীয় সুতরাং সমস্ত সুযোগসুবিধা এরাই কু(গত করে রেখেছিল। ইওরোপীদের মধ্যে যারা ছিল ডাচ্ বংশগত তারা আবার তুলনায় বেশি জাত্যাভিমান র(া করত। তুলনায় ইংরেজরা কিন্তু উদার ভাবাপন্ন ছিল।

পরবর্তীকালে বর্ণবৈষম্য এক প্রবল জাতিবৈষম্যের দিক উন্মোচন করে। বিংশ শতাব্দীতে এমন ধারণার জন্ম হয় যে পাশ্চাত্য (েতকায় মানুষরা সমস্ত দিক দিয়ে অনেক বেশি উন্নত মানের বর্ণবৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন Dr. Malan পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরীরাও একই পথ অনুসরণ করেছিলেন। দ(ণ আফ্রিকানদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল পৃথক বাসযোগ্য স্থান, দোকান, হাসপাতাল, শি(ায়তন ইত্যাদি। প্রত্যেক মানুষের ছিল নির্দিষ্ট জাতি পরিচয়।

মহাত্মা গান্ধি তাঁর জীবনে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন দ(ণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে। ১৯৪৬ সালে ভারত আরও একবার প্রতিবাদ জানিয়েছিল দ(ণ আফ্রিকার বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তার এক প্রস্তাবনায় ধিক্কার জানিয়েছিল এই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যভূষিত হয়। শেষে ১৯৬০ সালে ২০ মার্চ গণবিস্ফো রণ ঘটে Sharpeville নামক স্থানে। জাতিপুঞ্জ তার সদস্য রাষ্ট্রদের আবেদন জানায় দ(ণ আফ্রিকার সাথে সমস্ত রকম কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে এবং দ(ণ আফ্রিকার অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাসের জন্য। বর্ণবৈষম্য এর বিরুদ্ধে জাতিপঞ্জ ১৯৭৪ সালে এক বিশেষ কমিটি গঠন করে। কিন্তু কমনওয়েলথ, জাতিপুঞ্জ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরোধিতা সত্ত্বেও বর্ণবৈষম্য তার গতিতে অবিচল থাকে।

জাতিপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে দ(ণ আফ্রিকার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কে বিশেষত তৈল রপ্তানির (ত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এমনকি ক্রীড়া জগতেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। দ(ণ আফ্রিকা কমনওয়েলথের

সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। দ(ণ আফ্রিকা বর্ণবৈষম্যবাদী বিভিন্ন দমনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে। যাইহোক শেষ পর্যন্ত ২৭ বছরের বন্দী জীবনের অবমান ঘটিয়ে ৭১ বছরের নেলসন ম্যান্ডেলা আফ্রিকান ন্যাশানাল কংগ্রেসের নেতা রাজনৈতিক মঞ্চে ফিরে আসেন। প্রেসিডেন্ট Ulerthe আফ্রিকানদের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গো বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন।

দ(ণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া জগতে নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করে, বিশেষত ত্রি(কেট দুনিয়ায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৯২ অলিম্পিক, ১৯৯২ W orld Cup Cricket এ দ(ণ আফ্রিকা অবিস্মরণীয় যোগাদন। নানাপ্রকার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দ(ণ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। অবশ্য এর জন্য যার অবদান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা এবং অপর এক বিচ(ণ রাষ্ট্রনেতা F.W. De Clerk। যদিও এই নব উদ্ভুত রাষ্ট্রের বিবিধ সমস্যা বিদ্যমান তবুও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে দ(ণ আফ্রিকার এই সংগ্রাম আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এক দৃষ্টান্ত মূলক অধ্যায়।

❑ গ্রন্থপঞ্জী

A. H. Robert : Human Right in the W orld.
H. J. Morgenthau - Politics Among Nations.
M. P.Tandon - Public International law.

৪.২ ❑ লাতিন আমেরিকা বা দ(ণ আমেরিকা

লাতিন আমেরিকা বা দ(ণ আমেরিকা আয়তনের দিক দিয়ে শুধু নয় রাজনৈতিক দিক দিয়েও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণভাবে ২২টি সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং কিছু ছোটো ছোটো অঞ্চল এর সমন্বয়ে রূপে নিয়েছে দ(ণ আমেরিকা।

এই মহাদেশের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য আজও বি৻বাসীকে রোমাঞ্চিত করে। কোথাও সুউচ্চ মালভূমি, কোথাও বা গহন গভীর উপত্যকা আবার কোথাও বা ঘন জঙ্গল। এখানকার অধিবাসীরা মোটামোটিভাবে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। আঞ্চলিক ভাষা মূলত স্প্যানিশ, পুর্তগীজ বা ব্রাজিলিয়। অধিবাসীদের বিরাট অংশ এখনও লিখতে বা পড়তে জানে না। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এরা ১৫২১ থেকে ১৮২১ পর্যন্ত ইওরোপীদের উপনিবেশবাসী ছিল। কিন্তু ১৮২৩ পর থেকে জহরলাল নেহেরুকে অনুসরণ করে বলা যায় এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক 'অদৃশ্য সাম্রাজ্য' গড়ে ওঠে। ফর্লস্বরূপ দেখা দেয় দারিদ্য, অশি(া, শ্রেণিবৈষম্য।

৪.৩ ❑ দ(ণ আমেরিকা এবং বি৻ রাজনীতি

কিছুদিন আগে পর্যন্ত দ(ণ আমেরিকা বি৻ রাজনীতিতে ছিল অপাঙ্‌ক্তে(য়। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলি লাতিন আমেরিকাকে বি৻বাসীর কাছে উপস্থিত করেছে নবরূপে। উদাহরণ স্বরূপ—কিউবার বিদ্রোহ। বলিভিয়ার যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে কলম্বিয়া, পেরু, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ভেনিজুয়েলা, উরুগুয়ে প্রভৃতি

স্থানে। এই সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি মোটামোটিভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। অন্যদিকে কিউবা এবং পানামার স্বাধীনতা পায় বিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা মুক্তি দিতে পারেনি দক্ষিণ আমেরিকাকে। কারণ অর্থনৈতিক ভাবে তারা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল উত্তর আমেরিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর। এখনও পর্যন্ত মোটামোটিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হল একমাত্র রাষ্ট্র যে দক্ষিণ আমেরিকার পণ্য ক্রয় করতে পারে। অন্যদিকে লাতিন আমেরিকা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য আমদানী উন্মুক্ত ক্ষেত্র। ১৮২৩ সালে 'Monroe Doctrine' এর সাহায্যে যা আরো জোরদার হয়ে ওঠে। এইভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে দক্ষিণ আমেরিকা এক অত্যন্ত সংবেদনশালী বিষয়।

৪.৪ ❑ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আমেরিকা

সাধারণভাবে বলা যায় যে, ১৮২৩ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকায় তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। কিন্তু ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট লাতিন আমেরিকার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতিতে এক পরিবর্তিত রূপ আনলেন 'Good Neighbour Policy' এর মাধ্যমে। এরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৬১ সালে কেনেডি ঘোষণা করেন ''Alliance for progress'' এবং ১৯৬৯ সালে নিক্সন জারি করেন ''Action for Progress Programme''.

(১) Monroe Doctrine :-

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত লাতিন আমেরিকার দেশগুলির ওপর Monroe Doctrine এর দ্বারাই প্রথমে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি জেমস মনরো বলেন যে মুক্তিপ্রাপ্ত এই দেশগুলিতে যেন পুনরায় ইওরোপীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা না হয় তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। পরবর্তীকালে এই নীতিই মুখ্য পররাষ্ট্রনীতি হয়ে দাড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাতিন আমেরিকার দেশগুলির প্রতি। প্রথমে লাতিন আমেরিকা এই নীতিকে সাদরে গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে এই নীতির আড়ালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদ তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিল।

Monroe Doctrine এর পরবর্তীকালে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সম্প্রসারণ নীতি অন্যত্র বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করছে। যেমন ১৮৪৫ সালে টেক্সাস জয়। ১৮৪৬ সালে মেক্সিকোর বিরাট অংশ কেড়ে নেওয়া হয়। একইভাবে ১৮৬৭ সালে রাশিয়ার থেকে আলাস্কা এবং ১৮৯৮ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি। স্বাভাবিক ভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সম্প্রসারণ নীতিকে লাতিন আমেরিকা সমর্থন করেনি।

(২) Good Neighbour Policy :-

বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত এবং বিক্ষোভের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্র নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। মার্চ, ১৯৩৩ সালে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ঘোষণা করেন ''Policy of Good Neighbour'' অর্থাৎ সমস্ত রকম মার্কিন সামরিক আদানপ্রদানের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয় এবং বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের ওপর জোর দেওয়া হয়।

দুই মহাদেশকে সমমর্যাদা সম্পন্ন বলা হয়। এবং ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'Pan-American Union'

ওয়াশিংটনে। কিন্তু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল দ(ি ণ আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক স্বার্থকে আরো বেশি জোরদার করা।

দ্বিতীয় বি(েযুদ্ধের পর ঠাণ্ডা যুদ্ধের (cold war) সময় ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Organisation of American states (OAS), এর সদস্যরা হলেন যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দ(ি ণ আমেরিকার দেশসমষ্টি। ইউনাইটেড নেশনস্ এর চার্টার এর ৫১-৫২ অনুচ্ছেদে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি একটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান যার ল(্য দ(ি ণ আমেরিকার শান্তি র(া করা, আঞ্চলিক ঐক্যসাধন এবং তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখা। কিন্তু সার্বিক ভাবে OAS এর প্রতিবেদন পর্যবে(ণ করে দেখা গেছে যে, যেসমস্ত উচ্চ আদর্শের কথা গোড়ার বলা হয়েছিল তা কোনোটিই বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়নি। এ ব্যাপারটি পরিষ্কার হয় যখন কিউবা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে তাকে OAS থেকে বিতাড়ণ করা হয়। যদিও প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল কোনো সদস্য রাষ্ট্রকে বিতাড়িত করা যাবে না। ১৯৬২ সালে OAS এ সম্মেলনে বলা হয় Inter-American system এর মধ্যে কোনো ভাবেই মার্কসবাদ বা লেনিনবাদকে সহ্য করা হবে না। স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্ত লাতিন আমেরিকার দেশ সমূহের সার্বভৌমত্বকে আঘাত করেছিল। এই একই নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল Dominican Republic এর (ে ত্রে যখন তারা জাতীয় আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি জনসন সদর্পে ঘোষণা করেন যে লাতিন আমেরিকায় কোনো ভাবেই সমাজতান্ত্রিক ভাবা দর্শকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। গঠিত হয় ''Inter American Armed Force''। যার সাহায্যে মেক্সিকো, চিলি, পেরু, উ(গুয়ে প্রভৃতি দেশে সামরিক অভিযান চালানো হয়। কারণ এরা প্রত্যেকেই OAS এর এই সিদ্ধান্তকে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে পানামা, বলিভিয়া, পেরুতে যেসমস্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাতে প্রমাণিত যে উত্তর ও দ(ি ণ আমেরিকার সম্পর্ক এক তিক্ততায় পরিণত হয়েছে।

(৩) Alliance for Progress :-

বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক কিউবাকে নিরস্ত্র করার অভিপ্রায়ে ১৯৬১ সালের ১৩ই মার্চ রাষ্ট্রপতি কেনেডি 'Alliance for Progress' নামক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এই উদ্দেশ্যে তিনি 'দশ দফা' পরিকল্পনার উল্লেখ করেন। যাতে তিনি প্রথম পর্যায়ে ৫০০ মিলিয়ান ডলার ধার্য করেন দ(ি ণ আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নতি কল্পে। দ(ি ণ আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সমন্বয়ের ওপর জোর দিয়ে 'free trade' কে উৎসাহ দেওয়া হয়। রপ্তানি বাণিজ্যকে সুর(ি ত করার আ(াস দেওয়া হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে দ(ি ণ আমেরিকাকে যথেষ্ট সাহায্যের আ(াস দেওয়া হয়। বিভিন্ন অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপযুক্ত(খাদ্য সবরববাহ সুনিশ্চিতের ব্যবস্থার আ(াস দেওয়া হয়। এবং পুনরায় লাতিন আমেরিকার প্রতির(াকে জোরদার করে তোলা হবে এ কথা এই প্রস্তাবনায় জোড়ের সাথে বলা হয়।

১৯৬১ সালে ১৭ই আগষ্ট ২০ বিলিয়ন ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প(থেকে সাহায্য হিসাবে পাঠানো হয়। কিন্তু সাহায্য প্রাপ্ত রাষ্ট্রকে কিছু শর্ত মেনে চলা আবশ্যক ছিল। যেমন তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করতে হবে। বিচার ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করতে হবে। অভ্যন্তরীণ সুর(া বজায় রাখতে হবে এবং মহাদেশের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তুলতে হবে।

এ থেকে পরিষ্কার যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠা করে এবং কিউবার প্রগভবকে দূরে সরিয়ে রাখে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। অন্যদিকে ব্যণিজ্যিক সম্প্রসারণকে উৎসাহ দেওয়া হলেও এর মূল উদ্দেশ্য ছিল লাতিন আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের বাজারে পরিণত করা এবং সস্তায় কাঁচামালের উৎসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। যার ফলে দ(িণ আমেরিকার মার্কিন বিরোধী আন্দোলন এক চরম আকার ধারণ করে।

(৪) Doctrine of Equal Partnership :-

পূর্বতন নীতির বারংবার ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে রাষ্ট্রপতি এন. নিক্সন ঘোষণা করেন ১৯৬৯ সালের ৩১শে অক্টোবর এ ''equal partnership'' এবং 'joint responsibility'' এর উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয় OAS কে আরো বেশি দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠান হিসাবে তুলে ধরা, অর্থনৈকি অনুদানকে অব্যাহত রাখা এবং বাণিজ্যিক সম্প্রসারণে উৎসাহদান। স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখা। যার ফলে লাতিন আমেরিকা প্রচেষ্টা চালায় মার্কিন অনুশাসন থেকে মুক্ত হতে। যা পরিষ্কার হয় ১৯৬৯ সালে লাতিন আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রস্তাব দেয় যে অর্থনৈতিক সাহায্যের বিনিময়ে কোনোভাবেই যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকায় রাজনৈতিক এবং সামরিক নিয়ন্ত্রণ রাখবে না এবং ব্যাবসায়িক বৈষম্যকে পুরোপুরি ভাবে বিনষ্ট করতে হবে।

স্বাভাবিকভাবেই ১৯৭০ সালে OAS এ জানানো হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব গ্রহণে অ(ম। সুতরাং ট্রুম্যান, কেনেডি, জনসন থেকে নিক্সন পর্যন্ত সবারই প্রচেষ্টা ছিল লাটিন আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যতদিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ''Neo-Colonialist policy'' থেকে সরে দাড়াবে না ততদিন দ(িণ আমেরিকার এই অশান্ত পরিস্থিতি আসবে না।

(৫) Doctrine of Anti-Communism :-

১৯৭৯ সালে নিকারগুয়ায় বিদ্রোহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়ে প্রতিবেশী গুয়ে গমালা, এল সালগদারে বি(োভের স্ফলিঙ্গা ছড়িয়ে দেয়। যাই হোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছে দ(িণ আমেরিকায় কমিউনিজমকে প্রহিহত করা এবং মার্কি'ন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকেই সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা তার দ(িণ আমেরিকার বিদেশনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

❑ গ্রন্থ পরিচিতি

Brower, T. L – American Foreign policy
Han, H : – Problems and Prospects of the OAS.
Heine, J. And Monigol L. – The Caraibean and W orld Politics.
Sparier, John – American Foreign Policy Sinec W orld W ar II.
Thomas. C. – In search of Security : the Third world in International Relation.
Bhattacharyya. D.C. – International Relations since the Twentieth Century.

❑ অনুশীলনী

১। আধুনিক বি(ে বর্ণবৈষম্য কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ?

২। বর্তমান পরিস্থিতিতে লাতিন আমেরিকা বি(েরাজনীতিতে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে?

ইতিহাস—ষষ্ঠ পত্র

পর্যায়—৪

একক ১ ❑ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন : গরবাচভের সময়কাল—ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান—একমেরু বিশ্বের দিকে যাত্রা

গঠন

১.০ ভূমিকা
১.১ গরবাচভের নতুন চিন্তাধারা
  ১.১.১ শিল্প
  ১.১.২ কৃষি খামার
  ১.১.৩ দলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন
  ১.১.৪ জাতীয়তার প্রশ্ন
১.২ শীতল যুদ্ধের অবসান ও একমেরু বিশ্বের উত্থান
১.৩ অনুশীলনী
১.৪ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ ❑ ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসের নানাবিধ পট পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক। সুবিশাল এই রাষ্ট্রের পতন আকস্মিকভাবে হয়নি। ১৯৮০-র দশক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন যে ভাঙ্গান প্রক্রিয়া শুরু করেছিল তার চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে ১৯৯০-এর দশকে এই রাষ্ট্রের পতন ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গো সঙ্গো দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা দুই মেরু বিশ্বের শীতল যুদ্ধেরও অবসান ঘটে। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও সৃষ্টি হয় পরিবর্তনের ধারা। এই এককে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনীতি ও আর্থসামাজিক পরিবর্তন, এর পতন ও শীতল যুদ্ধের অবসান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া শীতল যুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিতে একমেরু বিশ্বের উত্থান নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

১.১ ❑ গরবাচভের নতুন চিন্তাধারা

সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্ণধার হিসাবে তার উত্থানের পূর্বে বিশ্বরাজনীতিতে মিখাইল গরবাচভ-এর পরিচিতি ছিল খুব সামান্য। বিশ্বরাজনীতিতে তার পদার্পণ ঘটে মূলত ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন ভ্রমণকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে নতুন ধারণা প্রচার করার মধ্য দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্বতন রাষ্ট্রপ্রধানদের থেকে খানিকটা সরে গিয়ে ইংল্যান্ডের সঙ্গো সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধকালীন মিত্রতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। পাশাপাশি নিরস্ত্রীকরণের উপরও জোর দেন তিনি। গরবাচভের এই অবস্থানকে স্বাগত জানান ইংল্যান্ডের রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার। তিনি বলেন—I like him, we can do business with him.

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি বিশেষ ঘোষণার দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ববর্তী নেতাদের থেকে ভিন্ন সুরে গরবাচভ মন্তব্য করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এর আমূল পরিবর্তন দরকার। তিনি বলেন—কাগজপত্র ওল্টানো, ফলবিহীন বৈঠকপ্রিয়তা, বাগাড়ম্বর ও আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণ পরিত্যাগ করতে হবে ('Paper shuf fling, an addiction to fruitless meetings, windbaggery and formalism' would no longer do.)। একজন উৎসাহী সংস্কারক হিসাবে গরবাচভ রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করার সময় থেকেই গরবাচভ সোভিয়েত ইউনিয়নকে নতুনভাবে সাজানোর (Perestraika) উপর জোর দেন। এক্ষেত্রে তিনি নতুন চিন্তাভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গরবাচভের নতুন চিন্তাভাবনার মূল আধার ছিল পরিকল্পিত কেন্দ্রীভূত শিল্পায়ন (centrally Planned industrial system) এবং ১৯২০-র দশকে জোসেফ স্ট্যালিনের দ্বারা গ্রহণ করা যৌথ খামার ব্যবস্থা। তিনি রাষ্ট্র ও সংগঠিত ধর্মের দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। পাশাপাশি দেশের বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠির বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃতদের মূল ভূ-খণ্ডে ফিরিয়ে এনে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের ছাত্র পশ্চিমী বিশ্বে পাঠিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বৌদ্ধিক মহলে আমূল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সৃষ্টি করেন। তাছাড়া পশ্চিমী প্রকাশনার প্রচারের স্বাধীনতা দিয়ে এবং সোভিয়েত ঐতিহাসিকদের রক্ষণশীল মনোভাব ক্ষুণ্ণ করে গরবাচভ রাজনৈতিক ক্ষমতায় দলের একাধিপত্য ধ্বংস করতে উদ্যোগী হন। এমনকি চীন, পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিমী জগত ও তৃতীয় বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থান বিষয়ে নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে আফগানিস্থান থেকে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহার করেন গরবাচভ।

পেরেস্ত্রৈকার পাশাপাশি গরবাচভের আরেকটি প্রধান ধ্বনি ছিল গ্লাসনস্ত (Glasnost) যা সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক তথা বুদ্ধিজীবী মহলকে খোলাখুলি আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছিল। তবে এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল সেখানে Glasnost-এর প্রতিক্রিয়া কুণ্ঠাবিহীন ছিল না। ১৯৮৬-র চেরনোবিল-এর পারমাণবিক চুল্লির বিস্ফোরণ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিস্ফোরণের পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া বেলারুশ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়া ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় জার্মানি ও ইতালিতে। এই ঘটনার ১৯ দিন পর গরবাচভ সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় টেলিভিশনে স্বীকার করে নেন যে পারমাণবিক চুল্লির এই বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণবিহীনতার অন্যতম ফল। তবে গরবাচভ চেরনোবিল বিস্ফোরণকে পেরেস্ত্রৈকা বিরোধী রক্ষণশীলদের কোণঠাসা করার কাজে ব্যবহার করেন।

অন্যদিকে শিল্পী ও লেখকগোষ্ঠি গ্লাসনস্ত-এর সীমা পরীক্ষার কাজে নেমে পড়েন। এর পরিণতি হিসাবে সৃষ্টির বন্যা বইতে শুরু করে। অসংখ্য সম্ভাবনাময় লেখা যা ইতিপূর্বে ছাপার সুযোগ পায়নি এখন সেগুলি প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠির হাত ধরে দিনের আলো দেখার জন্য এগিয়ে আসে। এদের মধ্যে স্ট্যালিনের সন্ত্রাসের শুরুর সময়ের উপর লেখা উপন্যাস আনাতলি রিবাকভ (Anatoli Rybakov)-এর Children of the Arbat এবং স্ট্যালিন যুগের উত্তরাধিকার নিয়ে সৃষ্ট চলচ্চিত্র— Our Armoured Train বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মানবিক পরিবর্তনে নির্বাসনে থাকা সোভিয়েত ঔপন্যাসিক আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন (Alexander Solzhenitsyn)-এর রচনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। সোলঝেনিৎসিন-এর One Day in the Life of Ivan Denisovich সোভিয়েত

জেল ব্যবস্থার সমালোচনায় মুখর। তিন খণ্ডে লেখা তার Gulag Archipelago-তে সোলঝেনিৎসিন সোভিয়েত জেল ব্যবস্থার নৃশংসতার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের রূপকার, অবিসংবাদিত ও পূজ্য ব্যক্তি মহান লেনিনকে দায়ী করেন। গরবাচভ ও পার্টির পলিটব্যুরো লেনিনকে সমালোচনা করার জন্য এই প্রকাশনার বিরোধিতা করেন প্রথম দিকে। কিন্তু প্রবল জনমতের চাপে আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন-এর রচনার প্রকাশনা থেমে থাকেনি বরং অতি দ্রুত সোভিয়েত পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ প্রথমদিকে গরবাচভের নতুন চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হননি। কিন্তু ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বাধিক প্রচারিত Voprosy istorii (Problems of History)-এর ফেব্রুয়ারী সংখ্যার সম্পাদকীয়তে প্রচার করা হয় যে সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিহাস তথা স্ট্যালিনের কার্যাবলীর এবং জাতীয়তার (nationality) প্রশ্নের পূনর্মূল্যায়নের সময় উপস্থিত হয়েছে। ট্রটস্কির বিখ্যাত রচনা The Stalin School of Falsification of History প্রকাশ করা হয় এই সময়। নতুন চিন্তাসমৃদ্ধ বই ও পূর্বতন নিষিদ্ধ বইসমূহকে সোভিয়েত পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হয়। বেশীরভাগ বুদ্ধিজীবী বাধামুক্ত হয়ে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ করার কাজে লিপ্ত হন। মস্কোর লেনিন গ্রন্থাগার সহ দেশের অন্যান্য গ্রন্থাগারে নতুন বইসমূহকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পাশ্চাত্যের নতুন ভাবনা ও উদারনীতির দ্বারা প্রভাবিত সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীদের একাংশ স্ট্যালিনের কার্যাবলীর সমালোচনায় মুখর হন। অন্যদিকে উদারনীতি তথা পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনাও করেছেন অনেকে। বিশেষ করে The Russian National Patriotic Memory Front (Pamiat) সোভিয়েত ইউনিয়নের অধোগতির জন্য স্ট্যালিন যুগকে দায়ী করার পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু প্রগতিবাদীগণ Pamiat-এর বিরোধিতা করেছেন।

১.১.১ ❑ শিল্প

গরবাচভ যখন পেরেস্ত্রৈকার কথা প্রথম বলতে শুরু করেছিলেন সেই সময় থেকেই তিনি দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক সংস্কারের উপর জোর দেন। কিন্তু সংস্কার প্রক্রিয়া অত নিষ্কণ্টক ছিল না। বিশেষ করে শ্রমিক ও কারখানার প্রবন্ধকগণ গরবাচভের অর্থনৈতিক সংস্কারমুখিতাকে সন্দেহের চোখে দেখত, কারণ তারা মনে করত সংস্কার প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে তারা কর্মহীন হয়ে পড়বে। অন্যদিকে রক্ষণশীল রাজনীতিবিদগণও সংস্কার প্রক্রিয়ার বিরোধী ছিলেন। দেশের সংখ্যাগুরু অংশ মনে করত তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু গরবাচভ যখন ঘোষণা করলেন যে রুটি, দুধ, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণসহ অন্যান্য জরুরী ক্ষেত্রে ভর্তুকী তুলে দিতে হবে বা ক্ষতিতে চলা কারখানা বন্ধ করতে হবে তখন সাধারণ নাগরিকসহ কারখানার সঙ্গে যুক্ত সকলেরই মনে হল তাদের ভবিষ্যত যেন অন্ধকার, অনিশ্চিত। গরবাচভের এই ঘোষণা স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা শিল্পনীতি থেকে বিচ্যুতির স্পষ্ট লক্ষণ ছিল।

১.১.২ ❑ কৃষি খামার

অক্টোবর বিপ্লবের সত্তরতম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর গরবাচভ রক্ষণশীলদের চাপে স্ট্যালিনের দ্বারা গৃহীত যৌথ খামার ব্যবস্থাকে (Collectivization) রক্ষা করার কথা ঘোষণা করলেও ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে এক টিভি সম্প্রচারে তিনি খামার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন। এমনকি বলতে শুরু করেন যে কৃষকরা পুনরায় হবে তাদের জমির মালিক। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে গরবাচভ এই বিষয়টিকে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে উপস্থাপন করে বলেন

যে স্ট্যালিন, ক্রুশ্চেভ বা ব্রেজনেভের খামারনীতির পরিবর্তন ঘটানো সোভিয়েত রাশিয়ার কৃষি উন্নয়নের জন্যই অত্যন্ত জরুরী। তার মতে উপরমহলের চাপানো সিদ্ধান্তের পরিবর্তে কৃষি-উন্নয়নের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে কৃষককেই। এক্ষেত্রে তিনি আমেরিকা, চীন, এমনকি ভারতের সবুজ বিপ্লবের কথাও তুলে ধরেন।

কিন্তু সংস্কার বিরোধীগণও চুপচাপ বসে ছিলেন না। পলিটব্যুরোয় তারা গরবাচভের এই সিদ্ধান্তকে কোনভাবেই কার্যকরী হতে দিতে রাজী ছিলেন না। ফলে গরবাচভ যৌথ খামার ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটন করেননি। তবে ১৯৮৯-এর ৯ই এপ্রিল সোভিয়েত সরকার ব্যক্তি মালিকানায় খামার বা কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন গ্রহণ করে। সোভিয়েত সংবাদ সংস্থা TASS এই আইনকে পারিবারিক খামার ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতীক হিসাবে প্রচার করে।

১.১.৩ ❑ দলীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তন

গরবাচভের নতুন চিন্তাভাবনায় দলীয় ব্যবস্থাও সংস্কার থেকে বাদ পড়েনি। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি Congress of People's Deputies নামের নতুন আইনসভা তৈরী করেন যার বেশীরভাগ সদস্যই ছিলেন নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি। এমনকি ঐ সভার অনেকেই ছিলেন অকমিউনিস্ট প্রতিনিধি। তবে গরবাচভ এই সময় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সংবিধানের Article-6 যা কমিউনিস্ট পার্টিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনৈতিক একাধিপত্য দিয়েছিল তা পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারেননি। কারণ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির (Central Committee) অনুমোদন ছাড়া তা সম্ভব ছিল না আর সেই কমিটিতে গরবাচভ অনুগামীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সংবিধানের ঐ Article-6-এর পরিবর্তনের জন্য জনগণের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়েছিল। এই আকাঙ্ক্ষাকে গরবাচভ কার্যত স্বীকৃতি জানান ১৯৯০-এ যখন লিথুয়ানিয়া ভ্রমণকালে সেখানকার বহুদলীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়াসকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন—We should not be afraid of a multi-party system, the way the devil fears insense. ঐ বছরেই দলের কেন্দ্রীয় কমিটি বহু বিতর্কের পর বিরোধীদলের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টি বহুদিনের রাজনৈতিক-একাধিপত্য হারায়।

১.১.৪ ❑ জাতীয়তার প্রশ্ন The Nationality Question :

সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি বড় সমস্যা ছিল জাতীয়তার প্রশ্ন। গরবাচভের গ্লাসনস্ত এই প্রশ্নটিকে জনসমক্ষে তুলে আনে। মোট ২৮২ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ১৪৫ মিলিয়ন ছিলেন রুশ, ৫১ মিলিয়ন ইউক্রেনিয়, ১০ মিলিয়ন বেলারুশ এবং বাকীরা ছিলেন শ্লাভ। ইউক্রেনিয় ও বেলারুশগণ বহু আগে থেকেই নিজেদের জাতীয় ভাবধারার প্রতি ছিলেন অনুরক্ত। ফলে তাদের জাতীয়তাবাদ গ্লাসনস্ত- এর আলোকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, এমনকি এদের অনেকেই মস্কোর নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের স্বাধীন করার কথাও বলতে শুরু করেন।

প্রকৃতপক্ষে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের সময় ঐ দেশে জাতির (Nationality) সংখ্যা ছিল প্রায় একশ। ধীরে ধীরে তারা রুশ পরিচিতির (Identity) মধ্যে মিশে যায়। কিন্তু গ্লাসনস্ত রুশিকরণ

(Russification) বিরোধী আবহাওয়া তৈরী করে। সংখ্যালঘু (minority) জাতিসমূহের মধ্যে গভীর হতাশার সৃষ্টি হয় যা রুশজাতি ছাড়াও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এই অবস্থায় ১৪টি অ-রুশ বিপাবলিক অধিকতর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্তাধিকারের (autonomy) দাবী জানায়। গরবাচভ এই স্বাধিকারকে অস্বীকার করেননি বরং a nation with nationalities-এর মডেলকে অনুসরণ করে গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া (Democratisation process)-কে আরো উদ্দীপিত করেন।

তবে লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া এবং এস্তোনিয়া গরবাচভের Democratization-এর পদ্ধতির চেয়েও দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক স্বতন্ত্রতার দাবী জানায়। এক্ষেত্রে এদের যুক্তি ছিল যে তারা কেবলমাত্র Perestroika-কেই সমর্থন করছে। তারা নিজেদের ইতিহাস, জাতীয় পতাকা, এবং স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে স্বাধিকারের দাবী জানায়। এমনকি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়, বিশেষ করে অলিম্পিক-এ আলাদাভাবে প্রতিযোগী পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবং তাদের কমিউনিস্ট পার্টিকে মস্কোর কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখার দাবী জানায় বাল্টিক অঞ্চলের এই দেশসমূহ।

বাল্টিক দেশসমূহের এই যুক্তিবাদী অনড় মনোভাব তৈরী হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল এখানকার সাম্প্রতিক ইতিহাস। বাল্টিক দেশগুলি দুশ বছর ধরে ছিল রুশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অঞ্চল। কিন্তু ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের বলশেভিক বিপ্লবের পর তারা স্বাধীনতা অর্জন করে যা ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে স্ট্যালিন ও হিটলারের মধ্যে যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার সহযোগী গোপন চুক্তি অনুসারে উভয়েই পূর্ব ইউরোপের বিভাগের পক্ষে ছিলেন। তদনুসারে বাল্টিক দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্ট্যালিন সেখানকার জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে ধ্বংস করার জন্য সেখানকার অসংখ্য জাতীয়তাবাদীকে নির্বিচারে হত্যা করেন। যেহেতু গ্লাসনস্তের হাওয়া স্ট্যালিনের সমালোচনা করার আবহাওয়া তৈরী করেছিল, স্ট্যালিন-হিটলারের ঐ জন-নিন্দিত চুক্তির সমালোচনাও কঠোরভাবে শুরু করেন বাল্টিক অঞ্চলের ঐতিহাসিকগণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিকগণও বহু আলোচনার পর স্ট্যালিন-হিটলার গোপন চুক্তির কথা স্বীকার করেন।

১৯৮৯খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লিথুয়ানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি মস্কো থেকে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেখানকার জনগণ (১) *মুক্তি, স্বাধীনতা এবং স্ট্যালিন-হিটলার চুক্তি বাতিল;* (২) *সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহার;* (৩) *লিথুয়ানিয়ার হত্যাকাণ্ড ও পরিবেশকে ধ্বংস করার ক্ষতিপূরণ; এবং* (৪) ১৯২০ *খ্রিস্টাব্দের শান্তিচুক্তির ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের দাবী জানায়*। এই অবস্থায় গরবাচভ ১৯৯০-এর গোড়ায় রাজনৈতিক উদ্দেশে লিথুয়ানিয়া ভ্রমণে যান। কিন্তু গরবাচভের সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ১৯৯০-এর ১১ই মার্চ লিথুয়ানিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তবে লিথুয়ানিয়ার পোলগণ সোভিয়েত ইউনিয়ন বা লিথুয়ানিয়া কারোর সঙ্গেই থাকতে রাজী ছিলেন না। তারা পার্শ্ববর্তী পোল্যান্ডের সঙ্গে থাকার দাবী জানায়, প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিটি রিপাবলিকের মধ্যে বিভিন্ন nationality-র অস্তিত্ব থাকায় তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। জর্জিয়ায় খ্রিস্টান জর্জিয়ানদের বিরুদ্ধে মুসলিম জর্জিয়ান (Abkhazians)-দের মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব সবচেয়ে জটিল আকার ধারণ করে খ্রিস্টান আর্মেনিয়-শিয়া মুসলিম দ্বন্দ্ব এবং তুর্কী-আজার-বাইজান দ্বন্দ্ব।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে গরবাচভের পক্ষেও রাজনীতিতে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৯০-এ বাম-ডান নির্বিশেষে গরবাচভকে বিতাড়নের প্রক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু

গরবাচভ তার সংস্কারমুখিতাকে ত্যাগ করেননি। গরবাচভ ও তার অর্থনৈতিক পরামর্শদাতাগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে পণ্যের মুক্ত বাজারী মূল্য (Free price) ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের রাস্তা খোলা রাখলেও অর্থনীতির ইতিবাচক চালিকা শক্তি (Positive economic force) হিসাবে অত্যন্ত সময়োপযোগী। অন্যভাবে বলা যায় সে সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদ (Capitalism)-কে কার্যত স্বাগত জানাচ্ছে। সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ স্ট্যানিশ্লাভ সাটালিন (Stanislav Shatalin) গরবাচভকে কেন্দ্রীভূত সোভিয়েত অর্থনীতির (Centralised Soviet Economy) পরিবর্তে বিকেন্দ্রীভূত বাজারী অর্থনীতি (Market economy) গ্রহণ করার পরামর্শ দেন যাতে অতি দ্রুত পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কার্যকর করার কথা বলা হয়। এই নীতি কার্যকরী হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন মূলত ভেঙে পড়বে এই আশঙ্কায় গরবাচভ সংরক্ষণবাদী (Conservatives যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব রক্ষায় সোচ্চার ছিলেন)-দের পক্ষ অবলম্বন করেন।

কিন্তু গণতান্ত্রিক বা উদারবাদীদের চাপও কম ছিল না। এই অবস্থায় ১৯৯১-র এপ্রিল মাসে গরবাচভ ও বরিস ইয়েলৎসিন (Boris Yeltsin) 'I plus 1' সূত্র (I plus 1 formula) গ্রহণ করেন যা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে কার্যত স্বীকার করে নেয়। রিপাবলিকগুলির হাতে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা চলে যায় বিশেষ করে স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে। তবে সোভিয়েত সরকারের কাছে মুদ্রা, কূটনীতি ও সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থেকে যায়।

১৯৯১-এর জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বরিস ইয়েলৎসিন বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন রাশিয়ান রিপাবলিক-এর প্রেসিডেন্ট পদে। এই প্রথম রাশিয়ার সর্বোচ্চ পদে নির্বাচিত কোন জনপ্রতিনিধি আরোহণ করেন। গরবাচভ অন্যদিকে বামপন্থীদের সহযোগিতায় এবং অর্থনীতিবিদ Grygorie Yavlinskii-এর পরামর্শে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হন।

কিন্তু সোভিয়েত সেনাবাহিনী এই সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। গরবাচভের ক্রিমিয়া সফরের সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনীর নেতাগণ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী Dmitrii Yanov, গুপ্তচর পুলিশ (KGB)-র প্রধান Vladimir Kriuchkov ও আরো অনেকে ১৯১১-এর ১৮ই আগস্ট মস্কোর রাস্তায় ট্যাঙ্ক ও সেনাবাহিনী নামিয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। গরবাচভকে অসুস্থ ঘোষণা করে Gennadie Yanaev-কে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু রুশ রিপাবলিক-এর প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন সেনাবাহিনীর উত্থানকে সফল হতে দেননি। ইয়েলৎসিন ও তার সহযোগী Radical গণ ১৯৯১-এর শেষদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি ঘটান। কাস্তে হাতুড়ি ও তারা সমন্বিত লাল পতাকার পরিবর্তে ক্রেমলিন-এ রাশিয়ার পুরানো পতাকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ দশকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সেনা উত্থান এবং সবশেষে এর পতন সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসের চমকপ্রদ ঘটনা। ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে ঐতিহাসিক নিয়মেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন অবশ্যম্ভাবী ছিল। অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে বা রাশিয়ার unity of action-কে অস্বীকার করে রাশিয়ায় কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। পাশাপাশি 'জাতীয়তা'বোধের (Nationalism) চাপকে সহ্য করার ক্ষমতা শেষ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন হারিয়ে ফেলেছিল। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরও republic গুলোতে জাতীয়তার সমস্যার সমাধান হয়নি।

১.২ ❑ শীতল যুদ্ধের অবসান এবং একমেরু বিশ্বের উত্থান

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পূর্বতন সোভিয়েত রিপাবলিক সমূহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অসাবলীল হয়ে পড়ে। তাছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই রিপাবলিক সমূহের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ-এর অধিকার ও ব্যবহারের প্রশ্ন নিয়েও প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষা শুরু হয়ে যায়। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য এমন তারা IMF (International Moneytary Fund)-এর দ্বারস্থ হয়। ঋণদানের শর্ত হিসাবে IMF এই সমস্ত দেশকে নির্ভরযোগ্য বাজেট তৈরীর সুপারিশ করে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমকালীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কার্যকরী দিকগুলিকে ঢালাওভাবে গ্রহণ করতে শুরু করে এই নবগঠিত দেশসমূহ।

অন্যদিকে জাতীয়তার প্রশ্ন থেকে যায় অমীমাংসিত। আর্মেনিয়ার ক্ষেত্রে ৯০% আর্মেনিয় জনগণ থাকলেও লাটভিয়ায় রাশিয়ান ছিলেন ৩৪% । কাজাকিস্থানেও ৩৮% ছিলেন রুশ, কিন্তু মালডোভায় মোট জনসংখ্যার ১৪% ছিলেন ইউক্রেনিয় এবং ১৩% ছিলেন রুশ। বিভিন্ন রিপাবলিকে জনগোষ্ঠির এই ধরনের বিন্যাস Ethnicity ও nationality-র প্রশ্নকে উজ্জীবিত রাখে। এই অবস্থায় সোভিয়েত রিপাবলিকগুলোর পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশ নীতি তথা আদর্শগত প্রচার (ideological propaganda) জারী রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আদর্শগত লড়াই স্তিমিত হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক শীতল যুদ্ধের অবসানের পথ হয়ে ওঠে কুসুমিত।

গরবাচভ নিজেও শীতল যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ অবসানের পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষেত্রে আফগানিস্থান থেকে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গরবাচভ আফগানিস্থান থেকে সেনা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে আফগানিস্থানে যাতে Pro-western সরকার যাতে তৈরী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত Pro-Russian নাজিবুল্লা সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে ১৯৮৯-র ১৫ই ফেব্রুয়ারী সোভিয়েত সেনা আফগানিস্থান ত্যাগ করে। তবে আফগানিস্থানের পক্ষে এর প্রভাব শঙ্কাবিহীন হয়নি। বরং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি অধ্যুষিত আফগানিস্থান একটি সংঘর্ষসঙ্কুল রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হয়।

অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টি শাসিত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। বিশেষ করে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে গরবাচভ যখন Breznev doctrine-কে মৃত বলে ঘোষণা করেন তখন পূর্ব ইউরোপের এই দেশগুলি নিজেদেরকে রাজনৈতিক অভিভাবকহীন বলে মনে করতে থাকে, পাশাপাশি এই দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থাও তাদের কমিউনিস্ট আদর্শ পরিত্যাগ করতে প্ররোচিত করেছিল। পোল্যান্ড ১৯৯০-এর নববর্ষের দিন তার নাগরিকদের দেওয়া দীর্ঘকালের ভর্তুকি নীতি পরিত্যাগ করে। এক বছরের মধ্যে সেখানে Free-market economy বা মুক্ত বাজারী অর্থনীতির যাবতীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়। পাশাপাশি পূর্ব জার্মানীও অনুরূপ নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে। পূর্ব জার্মানীর মানুষ পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানায়। অন্যদিকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকেই পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার হেলমুট কোল দুই জার্মানীর একত্রীকরণের আলোচনার সূত্রপাত করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৯০-এর অক্টোবর-এ দীর্ঘকালের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী একতাবদ্ধ হয়। পাশাপাশি হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া ও আলবেনিয়ায় কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটে ১৯৯৩-এর মধ্যেই। সোভিয়েত

ইউনিয়নের পতনের পর বিভিন্ন জাতীয়তা (Nationality) অধ্যুষিত চেকোশ্লোভাকিয়াও টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের পূর্বতন কমিউনিস্ট দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা দুই মেরুর শীতল যুদ্ধের অবসান ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রসমূহের (Western Capitalist democracy) কমিউনিস্ট ভীতি দূরীভূত হয়। ফলে এই দেশগুলিরও আর আদর্শগত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন দুই মেরু বিশ্বের অবসান ঘটিয়ে একমেরু বিশ্বের উত্থানের পথকে সুগম করেছে।

১.৩ ❑ অনুশীলনী

১. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের জন্য গরবাচভ কতটা দায়ী ছিলেন?
২. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফল কী হয়েছিল?
৩. শীতল যুদ্ধের অবসানের কারণ কী?
৪. জাতীয়তার প্রশ্ন কি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল?

১.৪ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১. Archie Brown : The Gorbachev Factor, New York, 1996.
২. Poeter Reddaway & Glinski Dmitri : The Tragedies of Russia's Reforms. Washington, 2000
৩. Gail Stoeks : From Stalinism to Pluralism, New York, 1996.
৪. Wayne C. Me Williams & Harry Piotrowski : The World Since, 1945, New Delhi, 2006.

— — —

একক ২ ❑ বিশ্বায়ন ও তার প্রভাব

গঠন

২.০ ভূমিকা
২.১ বিশ্বায়ন কী ?
২.২ তথ্য প্রযুক্তির বিশ্বায়ন
২.৩ আর্থিক বিশ্বায়ন
২.৪ ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠি
২.৫ European Economic Community-র সম্প্রসারণ ও European Union-এর প্রতিষ্ঠা
২.৬ অন্যান্য আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোটসমূহ
    ২.৬.১ The North American Free Trade Agreement বা NAFTA
    ২.৬.২ দক্ষিণ আমেরিকার অর্থনৈতিক আঞ্চলিকতাবাদ এবং MERCOSUR
    ২.৬.৩ The Association of Southeast Asian Nations = ASEAN
    ২.৬.৪ APEC ও Yen Block
    ২.৬.৫ SAARC ও SAFTA
২.৭ বিশ্বায়ন আশীর্বাদ না অভিশাপ
২.৮ অনুশীলনী
২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ ❑ ভূমিকা ঃ

বর্তমান বিশ্বরাজনীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিশ্বায়ন বা Globalisation. 'বিশ্বায়ন' ধারণাটির প্রয়োগ ছাড়া সমসাময়িক আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ প্রায় অসম্ভব। অর্থ, সম্পদ, মানবসমাজ, কারিগরি বিদ্যা, এমনকি মানবিক আদর্শ এখন আর কোন জাতীয় রাষ্ট্র বা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবন্ধ নয়। এদের ব্যাপ্তি এখন বিশ্বব্যাপী যা একাধারে মানব উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী এবং অন্যদিকে স্থানীয় সমাজ-সংস্কৃতি (Local Culture) এবং প্রান্তিক মানব গোষ্ঠির অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি করেছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন স্থানীয় ঘটনাও এখন আর বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যার সুযোগ পাচ্ছে না। বিশ্বায়নের ধারণাসহ এর নানাবিধ বৈশিষ্ট্য এবং এদের প্রভাব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল বর্তমান এককে।

২.১ ❑ বিশ্বায়ন কী ?

বিশ্বায়ন শব্দটির প্রকৃত অর্থ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী তথা ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। রবার্ট জে স্যামুয়েলসন (Robert J. Samuelson)-এর মতে বিশ্বায়ন হল দুই দিকে

ধারওয়ালা এমন একটি তলোয়ার বা যন্ত্র যা একদিকে কারিগরি বিদ্যার (technology) বিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাহায্যে উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলিতে সমানতালে জনসমষ্টির আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে কিন্তু বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া অন্যদিকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্থানীয় সমাজ-সংস্কৃতির পক্ষে বিপদ সৃষ্টি করে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিরতাকে বিঘ্নিত করে। কিন্তু বিশ্বায়নের মত জটিল বিষয়কে এত সহজভাবে ব্যাখ্যা করার আগে বিশ্বায়ন বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায় তার আলোচনা অত্যন্ত জরুরি।

পুঁজি (Capital), ব্যবসা, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি প্রভৃতি অতিদ্রুত বিশ্বময় ধাবিত হয়ে যে জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার বিকাশকে পরিচালিত করছে তাকে সাধারণভাবে আমরা বিশ্বায়ন শব্দটির সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি। পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ের তালগোল পাকানো বিশ্বরাজনীতির একবিংশ শতাব্দীর রূপই হল বিশ্বায়ন। এই ধারণাটির সাহায্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অদৃশ্য কিছু শক্তি বা প্রক্রিয়ার ভূমিকা অতি সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। Thomas Friedman-এর মতে বিশ্বায়ন হল 'a permanent trend leading to a global phenomenon-the ever arching international system shaping the domestic politics and foreign relations of virtually every country (that envolves) the inexorable integration of markets, nation states and technologies to a degree never witnessed before, in a way what is anabling individuals, corporations and nation states to reach around the world further; Faster; deeper and cheaper than ever before (Understanding Globalisation, New York, 1999). বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া তাই বাণিজ্যপুঁজি বা তথ্যপ্রযুক্তির অতিদ্রুত বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রকে একসূত্রে বেঁধে ফেলছে এবং এক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও অতিদ্রুত বাড়িয়ে তুলছে।

বিশ্বায়ন অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সীমানা এবং জাতীয়-রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে। তাই বিশ্বায়ন কোন একমুখী বা বিতর্কবিহীন বিষয় নয়। বিশ্বায়নের একটা সদর্থক দিক হল বাজার ও সংস্কৃতিকে সমসাময়িক ভূ-রাজনৈতিক সীমানাকে অতিক্রম করে জাতীয় সত্তা বা সংস্কৃতির তোয়াক্কা না করে আমাদের বিশ্বনাগরিক হিসাবে ভাবতে সাহায্য করে।

২.২ ❑ তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্বায়ন :

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন হল তথ্য বিনিময়ের অভূতপূর্ব প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। তথ্য ও প্রযুক্তি বিনিময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যন্ত্র ও পদ্ধতি হল কম্পিউটার, সেলুলার ফোন এবং ইন্টারনেটের (Internet) মত আধুনিক প্রযুক্তি। সেল ফোন এখন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। এমনকি যে দেশে সাধারণ দূরভাষ (Basic telephone) ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেনি সেখানেও অতিদ্রুত সেলফোন ছড়িয়ে পড়ছে। 'তারবিহীন' এই যন্ত্রটির সংখ্যা বাড়ছে অতিদ্রুত গতিতে। এই যন্ত্র যে কোন জটিল পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতিকে আমূল পাল্টে দিয়েছে যা ১৯৯০-এর গোড়ায় বা তার আগে ভাবাই যেত না। জাতীয় রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যে কোন ব্যাপারের বিশ্বায়নে এই যন্ত্রটির গুরুত্ব অপরিসীম।

কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা হল বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রতীক। বিশ্বের যে কোন প্রান্তের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বা সংস্কৃতিই এখন আর কম্পিউটার নামক যন্ত্রটির প্রভাবের বাইরে নয়।

অতিদ্রুত গতিতে এই যন্ত্রটির সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াই দ্রুততর হচ্ছে বিশেষ করে ইন্টারনেট-এর অতিসহজলভ্যতার ফলে।

অন্যদিকে Print ও Electronic media-র উন্নয়নও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে গতিময় করে তুলেছে। ভাব বিনিময় তথা সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে Television-এর মতো মাধ্যম আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে করে তুলেছে আন্তর্জাতিক। তবে অর্থনৈতিকভাবে কর্তৃত্বকারী গোষ্ঠীর সংস্কৃতি (Economically dominant culture) electronic media ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে অবাধে হয়ে উঠছে global culture.

২.৩ ❑ আর্থিক বিশ্বায়ন :

বিশ্বব্যাপী পুঁজি ও বাজারের কেন্দ্রীকরণ এককথায় আর্থিক বিশ্বায়নের মূলকথা যা জাতীয় বাজার বা রাষ্ট্রের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে। এর অর্থ হল পুঁজি বা বাজার এখন আর রাষ্ট্রের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। অর্থাৎ ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করে অনতিক্রম্য দূরত্ব (distance)-কে ঘুচিয়ে finance হয়ে উঠেছে Global.

অন্যদিকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম চালিকা শক্তি হল বাণিজ্য। জাতীয় বাণিজ্যকে বিশ্ব-বাণিজ্যের স্তরে উন্নয়নের পেছনে কাজ করে চলেছে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত প্রয়াস বিশেষ করে শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়া ও অবাধ বাণিজ্যের নীতি। বর্তমানে অবাধ বাণিজ্যের রমরমা অবস্থা থাকলেও এই অবস্থায় পৌঁছানোর পেছনে বাণিজ্যিক ধারণা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সংঘাতের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আর্থিক বিশ্বায়নের একবিংশ শতকীয় রূপ আলোচনা করার আগে এই ইতিহাস একটু আলোচনা করা যাক।

বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যপুঁজির ধাবমানতা মূলত শুরু হয় ইউরোপীয় দেশসমূহের বাণিজ্য বৃদ্ধির তাগিদে নতুন নতুন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে। বিংশ শতকের গোড়ায় বিশ্বব্যাপ্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা বাণিজ্য একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়ে পরিণত হয়। বিশ্ববাণিজ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ আবর্তিত হতো একটি প্রশ্নকে ঘিরে যার বক্তব্য ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য প্রয়োজন? এই ভাবনার সঙ্গে সমাপতন ঘটেছিল ইউরোপের জাতি-রাষ্ট্রের (Nation-states) বিকাশের যেখানে ঐ রাষ্ট্রসমূহের প্রধানগণ বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁদের সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কোষাগারকে ভরে রাখার জন্য। এর ফলস্বরূপ বিকাশ ঘটে Mercantilism-এর যা রাষ্ট্রকে বাণিজ্যে লাভবান করাত সোনা ও রূপার আমদানীর মধ্য দিয়ে। Mercantilism-এর বিকাশের ফলে ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের রাজধানীতে বিশেষ করে লিসবন, প্যারিস, এবং লন্ডনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সোনা ও রূপার আগমন ঘটতে থাকে।

Mercantilism-এর এই ধারাবাহিকতার পাশাপাশি আরেকটি প্রশ্নও উত্থাপিত হয় যার বক্তব্য ছিল বিশ্ব বাণিজ্য বিকাশে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বা মুক্ত-বাণিজ্য (Free Trade) বাণিজ্য বৃদ্ধির তাগিদেই অবশ্য প্রয়োজনীয়। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে Adam Smith-এর The Wealth of Nations প্রকাশের পর মুক্ত-বাণিজ্যের ধারণা জনপ্রিয় হতে থাকে। এই ধরনের ভাবনার মূল বক্তব্য ছিল যে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলী পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়া উচিত যা আখেরে

রাষ্ট্র বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান সবাইকেই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করবে। ধীরে ধীরে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক জগৎ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়াসহ) মুক্ত বাণিজ্যের এই ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এর বিকাশের অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তবে মুক্ত বাণিজ্য এবং Mercantilism-এর সংঘাত নিরসন খুব সহজ ছিল না। মুক্ত বাণিজ্য প্রকৃত অর্থে কোনদিনই মুক্ত (Free) ছিল না। কারণ মুক্ত বাণিজ্য সবসময়ই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দাবী করত বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমদানী শুল্কের বাধা (Tariff barier) কে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিল। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Stock Market-এর ধ্বংসের ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রতিক্রিয়া মুক্ত বাণিজ্যের শুল্কনীতির এই বিষয়টির স্পষ্ট উদাহরণ। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য মার্কিন কংগ্রেস ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে Smoot-Hawley tariff নীতি গ্রহণ করে যা এক ধাক্কায় আমদানী শুল্কের পরিমাণ 50% বাড়িয়ে দেয়। এর পরিণতি হিসাবে Stock Market-এর পতন ঘটে এবং ১৯৩০-র দশকে মহা মন্দার (Great Depression) সৃষ্টি করে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক বন্ধু দেশসমূহও একই ধরনের নীতি গ্রহণ করে। ফলে বিশ্বব্যাপী মন্দার সৃষ্টি হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জার্মানীর অবক্ষয়প্রাপ্ত অর্থনৈতিক অবস্থাই ১৯৩৩-এ হিটলারকে ক্ষমতায় আসতে সহযোগিতা করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে পাশ্চাত্যের মিত্র জোটের মনে হয়েছিল যে যুদ্ধোত্তরকালে অর্থনৈতিক মন্দার হাত থেকে বাঁচার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরী। ১৯৪৪খ্রিস্টাব্দে ৪৪ (চুয়াল্লিশ) টি দেশের প্রতিনিধিগণ যুদ্ধোত্তরকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মতামত জ্ঞাপন করেন (Bretton Woods Conference, New Hampshire, July, 1944)। তাঁরা আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা বা International Moneytary Fund বা IMF তৈরী করেন বহুজাতিক সংস্থার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আদান প্রদানের ব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য যা মহা মন্দার সময় ভেঙে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিলগ্নে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশই IMF-এ যোগদান করেছে।

IMF-এর মূলধনের জোগান এসেছিল মূলত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের থেকে যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন সবথেকে বেশী। এই কারণে IMF-এর টাকা খরচ করার প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশী। IMF বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে গরিব রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ঋণ দান করে। বিনিময়ে ঋণগ্রহীতা দেশসমূহ IMF-এর ঋণগ্রহণ শর্ত মানতে বাধ্য থাকে। এর দ্বারা IMF আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আদান-প্রদানকারী হিসাবে কাজ করে এবং অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা দেশ-সমূহের সরকারের উপর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

IMF-এর কার্যকারিতার এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে IMF সম্পর্কে বিরোধী ধারণার সৃষ্টি করেছে, কারণ IMF এখানে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকারীর চেয়েও অধিকমাত্রায় ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। IMF এর স্পষ্ট কার্যাবলী তৃতীয় বিশ্বে এই ধারণার সৃষ্টি করেছে যে পুঁজিবাদী ও উন্নত প্রথম বিশ্বের দেশসমূহ তৃতীয় বিশ্বকে বিভিন্নভাবে শোষণ করছে। পক্ষান্তরে IMF মনে করে যে অর্থনৈতিক অবস্থার পুনর্গঠনের প্রধান অঙ্গা অর্থাৎ পুঁজি দিয়ে সাহায্য করছে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে যা তাদের একান্ত প্রয়োজন।

1944-এর Bretton Woods Conference-এর আরেকটি ফল হল World Bank বা বিশ্বব্যাঙ্ক-এর প্রতিষ্ঠা। এই অর্থনৈতিক সংস্থাটি 1946 খ্রিস্টাব্দ থেকে তার কার্যাবলী শুরু করে। এর

প্রধান কাজ হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গৃহীত কোন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান। এর কার্যকরী মূলধন আসে মূলত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের চাঁদা থেকে। তবে এই ব্যাঙ্ক বিশ্বের অর্থ বাজার (World's money market) থেকেও প্রভূত পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে আন্তর্জাতিক স্তরে IMF, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মিলিত প্রয়াসে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য গ্রহণ করা হয় General Agreement an Tariffs and Trade (GATT)। শুল্ক হ্রাসের ক্ষেত্রে GATT ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছরে GATT শিল্পজাত পণ্যের বাজারদরে 40 থেকে 5% পর্যন্ত শুল্ক হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। শুল্ক হ্রাস ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে GATT-এর ভূমিকা অপরিসীম।

GATT মূলত গৃহীত হয়েছিল সাময়িকভাবে বাণিজ্য বৃদ্ধির তাগিদে। তা সত্ত্বেও GATT প্রায় অর্ধশতক টিকেছিল। 1995 খ্রিস্টাব্দে GATT তার অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটিয়ে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে Word Trade Organization (WTO) বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হিসাবে। WTO তৈরী হয়েছে মূলত অর্থনৈতিক উদারীকরণকে দ্রুততর করার জন্য। এই সংস্থার নিয়মাবলী সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উপর সর্বতোভাবে কার্যকরী। চীন যখন WTO-র সদস্য হওয়ার আবেদন জানায় তখন বলা হয় চীন অবশ্যই উচ্চহারে আদায়ীকৃত আমদানী শুল্ক (কোন কোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে 200%) কমাতে বাধ্য থাকবে।

২.৪ ❑ ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠি :

মুক্ত বাণিজ্য বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যে সংগঠনের কথা উল্লেখ করা যায় সেটি হল ইউরোপীয় সংঘ (বা European Union)। এই সংঘের সূচনা ঘটে 1952 খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের কয়লা ও ইস্পাত সম্প্রদায়ের (Coal and Steel Communities) দ্বারা। ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ এই সংঘের মূল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। 1957 খ্রিস্টাব্দের রোম চুক্তি (Treaty of Rome, 1957) অনুসারে এই সংঘ The European Economic Community (EEC) হিসাবে চিহ্নিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য (Free trade) তথা সাধারণ বাজার (Common market)-এর বিকাশ ঘটানো।

ইউরোপীয় সংঘের মূল স্থপতি ছিলেন ফ্রান্সের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী রবার্ট স্যুম্যান (Robert Schuman) এবং অর্থনীতিবিদ জ্যাঁ মোনেট (Jeau Monnet) যাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ করে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পাঁচ বছর পর 1950-এর 7ই মার্চ স্যুম্যান যখন তাঁর এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন তখন তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানি ও ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের শত্রুতার অবসান ঘটিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে উভয় দেশই সফলতা অর্জন করেছে।

1985 খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে European Council-এর 12টি সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানগণ ঘোষণা করেন যে তাঁরা আগামী 1992 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিজেদের নিবিড় ও মুক্ত বাজার তৈরি করবেন যা 1957 খ্রিস্টাব্দে গৃহীত উদ্দেশ্যকে সফল করবে। Council-এর শ্বেতপত্র Completing the Internal Market-এ বলা হয় যে ব্যাঙ্ক পরিষেবা, পরিবহণ, সীমান্ত ইত্যাদির ক্ষেত্রে জাতীয় নীতির বাধা

অতিক্রম করে পশ্চিম ইউরোপের সামগ্রিক স্বার্থে কাজ করবে এই Council-শ্রমশক্তি থেকে শুরু করে কৃষি, শিল্প, শিশুশ্রম, মহিলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিও আলোকপাত করার কথা ঘোষণা করা হয়। এমনকি সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সাধারণ মূদ্রা বা Common Currency চালু করার কথাও ঘোষণা করা হয়।

যাত্রাশুরুর কয়েক দশকের মধ্যেই ইউরোপীয় সংঘ অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। বিশেষ করে ফ্রান্স ও স্পেন বাজার অর্থনীতি (market economy)-র কার্যকারিতা অর্থাৎ বাণিজ্য বিকাশে সরকারী নিয়ন্ত্রণ পরিত্যাগ (deregulation) করে অবাধ বাণিজ্য বিকাশে জোর দেওয়ার জন্য ইউরোপীয় সংঘকে উৎসাহিত করে। পাশাপাশি পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলার Helmut Cohl-ও অনুভব করেন যে তাঁর রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিয়ন্ত্রণ নীতি (Tariff barlear) পরিত্যাগ করা দরকার। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে 1989-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও জাপানকে নিয়ে যে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (Free Trade zone) তৈরি হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইউরোপীয় সংঘ বাণিজ্য বৃদ্ধিকে মসৃণ রাখার জন্য মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে আরো বেশি সচেতন হয়। 1989-এ পশ্চিম ইউরোপে জাপানের মূলধন বিনিয়োগের প্রয়াসকে ঘিরে ইউরোপীয় সংঘ উদ্দীপিত হয়ে ওঠে।

২.৫ ❑ European Economic Community-**র সম্প্রসারণ ও** European Union-**এর প্রতিষ্ঠা :**

EEC-র রোগমুক্তির প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল যে এই সংস্থা ইউরোপের জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবে। এই গোষ্ঠির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ মনে করেছিলেন যে মাত্র ছয়টি দেশ নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হলেও সমগ্র ইউরোপে তাদের প্রয়াসকে সম্প্রসারিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে 1973 খ্রিস্টাব্দে এই সংস্থা ব্রিটেন, ডেনমার্ক ও আয়ারল্যান্ডকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করে। 1981 খ্রিস্টাব্দে গ্রীস এবং 1986-এ স্পেন ও পর্তুগাল এই সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে। এরপর 1995 খ্রিস্টাব্দে সুইডেন, অস্ট্রিয়া ও ফিনল্যান্ড এই সংস্থার আওতাভুক্ত হয়।

EEC তার 1985 খ্রিস্টাব্দের ঘোষণাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে 1991 খ্রিস্টাব্দে। ঐ বছর Maaszricht Treaty-তে EEC ইউরোপে অভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই চুক্তিতে EEC-র সদস্য দেশসমূহের মধ্যে একই ধরনের শ্রম আইন ও সামাজিক নীতি গ্রহণ করার কথাও ঘোষণা করে।

তবে Maastricht Treaty অবিসংবাদিতভাবে গৃহীত হয়নি। নয়টি সদস্য রাষ্ট্র অতি দ্রুত এই চুক্তিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের সম্মতি জানালেও ফ্রান্স, ডেনমার্ক ও আয়ারল্যান্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বেশ বিলম্ব ঘটায়। শেষ পর্যন্ত Maastricht Treaty কার্যকরী হয় 1993 খ্রিস্টাব্দে। তখন থেকে European Econimic Community-র নাম পরিবর্তিত হয়ে European Union (EU) হয়।

European Union-এর একান্ত চেষ্টায় এক দশকের মধ্যেই এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে (কয়েকটি বাদে) বিনিময়ের সাধারণ মুদ্রা (Common Currency Called Euro) বা Euro চালু করে (2002)। এই মুদ্রা ব্যবস্থা শুধুমাত্র ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহকে একতাসূত্রেই আবদ্ধ করেনি এটা ইউরোপে

মুক্ত বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের হাতিয়ারে পরিণত হয়। পাশাপাশি EU-এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। 2004-এর মধ্যে পোল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাটাভিয়া, চেক্ রিপাবলিক, শ্লোভাকিয়া, লিথুয়ানিয়া, হাঙ্গেরী, মাল্টা, সাইপ্রাস প্রভৃতিও EU-এর সদস্যপদ লাভ করে (মোট 25টি)। বুলগারিয়া ক্রোয়েশিয়া, রোমানিয়া ও তুর্কী EU-এর সদস্যপদ লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। দীর্ঘদিন বাদে অতি সম্প্রতি তারা EU-এর সদস্য হয়েছে।

২.৬ ❑ অন্যান্য আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোটসমূহ :

EU-র মতো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুক্ত বাজার তথা সাধারণ বাজার প্রতিষ্ঠা এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ অনেকগুলি আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোট গড়ে উঠতে থাকে বিংশ শতকের শেষার্ধে, এক্ষেত্রে উত্তর আমেরিকার জোট, দক্ষিণ আমেরিকার জোট, আফ্রিকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক বাণিজ্যিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে অতি সংক্ষেপে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

২.৬.১ The North American Free Trade Agreement বা NAFTA :

সারাবিশ্বে তার বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ও মেক্সিকোকে নিয়ে 1980-র দশকে North American Free Trade Agreement (NAFTA) তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল 400 মিলিয়নের অধিক ক্রেতাকে নিয়ে একটা সাধারণ বাজার তৈরি করা।

1990-এর জুন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি H.W. Bush ও মেক্সিকোর Carlos Salians de Gartari NAFTA তৈরি করার কথা ঘোষণা করে বলেন যে এটা হল একটি Powerful engine for economic development, creating new jobs and opening new markets. এই মন্তব্য থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা কাজের নতুন ক্ষেত্র ও নতুন বাজার প্রতিষ্ঠা ছিল NAFTA-র মৌলিক উদ্দেশ্য। January 1, 1994-এ NAFTA তার কাজকর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করে।

তবে NAFTA-প্রতিষ্ঠা বিতর্কবিহীন ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও কানাডার ব্যবসায়ীগণ NAFTA তৈরির ঘোষণাকে স্বাগত জানান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি সহ Secretary for state এবং তিনজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের অকুণ্ঠ সমর্থন আদায় করে NAFTA মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি Bill Cliton বারবার NAFTA-র ইতিবাচক দিকগুলিকে মার্কিন নাগরিকদের অবহিত করান। কিন্তু Mexico-র Chiapas প্রদেশে NAFTA-র বিরুদ্ধে রীতিমতো বিদ্রোহ দেখা দেয়। কারণ বিদেশীরাও মেক্সিকোর জমি ক্রয় করার অধিকার পায়। অন্যদিকে কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা বলতে শুরু করেন যে মেক্সিকোর কম মজুরী প্রাপ্ত শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে তাদের জীবনযাত্রার মানে অধোগতি হবে। এখানে উল্লেখনীয় যে 1989 থেকে 1993 খ্রিস্টাব্দে মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন শিল্পে 360000-এরও বেশি কাজ মেক্সিকোর শ্রমিকদের হাতে চলে যায়। The American Federation of Labour-Congress of Industrial Organisations (LAFL-CIO) আশঙ্কা প্রকাশ

করে যে NAFTA–র ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 500000 উৎপাদন শিল্পের কাজ মেক্সিকোর শ্রমিকদের হাতে চলে যাবে।

মুক্ত বাজারী অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার লক্ষে উৎপাদন শিল্পের শ্রমিকদের মজুরী হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দেয় NAFTA–র নীতির প্রভাবে। এমনকি মেক্সিকোর কৃষকরা কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নত কৃষকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অপারগ হয়।

NAFTA প্রকৃতপক্ষে ছিল একটা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা যার আগে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে কোন নজীব্দ বিশ্বে ছিল না। এর দ্বারা উন্নত বিশ্বে সমস্ত রকম নিয়ন্ত্রণ কাটিয়ে ওঠে প্রকৃত মুক্ত অর্থনীতির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। NAFTA এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের বিশেষ সুবিধা দিয়েছিল এবং এই হিসাবে NAFTA ছিল Free Trade Agreement-এর পাশাপাশি Free Investment Agreement যেখানে বিনিয়োগকারীগণ নিয়ন্ত্রণবিহীন (deregulated) বাজার থেকে যথাসম্ভব কম দামে শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে NAFTA–র সদস্য রাষ্ট্রে শ্রমিকদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে NAFTA–র নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। NAFTA তৈরির দশ বছর পর (1994–2004) দেখা যাচ্ছে যে মেক্সিকোর শ্রম বাজারে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি ঘটেনি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কম মজুরীতে দক্ষ শ্রমিক তৈরির পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে।

২.৬.২ দক্ষিণ আমেরিকার অর্থনৈতিক আঞ্চলিকতাবাদ এবং MERCOSUR :

1991 খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাংশের চারটি দেশ—আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে ও পারাগুয়ে—MERCOSUR বা The Southern cone common market নামের একটি সাধারণ বাজার তৈরি করে। 1996 খ্রিস্টাব্দে চিলি ও বলিভিয়া এতে যোগদান করলে MERCOSUR-এর বাজারের ক্রেতার সংখ্যা 210 মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায় যা লাতিন আমেরিকার GDP <Gross Domestic Product)-র 60% এবং এর মোট ব্যবসার 40%-এ দাঁড়ায়। 1994 খ্রিস্টাব্দে MERCOSUR NAFTA–র সঙ্গে আলোচনা শুরু করে বিশেষ করে মুক্ত বাজারী অর্থনীতিকে আরো প্রসারিত করার জন্য।

ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার নেতৃত্বে MERCOSUR-এর সৃষ্টি পরস্পর বিবদমান এই দুই রাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের স্বাভাবিক শত্রুতার অবসান ঘটায়। এই সংস্থা ঐ অঞ্চলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রসারের এবং সমমানের শুল্কনীতির প্রসারের কাজে যুক্ত আছে।

২.৬.৩ The Association of Southeast Asian Nations = ASEAN :

The Association of Southeast Asian Nations বা ASEAN তৈরি হয় 1967 খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া, মালেসিয়া, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডকে নিয়ে। ASEAN তৈরির পেছনে মূল চালিকা শক্তি ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক সুরক্ষার প্রশ্ন। পরবর্তীকালে ব্রুনেই, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস ও মায়ানমার ASEAN–এ যোগ দেয়। 1970–এর দশক থেকে ASEAN তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।

২.৬.৪ APEC ও Yen Block :

1996 সালে প্রশান্ত মহাসাগরের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের মধ্যে তৈরি Asian Pacific Economic cooperation বা APEC. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়া, জাপান, চীন, মেক্সিকো ও পেরু এই অর্থনৈতিক সংস্থাটির সদস্য। APEC-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ প্রতিবছর তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিশেষ করে শুল্ক কমানোর (Tariff barrier) নিয়ে আলোচনা করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। APEC পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ নিয়ে গঠিত একটি সংস্থা যা বিশ্ব-বাণিজ্যের 40% নিয়ন্ত্রণ করে।

অন্যদিকে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান গড়ে তুলেছে Yen Block যদিও এটা কোন Formal Organization নয়, তবুও এর সদস্যগণ পরস্পরের স্বার্থ বিবেচনা করে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথে হাঁটছে।

২.৬.৫ SAARC ও SAFTA :

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশগুলিও অর্থনৈতিক আঞ্চলিকতাবাদ থেকে পিছিয়ে নেই। বহু আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশসমূহ ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনে (Dacca Summit, 1985 December) গঠিত হয়। South Asian Association for Regional Cooperation বা SAARC. ঢাকা সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপকে গঠিত এই আঞ্চলিক সংস্থা নিজ নিজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে দেশগত ও যৌথ ভাবে আত্মনির্ভরতার পথে হাঁটবে। সার্ক এর পরবর্তী সম্মেলনগুলিতে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন সাধারণ সমস্যার সমাধান সহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষে SAARC-এর মালে সম্মেলন (১৯৯৭ মে) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ ঐ সম্মেলনে South Asian Free Trade Agreement বা SAFTA-র উপর জোর দেওয়া হয়।

মূলত নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় SAARC ভুক্ত দেশগুলি South Asian Preferential Trade Arrangement বা SAFTA-য় পরিণত হয়। SAFTA দক্ষিণ এশিয়ায় নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বার্তা বহন করে চলেছে।

২.৭ ❑ বিশ্বায়ন আশীর্বাদ না অভিশাপ :

1990-এর দশকে বিশ্বায়ন শব্দটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এটা হল নতুন যুগের নতুন সত্য (reality)। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এর প্রধান সূচকগুলো হল—

(১) অর্থনৈতিক বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ কমানো বা deregulation।

(২) ব্যক্তি মালিকানায় উৎপাদন ও সরকার নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা বা Privatization।

(৩) সরকারি বাজেট নিয়ন্ত্রণ বা austerity।

(৪) মুক্ত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা বা Trade liberalization।

এই ব্যবস্থাকে Washington Consensus-ও বলা হয়ে থাকে যাকে IMF ও World Bank ঋণদানের শর্ত হিসাবে গ্রহণ করেছে। এর অর্থ হল কোনো দেশ IMF বা World Bank থেকে ঋণ গ্রহণ করতে চাইলে তাকে কতকগুলি বেদনাদায়ক অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ওই দেশের রাষ্ট্র নেতা বা সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয় যে ওই অর্থনৈতিক বেদনা হবে সাময়িক। এশিয়ার বেশিরভাগ দেশই 1997-এর পর এই অর্থনৈতিক বেদনার দ্বারা জর্জরিত। পাশাপাশি এখানকার রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন এই বেদনাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। তবে IMF সহজ শর্তে ঋণদানের মাধ্যমে এই অবস্থাকে কাটিয়ে তুলতে চাইছে বিশেষ করে ঋণে ভরাক্রান্ত দেশীয় ব্যাঙ্ক এবং Crony Capitalism (রাজনীতিবিদ, দেশীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ীদের যোগসাজস)-এর নিয়ন্ত্রণ দূর করার মাধ্যমে।

লাতিন আমেরিকাতেও বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব পরেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে খরচ কমিয়ে বাঁচতে চাইছে মেক্সিকোর উদার ও মুক্ত অর্থনীতি। লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশও এই নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে এখানকার গরিবি (Poverty) কোনভাবেই কমানো যায়নি। World Bank-এর মতে এটা শুধুমাত্র লাতিন আমেরিকা নয় এটা প্রায় সার্বজনীন সমস্যা। World Bank স্বীকার করে নিয়েছে যে 1990 থেকে 1998-এর মধ্যে International Poverty Line-এর নীচে (দৈনিক ২ মার্কিন ডলার-এর কম আয় সম্পন্ন) বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা 2.1 থেকে 2.4 বিলিয়ন হয়েছে। অন্যদিকে দৈনিক 1মার্কিন ডলারের থেকে কম আয় সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা 1.2 বিলিয়ন। আফ্রিকার ক্ষেত্রে 80%-90% মানুষ International Poverty Line-এর নীচে বসবাস করছে। ভারতের ক্ষেত্রে তা 86%, ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে 66% এবং চীনের ক্ষেত্রে তা 53%। World Bank আরো স্বীকার করেছে যে বিশ্বের ২০০ জন ধণী ব্যক্তির মোট আয় ২ বিলিয়ন গরিব মানুষের আয়ের সমান।

বিশ্বায়নের প্রধান বিরোধী শক্তি হল বিশ্বের শ্রমিক সংগঠনসমূহ। পাশাপাশি পরিবেশবাদীরাও (Environmentalist) এর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। 1999-এ সিয়াটলে WTO-এর সম্মেলনে G77, পরিবেশবাদী, মানবতাবাদী ও শ্রমিকদের যৌথ প্রতিবাদ এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একবিংশ শতকের গোড়ায় বিশ্বায়নবাদী অর্থনীতিবিদগণ (New Liberals) ও প্রথম বিশ্বের রাজনীতিবিদগণ IMF-এর অর্থনৈতিক দাওয়াই-এর প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। একদল মনে করছে সহজ শর্তে IMF-এর ঋণদান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া উচিত। অন্যদিকে আরেকদলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি (Economic Growth)-ই সারা বিশ্বের গরিবি সমস্যা তথা সম্পদ বিতরণের সমস্যার সমাধান করবে।

২.৮ ❑ অনুশীলনী

১। বিশ্বায়ন কী?

২। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের প্রধান সূচকগুলি কী কী?

৩। বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা করুন।

৪। অর্থনৈতিক আঞ্চলিকতা কী?
উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২.৯ ❑ গ্রন্থপঞ্জী :

১। Desmond Dian (ed) : Encyclopedia of European Union, Boulder Colo, 2000.
২। Thomas Frank : One market under Gd, New York, 2000.
৩। Charles W. Kegby and Eugene R. Wihkopf : World Politics, Boston, 2001.
৪। James H. Mittleman (ed) : The Globalization Syndrome, Princeten, 2000.
৫। Thomas Freidman : Understanding Globaliztion. New York, 1999.
৬। Wayne C. Mc Williams, & Harry Piotrawski : The World since 1945. New Delhi, 2006.
৭। রাধারমণ চক্রবর্তী (স.) : সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৯.

একক ৩ ❑ ভারত ও দক্ষিণ এশিয়া

গঠন

৩.০ ভূমিকা
৩.১ স্বাধীনোত্তর ভারত ও তার উন্নয়ন প্রক্রিয়া
৩.২ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ
৩.৩ নেপাল ও ভুটান
৩.৪ শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ
৩.৫ পর্যবেক্ষণ
৩.৬ অনুশীলনী
৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ ❑ ভূমিকা

উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের জলরাশি পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বালুচিস্থানের মরু অঞ্চল থেকে পূর্বে ভারত-মায়ানমারের পার্বত্য সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতীয় উপমহাদেশ (Indian sub-continent) বা দক্ষিণ এশিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চল। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার মত দেশগুলি নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ বসবাস করে। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া এই দেশগুলির মধ্যে নানাবিধ সাধারণ সমস্যা বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দারিদ্র, অশিক্ষা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, মৌলবাদ তথা সন্ত্রাসবাদের মতো সমস্যাগুলির নিয়মিত উপস্থিতি থাকা সত্তেও এই দেশগুলি পরস্পর বিবদমানতা থেকে সরে আসতে পারেনি। বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক বৈরী মনোভাব দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক উন্নয়নের পথে একটা গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। তা সত্তেও অতি সাম্প্রতিক কালে বিশেষত শীতল যুদ্ধের অবসানের পর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হয়েছে।

৩.১ ❑ স্বাধীনোত্তর ভারত ও তার উন্নয়ন প্রক্রিয়া

প্রায় দুশ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর 1947 খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নানাবিধ সমস্যার হাত ধরে অগ্রসর হচ্ছে। স্বাধীনতার পর ভারতের মূল সমস্যাসমূহের অন্যতম ছিল তার বিশাল জনসংখ্যা ও কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের অপ্রতুলতা। তাছাড়া বিত্তশালী ভূম্যধিকারী (Wealthy landowners) শ্রেণি ও দরিদ্র কৃষককুলের মধ্যে বিশাল ব্যবধান ও সামগ্রিকভাবে কৃষি উন্নয়নের পরিপন্থী ছিল।

ভারত তার স্বাধীন সত্তার শুরু থেকেই তার অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণ ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করে। এক্ষেত্রে ভারত মিশ্র অর্থনীতির (Mixed economy) চরিত্র গ্রহণ করে যেখানে প্রধান শিল্পক্ষেত্রসমূহ, যেমন— লোহা ও ইস্পাত, খনি, পরিবহণ বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে জাতীয়করণ (Nationalisation) করা হয় অর্থাৎ সরকারি মালিকানায় এদের উৎপাদন ও পরিচালনার নীতি গ্রহণ করা হয়। এই অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে সফলতা প্রদান করার জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five years plan) গ্রহণ করে 1951 খ্রিস্টাব্দে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত শিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করে যা পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনাতেও চলতে থাকে। 1961 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু স্বীকার করেন যে ভারত 'Would need many more five years plans to progress from the cowdung stage to the age of atomic energy'. শিল্পের ক্ষেত্রে যদিও ভারত কতকগুলি বৃহদায়তনের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিল ঐ সময়ের মধ্যে কিন্তু ভারতের বেশির ভাগ শিল্পই তখনো পর্যন্ত ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের এবং ভারতের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল।

ভারতের গড় শিল্পোৎপাদনের প্রগতি মাঝারি মানের হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল কম। 1947 সাল থেকে ভারতের বার্ষিক গড় GNP (Gross National Product)-র হার ছিল 3% থেকে 4%। অভিজাত শ্রেণির সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণির আয়ের বৈষম্যও ছিল অনেক বেশি। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত ভারতের অন্যতম সমস্যা ছিল মূলধনের অভাব, অশিক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তির অভাব। এছাড়া সামাজিক সচলতার প্রভাব, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বহুত্ব এবং আঞ্চলিকতাবাদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী ছিল। ভারতের মেধাশক্তির বহির্গমন (brain drain)-ও প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা হিসাবে দেখা যায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হচ্ছে বাজার। ভারতের জনগণ দারিদ্র সম্পৃক্ত হওয়ায় ভারতের Home market ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল। ফলে ভারত তার কাঁচামাল রপ্তানীর বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানীর প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। আর পেট্রোলিয়াম, খাদ্যদ্রব্য এবং শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানীর দাম মেটাতে এর প্রয়োজনও ছিল। 1970 খ্রিস্টাব্দের খনিজ তেলের অপ্রতুলতা এবং বিশ্ববাজারে মূদ্রাস্ফীতি বাণিজ্যিক সূচক ভারতের সপক্ষে ছিল না। ভারত বেশি দামে তার আমদানী- কৃত পণ্যের দাম মেটাতে পণ্য রপ্তানীর উপর জোর দিতে থাকে। বছরের বছর ভারতের বাণিজ্যিক ঘাটতি (Trade deficit) চলতে থাকে। শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে চালু রাখার জন্য অধিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা ও খাদ্যশস্যের ঘাটতি ভারতকে ক্রমশ বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। 1950 ও 1960-এর দশকে ভারতে কৃষি উন্নয়নের জন্য উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় যা সবুজ বিপ্লব (Green Revolution) হিসাবে চিহ্নিত হয়। সবুজ বিপ্লবের ফলে ভারতের খাদ্য ঘাটতি কমতে থাকে এবং খাদ্য সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা কমতে থাকে। এমনকি 1980-র দশক থেকে ভারত উদ্বৃত্ত খাদ্য রপ্তানী করার অবস্থায় পৌঁছায়।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মার্কিন অর্থসহযোগিতা 1971 খ্রিস্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ঐ বছর থেকে ভারতের আর্থিক উন্নয়নের সহযোগিতা করতে থাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ভারত পাশাপাশি অন্যান্য সংস্থা থেকেও তার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আর্থিক সাহায্য লাভ করে। এক্ষেত্রে World Bank, Asian Development Bank এবং জাপান বিশেষভাবে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে

সাহায্য করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভারত 1958 খ্রিস্টাব্দে প্রথম জাপানের Official Development Assistance পায়।

যেকোন দেশের উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হচ্ছে তার রাজনৈতিক স্থায়িত্ব (Political Stability)। এই বিষয়ে ভারতের কৃতিত্ব বিশেষ করে তার স্বাধীন সত্তার বিকাশের প্রথম দিকে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির থেকে অনেক বেশি। ভারত জাতি হিসাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে প্রবর্তিত হওয়া Parliamentary system-কে ধরে রাখে। ভারতে স্বাধীনতার পর একটি নির্দিষ্ট শক্তিশালী রাজনৈতিক দল অর্থাৎ কংগ্রেস দলের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। 1947 থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (1964) জওহরলাল নেহেরু, তার কন্যা ইন্দিরা গান্ধী (অল্প কয়েক বছর বাদে) 1966 থেকে 1984 এবং রাজীব গান্ধী 1984 থেকে 1989 পর্যন্ত ভারতের রাজনীতিতে কংগ্রেস দলের কর্তৃত্ব ধরে রাখেন। তবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস দলের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল না।

স্বাধীনতার পর ভারতের উন্নয়ন প্রক্রিয়া তার জাতিসত্তার বহুত্বতা (Plurality of nationhood) -র দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বারবার। বহু ভাষা-সংস্কৃতির এই দেশ বিভিন্ন আঞ্চলিক জনগোষ্ঠি ও অঞ্চলগত পরিচিতির আন্দোলনের দ্বারা বারবার সমস্যাগ্রস্ত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে বহুকৌণিক আঞ্চলিক আন্দোলন শুরু হয়। ভারতের ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিকতার সূত্রপাত হয় স্বাধীনতার পর পরই। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ভেঙে ভাষাভিত্তিক অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি ভারতের ভাষাভিত্তিক ও জনগোষ্ঠিগত (linguistic and ethni regionalism) আঞ্চলিকতাকে উদ্দীপিত করে। 1955–56 খ্রিস্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (State Reorganisation Commission বা SRC) তৈরি হওয়ার পর এই উদ্দীপনা আরো বেড়ে যায়। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ভেঙে নতুন রাজ্য তৈরি করার জন্য মারাঠী ও গুজরাটি ভাষাভাষি জনগণের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয় 1961 খ্রিস্টাব্দে যখন মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে পাঞ্জাবীদের ভাষার স্বীকৃতি ও পাঞ্জাব রাজ্যের দাবী কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করে নেয় 1966 খ্রিস্টাব্দে। ১লা নভেম্বর 1966 পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে 1963 খ্রিস্টাব্দে নৃগোষ্ঠিক পরিচিতি (ethnic identity)-র গুরুত্বকে স্বীকার করে নাগাল্যান্ডকে রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। একইভাবে 1972 সালে গারো, জয়ন্তীয়া ও খাসি পাহাড়ের জনগোষ্ঠি (Tribal)-দের জন্য আসাম থেকে আলাদা করে মেঘালয় রাজ্য তৈরি করা হয়। SRC–র এই সমস্ত পদক্ষেপ সারাভারত ব্যাপী নতুন রাজ্য গঠনের আন্দোলন তথা আঞ্চলিকতাবাদকে পরোক্ষভাবে উদ্দীপিত করেছে। পরবর্তীকালে 2000 খ্রিস্টাব্দে বিহার ভেঙে ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ ভেঙে ছত্তিশগড় ও উত্তরপ্রদেশ ভেঙে উত্তরাঞ্চল (বর্তমানে উত্তরাখণ্ড) রাজ্যের সৃষ্টি আঞ্চলিকতাবাদের দাবীকে প্রচ্ছন্ন মদত দিয়ে যাচ্ছে।

আঞ্চলিকতাবাদের নেতিবাচক প্রভাব ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াতেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতিবাচক ফল প্রদান করেছে। ফলে 1970 খ্রিস্টাব্দে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়। বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি, বন্‌ধ্‌ ইত্যাদির প্রভাবে 1975 খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন যা একুশ মাসব্যাপী চলেছিল। জরুরী অবস্থায় বাক্‌স্বাধীনতার তথা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার ভারতে শোচনীয় অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করে। 1977 খ্রিস্টাব্দে ভারতে নতুনভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে ইন্দিরা গান্ধী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। 1980–র দশকে কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। এই দশক থেকে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে (Standard

of living) উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায়। এই সময় থেকে ভারতের শিল্পক্ষত্রে ধীরগতিতে হলেও ক্রমোন্নয়ন (slow but steady), নগর উন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়নে প্রভূত উন্নতি হয়। পাশাপাশি ভারতীয় সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি (Middle class)-র বিস্তার ঘটে। তা সত্তেও ভারত বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অন্যতম, কারণ ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অত্যন্ত বেশি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি (Family Planning Pragram) গ্রহণ করা হলেও তার বাস্তবায়ন খুব সহজে হচ্ছে না। কারণ অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা ভারতের আরেকটি বড় অভিশাপ। এই সমস্ত কারণে 1994 খ্রিস্টাব্দে ভারতের Per capita GNP ছিল 320 মাত্র।

1980-র দশক ভারতে আরেকটি বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। সেটা ছিল বিচ্ছিন্নতার বিকাশ। পাঞ্জাবে পৃথক খালিস্তান রাষ্ট্র তৈরি করার আন্দোলন, আসামে আহোম রাষ্ট্র তৈরির জন্য United Liberation Front of Assam (ULFA)-র আন্দোলন এবং কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ভারতের নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী 1984 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে অমৃতসরের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গীদের দমন করার জন্য অভিযান চালায়। এই অভিযানের পরিণতি হিসাবে প্রায় 1200 মানুষ নিহত হন এবং অসংখ্য খালিস্তানপন্থীদের জেলে ঢোকানো হয়। এমনকি সন্দেহভাজন বন্দীদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালানো হয়, প্রায় 2000 জনকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। পাঞ্জাবের এই ঘটনার পরিণতি হল 1984 খ্রিস্টাব্দের 31 অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা। প্রধানমন্ত্রীর দুইজন শিখ পাঞ্জাবী দেহরক্ষী এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। ইন্দিরা হত্যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে পাঞ্জাব তথা উত্তরভারতে শুরু হয় শিখ নিধনযজ্ঞ। প্রায় ১০০০ শিখকে বিভিন্নভাবে হত্যা করা হয়।

ইন্দিরার মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী হন তাঁর পুত্র রাজীব গান্ধী। রাজীব গান্ধীও কঠোর হাতে শিখ সমস্যার মোকাবিলা করেন। পাঞ্জাবে ভারতের নিরাপত্তা রক্ষীদের মোতায়ন করার ফলে সেখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। এমনকি 1987 খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের নির্বাচিত সরকারকে ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়।

1989 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দল পরাজিত হয়। প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে রাজীব গান্ধী পদত্যাগ করেন। পরবর্তী দুই বছর কেন্দ্রের জোট সরকার মূলত ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং ধর্মীয় ও নৃগোষ্ঠিক (religious and ethnic) আন্দোলনের বিষয়ে ব্যাপ্ত থাকে। এখানে উল্লেখ্যনীয় যে ঐ দুই বছরের মধ্যে ভারতের আরেকটি সাধারণ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেটা ছিল জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ নীতি (Caste based reservation policy)-র সম্প্রসারণ। মূলত 1980 খ্রিস্টাব্দে জমা পড়া মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশগুলিকে কার্যকরী করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই কমিশনের রিপোর্টে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সরকারি চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৭% সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং-এর নেতৃত্বে সরকারি চাকরিতে OBC-দের জন্য সংরক্ষণ নীতি কার্যকর করা হয় 1990 দশকের গোড়ায়। পরবর্তীকালে 2007 খ্রিস্টাব্দে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে OBC-দের সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু এই সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে ভারতে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন সময়ে (1991 may) রাজীব গান্ধীকে হত্যা করা হয়। রাজীব হত্যার পেছনে শ্রীলঙ্কার Tamil Liberation Tiger-দের প্রত্যক্ষ হাত ছিল। কারণ তারা মনে করত শ্রীলঙ্কার সিংহলি সংখ্যাগুরুদের

হাত থেকে সংখ্যা লঘু তামিলদের স্বাধীনতা অর্জনে রাজীব গান্ধী বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। রাজীব হত্যার পর কংগ্রেস নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় ফিরে আসে প্রধানমন্ত্রী P.V. Narashima Rao-এর নেতৃত্বে।

1990-র দশকে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেশ কঠিন হয় দাঁড়ায়। কারণ ভারতের বিদেশী ঋণ (Foreign loan)-এর পরিমাণ দ্বাড়ায় 71 বিলিয়ন ডলার। পাশাপাশি বিদেশী সাহায্য গ্রহণের রাস্তাও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কারণ ভারতের সহযোগী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে 1991 সালে। ফলে ভারত তার কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি (Centrally Planned Economy)-তে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের সূচনা করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে উৎসাহদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ভারত মূলত এক নতুন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic policy) গ্রহণ করে যাকে এক কথায় উদারীকরণ বলা যায়। উদারীকরণ প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য ভারত International Monetary Fund (IMF) এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক (World Bank) থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণের শর্ত হিসাবে ভারত সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ, ব্যাঙ্ক ঋণে সুদের হার কমিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎসাহ দান, অর্থনীতিতে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতার অবসান, শুল্ক কমিয়ে ব্যবসা বৃদ্ধি করতে রাজী হয়।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের এই সমস্যাসংকুল সময়ে ভারত আরেকটি গভীর সমস্যায় পড়ে যায়। সেটা তৈরি হয়েছিল 1992 খ্রিস্টাব্দে (6th December) অযোধ্যায় বাব্‌রি মসজিদ ধ্বংস করার ফলে। 1947 খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পর ভারতে এটাই ছিল প্রথম মসজিদ ভাঙার ঘটনা। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা বেধে যায়। অন্যদিকে পাকিস্তান সহ অন্যান্য ইসলামিক দেশে ভারত তথা হিন্দু বিরোধী প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

1990-এর দশকের শেষ দিকে কংগ্রেস আবার ক্ষমতাচ্যুত হয়। ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) অটলবিহারী রাজপেয়ীর নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসে। BJP ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী ভারত গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এই প্রতিজ্ঞার উদাহরণ পাওয়া যায় 1998-র may মাসে পোখরানে ভারতের পারমাণবিক, কারগিল যুদ্ধে সাফল্য এবং পাকিস্তান, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসের দ্বারা BJP সরকার তার কার্যকাল পূরণ করে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে 2004-এর নির্বাচনে BJP পরাজিত হয় এবং কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসে সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে। কিন্তু সোনিয়া গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করা নিয়ে আপত্তি থাকায় মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হন।

BJP-র এই পরাজয়ের কারণ ছিল মূলত 1999-র দশক থেকে চলতে থাকা অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিক্রিয়া। BJP-র Shining India-র প্রচার সমাজের বিত্তশালী অংশের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। দারিদ্র, অশিক্ষা, নিরক্ষরতা, পানীয়জলের অভাব ও স্বাস্থ্য অবক্ষয়ের মত বিষয় এখনও ভারতের দৃষ্টান্ত মূলক ব্যর্থতা।

৩.২ ❑ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

যদিও ভারত 'বাঁচো ও বাঁচতে দাও' নীতিতে বিশ্বাস করে কিন্তু স্বাধীন ভারতের জন্মের পর থেকে তার বিদেশ নীতি সবসময় শান্তিপূর্ণ ছিল না। জওহরলাল নেহেরুর জোট নিরপেক্ষতার নীতি

শীতল যুদ্ধের সময়ে গুরুত্ব অর্জন করলেও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। জন্মলগ্ন থেকেই ভারত ও পাকিস্তান বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। উভয় দেশই কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দাবী করতে থাকে। 1948 ও 1949 খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধও বেধে যায় যদিও রাষ্ট্রসংঘ শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। ভারত কাশ্মীরে তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয় যদিও পাকিস্তান কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করায় কথা বার বার বলতে থাকে। পাকিস্তান মূলত কাশ্মীরের জনসংখ্যায় মুসলিমদের আধিপত্যের উপর ভিত্তি করে গণভোটের দাবী জানায়। অন্যদিকে ভারত কাশ্মীরের ভারত ভুক্তির সময় হিন্দু শাসকের ইচ্ছার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কারণ কাশ্মীররাজ মহারাজা হরি সিং ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তির পক্ষে মত দিয়েছিলেন।

পাকিস্তান ছাড়াও চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বিরোধ দেখা দেয়। সীমান্ত বিরোধের পরিণাম হিসাবে 1962 খ্রিস্টাব্দে ভারত-চীন যুদ্ধ বেধে যায়। এই যুদ্ধে ভারতের পরাজয় পাকিস্তানকে ভারত বিরোধী কাজে উৎসাহিত করে। ফলে কাশ্মীর সীমান্ত নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষ চলতে থাকে। 1965 খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সীমান্ত লঙ্ঘন করলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। উভয়দেশই বিদেশ থেকে কেনা অস্ত্রের সাহায্যে পরস্পরের মোকাবিলা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ভারত এই যুদ্ধে জয়লাভ করে।

ইন্দো-পাক যুদ্ধের পর পাকিস্তানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত সামরিক সাহায্য দিতে থাকলে ভারত তার নির্জোট অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকে। ভারত ক্রমশ সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নও দক্ষিণ এশিয়ায় তার প্রভাব বিস্তারের জন্য ভারতকে সাহায্য করতে সম্মত হয়। অন্যদিকে পাকিস্তান গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে তার বন্ধু হিসাবে কাছে পায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল শীতলযুদ্ধ চলাকালীন পরস্পরের মহাশত্রু।

ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়াও অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করা ছিল পাকিস্তানের বিশেষ ক্ষেত্র। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ ও জনসংখ্যার চাপ কমানো ছিল পাকিস্তানের আশু প্রয়োজনীয়তা। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জাতি গঠন (Nation building process) প্রক্রিয়ার যে সমস্ত সমস্যা তার প্রতিটারই মারাত্মক উপস্থিতি ছিল পাকিস্তানে। তাছাড়া পাকিস্তানের আরেকটা বড় সমস্যা ছিল তার দুই অংশের মধ্যে বিশাল ভৌগোলিক ব্যবধান। পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত রাজধানী থেকে পূর্ব পাকিস্তানের দূরত্ব ছিল 2000 মাইলেরও বেশি। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের মধ্যেও বিস্তর পার্থক্য ছিল। বিভিন্ন জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছিল সম্পূর্ণভাবে আলাদা। একমাত্র 'মুসলমান' এই ধর্মীয় পরিচয় ছাড়া পূর্ব ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন মিল ছিল না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিকতাবাদও (Regionalism) মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

জন্মলগ্নের কিছুকাল পর থেকেই পশ্চিম ও পূর্ব ওর পারস্পরিক সম্পর্ক সংঘর্ষসংকুল হয়ে পড়ে। অত্যন্ত বেশি জনঘনত্ব নিয়ে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অধাংশ বসবাস করত। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের পাঁচটা প্রদেশের একটা ছিল মাত্র। ফলে তার রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র 20%। অর্থনৈতিকভাবে মোট বাজেটের 35% মাত্র থাকত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসাবে দেখত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ।

পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলাভাষী জনগণ 1970-এর গোড়া থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধিতা করতে

থাকে। 1970-এ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ পাঠাতে পাকিস্তান সরকারের অনীহা পূর্ব পাকিস্তানের ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে উদ্দীপিত করে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল পাকিস্তানের আরেকটি বড় সমস্যা। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন ও দীর্ঘকালব্যাপী সামরিক শাসন পাকিস্তানের একটা সাধারণ রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত হয়। তবে 1970 খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইহাহিয়া খান (Yahya Khan) তের বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়েপাকিস্তানের জন্য একটি নতুন সংবিধান গ্রহণ করার জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার কথা ঘোষণা করেন। এই নির্বাচনে পূর্বপাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতীক মুজিবরের এই সাফল্য জেনারেল ইহাহিয়া খান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো মেনে নিতে পারেননি। পাকিস্তানের জাতীয়সভার অধিবেশন শুরুর আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলতে থাকলেও এবং মুজিবরের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা চলতে থাকলেও জেনারেল খান জাতীয়সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা করেননি। বরং 1971 খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা পাঠিয়ে মুজিবর সহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পাকিস্তানী সেনা নির্বিচারে গণহত্যা চালাতে থাকে। কম করেও 3 মিলিয়ন বাঙালীকে হত্যা করা হয়। 10 মিলিয়ন লোক পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

পশ্চিম পাকিস্তানের এই অমানুষিক বর্বরতা পূর্ব পাকিস্তানীদের তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য করে। এর ফলে পূর্বপাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। ভারত পাকিস্তানের এই সঙ্কটের সুযোগ গ্রহণ করে। 1971-এর December ভারতীয় সেনা পূর্বপাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে যায় এবং দীর্ঘ লড়াই-এর পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানে জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের।

পূর্ব-পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর অত্যাচারের খবর বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়লেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্বীকার করেনি। বরং পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের হস্তক্ষেপকে ভারতের আগ্রাসী মনোভাব হিসাবে চিহ্নিত করে ভারতকে যাবতীয় মার্কিন সাহায্য বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তান চীনের মদত পেতে থাকে। ফলে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 1971 খ্রিস্টাব্দে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1972-এর মে মাসের আগে বাংলাদেশকে জাতি হিসাবে স্বীকার করেনি। পাশাপাশি চীন 1975 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ লাভে বাংলাদেশের আবেদনে ভোটো প্রদান করেছে।

বাংলাদেশের জন্মের পর পাকিস্তানের জনসংখ্যা অর্ধেক কমে যায়। এখন পাকিস্তান তার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বেশি উৎসাহী হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। মুজিবুর রহমানকে জেল থেকে থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভুট্টো ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য 1972 খ্রিস্টাব্দে ভারতের সঙ্গে সমঝোতায় আসেন যা 1974 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। 1974 খ্রিস্টাব্দে ভারতের পরমাণু পরীক্ষার পর ভারত-পাক সম্পর্ক আবার খারাপ হতে থাকে।

বাংলাদেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও জন্মলগ্ন থেকেই দারিদ্র বাংলাদেশের নিত্য সঙ্গী। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভারত বাংলাদেশের শরণার্থীদের দেশে ফেরার আদেশ জারি করে। কিন্তু দেশে ফিরেও তাদের কোনো শান্তি ছিল না। কারণ বন্যা, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে অনশন ও রোগে

ভোগে দেহ ত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না। মুজিবরের সরকার অপরাধ, হিংসা ও হানাহানির শিকার হয়। বাংলাদেশের এই অস্থিরতা 1974 খ্রিস্টাব্দে 'জরুরী অবস্থায়' পর্যবসিত হয়। আর এই জরুরী অবস্থায় সেনা অভ্যুত্থানে এক সময়কার জনপ্রিয় নেতা মুজিবর রহমান নিহত হন। মুজিবরের হত্যার পর বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ মূলত সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের লুকোচুরি খেলার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ মূলত দারিদ্রের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এটা বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। 1994 খ্রিস্টাব্দে যার Per capita GNP ছিল $ 220. 1990–র পর বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে খানিকটা স্বস্তি পেয়েছে।

অন্যদিকে পাকিস্তানেও বাংলাদেশের মত রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রকট হয়ে ওঠে 1980–র দশকে। 1988 পর্যন্ত পাকিস্তানে সামরিক শাসন বলবৎ থাকে জেনারেল জিয়া-উল-হকের নেতৃত্বে। জেনারেল হক তাঁর সমালোচক বিশেষত যাঁরা গণতন্ত্রের জন্য সরব ছিলেন, তাঁদের একদমই আমল দিতেন না। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আফগানিস্থানের যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট আফগান শরণার্থীগণ পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকলে জেনারেল শঙ্কিত হয়ে সামরিক শাসনের ক্ষমতাকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু 1988–র আগস্ট মাসে বিমান দুর্ঘটনায় জেনারেল হকের মৃত্যু হলে সামরিক শাসনের হঠাৎই অবসান ঘটে। 1988–র নভেম্বরে পার্লামেন্টারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি (Pakistan People's Party PPP) বেন্‌জির ভুট্টোর নেতৃত্বে গঠিত সরকার জুলফিকার আলি ভুট্টোর অসামরিক সরকারের উত্তরাধিকারী হয়। এখানে উল্লেখনীয় যে 1974 খ্রিস্টাব্দে জুলফিকার আলির সরকারকে বরখাস্ত করেন জেনারেল হক ও ভুট্টোকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ফলে PPP সরকার সামরিক গোষ্ঠি বা রক্ষণশীল মৌলবি গোষ্ঠির থেকে নিরাপদ ছিল না। তাছাড়া PPP সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুব শক্তিশালী ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই বেনজির ভুট্টোর পক্ষে সরকার চালানো খুব কঠিন ছিল। তৃতীয় বিশ্বের যে কোন উন্নয়নশীল দেশের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে, সেনাপ্রধানদের তুষ্ট করে ও মৌলবাদীদের উপেক্ষা করে তাঁর শাসনকালের প্রথম বছরেই বেনজির ভুট্টো সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আলোচনার মাধ্যমে আফগানিস্থান থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রাজী করান তিনি (যদিও আফগান বিদ্রোহীদের মদত চালিয়ে ছিলেন।)

পাকিস্তানের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের দূত হিসাবে বেনজির ভুট্টোর আবির্ভাব ঘটলেও তাঁর পক্ষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন চালানো সম্ভব ছিল না। সেনাপ্রধানদের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস, দুর্নীতি, জনগোষ্ঠির মধ্যে দ্বন্দ্ব (ethnic conflict) প্রভৃতি কারণে 1990–এর আগস্ট মাসেই সরকারের পতন ঘটে। বেনজিরের পতনে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন জেনারেল মিরজা আসলাম বেগ। বেনজিরের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়।

1990–খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার তৈরি করেন নওয়াজ শরিফ। নির্বাচনের প্রাক্কালে কোরানকে সর্বোচ্চ আইন হিসাবে গ্রহণ করে প্রকৃত ইসলামিক দেশ বানানোর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নওয়াজ শরিফকে জয় এনে দেয়। কিন্তু দুর্নীতি, ছিনতাই, রাহাজানী, খুন, বৈদেশিক ঋণ, $ 500 মিলিয়ন মার্কিন সাহায্য বন্ধ হয়ে যাওয়া ও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কারণে শরিফ সরকারেরও পতন ঘটে অচিরেই।

1993-র নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসেন বেনজির। কাশ্মীর ও পারমাণবিক প্রশ্নে

পাকিস্তান তাঁর আমলে কূটনৈতিক সাফল্য লাভ করলেও দুর্নীতি ও তাঁর বিরুদ্ধে ছড়ানো অপবাদ তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে কলুষিত করে। তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। 1997-এর নির্বাচনে শরিফ আবার ক্ষমতায় ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির নানাবিধ অভিযোগ এবং পাকিস্তানের গোষ্ঠি দ্বন্দ্ব শরিফ সরকারকে শীঘ্রই অপ্রিয় করে তোলে। পাশাপাশি 1998-র এপ্রিল মাসে ঘাওরি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষার ফলে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোষানলে পতিত হয়। এই অবস্থা থেকে পাকিস্তানীদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য শরিফ 1999-র গোড়ায় হঠাৎই Line of control অতিক্রম করে পাকিস্তানের সেনাকে ভারতে ঢুকিয়ে দেয়। 19000 ফুট উঁচুতে অবস্থিত সিয়াচেন হিমবাহের কাছে পাকিস্তানের এই প্রয়াস সফলতা লাভ করনি। ভারতের প্রত্যুত্তর ও মার্কিন চাপের ফলে শরিফ দেশের ভেতরই কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ঐ বছরেরই অক্টোবর মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সেনাবাহিনী। এবং সেনাপ্রধান পারভেজ মুশারফ্ পাকিস্তানে অসামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে পুনরায় সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

৩.৩ ❑ নেপাল ও ভুটান

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত পর্বতময় নেপাল ও ভুটান সাম্প্রতিকভাবে বিশ্বরাজনীতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মূলত সেখানকার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের দরুন। কেবলমাত্র দক্ষিণ খোলা নেপালের ও ভুটানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছেদ্য। 1816 খ্রিস্টাব্দে মগৌলির সন্ধির পর নেপালের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের সম্পর্কও ছিল শান্তিপূর্ণ। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রাক্কালে নেপালেও সেখানকার কর্তৃত্ববাদী রানা শাসনের অবসানের দাবীতে সোচ্চার হন নেপালী জনগণ। ভারতের স্বাধীনতার পর 1950-এর দশকে রানা শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজা ত্রিভুবন নারায়ণ শাহকে নেপালের প্রকৃত শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষে ভারত নেপালী জনগণকে সহযোগিতা করে। কিন্তু নেপালী জনগণের আকাঙ্ক্ষা মত সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি কেননা পরবর্তী রাজা মহেন্দ্র বীরবিক্রম তা গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। তা সত্তেও 1959-এ নেপালে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র (Parliamentary Democracy) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই সরকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

1960 খ্রিস্টাব্দে রাজকীয় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নেপালের পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে রাজার ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভেঙে দেওয়া হয়। দুবছর পর বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে রাজা নেপালে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এরপর তিরিশ বছর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নানা পরিবর্তন ও সংশোধনের মধ্য টিকে ছিল। পঞ্চায়েত সংবিধান 1990-এর গোড়ায় নতুন এক সংবিধান গ্রহণের পর্যায় তৈরি করে। এই সংবিধানে নেপালকে চূড়ান্ত রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে বহুজাতি, বহুভাষা সম্পন্ন গণতান্ত্রিক স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র (multi-ethnic, multi-lingual, democratic, independent, sovereign Hindu state) হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এই সংবিধান জনগণকে নেপালের সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসাবে বর্ণনা করে নেপালের রাজাকে নেপালী জাতির প্রতীক (symbol of the Nepalese Nation)।

কিন্তু নেপালে গণতন্ত্রের এই যাত্রা সমস্যাবিহীন ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সংঘাত ও দলাদলি, নিরক্ষরতা, দারিদ্র, অপরাধ ও দুর্নীতি গণতন্ত্রের যাত্রাকে মন্থর করে দেয়। তবে

রাজা বীরেন্দ্র বীরবিক্রম জনগণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার বিরোধী শক্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এই অবস্থায় 1990-র দশকে ভুটানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পদক্ষেপের দ্বারা সৃষ্ট ভুটানী-নেপালী (ভুপালী Lhotshampas) শরণার্থীগণ দলে দলে নেপালে প্রবেশ করতে থাকে। প্রায় এক লক্ষ ভুপালী শরণার্থীকে নেপালে আশ্রয় দেওয়া হয় রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী শিবিরগুলিতে।

ভুপালীদের আগমন ছাড়াও নেপালের চূড়ান্ত আর্থ-সামাজিক দুরবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নেপালের মাওবাদী দলের রাজনৈতিক কার্যাবলী নেপালকে অস্থির করে তোলে। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানায় তারা। এমনকি তাদের লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য ভ্রাতৃঘাতী ও সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম শুরু করে মাওবাদীরা।

2001 খ্রিস্টাব্দে নেপালের রাজপ্রাসাদে রাজা বীরেন্দ্র সহ রাজপরিবারের অন্য সদস্যদের আকস্মিক দুর্ঘটনায় নেপালের রাজনীতিতে নয়া মোড় নিয়ে আসে। নতুন রাজা জ্ঞানেন্দ্র, তার পিতা মহেন্দ্রর মতই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করতে শুরু করেন। 2005-এর ফেব্রুয়ারী মাসে জ্ঞানেন্দ্র পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে শাসনক্ষমতা রাজার হাতে তুলে নেন। রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। নেপালের জনগণ জ্ঞানেন্দ্রর এই পদক্ষেপ মেনে নিতে পারেনি। মাওবাদী সমস্যার পরিবর্তে রাজাকে দেশের প্রধান শত্রু বিবেচনা করে নেপালে রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন শুরু 2006 খ্রিস্টাব্দে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর 2006-এর 6 এপ্রিল মাসে পার্লামেন্টকে ফিরিয়ে আনা হয়। November 21, 2006-এ স্বাক্ষরিত Seven Party Alliance (SPA)-এর মাধ্যমে নেপালের মাওবাদীগণও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসে। এই অবস্থায় নেপালকে Secular republic হিসাবে ঘোষণা করা হয়। রাজার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছেঁটে ফেলা হয়। এবং নেপাল নয়া গণতন্ত্রের দিকে এগোতে থাকে।

ভুটানের রাজনৈতিক বিবর্তন নেপালের থেকে খানিকটা ভিন্ন। 1907 খ্রিস্টাব্দে ভুটানের বর্তমান বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন উগেন ওয়াংচুক (Ugyen W angchuk 1907-1926)। উগেন ওয়াংচুক ও তার উত্তাধিকারী রাজা জিগমে ওয়াংচুক (Jigme W angchuk 1926-52) রাজার হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা (1947) ও গণতন্ত্রী চীনের (People's Republic of China PRC 1949) উত্থানের পর তাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া ভুটানের উপর এসে পড়ে। কারণ ভুটান ভারত ও চীনের মাঝখানে অবস্থিত। ফলে ভুটানেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

নতুন রাজা দোরজি ওয়াংচুক (1952-1972) ভুটানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ভুটানে সাংবিধানিক সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু করেন। 1953 খ্রিস্টাব্দে 150 জন সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় সভা (tshogdu) স্থাপন করেন। এই জাতীয় সভায় মোট তিন ধরনের প্রতিনিধিত্ব ছিল—ধর্মীয় প্রতিনিধি, সরকারি প্রতিনিধি ও জনসাধারণের প্রতিনিধি। 1966 খ্রিস্টাব্দে এই জাতীয় সভায় একটি নির্বাচিত স্পীকার (speaker) পদ নিয়োগ করা হয়। এমনকি রাজা 1968 খ্রিস্টাব্দে ঘোষণা করে যে যদি জাতীয়সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে রাজার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহলে দোরজি ওয়াংচুক পদত্যাগ করবেন এবং তার উত্তরাধিকারী হবেন তারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। 1969 খ্রিস্টাব্দে আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে জাতীয় সভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তার ভেটো (Veto) প্রয়োগ করার ক্ষমতা ত্যাগ করেন। ফলে ভুটানের জাতীয় সভা 1969 খ্রিস্টাব্দে তার পূর্ণ মর্যাদা লাভ করে। জাতীয় সভার পাশাপাশি ভুটানে একটি মন্ত্রীসভাও (Council of ministers) তৈরি করেন দোরজি ওয়াংচুক। তার সময়ই ভুটান রাষ্ট্রসংঘে যোগ দেয় (1971)।

1972 খ্রিস্টাব্দে দোরজি ওয়াংচুকের স্থলাভিষিক্ত হন সিংঘে ওয়াংচুক্ (1972 মার্চ)। সিংঘে ওয়াংচুক তাঁর শাসনকালের গোড়া থেকেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of power) প্রক্রিয়া শুরু করেন। বিকেন্দ্রীকরণের ফল হিসাবে 1981 খ্রিস্টাব্দে ভুটানের প্রতিটি জেলায় জেলা উন্নয়ন কমিটি (District Development Board or Dzongkha Yarge Thoching) তৈরি করা হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করে 1998 খ্রিস্টাব্দে সিংঘে ওয়াংচুক একটি নির্বাচিত মন্ত্রীসভার হাতে ক্ষমতার সিংহভাগ ছেড়ে দেন। এমনকি জাতীয় সভাকে রাজার বিরুদ্ধে অনাস্থা (Noconfidence) প্রস্তাব গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় 1999 খ্রিস্টাব্দে। রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগের আলাদা আলাদা রূপ দেওয়া হয় 2002 খ্রিস্টাব্দে। একই সঙ্গে ভুটানের দরজা বহির্বিশ্বের কাছেও খুলে দেওয়া হয়।

2005 খ্রিস্টাব্দ ভুটানের রাজনৈতিক উন্নয়নের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সময়। ঐ বছরের শেষের দিকে সিংঘে ওয়াংচুক ঘোষণা করেন যে তিনি স্বেচ্ছায় রাজপদ ত্যাগ করবেন। তাঁর পুত্র জিগ্‌মে কেশার নামগিয়াল (Jigme Khesar Namgyal) দেশের নতুন রাজা হবেন। পাশাপাশি দেশের গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়াকে বাস্তবে রূপদান করতে একটি নতুন সংবিধানের কাগজ তৈরি করা হয় যা 2004 খ্রিস্টাব্দে গৃহীত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন সংবিধানে বংশানুক্রমিক রাজপদ থাকলেও রাজনৈতিক দল গঠন ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠন করার ক্ষমতা দেওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখনীয় যে নেপালে রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন রাজা কিন্তু ভুটানে রাজা নিজেই গণতন্ত্রীকরণ (Democratization) প্রক্রিয়াকে মসৃণ করে দিয়েছেন।

রাজনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ভুটানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াও চালু হয় বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। 1961 খ্রিস্টাব্দ থেকে ভুটান ভারতের সহযোগিতায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five years plan) শুরু করে। এই পরিকল্পিত অর্থ উন্নয়নের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল (১) উৎপাদনের উৎসসমূহের ভাণ্ডার নষ্ট না করে পদের যথাযথ প্রয়োগ, (২) ব্যক্তিগত উদ্যোগের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি, (৩) আত্ম-নির্ভরতা, (৪) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, (৫) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও (৬) উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্যের অবসান ইত্যাদি। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গতি আনতে ভুটান SAARC, SAPTA ইত্যাদি দক্ষিয় এশীয় আঞ্চলিক সংগঠনগুলির সহযোগিতা গ্রহণ করছে।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল বক্তব্য ছিল Gross National Happiness (GNP)। এর অর্থ হল সকলের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা। GNP-র পাশাপাশি ভুটানী জাতীয়তাবাদের দাবী জোরদার করতে গিয়ে দক্ষিণ ভুটানে মূলত শ্রমিক হিসাবে নেপাল থেকে আগত নেপালীভাষী জনগোষ্ঠির নাগরিকত্বের অধিকারকে লঙ্ঘন করছে। এই সমস্যার পরিণতি হল 1990 থেকে ভুটান থেকে উৎখাত নেপালীভাষী (ভুপালী)-দের দলে দলে শরণার্থী হিসাবে নেপালে গমন। ভুপালী সমস্যায় ভুটান, নেপাল ও ভারত এই তিনটি রাষ্ট্রেরই স্বার্থ জড়িত আছে।

৩.৪ ❑ শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ

ভারত মহাসাগরে অবস্থিত শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ উভয়েই দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভ করার পর বহুভাষা ও জাতিগোষ্ঠি সম্বলিত শ্রীলঙ্কা

তার জাতিগঠন প্রক্রিয়া শুরু করে। Soulbury Commission-এর ভিত্তিতে গৃহীত 1947 খ্রিস্টাব্দে Soulbury Constitution শ্রীলঙ্কায় দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা তৈরি করে। House of Representative বা নিম্নকক্ষ ও Senate বা উচ্চকক্ষ বিশিষ্ট শ্রীলঙ্কার এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল 1972 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। 1947 খ্রিস্টাব্দে The Ceylon Independence Order-in Council (যা কার্যকরী হয় 1948-এর 4th February) গৃহীত হলে শ্রীলঙ্কায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তৈরি হতে থাকে। The United National Party (UNP 1947), Srilanka Freedom Party (SLFP 1951), The Lanka Sama Samaj Party (LSSP 1953), Bolshevik Leninist Party (BLP) ইত্যাদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। মূলত UNP ও SLFP-র হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়।

D.S. Senanayake-র নেতৃত্বে গঠিত প্রথম ক্যাবিনেট সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ঘটায় 1951 খ্রিস্টাব্দে নবগঠিত SLFP, UNP-র পরিবর্ত হিসাবে আবির্ভূত হয় S.W.R.D Bandarnaike-র নেতৃত্বে। তবে বন্দরনায়কের ক্যাবিনেট সরকারও ক্ষমতার অপব্যবহারের বদনামের ভাগীদার হয়।

1972 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টারী সরকারের আমলে সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা হল 1956 সালের নির্বাচন। এই নির্বাচনে শহুরে রাজনীতিবিদদের থেকেও বেশি শক্তিশালী হয় ওঠে গ্রামীণ নেতৃত্ব যা মূলত বেকারী, দারিদ্র এবং সিংহলী জাতীয়তাবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। তবে 1970 খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী শিরিমাভো বন্দরনায়কের নেতৃত্বে গঠিত United Front Government শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর ফলশ্রুতি হল 1972 খ্রিস্টাব্দের Republican Constitution.

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার অগ্রগতি উল্লেখনীয়। 1960-70 এবং 1970-80-র দশকে শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ছিল যথাক্রমে 4·6% এবং 4·3% । তবে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার অগ্রগতি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। পরিষেবা ও শিল্পে তার অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু শিল্পায়নের জন্য শ্রীলঙ্কা বড় উদ্যোগ গ্রহণ করে 1956-65 এবং 1970-77-এর বছরগুলোতে। 1977-র পরবর্তীকালে শ্রীলঙ্কা মুক্ত বাণিজ্যের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক নীতি শ্রীলঙ্কার বিদেশী ঋণের বোঝা কমাতে পারেনি।

অন্যদিকে সিংহলী জাতীয়তাবাদ শ্রীলঙ্কার তামিল জনগোষ্ঠি তথা ভারতীয় তামিলদের স্বার্থের পরিপন্থী হিসাবে উত্থিত হয়। এর পরিণতি হিসাবে তামিল জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়।

শ্রীলঙ্কার তুলনায় মালদ্বীপের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো খারাপ। 1968 খ্রিস্টাব্দ থেকে রিপাবলিক হিসাবে ঘোষিত মালদ্বীপের রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল হল তার রাজধানী মালে। এই দেশটির মূল আয় আসে মৎস্যশিল্প ও পর্যটন শিল্প থেকে।

৩.৫ ❑ পর্যবেক্ষণ

ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মূল সমস্যা হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মন্থরগতি। বহুভাষা, জাতি, ধর্ম, অঞ্চল নিয়ে গঠিত এই দেশগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা বহুলাংশে বিঘ্নিত করেছে। তবে 1985 খ্রিস্টাব্দে South Asian

Association for Regional Cooperation বা SAARC গঠিত হওয়ার পর দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও যৌথ উদ্যোগে সহমতে পৌঁছেছে। পাশাপাশি BIMST-EC (Bangladesh-India-Maldip-Srilanka-Thailand Economic Cooperation 1997) এবং SAFTA (South Asian Free Trade Agreement) তৈরি হওয়ার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি এসেছে।

৩.৬ ❑ অনুশীলনী

১। স্বাধীনোত্তর ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক বিবর্তন সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখুন।
২। বাংলাদেশের উত্থানের প্রেক্ষাপট ও পশ্চাৎপট আলোচনা করুন।
৩। হিমালয়ের রাজতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক বিবর্তন পর্যালোচনা করুন।
৪। পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতার উপর টীকা লিখুন।
৫। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৩.৩ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১। Dr. Parmanand : Political Development in South Asia, New Delhi, 1988.
২। J.C. Johari and others : Government and Politics of South Asia, New Delhi, 1991.
৩। Rup Kumar Barman : Ethnicity, Cultural Nationalism and Democratisation : A Study from Contemporary Bhutan, Kolkata, 2007.
৪। Rup Kumar Barman : Contested Regionalism, Delhi, 2007.
৫। Wayne C. Mc Williams & Harry Piotroski : The World since 1945, New Delhi, 2006.
৬। Anjali Ghosh, Tridip Chakrabarty and S.Sen (ed) : Nationalism, Democracy Development, Kolkata, 2007.

— — —

একক ৪ ❑ ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর ভারতের বৈদেশিক নীতি

গঠন

৪.০ ভূমিকা

৪.১ অর্থনৈতিক কূটনীতি

৪.২ Look East Policy

৪.৩ ভারতের পারমাণবিক নীতি ও তার প্রভাব

৪.৪ ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচির সূচনা

৪.৫ অনুশীলনী

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ ❑ ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও শীতল যুদ্ধের অবসানের বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ তথা নির্জোট আন্দোলনের শরিকদের বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভারতের বিদেশ নীতিতেও বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা হয়। একদিকে মিশ্র অর্থনৈতিক মডেল (Mixed Economic Model) থেকে ভারতের অর্থনীতির উদারীকরণ বিশ্বের বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহকে ভারতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে অন্যদিকে তার পারমাণবিক পরীক্ষা আন্তর্জাতিক মহলে শঙ্কার বাণী পৌঁছে দেয়। ফলে 1991 খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে ভারতের নতুন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy) অর্থনৈতিক কূটনীতিতে গতি সঞ্চার করে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। এই এককে শীতল যুদ্ধোত্তর ভারতের বিদেশনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহকে তুলে ধরা হল।

৪.১ ❑ অর্থনৈতিক কূটনীতি

শীতলযুদ্ধের অবসানের পর ভারতের অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উদারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় যা প্রকারান্তরে অর্থনৈতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। কারণ বিনিয়োগ ও আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে ভারতের নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার ফলে বিশ্বের বৃহ! অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ ভারতে বিনিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহী হয়।

1991-র জুলাই মাসে ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী P.V. Narashima Rao-এর নেতৃত্বে নয়া অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy) গ্রহণ করার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ভারতকে সারা বিশ্বব্যাপী তার বাণিজ্যিক সহযোগী বন্ধু খুঁজতে একপ্রকার বাধ্য করে। এই প্রয়োজনীয়তাই ভারতের বিদেশনীতির অর্থনৈতিক কূটনীতিতে (Economic Diplomacy) গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে।

ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের (ASEAN) অর্থনীতির গঠনগত সাদৃশ্য এবং মিশ্র অর্থনীতি থেকে ভারতের ক্রমশ সরে আসার ফলে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ভারতের সঙ্গো অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ASEAN (Association for Southeast Asian Nations) ভারতকে নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক সহযোগী হিসাবে বাছাই করে। উদারীকরণে ভারতের দুর্দমনীয় প্রগতি ASEAN দেশগুলিতে মোহিত করে এবং ASEAN ভারতকে তার Sectoral Dialogue Partner হিসাবে গ্রহণ করে 1992 খ্রিস্টাব্দে। বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, কারিগরি ও পর্যটন প্রভৃতি বিষয়ে ভারত ও ASEAN-এর সম্পর্ক গভীরতা হয়। 1996 খ্রিস্টাব্দে ভারত ASEAN Regional Forum (ARF)-এর সদস্যপদ লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত 2002 খ্রিস্টাব্দে ভারত ASEAN Summit Partner হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ASEAN-এর সঙ্গো ভারতের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের পেছনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল অন্যতম চালিকা শক্তি।

গঠনের পর থেকে World Trade Organisation বা WTO-র ক্রমশ উন্নয়ন ও বিস্তার ভারতকে WTO-র সঙ্গো গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিস্তারে আগ্রহী করে তোলে। WTO-এর বিষয়গুলো গভীরভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা WTO-র সদস্যরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত। ফলে ভারত WTO-র সঙ্গো সম্পর্ক তৈরি করার মধ্য দিয়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গো বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিস্তারের সুযোগ পায়। জেনেভাতে অনুষ্ঠিত Second WTO Ministerial Conference-এ ভারতের অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ভারতের প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ এনে দেয়।

WTO-র পাশাপাশি ভারত আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট (Regional Economic Forum) গঠনে আগ্রহী হয়। 1997 খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে গঠিত Bangladesh-India-Myanmar-Srilanka-Thailand Economic Cooperation বা BIMST-EC-ই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। BIMST-EC-তে ভারতের অর্থনৈতিক সাফল্য তার কূটনীতিকে উদ্দীপিত করে। 1998 খ্রিস্টাব্দের 7 August ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত The BIMST-EC Economic Minister's Retreat-এ স্থির হয় যে প্রতিটি দেশ তার বিশেষ বিষয়ের উপর নিজস্ব উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে BIMST-EC-এর অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যবহারে সহযোগিতা করবে। তাই ভারত BIMST-EC-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রযুক্তি উন্নয়নে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পায়।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক ও পর্যটন মন্ত্রক The Confederation of Indian Industry কোলকাতায় 1998-র অক্টোবরে BIMST-EC Tourism Summit অনুষ্ঠিত করে। এখানে BIMSTEC-এর সদস্য রাষ্ট্রের পর্যটন মন্ত্রী, পর্যটন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং পরিবহণ বাণিজ্যের প্রতিনিধিগণ অংশ গ্রহণ করেন। এখানে BIMST-EC দেশগুলোর পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য কতকগুলো প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 2001 খ্রিস্টাব্দকে Visit BIMST-EC বছর হিসাবে ঘোষণা করা হয়। 1998-এর ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত BIMST-EC দ্বিতীয় মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করে ভারত পরিবহণ, পর্যটন ও শক্তি ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পাশাপাশি নেপালকে BIMST-EC-এর Observer হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

ভারত Group of 15 (G-15)-এ ব্যাপারেও শীতল যুদ্ধোত্তরকালে গুরুত্ব প্রদান করে। 1998-এর মে মাসে কায়রোতে অনুষ্ঠিত G-15-এর অষ্টম অধিবেশনে আন্তর্জাতিক অর্থবাজারের উন্নয়ন, Multiliteral Trading System-এর উন্নয়ন এবং G-15-র অভ্যন্তরণ বাণিজ্য বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। ভারতীয় প্রতিনিধিগণ সন্ত্রাসবাদ নির্মূল ও জীব-জগতের বৈচিত্র্যের রক্ষার উপরও গুরুত্ব

আরোপ করেন। 1999-এ G-15-এর নবম অধিবেশনে (Montego Bay, 1999 Feb) ভারতের প্রধান মন্ত্রী উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।

G-15-এর পাশাপাশি ভারত Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) ও Group of 77-এর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষে কাজ করে চলেছে। 1998-এর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত G-77 Trade Fair and Trade conference-ই তার প্রমাণ।

8.২ ❑ Look East Policy :

শীতল যুদ্ধোত্তর ভারতের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে Look East Policy বা পুবে তাকাও নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতি শুধুমাত্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সঙ্গো ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিবিড়তার গুরুত্ব প্রমাণ করছে না। এর মাধ্যমে ভারতও দঃ পূ এশিয়ার অধিচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ঐতিহ্যকে স্বীকার করা হচ্ছে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়া তথা চীন, জাপান ও কোরিয়ার সঙ্গো ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অতিপ্রাচীন। মূলত সামরিক অভিযান এবং অর্থনৈতিক আদানের প্রদানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি পূর্বের এই সমস্ত দেশে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। ফলে ভারতে ও পূর্বের এই দেশগুলির সঙ্গো সম্পর্ক কখনই ছিন্ন হয়নি। এমনকি ঔপনিবেশিক আমলেও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ যেমন বার্মা বা বর্তমান মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ও মালেশিয়া ব্রিটিশ অধীনে থাকায় ভারতের সঙ্গো এদের সংযোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন।

কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতের জাতীয় পুনর্গঠন ও নিরাপত্তার প্রশ্নে এই দেশগুলির সঙ্গো ভারতের সংযোগ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও ইন্দোনেশিয়া ভারতের মত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তার সঙ্গো জ্ঞানবিজ্ঞান তথা কারিগরীর প্রশ্নে ভারতের পাশ্চাত্যের সঙ্গো নিবিড় যোগাযোগ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় শীতল যুদ্ধের বিকাশ ভারতের সঙ্গো দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ দুর্বল করে দেয়।

ভারতের বিদেশ নীতিতে Look East বলতে আমরা সাধারণভাবে ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) এবং তিনটি পূর্ব এশীয় দেশ অর্থাৎ চীন, জাপান ও কোরিয়ার দিকে তাকানোর কথা বুঝি। কিন্তু 1890 খ্রিস্টাব্দে ভারতে তথা বিশ্বখ্যাত সমাজ জাগরণের নেতা স্বামী বিবেকানন্দ যখন জাপানীদের স্বাধীনতা বজায় রাখার অতুলনীয় স্পৃহা ও আধুনিকীরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তখন তিনি জাপানের দিকে তাকাতে বলেছিলেন। ভারতের সঙ্গো জাপানের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয় যখন ওকাকুরা তেনসিন (Okakura Tenshin 1862-1913) স্বামীজি ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গো মিলিত হন। 1901 খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী স্থাপন করলে বিশ্বভারতী হয়ে ওঠে ভারতে জাপানী বুদ্ধিজীবী, সাধু, কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রধান দর্শনীয় স্থল।

1904-05 খ্রিস্টাব্দে এশীয় জাপানের হাতে ইউরোপের শক্তিশালী দেশ রাশিয়ার পরাজয় পুনরায় ভারতীয়দের জাপানের প্রতি আকৃষ্ট করে। জাপানের এই জয় এশীয় দেশগুলিকে ইউরোপীয়দের উৎকৃষ্টতা নিয়ে সন্দেহ ও প্রশ্ন তোলার সুযোগ এনে দিয়ে এশীয় জাতীয়তাবাদকে উদ্দীপিত করেছিল। এর দ্বারা ভারতীয়রাও বলতে শুরু করলেন প্রাচ্যের যে-কোন দেশই স্বাবলম্বীতা ও উৎকর্ষতা অর্জন করতে পারে

যদি সে সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করতে পারে। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ বিশেষ করে দাদাভাই নৌরজী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, লালা লাজপত রায় এবং বালগঙ্গাধর তিলক জাপানের থেকে ভারতীয়দের শিক্ষাগ্রহণ বিশেষ করে স্বাদেশিকতা ও আত্মত্যাগের মন্ত্র গ্রহণ করার কথা বার বার বলতে থাকেন।

শুধুমাত্র সাফল্য নয় জাপানের সাফল্যের পেছনে প্রধান প্রধান কারণগুলোকে জানার জন্যও ভারতীয়রা ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। মহিশূরের দেওয়ান মোক্ষাগুন্দম বিশ্বেশ্বরায়া (Mokshagundam Visvesvaraya 1861-1962) জাপানের শিল্পায়ন ও সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারে অবিশ্বাস্য সাফল্যের ইতিহাস জানার জন্য 1898-এ জাপানে পাড়িদেন। ভারতের হায়দরাবাদ রাজ্যও Sayed Masud-এর নেতৃত্বে জাপানের শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামোর সাফল্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করার জন্য এক মিশন পাঠিয়েছিল। জাপান থেকে শিল্পোৎপাদনের শিক্ষা গ্রহণ করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করার (ঘড়ি, বাসনপত্র, পেন্সিল, দেশলাই, বস্ত্র ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। জাপানের প্রযুক্তি ভারতীয়দের কাছে ব্রিটিশ পণ্যের পরিবর্ত হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।

কিন্তু জাপানের প্রতি ভারতের আকর্ষণ খুব বেশি কার্যকরী হওয়ার সুযোগ পায়নি বিংশ শতকের প্রথমার্ধে, কারণ ভারত ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন। ফলে পরাধীন ভারত শিল্পোউদ্যোগে জাপানী মডেল সরাসরি গ্রহণ করতে পারেনি। কেবলমাত্র হায়দরাবাদ দেশীয় রাজ্য কিছুটা জাপানী পদ্ধতি গ্রহণ করতে পেরেছিল।

অন্যদিকে 1902 খ্রীস্টাব্দের Anglo-Jepanese Alliance স্বাক্ষরের দ্বারা (যা 1907-এ নবীকৃত হয়েছিল) জাপান ব্রিটিশদের সঙ্গো সুসম্পর্ক তৈরি করেছিল। তাই ভারতীয়রা জাপানের সহমর্মীতা আদায় করার চেষ্টা করলেও রাজনৈতিক কারণে তা সম্ভব ছিল না। তবে জাপানী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। 1903 খ্রিস্টাব্দে গঠিত Indo-Japanese Association এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ওকুমা সিগেনবু (Okuma Shigenable 1838-1922), জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ 1907-এর November মাসে Kobe Chamber of Commerce-এ ভাষণদান কালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সরাসরি বিরোধিতা করেন এবং জাপানীদের ভারতের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করার জন্য আহ্বান জানান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ভারতের অনেক নেতৃবর্গ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের সঙ্গো যোগাযোগ করার উপর জোর দেন। এশীয়দের একতার উপর জোর দিতে গিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরপর তিনবার 1916, 1924 ও 1929 খ্রিস্টাব্দে জাপান ভ্রমণ করেন। কবিগুরু জাপানীদের শিল্পোৎপাদনে অতিরিক্ত আগ্রহ কর্মোদ্যরে নিয়মানুবর্তিতা সময় জ্ঞান এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি তাদের উন্নয়ন দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি জাপানকে আবিষ্কার করেছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং প্রথাগত সামাজিকতা ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ হিসাবে। কিন্তু 1930-এর পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলির মত জাপানের আগ্রাসী মনোভাব কবিগুরুকে হত্যোদ্যম করেছিল। তবে তিনি একথা বারবার বলেছিলেন যে জাপানীরা একদিন তাদের আগ্রাসী মনোভাবের অসারতা বুঝতে পারবে।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জাপানীদের সহযোগিতায় ভারতকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু জাপানের (1946-এ 6th and 9th) হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় জাপানী সহযোগিতায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে ধূলিসাৎ করে দেয়। যাইহোক

1947 খ্রিস্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটো রাষ্ট্র তৈরি করে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করে।

যুদ্ধোত্তর জাপানের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও সদ্য স্বাধীন ভারতের জাতি গঠন প্রক্রিয়া ভারত ও জাপানকে কাছে টেনেছিল। 1952 India-Japan Peace Treaty তার প্রমাণ। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু (1889–1964)-র জাপান ভ্রমণ ও ভারত থেকে কাঁচা লোহা রপ্তানীর মাধ্যমে ভারত জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। পাশাপাশি ১৯৫০-এর দশকের জাপানে ভারতকে Most liked and respected country হিসাবে ঘোষণা করা হয়। 1958 খ্রিস্টাব্দে ভারত-জাপানের প্রথম Official Development Assistance loan পায়। তা সত্তেও জাপান ও ভারতের সম্পর্ক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়নি।

অর্থনৈতিক, সামরিক ও ভৌগোলিক কারণে এশিয়ার প্রথম আঞ্চলিক জোট হিসাবে 1967 খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ড—এই পাঁচটি দেশের সংঘবদ্ধ সংগঠন ASEAN–এর গঠন এশিয়ার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। পরবর্তীকালে ব্রুনেই (1984), ভিয়েতনাম (1995), লাওস ও ময়ানমার (1997), এবং কম্বোডিয়া (1999) এই পাঁচটি দেশ ASEAN–এ যোগ দেওয়ার ফলে এর সদস্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় 10–এ।

সমবেত কণ্ঠে এই ASEAN–এর সদস্যরা তার মুক্ত বাজারী অর্থনীতির প্রচার চালায় জাপান, আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে। ধীরে ধীরে ASEAN একটি সফল বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক জোট, বিনিয়োগের ক্ষেত্র, যৌথ উদ্যোগ ও পর্যটনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। 1980–র দশকে ভারত এই জোটের প্রতি আকৃষ্ট হয় কিন্তু USSR–এর সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ থাকার ফলে ASEAN ভারতকে আমন্ত্রণ জানায়নি। পাশাপাশি ভারতের রুদ্ধদ্বার অর্থনৈতিক (Closed economy) মডেলও এর জন্য দায়ী ছিল।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও শীতল যুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরস্পর নির্ভরশীলতার পথে হাঁটতে শুরু করে। তখন থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে বহুমেরুবিশিষ্ট পৃথিবীর মধ্যে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি জোট হিসাবে এবং আলাদা আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে।

বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে পূর্বে তাকাও নীতি (Look East policy)–র প্রবর্তন করেন মালেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মাহমূদ। মাহাথিরের কাছেও Look East–এর অর্থ হল জাপানের দিকে তাকানো। কারণ তিনিও জাপানের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রগতির দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যদি জাপানের মত এশীয় দেশ এই রকম অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে পারে তাহলে এশিয়ার অন্যান্য দেশই তা পারবে না কেন?

ভারতের ক্ষেত্রে Look East policy নির্ভর করে আছে তার অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সুফল গ্রহণ করতে গেলে ভারতের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের প্রধান ক্ষেত্র হতে পারে ASEAN। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক সফলতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 1991 খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পি. ভি. নরসীমা রাও Look East policy গ্রহণ করেন যার অর্থ ছিল পূর্ব-এশিয়া, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া—এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি করা।

প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গন্ধীর আমল থেকেই পুবে তাকাও নীতির সূচনা হয় যখন তিনি ASEAN–র বিভিন্ন দেশের রাজধানী শহরগুলো ভ্রমণ করেছিলেন। 1988–র ডিসেম্বর-এ চীনের সঙ্গে নয়া সম্পর্ক স্থাপনে রাজীব গান্ধীর প্রয়াস ও তাঁর জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ পুবের দেশগুলোর

কাছে এই বার্তা বহন করেছিল। যে ভারত ক্রমশ সোভিয়েতের পতন ও শীতল যুদ্ধের অবসান এক্ষেত্রে ভারতকে বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও তাঁর অর্থমন্ত্রীর সহযোগিতায় ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করেন। অর্থনৈতিক সংস্কার বিনিয়োগ ও আমদানী-রপ্তানীর বিধিনিষেধ অনেকটা কমিয়ে দেয়। ভারতের এই অর্থনৈতিক উদারীকরণ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কাছে এক নতুন বার্তা পৌঁছে দেয়। ভারত ও ASEAN পরস্পর পরস্পরের বিনিয়োগ ও আদানপ্রদানের ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই অর্থনৈতিক যুক্তিতেই 1992 খ্রিস্টাব্দে ASEAN ভারত Sectaral Dialogue partner হিসেবে চিহ্নিত করে এবং 1996 খ্রিস্টাব্দে Full Dialogue pertner-এ পরিণত হয়। ASEAN-এর সঙ্গে ভারতের এই সম্পর্ক পুবের অন্যান্য দেশ—চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার (ASEAN+3) সঙ্গেও অর্থনৈতিক সুসম্পর্ক স্থাপনে সহযোগিতা করে। একজন Full Dialogue partner হিসাবে ভারত ASEAN Regional Forum (ARF)-এর বাৎসরিক বৈঠকগুলোতে আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব আলোচনা করার সুযোগ পায়।

শীতল যুদ্ধের অবসান ও ARF-এ ভারতের যোগদান এবং ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরণ ভারত, জাপান সম্পর্কে উন্নতি ঘটায়। 1990 খ্রিস্টাব্দে জাপানের প্রধানমন্ত্রী Toshiki Kaifu-র ভারত ভ্রমণ এবং 1990 খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাষ্ট্রপতি আর ভেঙ্কটরামন-এর জাপান ভ্রমণ ভারত-জাপান সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়া মাত্রা যোগ করে। এরপর প্রতিবছরই ভারত ও জাপানের প্রতিনিধিদের পারস্পরিক ভ্রমণ এই দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গতি এনে দেয়।

কিন্তু 1998 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে পোখরানে ভারতের পরমাণু পরীক্ষা-নিরীক্ষা জাপানের সঙ্গে সুসম্পর্কে ছেদ ঘটায়। এমনকি রাষ্ট্রসংঘে Group-8, ARF-এ ভারতের এই পদক্ষেপের সমালোচনায় জাপান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জাপানও ভারতের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল। যেহেতু জাপানের ODA ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা অংশ ছিল তাই জাপান এই পদক্ষেপ নেওয়ায় ভারত জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। ভারতের নিরাপত্তা ও তার আঞ্চলিক অবস্থানের গুরুত্বের প্রশ্নকে অস্বীকার করায় ভারত জাপানের সমালোচনাও করে।

যাই হোক উভয় দেশই পুনরায় কাছে আসতে থাকে। 2000-এর আগস্ট মাসে জাপানের মন্ত্রী Molei Yoshilo-র ভারত ভ্রমণ ভারত-জাপান সম্পর্কের একটা নতুন পদক্ষেপ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় Molei Yoshileo ভারত-জাপানকে Global partners হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তথ্যপ্রযুক্তিতে ভারতের সাফল্যের দ্বারা আভিভূত হয়ে Molei ভারত ও জাপানের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিনিময়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

2001 খ্রিস্টাব্দের 11ই সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের World Trade Center-এর সদর দপ্তরের জঙ্গী হানা ভারত ও জাপানকে আরো কাছে এনে দেয়। সন্ত্রাসবাদ দমনে শুধুমাত্র যৌথ উদ্যোগ নয়, সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে ভারতের আশঙ্কা বিশেষ করে ভারতে সন্ত্রাসের বিস্তারে পাকিস্তানের মদত ও চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সমস্যাকে বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবার বুঝতে শিখল। ফলে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে জাপান পুনরায় আগ্রহী হয়ে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করে (October, 2001)। এর পরিণতি হিসেবে December, 2001-

এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জাপান ভ্রমণ ভারত-জাপান সম্পর্ককে স্বাভাবিক করে তোলে।

অন্যদিকে November, 2001 ভারতের সঙ্গো ASEAN-এর সম্পর্কের আরো উন্নতি ঘটে। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সম্পর্কেরই উন্নয়ন ঘটায়নি। Look East Policy গ্রহণ করে ভারত তার নিরাপত্তার প্রশ্নে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, এমনকি চীনের সঙ্গো নিরাপত্তার কূটনীতি বিস্তার করে।

৪.৩ ❑ ভারতের পারমাণবিক নীতি ও তার প্রভাব

শীতল যুদ্ধোত্তর ভারতের বিদেশ নীতি তথা নিরাপত্তার প্রশ্নে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত 1998 খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রাজস্থানের পোখরাণের মরু অঞ্চলে ভারতে পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সারাবিশ্বের কাছে এক নতুন বার্তা পৌঁছে দেয়। একদিকে ভারত তার নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে অন্যদিকে তার সমালোচনাও কম হয়নি। এই অংশে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল।

৪.৪ ❑ ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচির সূচনা

ভারতের পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক কর্মসূচির মূল সূচনা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলেই শুরু হয়েছিল। ভারতে অসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচি (Civilian Nuclear program) মূলত শুরু হয় ১৯৩০-এর দশকে ভারতের বিখ্যাত পদার্থবিদ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা (Homi J. Bhaba)-র একান্ত প্রচেষ্টায়। তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত পদার্থবিদ Lord Ernest Rutherford-এর সঙ্গো গবেষণা করতেন। ভাবা ভারতে ফেরার পর ভারতের শিল্পগোষ্ঠি বিশেষ করে 'টাটা পরিবার'-কে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ভারতে পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার (Nuclear physics) গবেষণার জন্য একটি উন্নতমানের গবেষণাগার প্রয়োজন। এরই ফলশ্রুতিতে 1945 খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই-এ স্থাপিত হয় Tata Institute for Fundamental Research (বা TIFR)। ভারতের স্বাধীনতার পর ভাবা ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে পারমাণবিক শক্তি অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করেন। কারণ ভাবার মতে ভারতের দারিদ্র মোচন করে শিল্পোন্নয়নের জন্য দরকার হল পারমাণবিক শক্তির। এই ভাবনার পরিণতি হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে Department of Atomic Energy তৈরি হয় 1954 খ্রিস্টাব্দে। ভাবা এই সংস্থার প্রধান নিযুক্ত হন।

তবে নেহেরু প্রকাশ্যভাবে পারমাণবিক অস্ত্র (Nuclear weapons) প্রতিযোগিতার বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে কোন আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ বা বিরোধকে পারমাণবিক অস্ত্রের দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়। নেহেরুর ভাবনা মূলত ছিল গান্ধীবাদী নীতির উত্তরাধিকার। নেহেরু আরো মনে করতেন যে অতিরিক্ত সামরিক প্রস্তুতি ভারতের সমাজে সামরিকীকরণ ঘটাবে। আর সামরিক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে 'a necessary evil'।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেহেরু জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (Non-Alignement Movement NAM) বা সামরিক জোটসমূহ থেকে দূরত্ব বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করলেও ভাবাকে পারমাণবিক গবেষণার উৎসাহ জুগিয়ে যান। ভাবা এক্ষেত্রে পারমাণবিক জ্বালানী ও তা সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেশীয় পদ্ধতির উপর জোর দেন। 1958 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পদার্থবিদ, নিরাপত্তা পরামর্শদাতা Lord P.M.S.

Blackett-এর সঙ্গো আলোচনা কালে ভাবা পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের উপর তাঁর উৎসাহের কথা প্রকাশ করেন। আর তার চার বছর পর ভারত-চীন যুদ্ধ (1962) এর প্রয়োজনীয়তাকেও তুলে ধরে।

1962 খ্রিস্টাব্দের ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধ ভারতের বিদেশনীতি তথা সমরসজ্জার দুর্বলতাকে প্রকট করে তোলে। Chinese People's Liberation Army ভারতের প্রায় 14000 sq. mile অঞ্চল দখল করে নেয়। ভারত ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ঘটলে নেহেরু সামরিক খাতে বেশি পরিমাণে ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন। ফলে ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচিতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়।

1964 খ্রিস্টাব্দের 16ই অক্টোবর চীন লপ নোর (Lop Nor)-এ তার পারমাণবিক পরীক্ষা চালায় যা ভারতকে পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার তৈরি করতে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে। ভাবাও পারমাণবিক অস্ত্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে সোচ্চার হন। 1964-র Twelfth Pugwash Conference-এ তিনি বলেন—

Nuclear weapons coupled with an adequate delivery system can enable a state to destroy more ar less totally the cities, industry, and all important targets in another state. It is then largely irrelevaut whether the state so attached has greater destructive power at its command. With the help of nuclear weapons, therefore a state can acquire what we may call a position of absatute deterrence even against another having a many times greater destructive power under its control.

ভাবার বক্তব্যের কড়া সমালোচনা হলেও চীনের পারমাণবিক পরীক্ষা ভাবার মন্তব্যের সার্থকতা প্রমাণ করে এবং নিরাপত্তার স্বার্থেই ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। স্বতন্ত্র দল ও ভারতীয় জনসংঘ ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র রাখার প্রয়োজনীয়তাকে বারবার তুলে ধরে। তবে নেহেরু কোনভাবেই পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারে রাজী ছিলেন না।

নেহেরুর মৃত্যুর পর 1964 খ্রিস্টাব্দের December লন্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ঘোষণা করেন যে ভারত পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ থেকে পারমাণবিক নিশ্চয়তা পেতে চায়। শাস্ত্রীর এই মন্তব্যকে ঘিরে ভারতের রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্ক তুঙ্গো উঠে। All India Congress Committee-র 1965-র সম্মেলনে অনেকেই বলতে থাকেন যে নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলনের পথিকৃত ভারত যদি পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নামে তাহলে তার ভাবমূর্তি অনেকটাই নষ্ট হবে। তবে অনেক কংগ্রেস নেতাই ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র রাখাকে জরুরী মনে করতেন।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষায় শঙ্কিত হয়ে এই অস্ত্র যাতে আর বিস্তার লাভ না করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। রাষ্ট্রসংঘ 1965 খ্রিস্টাব্দে এ ব্যাপারে Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) একটা খসড়া তৈরি করে যেখানে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র ও পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারত এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতের প্রতিনিধিরা এই খসড়ায় আরেকটি বিষয় জুড়ে দেয় যেখানে বলা হয় যে পারমাণবিক শক্তিবিহীন রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক পরীক্ষা (Peaceful Nuclear explosions) চালাতে পারবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গো একমত ছিল না। তবে Eighteen Nations Disarmament Conference (ENDC) (জেনেভা, 1965)-এ ভারত বারবার এই বিষয়টির উপর জোর দেয়।

এদিকে 1965 খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু হলে ভারত পুনরায় তার নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। কারণ চীন পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তবে 1966 খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে গৃহীত Tashkent Agreement অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হলে ভারত পুনরায় Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT)-র দিকে ধাবিত হয়। 1968 খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়ন NPT-তে স্বাক্ষর করে যা 1970 খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যকরী হয়। ভারত এই চুক্তির প্রতি সহমত পোষণ করেনি।

পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা ও পোখরানের দিকে ভারত : ভারতের পারমাণবিক নীতিতে নির্দিষ্ট গতির সূচনা হয় 1974 সালে যখন ভারত পোখরানে তার পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করে। নিরস্ত্রীকরণ থেকে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা — ভারতের এই পরিবর্তনের পেছনে অনেক কারণ ছিল। বৃহৎ শক্তিবর্গের ভারতের নিরাপত্তার জটিল সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দিতে অনীহা, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ভারত-পাক যুদ্ধ এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে ভারতের উপর মার্কিন চাপের কারণে ভারত পারমাণবিক সমরসজ্জায় আগ্রহী হয়ে।

অন্যদিকে হোমি ভাবার মৃত্যুর (1966) পর তাঁর উত্তরসূরী বিক্রম সারাভাই ভারতের পারমাণবিক গবেষণার পরিধি বিস্তারে বিশেষ মনোযোগ দেন। মহাকাশ গবেষণা এবং রকেট উৎক্ষেপণে ভারতের সাফল্য পারমাণবিক গবেষণাকে উৎসাহ দান করে। পাশাপাশি উত্তর ভারতে পারমাণবিক পরীক্ষার কাঁচামাল অর্থাৎ ইউরেনিয়াম ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জায় আর বাধা ছিল না। শুধুমাত্র দরকার ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের।

ভারত-পাক্ যুদ্ধের সমাপ্তি এবং পূর্ণপাকিস্তানের গর্ভ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থানের পর ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তিমান রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিপন্ন হতে থাকে। ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 1970-এর দশককে ভারতের পারমানবিক অস্ত্রপরীক্ষার সঠিক সময় হিসাবে চিহ্নিত করেন।

1974 খ্রিস্টাব্দে পোখরানে ভারতের প্রথম পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষাকে Peaceful Nuclear Explosion হিসাবে বর্ণনা করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম ঘোষণা করেন যে এই পরীক্ষার সঙ্গো সামরিক শক্তিবৃদ্ধির কোনো সংযোগ নেই। এটা কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণভাবে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের একটা পরীক্ষা মাত্র। এই পরীক্ষার সঙ্গো সম্পর্কিত বিজ্ঞানী R. Chidambaramও Raja Ramanna ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন। তা সত্তেও এই পরীক্ষার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয় সারা বিশ্বে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন চুপচাপ থাকলেও ভারতের প্রতি তাদের মনোভাব কখনই জটিলতা বিহীন ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা ভারতের সঙ্গো সমস্ত রকম পারমাণবিক সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়। পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের আশঙ্কা এবং নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ভারত তার পারমাণবিক গবেষণার ব্যাপারে প্রকাশ্যে কিছু বলাকে সাময়িক বন্ধ করে দেয়।

১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭-এ ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনের পর মোরারজী দেশাই এর প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ ভারতের পারমাণবিক নীতির বিশেষ পরিবর্তন নিয়ে আসে। দেশাই মূলত নৈতিক কারণে শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষারও বিরোধী ছিলেন। এমনকি তিনি প্রকাশ্য ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর আমলে ভারত কোনো ধরনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবে না।

1980-র জানুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রত্যাবর্তন, পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত সহযোগিতা এবং ক্ষেপনাস্ত্র গবেষণায় ভারতের সাফল্য পুনরায় ভারতের পারমাণবিক গবেষণায়

গতি সঞ্চার করে। 1983 খ্রিস্টাব্দে ভারতের Defence Research and Development Organization (DRDO)-এর উৎসাহে Integrated guided missile Development Program (IGMDP) ভারতের শক্তি গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করে। মহাকাশ বিজ্ঞানী A.P.J. Abdul Kalam কে ISRO (Indian Space Research Organisation থেকে সরিয়ে IGMDP-র দায়িত্ব দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের সামরিক শক্তির বিকাশে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। 1989 খ্রিস্টাব্দে কালামের নেতৃত্বে DRDO-র তত্ত্বাবধানে Intermediate Range Ballistic Missile (যা অগ্নি নামে পরিচিত) পরীক্ষা করে (1984 May 22)।

1984 খ্রিস্টাব্দে ইন্দিরার মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলে ভারতের পারমাণবিক নীতি খানিকটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে। রাজীব গান্ধী একদিকে সারাবিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রের অবসান ঘটানোর উপর জোর দেন, অন্যদিকে ভারতের পারমাণবিক গবেষণার বিকাশের উপর জোর দেন। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জায় পাকিস্তানের সাফল্য ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্ন হিসাবে উপস্থিত হয়। পাশাপাশি 1991 খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্নকে আরো জটিল করে তোলে।

অন্যদিকে 1995 খ্রিস্টাব্দে NPT-কে আরো বিস্তার করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়াস ভারতের পারমাণবিক শক্তির বিষয়টিকে জটিল করে তোলে। কেবলমাত্র ভারত, পাকিস্তান ও ইস্রায়েল NPT-র বাইরে থেকে যায়। কিন্তু 1995 খ্রিস্টাব্দেই পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিতঃশর্ত সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্নকে পুনরায় উজ্জীবিত করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী P.V. Narashima Rao মন্তব্য করেন যে পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন সাহায্য আসলে পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র মজুত করছে। একই সঙ্গে জেনেভাতে United Nations Disarmament Conference (UNDC)-এ Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)-র তোড়জোড় চলার ফলে ভারত পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার কথা ভাবতে থাকে। 1996 খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘ CTBT গ্রহণ করলেও ভারত তা সমর্থন করতে রাজী হয়নি।

Pokhran II : **পোখ্‌রান ২ :**

1997 খ্রিস্টাব্দে ভারতের সাময়িক রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটিয়ে উঠে BJP-র নেতৃত্বে নতুন সরকার ভারতের পারমাণবিক নীতিতে নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করে। ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচির প্রতি গভীর মনোযোগ দানে BJP-র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সরকার গঠিত হওয়ার পর কার্যে পরিণত হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়। 1998 খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল পাকিস্তান Ghauri নামের Intermediate Range Ballistic Missile উৎক্ষেপণ করে যা মূলত চীন ও উত্তর কোরিয়ার প্রযুক্তিতে তৈরি হয়েছিল। এই ক্ষেপনাস্ত্রের 750 k.g. ওজনের বিস্ফোরককে 1500 কিলোমিটার দুরে নিয়ে ফেলার ক্ষমতা ছিল। এই ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা পাকিস্তান মোট 26টি শহরকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত করে।

পাকিস্তানের এই সাফল্য ভারত সহজ মনে মেনে নিতে পারেনি। ভারতের BJP নেতৃত্বে চলা সরকার প্রত্যুত্তরে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার যুক্তি খুঁজে পায়। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী 9-10 May, 1998 রাজস্থানের পাখরানে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

পোখরানে ভারতের দ্বিতীয় পারমাণবিক পরীক্ষা আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিশেষ করে শীতল যুদ্ধোত্তর বিশ্ব যখন NPT (Nuclear Nonproliferation Treaty) গ্রহণ করেছে

তখন ভারতের এই পদক্ষেপ NPT-র অসারতা প্রমাণ করছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সহ লাতিন আমেরিকা NPT গ্রহণ করলেও ভারত, পাকিস্তান ও ইস্রায়েল এর বাইরে থেকে যায়। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণবিকীকরণ (nuclearization) সারা বিশ্বের শঙ্কর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪.৫ ❑ অনুশীলনী :

১। ভারতের অর্থনৈতিক কূটনীতির বিষয়ে টীকা লিখুন।
২। Look East Policy কি? ভারত ও ASEAN সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করুন।
৩। ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন।
৪। পোখরান বিস্ফোরণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪.৬ ❑ গ্রন্থপঞ্জী :

১. Ashok Kapur : Pohran and Beyond : India's Nuclear Bekhaviour, New Delhi, Oxford University Press, 2002.

২. Raju G.C. Thomas and Amit Gupta (eds) : India's Nuclear Security. New Delhi, Vistaar Publications, 2000.

৩. K. Raja Reddy : India and ASEAN : Foreign Policy Dimensions for the 21st Century, New Dethi, New Century Publications, 2005.

৪. R.K. Khilnani : Restructuring India's Forein Policy, New Delhi, Commonwealth Publishers, 2000.

— — —